বিষ্ণু প্রভাকর

ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ

(আওয়ারা মসীহা)

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ প্রামাণিক জীবনচরিত
[অখণ্ড সংস্করণ]

অনুবাদ
দেবলীনা ব্যানার্জি কেজরিওয়াল



ওরিয়েন্ট লংম্যান

প্রথম সংস্করণ ঃ মহালয়া ১৩৮৪

রেজিস্টার্ড অফিস
৫-৯-৪১/১ বশীর বাগ, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস
কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙগালোর ৫৬০ ০০১
৫-৯-৪১/১ বশীর বাগ, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯
জামাল রোড, পাটনা ৮০০ ০০১

প্রকাশক ঃ
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রক ঃ
গ্র্যাফিটেক্ ইন্ডিয়া লিমিটেড

'আওয়ারা মসীহা' পড়েছ?

যেখানেই গেছি এই একই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। অধীর আগ্রহে বইখানি পড়তে শুরু করি। 'আওয়ারা মসীহা'য় (ছন্নছাড়া মহাপ্রাণে) শরৎচন্দ্রকে নতুন আঙ্গিকে দেখার এই সুযোগ পেয়ে আমি অভিভূত হই। লেখক অত্যন্ত যত্ন, অনুসন্ধান ও পরিশ্রমে শরৎচন্দ্রের বহুবিতর্কিত সংশয়াচ্ছন্ন জীবনকে ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা ভাষায় এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর অভাবে বেদনা পেয়েছি। পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েছে এই শরৎকে সবার মনের দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু কেমন করে? চকিতে মনে হল, বইখানি যদি বাংলায় অনুবাদ করি, কেমন হয়? আমাদের জনমনের একক দাবিদার শরৎকে পুরোপুরি জানতে কে না আগ্রহী? এই বিশ্বাসই নিয়ত আমাকে 'আওয়ারা মসীহা' বইটিকে বাংলায় অনুবাদের প্রেরণা দিয়েছে।

বইখানি তন্ময় হয়ে পড়েছি আর ভেবেছি 'আওয়ারা মসীহা' হিন্দীতে শরতের সার্থক নামকরণ। আওয়ারা অর্থাৎ ভবঘুরে আর মসীহা মানে ত্রাণকর্তা বা দেবদূত। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই দুটি শব্দ হিন্দীতে সঠিক হলেও, বাংলায় এই নাম বেমানান। বর্তমানে সাহিত্য ও সমাজের ব্যাপক পরিসরে শরৎচন্দ্রের সুদূরপ্রসারী ভূমিকার জন্য শরৎচন্দ্রকে 'ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ' বলাই শোভন এবং সঙ্গত। লেখকের চোদ্দ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম সাধনা ও ভালোবাসার ফল আমায় উৎসাহ দিয়েছে। কী অনুরাগে একজন লেখক ভিন্ন ভাষার এক অদেখা রহস্যাবৃত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে এত মমতার সঙ্গে পাঠকদের কাছে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন, তা বোধহয় শুধু এই কারণেই যে, লেখকের কোনো জাত নেই। তাঁদের মৌন ভাষা যে অভিন্ন।

কী সেই অনুরাগ যা লেখকের অন্তর্মনকে এভাবে আলোড়িত করেছিল এবং যা তাঁকে বাংলা ভাষাই শুধু শিখতে বাধ্য করেনি, শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যখন যেটুকু পরিবেশ ও ঘটনার খোঁজ পেয়েছেন, সেখানেই আকুল হয়ে ছুটে গেছেন আর-এক ছন্নছাড়া মহাপ্রাণের মতোই!

সাহিত্যিককে জানতে হলে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য পড়তে হয়। সাহিত্যিকের ব্যক্তিমনের সঙ্গে তাঁর জীবনী-লেখকের সাক্ষাৎকার দরকারি নয়। শ্রী কালিদাস রায়কে একবার শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—আমার ভবিষ্যৎ জীবনী-লেখক অপরিচয়ের ব্যবধান ভেঙে আমার লেখা থেকে আমায় ঠিকই খুঁজে নেবে।

বিষ্ণু প্রভাকর কি সেই অন্বেষক নন?

বইটি পড়ার পর চির রহস্যাবৃতের যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে শরৎচন্দ্রের প্রতি আমাদের মন শ্রদ্ধায়, ব্যথায় আপনা থেকে ভিজে ওঠে। এই জীবনীটি বাস্তবিকই এক প্রতিজ্ঞারূঢ় সত্যান্বেষীর অপূর্ব নিষ্ঠার ফলশ্রুতি, যা তাঁর স্বচ্ছ সাবলীল লেখার ভঙ্গীতে আরও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

লেখকের বিস্তারিত মনোগ্রাহী ভূমিকা সত্ত্বেও কেবল একটি কথা না বলে পারছি না যে, লেখক বড় সুন্দরভাবে শরৎচন্দ্রের জীবনকে তিনটি ভাগে প্রকাশ করেছেন। 'দিশাহারা', 'দিশান্বেষণ' ও 'দিশান্ত'। প্রথম দুটি অধ্যায়ে ছন্নছাড়া এক ছেলে 'ভবিষ্যৎ সার্থকতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সমাজের আর পাঁচজনের মতোই লেখকের কাছ থেকেও সাধারণ স্বাভাবিক ব্যবহার পেয়েছে। অর্থাৎ শরৎ তখন—'সে'।

কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে বর্মা থেকে পাকাপাকি ভাবে ফিরে আসার পর যখন বাংলার সাহিত্যাকাশে তিনি পরিব্যাপ্ত তখন আর শরৎ 'সে' নয়—তিনি, অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লেখকের এ মনোবিশ্লেষণ গুণগ্রাহী পাঠকের নিকট অবশ্য প্রশংসার্হ।

এই অধ্যায়ে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি ফটো ও গিরীন মামার (গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) চিঠির ফোটোস্ট্যাট কপি

বইটির গৌরব বাড়িয়েছে। শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার অনাবিষ্কৃত একটা দিকের পরিচয় এই বইখানিতে পাই। অন্য ভাষার সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। শরৎচন্দ্রের লেখা 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধটি বাংলা সংস্করণে সংযোজনা করা হয়নি কারণ এই প্রবন্ধটি বাংলায় আজ যথেষ্টই পরিচিত।

যে উৎসাহ নিয়ে প্রথমে অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলাম, বার বার বাধা পেয়ে তা ব্যাহত হয়েছে। লেখক নিজের বক্তব্যে যে অসুবিধার উল্লেখ করেছেন, অনুরূপ অসুবিধা আমাকেও ভোগ করতে হয়েছে। লেখকের মতোই শরৎ সম্পর্কে যাবতীয় বই, পত্র-পত্রিকা আমাকেও দেখতে হয়েছে। যে-সব জায়গা থেকে তিনি প্রতিটি ঘটনা ও উদ্ধৃতি নিয়েছেন, সেই মূল লেখাগুলি খুঁজে খুঁজে আমায় পড়তে হয়েছে, মেলাতে হয়েছে। মাঝে মাঝে দারুণ হতাশ হয়ে পড়েছি। হয়তো সামান্য দুটো লাইন, কিছু কথার জন্য নানান বইয়ের খোঁজ করতে হয়েছে নানান লাইব্রেরিতে। দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। তবুও ত্রুটিহীন কাজের যে আনন্দ, তা আমি পাইনি।

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তর্জমার কাজ কখনই সহজ নয়। ভাষার গভীরে প্রবেশ করতে না পারলে সার্থক ভাষান্তর অসম্ভব, বিশেষত এই বইখানি যখন কল্পনাশ্রিত কোনও উপন্যাস নয়। বইটি এমন একজন সাহিত্যিকের জীবনকাহিনী যিনি মানুষের মন থেকে আজও বিস্মৃত হয়ে যাননি, যাঁর সমসাময়িক লেখক, বন্ধু ও পরিচিতের সংখ্যা আজও বিরল নয়, এমন অবস্থায় শুধুমাত্র অনুবাদের কথা ভাবা যায় না। বাংলা ছাড়া অন্য যে কোনো ভাষায় বইখানি অনুবাদের ব্যাপারে এত অসুবিধার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ অনুবাদক মূল বইটি থেকেই সম্পূর্ণ সাহায্য পেয়ে যান। কিন্তু বাংলা ভাষায় এর জন্যেই তা সম্ভব নয়। কারণ শরৎচন্দ্র সর্বজনীন লেখক হলেও তাঁর সাহিত্য বাংলা ভাষায় সঞ্জীবিত ও তাঁর সম্পর্কে অধিকাংশ প্রামাণিক বই ও বাংলাভাষায়। অন্যান্য ভাষায় সামগ্রী থাকলেও তুলনামূলকভাবে তা কম। এ কারণেই লেখকের দেওয়া প্রায় সম্পূর্ণ বইয়ের তালিকা অনুবাদকাকেও দেখতে হয়েছে। লেখকের নিজস্ব পাণ্ডুলিপির ছ'টি ফাইল আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছি। যার ফলে কী ভাবে বইটি তিনি খাড়া করতে পেরেছেন, তার হদিশ পেয়েছিলাম।

কিন্তু আফসোসের কথা, বইখানি লেখার সময় বহু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তিনি মূল ভাষায় নোট করে রাখেননি, প্রয়োজন মতো ভাষান্তর করে নিয়েছেন। তবে যেখানেই তিনি উচিত মনে করেছেন অবশ্যই সেখানে ঘটনা, বই, বা সাল-তারিখের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেখানে শুধু কোনো উদ্ধৃত অংশটুকু লিখেই বোঝাতে চেয়েছেন, সেখানেই আমি ভীষণ মুশকিলে পড়েছি। আমারও দিশাহারা অবস্থাই হয়েছিল। কোথায় খুঁজি? কোন্ বইয়ে থাকতে পারে এমন চিন্তা আমায় অসংখ্যবার করতে হয়েছে। পাণ্ডুলিপি তৈরির বেশ কিছু দিন পর আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সাহায্য ও খোঁজ পাই। লেখার শুরুতে তা পেলে আমার পরিশ্রম লাঘব হত। 'দেশ' পত্রিকার শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা ও শরৎ সাহিত্য শতবার্ষিকী সংস্করণের পরিশিষ্টে আমি অনেক তথ্যের খোঁজ পাই। বেনারস, কলকাতা যখন যেখান থেকে খোঁজ পেয়েছি তা সংগ্রহ করেছি ও লিখেছি। যা আমি পাইনি, তা আমার কথায় বুঝিয়েছি। লুপ্ত সংস্করণ কোনো বই বা পত্রিকা লাইব্রেরি ইত্যাদিতেও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলে, সেই সব জায়গায় খোঁজ নিতে হয়েছে যাঁদের কাছে মূল জিনিসটি সংরক্ষিত রয়েছে। স্বনামধন্য উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ ব্যাপারে আমায় আন্তরিক সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

এই বইটি বাংলায় অনুবাদ হওয়ার আগেই সিন্ধী অনুবাদ প্রকাশিত হয়; গুজরাতি, তেলুগু ও পাঞ্জাবি ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু হয়। মরাঠি ও মালয়ালম ভাষাতেও অনুবাদের ব্যাপারে কথাবার্তা চলছিল। হিন্দীতেও দ্বিতীয় সংস্করণ সমাপ্তপ্রায়। এ-সবই বইটির জনপ্রিয়তার প্রমাণ। লেখক এবং আমি দুজনেই শরৎ শতবার্ষিকী বৎসরে বাংলা অনুবাদ প্রকাশের স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু কোনো গবেষণামূলক কাজের অনুবাদ তাড়াতাড়িতে করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করিনি। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, যাতে বইখানি অনূদিত বই না হয়ে মূল গ্রন্থ হিসাবে

বাঙালি পাঠকের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

লেখার প্রারম্ভে নানান অসুবিধার জন্যে অনুবাদ-কর্মের প্রতি অনুরাগ আমি বজায় রাখতে পারিনি। লিখে আর কী হবে ভেবে রাশ আলগা করে ঢিলে দিয়েছি। অনিবার্যভাবেই এড়ানো চলে না এমন সব প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে বেশ কিছুদিন হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু একাজে নিশ্চেষ্ট হয়ে যিনি আমায় থাকতে দেননি, তিনি আমার স্বামী ডঃ ওমপ্রকাশ কেজরিওয়াল। প্রতিদিন অনলসভাবে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন - আজ কতটা লিখেছ? লিখিনি শুনে চুপ করে গেলেও পরের দিন আবার সেই একই প্রশ্ন। আমাকে নিয়মিত এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বইয়ের খোঁজেও তিনি আমায় সাহায্য করেছেন। শেষের দিকে কেবল তাঁর আগ্রহ ও তাগিদের ভয়েই নয়, দুঃখ পাবেন ভেবেও তাড়াতাড়ি লেখা সম্পূর্ণ করতে হয়েছে। আমি যখন বার বার নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েছি, তখন তিনিই উৎসাহ যুগিয়ে ত্বরান্বিত করেছেন আমার কাজকে। আজ যখন বই প্রকাশনের আয়োজন সম্পূর্ণ, তখন মনে হচ্ছে এমন অকপট, সদয় ও সহযোগিতামূলক আনুকূল্য না পেলে লিখতেই পারতাম না।

এই বইখানি অনুবাদের মূলে ছিলেন সাপ্তাহিক হিন্দুস্থান পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক আমাদের একান্ত আপন শ্রী গোবিন্দপ্রসাদ কেজরিওয়াল। এমন শরৎ-অনুরাগী লোক আমি দেখিনি। তাঁরই আগ্রহে শ্রীবিষ্ণু প্রভাকর নিজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি অনুবাদের ভার নিশ্চিন্তমনে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমার বিরাট পাণ্ডুলিপিখানি দেখে বলেছিলেন-কোনো প্রকাশকের সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ না করেও বইটি বাংলায় অনুবাদ করে যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছ, তা ব্যর্থ হবার নয়। বাংলায় বইটির সম্পূণ অনুবাদ হাতে পেয়ে অবশ্যই তিনি খুশি হবেন।

পাণ্ডুলিপি তৈরির পর স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশনের প্রশ্ন ওঠে। আমি বাংলার কোনো প্রকাশককে জানি না, কোথাও কোন পরিচয় নেই। এ ব্যাপারে সবার আগে উদ্যোগী হয়েছিলেন নিখিল ভারত মারওয়াড়ি সম্মেলনের সভাপতি, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কবি শ্রীভঁওরমল সিংঘী। তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় গোবিন্দ প্রসাদজীর মাধ্যমে। বইটি তাড়াতাড়ি প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীসিংঘীর আগ্রহের সীমা ছিল না। একদা শ্রী নিরঞ্জন হালদার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই বইখানি প্রকাশের কথা তোলেন। তখন অবাক হয়ে ভেবেছিলাম আমি তো তাঁকে চিনি না। আমার মত প্রবাসীর এই প্রচেষ্টার খবর তিনি কেমন করে জানলেন? পরে জেনেছি, এ কৃতিত্বও শ্রীসিংঘীর। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রী নিরঞ্জন হালদারের মাধ্যমে বই প্রকাশনের ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছেন। বর্ষীয়ান শ্রী সিংঘীজীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

শ্রীনিরঞ্জন হালদারের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। এই অনুবাদ-গ্রন্থের প্রকাশন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ দুবারই তিনি নিঃস্বার্থভাবে নিজের দায়িত্বে দেখেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি আমার আগেকার ও বর্তমান প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম।

পরিশেষে, আমার সহোদরা তপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা না বললে সবটুকু বলা হয় না। দিল্লিতে বাংলা টাইপের সুবিধা না থাকায় বেনারস থেকে সে আমার লেখা ১৩০০ পৃষ্ঠার বিরাট পাণ্ডুলিপি অফুরান আগ্রহে তৈরি করে দেয়। নানান বই, পত্র-পত্রিকা থেকে সংশোধন ও সংযোজনার সূক্ষ্ম দায়িত্ব একটানা বিরামহীন ভাবে পালন করেছে। আমার পরিশ্রমকে সে সার্থকতায় পরিণত করেছে। চিরস্নেহের ছোট বোনটির ঋণ আমি ভালোবেসে স্বীকার করছি।

কলকাতার এক প্রকাশক ১৯৭৭ সালে বইটির অংশবিশেষ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। বইটি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে 'আনন্দ পুরস্কারে' সম্মানিত হয় এবং সুধীসমাজেও আদৃত হয়। দ্বিতীয় অংশ প্রকাশে চূড়ান্ত বিলম্ব এবং বিশেষ কারণে প্রকাশকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে তিক্ত হওয়ায় আমরা অন্য প্রকাশকের শরণ নিতে বাধ্য হই।

মূল হিন্দী বইটিতে ছিল না এমন কিছু ছবি ও পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা, 'পথের দাবীর' প্রথম বাজেয়াপ্ত সংস্করণে শরৎচন্দ্রের নিজের হাতের সংশোধিত দুটি পৃষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

অপ্রেরিত চিঠি সমেত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিঠি, অপ্রকাশিত রচনার অংশবিশেষের প্রতিলিপি বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হল।

জাতীয় গ্রন্থাগারের আশুতোষ সংগ্রহ থেকে এগুলি সংগৃহীত। ওই বিভাগের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী কল্যাণী মৈত্র এগুলির সন্ধানই শুধু আমায় দেননি, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সর্ব রকমে সাহায্য করেছেন। বইটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর এত বহুমূল্য তথ্যের সংযোজন বইটির সমৃদ্ধি নিঃসন্দেহে বাড়িয়েছে। তাঁকে আমার প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন জানাই।

আমার শ্রদ্ধেয় দাদা শ্রী বারীন্দ্রলাল মৈত্র বইখানি মুদ্রিত হওয়ার সময় ক্লান্তিহীন সহযোগিতা করেছেন, তাঁকেও আমার আন্তরিক প্রণাম জানালাম।

শ্রীযুক্ত মানিক মুখোপাধ্যায় দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি ছবি দিয়ে বইটির উৎকর্ষমান বৃদ্ধি করেছেন—তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

'সুবর্ণরেখা'র শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার ও সাংবাদিক শ্রীনিরঞ্জন হালদারের চেষ্টায় অরুণা প্রকাশনী সম্পূর্ণ বইটি প্রকাশে উদ্যোগী হন। পরবর্তীকালে শ্রীনির্মাল্য আচার্যের উদ্যোগে ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড থেকে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। এ-ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য আমরা অরুণা প্রকাশনীর নিকট কৃতজ্ঞ। অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেডের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। আমি এঁদের সকলের নিকটেই ঋণী।

বাংলার বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিকের লেখা আমি হিন্দীভাষী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছি। আজ হিন্দী ভাষার এক শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে বাঙালি পাঠকের হাতে পৌঁছে দিলাম। বাংলার শরৎকে বাংলার বাইরের ভালোবাসার আঙিনা থেকে বাংলার ঘরে আবার পাঠিয়ে দিলাম। আমার এ চেষ্টা কতখানি সার্থক হতে পেরেছে, সে বিচারের ভার থাকল সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার হাতে।

দেবলীনা ব্যানার্জি কেজরিওয়াল

ই-৩৩/ই, ডি-ডি-এ (মিগ) ফ্ল্যাট্‌স্,
মায়াপুরী, দিল্লি ১১০ ০৬৪

বিষয়সূচী

প্রথম পর্বঃ দিশাহারা

দ্বিতীয় পর্বঃ দিশান্বেষণ

তৃতীয় পর্বঃ দিশান্ত

প্রথম পর্ব

দি শা হা রা

সেদিন কোন কারণে অর্ধেক স্কুল হয়ে ছুটি হয়ে গিয়েছিল। গাঙ্গুলীদের শরৎ বাড়ি ফিরেই সুরেন্দ্রকে বলল, 'চল পুরোনো বাগানে একটু ঘুরে আসি।' সেবার খুব গরম পড়েছিল, ফলপাকড়, ফুল, লতাপাতা সব শুকিয়ে গিয়েছিল, তবুও নিস্তব্ধতায় ঘেরা ছায়ার নীচে সময় কাটাতে বড় ভালো লাগত। কিন্তু এসব ছেড়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে একথা ভেবে মনটা কেমন ভার ভার লাগছিল শরতের, অথচ মনের কথা কাউকে বলতেও ইচ্ছে হত না।

সুরেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল। সম্পর্কে মামা অথচ বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও দুজনের ভারি বন্ধুত্ব ছিল। বাগানে গিয়ে গাছপালার চারপাশে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনে মনে সে যেন এদের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিচ্ছিল। হয়তো একথাও মনে হচ্ছিল, কি জানি আবার কখনও এখানে আসা হবে কি-না! হঠাৎই, যেমন তার স্বভাব, লাফ দিয়ে একটা গাছের ডালে চড়ে বসে গল্প আরম্ভ করে দিল। এ-গল্পের কোনো আদি-অন্ত ছিল না। বিদায়ের দুঃখকে লুকোবার জন্যই শুধু কথার অবতারণা। বলল, 'তুই দুঃখ করিস না, মাঝে মাঝে তো আসবই—আবার দেখা হবে।'

'আসবি?'

'কেন আসব না, ভাগলপুর কি আমার কম ভালো লাগে নাকি? ঘাটের ভাঙা স্তূপের ওপর থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যা মজা! আর ওপারে ওই ঝাউয়ের বন, ওকে কি ভোলা যায়? আমায় ও ডাক দেবেই, আর আমিও ঠিক চলে আসব।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সত্যি এমন জায়গা এই ভাগলপুর, দেখিস আমি ঠিক আসব।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। হঠাৎ শরৎ বলে উঠল, 'গাছে চড়তে জানা বড্ড দরকারী। মনে কর কোনো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিস, ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে এল। হিংস্র পশুর চিৎকার ভেসে আসছে, তখন যদি গাছে চড়তে না জানিস তো মহাবিপদ '

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, 'আর যদি পড়ে যাই?'

শরৎ উত্তর দিল, 'পড়বি কেন রে?' বলে তরতর করে গাছের মগডাল পর্যন্ত উঠে গিয়ে একটা কাপড় দিয়ে নিজের কোমরের সঙ্গে গাছের ডালটাকে কষে বেঁধে সটান শুয়ে পড়ে বলল, 'এমনিভাবে শুয়ে কিন্তু বেশ রাত কাটানো যায়।'

প্রায় তিন বছর হতে চলল শরৎ মামার বাড়িতেই আছে। এর আগে মার সঙ্গে বার কয়েক এসেছিল। প্রথম যেবার মার সঙ্গে আসে দাদু-দিদিমা সোনা ও টাকা দিয়ে মুখ দেখেছিলেন। দাদামশায় কেদারনাথ কোমরে সোনার গোট পরিয়ে তবে কোলে তুলেছিলেন কারণ বংশে এ-পুরুষের এই তো প্রথম ছেলে। কিন্তু তিনবছর আগের সে-আসা তো সম্পূর্ণই আলাদা। শরতের বাবা যাযাবর প্রকৃতির স্বপ্নবিলাসী ব্যক্তি ছিলেন। কোনো জীবিকাতেই তিনি টিঁকে থাকতে পারেননি। কিন্তু সংসার তার প্রাপ্য চাইবেই। তাই চতুর্দিক থেকে লাঞ্ছিত হয়ে তিনি কাজের চেষ্টায় হন্যে হয়ে বেড়াতে লাগলেন। চাকরি যদিও বা কখনও জুটত, তাঁর শিল্পী-মন

দাসত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়তে চাইত না। অতএব কিছুদিন কাজকর্ম করার পর হঠাৎই একদিন বড় সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে অথবা সেই অজুহাতে চাকরি ছেড়ে পড়াশোনা বা কবিতা রচনায় মেতে ওঠা—এই ছিল তাঁর স্বভাব। গল্প, উপন্যাস, নাটক, ছবি–আঁকা একাধারে সব বিষয়েই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। সৌন্দর্যবোধও তাঁর কিছু কম ছিল না। নতুন নিবের সুন্দর কলম দিয়ে ভালো কাগজে মুক্তাক্ষরে লেখা শুরু করতেন। কিন্তু শুরু যত উল্লেখযোগ্য হত, শেষ ঠিক ততই অর্থহীন হয়ে পড়ত। স্বাভাবিক সমাপ্তিকে বোধ হয় তিনি কখনও স্বীকার করেননি। তাই মাঝপথে অসম্পূর্ণ লেখা ফেলে নতুন লেখার ঝোঁক বা প্রবণতা তাঁকে পেয়ে বসত। হয়তো তাঁর নিজস্ব কোন এক উচ্চ আদর্শ কিম্বা জীবনদর্শন ছিল, নতুবা শেষ পর্যন্ত পৌঁছবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কোনো লেখাই তিনি সম্পূর্ণ করেননি। একবার শিশুদের জন্য ভারতবর্ষের মানচিত্র তৈরি করেছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে হয়, এই মানচিত্রে কি হিমালয়ের গরিমাকে যথাযথ ফোটাতে পারবেন? এই সংশয়ের দরুন তিনি এই কাজ থেকে বিরত হন।

এইভাবেই মতিলালের শিল্পসাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও শরতের মধ্যে তা সার্থক হয়। সংসারের ভরণপোষণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। শরতের মা ভুবনমোহিনী প্রথম প্রথম স্বামীকে বোঝাতেন, রাগ–অভিমানও করতেন, কিন্তু পরে বাধ্য হয়েই বাবা কেদারনাথের কাছে সবাইকে নিয়ে চলে আসেন। মতিলাল ঘরজামাই হয়ে থাকতে এলেন।

২

ভাগলপুরে আসার পর দুর্গাচরণ এম. ই স্কুলের ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে শরৎকে ভর্তি করে দেওয়া হল। দাদামশায় স্কুলের কর্তাব্যক্তি ছিলেন, কাজেই ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কতদূর তা কেউ তেমন খোঁজ করেননি। বোধোদয় পর্যন্ত শরতের পড়া ছিল। এ স্কুলে তাকে 'সীতার বনবাস', 'চারুপাঠ', 'সদ্‌ভাব সদ্‌গুরু' আর প্রকাণ্ড ব্যাকরণ পড়তে হত; শুধু পড়াই নয়, পণ্ডিতমশায়ের কাছে প্রতিদিনের পড়াও দিতে হত। অতএব অসঙ্কোচে একথা বলা যায় সাহিত্যের সঙ্গে শরতের প্রথম পরিচয় চোখের জলেই হয়েছিল। তাই মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে একথা সে ভাবতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারে ক্লাসে সে সবার পিছনে পড়ে আছে। এ গ্লানি তার পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর ছিল, তাই খুব মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা আরম্ভ করে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অনেককে ডিঙিয়ে ভালো ছেলেদের মধ্যে সে নিজের স্থান করে নিল।

দাদামশায়রা, সব ভায়েরা একত্রেই ছিলেন। মামা-মাসীর সংখ্যাও ছিল অনেক। ছোট দাদামশাই অঘোরনাথের ছেলে মণীন্দ্র ছিল শরতের সহপাঠী। দুজনকেই বাড়িতে পড়াবার জন্য অক্ষয় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা হয়। অক্ষয় পণ্ডিতকে পণ্ডিত না বলে যমের সহচর বললেও অত্যুক্তি হয় না। গুরুর যষ্টিতেই যে বিদ্যার নিবাস একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, তাই মাঝে মাঝে তাঁর সিংহনাদের সঙ্গে শিশুকণ্ঠের করুণ সুরও শোনা যেত।

পড়াশোনার সময় দুষ্টুমিও কিছু কম হত না, শরৎ এখানেও অগ্রণী ছিল। সেদিন প্রদীপের আলোয় ছেলেরা সবাই পড়তে বসেছে। দালানে নেয়ারের খাটে দাদামশায় শুয়ে শুয়ে পড়া শুনছেন, বললেন, 'পুরোনো পড়া কেন মুখস্থ করছ? নতুন পড়া নেই?'

'না।'

'কেন?'

'পণ্ডিত মশাই আসেননি, তাঁর অসুখ করেছে।'

তখুনি দাদামশাই চাকর মুশাইকে ডেকে বললেন, 'লণ্ঠন জ্বালাও, পণ্ডিত মশাইয়ের জ্বর হয়েছে দেখতে যাব।'

তিনি শুধু স্কুলেরই কর্তাব্যক্তি ছিলেন না, সমাজপতিও ছিলেন। কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন আদর্শ। দাদামশাই বেরিয়ে যেতেই শরৎ বলে উঠল—

'ক্যাট ইজ আউট লেট মাউস প্লে।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠল–

'ডান্স লিট্‌ল বেবি ডান্স আপ হাই
নেভার মাইন্ড বেবি মাদার ইজ নাই।
ক্রো অ্যান্ড কেপার, কেপার অ্যান্ড ক্রো–
দেয়ার লিটল বেবি, দেয়ার য়ু গো
আপ টু দি সিলিং, ডাউন টু দি গ্রাউন্ড
ব্যাকওয়ার্ডস, অ্যান্ড ফরওয়ার্ডস রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড
ডান্স লিটল বেবি, অ্যান্ড মাদার উইল সিং
মেরিলি মেরিলি ডিং ডিং ডিং।'

একটি উদ্যমী ছেলে সঙ্গে সঙ্গে শেষের লাইনটির হিন্দী অনুবাদ করে ফেলল,

'খুশীমে খুশীমে তাক্‌ ধিনা ধিন্‌।'

বর্ষা শেষের একটি দিনে কোত্থেকে একটা চামচিকে এসে বাচ্চাদের মাথার উপর ফরফর করে উড়ে বেড়াতে লাগল। ছোট মামা দেবী দাদামশায়ের সঙ্গে শুয়ে পড়েছিল। অন্যরাই বা শুধু শুধু পড়বে কেন? চামচিকে দেখে মণি আর শরৎ উসখুস করতে লাগল, একটা লাঠি নিয়ে সেটাকে ধরতে ছুটল। সে এক এলাহি কাণ্ড! চামচিকে তো ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল কিন্তু লাঠির খোঁচায় প্রদীপ উল্টে নিভে তো গেলই, তেল পড়ে চাদরও নষ্ট হল। মণি আর শরৎ ঘটনাস্থল থেকে চুপচাপ কেটে পড়ল কিন্তু দাদামশায় ঘুম থেকে উঠে ডাকলেন, 'মুশাই, মুশাই।'

মুশাই ছুটে এসে বলল, 'আজ্ঞে।'

'আলো নিভে গেল কি করে?'

দেশলাই জ্বেলে মুশাই দেখল মণি আর শরতের কোথাও চিহ্নমাত্র নেই, শুধু দেবী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বলল, 'মণি আর শরৎ খেতে গেছে, দেবী বাতি নিবিয়ে ফেলেছে।' এ অপরাধের কোনো ক্ষমা ছিল না। কেদারনাথ দেবীকে কান ধরে তুলে মুশাইকে বললেন, 'একে আস্তাবলে বন্ধ করে রেখে এসো।'

পরদিন দেবীমামাকে খুশি করার জন্য বেশ ভালো রকম ঘুষ দিতে হল। দেবীর উপর মা সরস্বতীর তেমন কৃপাদৃষ্টি ছিল না। শরতের বড়মামা ঠাকুরদাস ছোটদের পড়াশোনা দেখতেন। তিনি গাঙ্গুলী বংশের গোঁড়ামি ও কঠোরতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। একদিন মতিলাল বাড়ির সব ছোট ছেলেদের নিয়ে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ ঠাকুরদাসের সঙ্গে দেখা। তাঁর চোখে ছোটদের এভাবে বেড়ানো অমার্জনীয় অপরাধ। তিনি তক্ষুনি তাদের পরীক্ষা নিতে তৎপর হলেন। মণি আর শরৎ কোনোরকমে উৎরে গেল, কিন্তু দেবী জগন্নাথ শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করল জগড় + নাথ।

এ অপরাধের শাস্তি বেত্রাঘাত কিংবা আস্তাবলে বন্ধ করে রাখা। শরৎ কিন্তু এসবে ভয় পেত না। সুযোগ পেলে স্কুলেও দুষ্টুমি করতে পেছ–পা হত না। স্কুলের ঘড়িটি প্রায়ই ফাস্ট চলত। সময় মতো তাতে চাবি দেওয়া বা কাঁটা ঠিক করা অক্ষয় পণ্ডিতের কাজ ছিল। কিন্তু তাঁর এমনই অভ্যেস, ঘণ্টাদুয়েক মন দিয়ে কাজ করার পর তামাক না খেলে তাঁর চলত না। স্কুলের চাকর জগুয়ার পানের দোকানটিতে গিয়ে দাঁড়াতেন। এই সুযোগে শরতের প্ররোচনায়

কেউ একজন ঘড়ির কাঁটাটাকে দশ মিনিট এগিয়ে দিত। কয়েক দিন পর্যন্ত চুরি ধরা না পড়াতে সাহস বেড়ে গেল। ফলে কখনও আধঘণ্টা আবার কখনও একঘণ্টাও ঘড়ির কাঁটা এগুতে লাগল। কোনো কোনো দিন তিনটের জায়গায় চারটে বেজে গেল। অভিভাবকদের মনেও সন্দেহ দেখা দিল। কিন্তু পণ্ডিত মশাই বললেন, 'তা কি করে হয়, ঘড়ি তো আমি নিজে দেখাশোনা করি।' জবাব তিনি দিলেন বটে কিন্তু তাঁর নিজের মনেও সন্দেহ হল। তাই চুপচাপ এই রহস্যোদ্ঘাটনে মন দিলেন। একদিন পানের দোকান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখেন যে, একটি ছেলের কাঁধে আর একটি চড়ে ঘড়ির কাঁটাকে এগিয়ে দিচ্ছে। আর যায় কোথায়? রাগে ফেটে পড়লেন। নিমেষে ছেলেরা উধাও। শরৎ কিন্তু অতি ভালো মানুষের মতো চুপচাপ বসে রইল। পণ্ডিত মশাই ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না যে, শরতের ব্যবস্থাপনায় এ নাটক রচিত হয়েছে, উপরন্তু পণ্ডিত মশাইয়ের পা ছুঁয়ে বলল, 'আমি কিছু জানি না, পণ্ডিত মশায়। তখন থেকে তো আমি মন দিয়ে অংক কষছি।'

মুখের ভাব ভঙ্গি আর অভিনয়ে সে এমনই পটু যে, কে তাকে অবিশ্বাস করবে? দুর্দান্ত সাহস আর বুদ্ধির জোরে মামাদের দলে পাণ্ডা ছিল সে, আবার স্কুলের ছেলেদের নেতৃত্বের ভারও তার উপরেই ছিল। পশুপাখি পোষা, বাগান তৈরি করা, একরকম অনেক শখ ছিল তার, তার মধ্যে প্রজাপতি ও ফড়িং ধরার উদ্যোগ ছিল মুখ্য। নানা রঙের প্রজাপতি ধরে কাঠের বাক্সে রেখে যত্নের সঙ্গে তাদের দেখাশোনা করত। তাদের রুচিমত খাবারের ব্যবস্থাও করত। প্রজাপতি আর ফড়িংয়ের লড়াইয়ের প্রদর্শনী করা হত, লড়াই দেখার লোভে অন্যান্য ছেলেরা তাকে সাহায্য করে নিজেদের ধন্য মনে করত। বাড়ির ছেলেরা ছাড়া এই দলে গণ্যমান্য লোকেদের ছেলেরাও যেমন ছিল, অপরদিকে তেমনি বাড়ির চাকর বাকরদের ছেলেদেরও কোনো ভেদাভেদ না রেখে দলে নেওয়া হয়েছিল। এরাও শরৎকে সাহায্য করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করত।

বাগানে শরৎ মনোমত নানান ধরনের ফুল লতা পাতার গাছ পুঁতেছিল। বেল, যুঁই, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা সবরকম ফুলই ঋতু অনুসারে ফুটত, তাই দেখে দলপতি ও দলের ছেলেরা সবাই আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠত। বাগানের একধারে মাটি খুঁড়ে একটা পুকুরও তৈরি করেছিল। একটা ভাঙা কাঁচে মাটি লেপে সেটা ঢেকে রাখত। কেউ দেখতে চাইলে ঢাকনা সরিয়ে পুকুরটিকে দেখিয়ে তাদের অবাক করে দিত। লুকিয়ে-চুরিয়েই তাকে এসব কাজ করতে হত, কেননা দাদামশায়রা কেউই এসব পছন্দ করতেন না। তাঁদের ধারণা, লেখাপড়া ছাড়া শিশুদের আর কোনো-কিছুর উপর দাবি থাকা উচিত নয়। খেলাধুলা বা স্নেহ-ভালোবাসার আধিক্যে শিশুদের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। ভোরবেলায় স্কুল যাবার আগে জোরে জোরে পড়া মুখস্থ করা আবার সন্ধেবেলায় স্কুল থেকে ফিরে রাতের খাওয়ার আগে পর্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপে প্রদীপের আলোয় পড়া মুখস্থ করা, গুরুজনদের প্রীতিভাজন হওয়ার এই ছিল একমাত্র উপায়। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করত, বয়স হিসেবে তাকে শাস্তি দেওয়া হত। কেউ জানতে পারত না কখন কাকে একপায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতে হবে। এইরকম কঠোর অনুশাসনের ভিতর খেলার সময় পাওয়া ছিল দুষ্কর; কিন্তু চোখে ধুলো দেওয়ার বিদ্যেতে শরতের জুড়ি ছিল না।

ছাত্রবৃত্তি[১] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শরৎ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হল। গাঙ্গুলীবংশে ঘুড়ি ওড়ানো, শাস্ত্রে সমুদ্র-যাত্রার মতোই নিষিদ্ধ ছিল। আর শরতের প্রিয় খেলাই ছিল ঘুড়ি ওড়ানো, লাট্টু নাচানো ও গুলি খেলা। নীলাকাশে শরতের ঘুড়ি যখন আনন্দে নাচত, তাই দেখে দলের

১ ১৮৮৭ সেই সময় ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ক্লাস সিক্স অবধিই হত। আজকের মতো নয়।

বন্ধুদের মনও খুশিতে উথলে উঠত। সুতোর মাঞ্জা ছিল তার বিশ্বজয়ী। এমন প্যাঁচে ফেলত যে, প্রতিপক্ষের ঘুড়ি তখুনি কেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। শূন্যে লাট্টু নাচিয়ে এমনভাবে হাতের তেলোয় এনে ফেলত যে, বন্ধুরা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। বাগানের ফলপাকড় চুরি করাতেও সে সিদ্ধহস্ত ছিল। যতই পেয়ারা গুনে রাখা হোক না কেন, শরৎ ঠিক ফাঁকি দিয়ে চুরি করবেই। সেই যে কথায় আছে না, 'তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায়'—শরৎ সেইরকমই চালাকি আর ক্ষুরধার বুদ্ধির জোরে বাগান-মালিকের সব চেষ্টা ও সতর্কতা ব্যর্থ করে দিত। আর যদিবা কখনও ধরা পড়ত, বীরের মতো মাথা পেতে শাস্তি সহ্য করত। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কদের—যেমন, দেবদাস, শ্রীকান্ত, রাম এবং সব্যসাচী সবাইকেই প্রায় এ-সব বিদ্যায় দক্ষ দেখা যায়। জানি না রামের মতো তাঁরও কোনো নারায়ণী বৌদি ছিল কিনা। কিন্তু একথা সত্যি যে, চুরির অভিযোগ শুনলে শরতের মা- ও পোড়ারমুখোটাকে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকাব শাস্তি দিতেন, আর শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শরৎ এ শাস্তি মাথা পেতে নিত। এক কথায় শরৎ অত্যন্ত খেলুড়ে, বিদ্রোহী প্রকৃতির ছেলে কিন্তু তা বলে তাকে বদমাশ বলা যেতে পারে না, যদিও সেকালের বিচারের মানদণ্ডে তাকে অবশ্য সেই পর্যায়েই ফেলা হয়েছে। বাবার মতো তার মধ্যেও প্রচুর সৌন্দর্যবোধ ছিল। পড়ার ঘরটিকে সে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত। একটা তক্তপোষের উপর একটা সুন্দর তেপায়া টেবিল, একটা বন্ধ ডেস্ক ছিল, তাতে বই খাতা-পত্র, কলম, দোয়াত ইত্যাদি থাকত। বইপত্র একেবারে পরিষ্কার ঝকঝক করত। কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে সুন্দর দেখবার মতো খাতা তৈরি করত।

কোনো জিনসের প্রতিই তার আসক্তি ছিল না। সারাদিন খেলাধুলো করে যতগুলো গুলি বা লাট্টু পেত বিকেল বেলায় সব ছোট ছোট ছেলেদের হাতে তুলে দিত। এই তার স্বভাব -দিয়ে সে আনন্দ পেত। এ- আনন্দ দানের অহংকারের আনন্দ নয়, ভারমুক্তির আনন্দ। আহার নিদ্রার উপরেও তার অসীম সংযম ছিল। ছেলেবেলা থেকেই স্বল্পাহারী। পরবর্তীকালে কথাশিল্পীর 'বড় বৌ' এর তাই দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। ইংরেজি স্কুলে পড়ার সময়েই শরীব চর্চায় মন দেয়। মামার বাড়ির উত্তরে ঠিক গঙ্গার উপর একটা বিবাট বাড়ি ছিল কিন্তু বাড়িটির সম্বন্ধে নানা অপশ্রুতি প্রচলিত ছিল। এককালে সেই বাড়িটায় এক বৃহৎ যৌথ পবিবাবের বাস ছিল, দুর্ভাগ্যবশত পরপর কয়েকজন মারা যেতে বাড়ির লোকেরা সে বাড়ির বাস উঠিয়ে দেয়। অনেকদিন পর্যন্ত সে বাড়ি ভূতুড়ে বাড়ি বলে পড়ে ছিল। গুরুজনদের নজর এড়িয়ে শরৎ সেই বাড়ির উঠোনে কুস্তির আখড়া তৈরি করল। গঙ্গা থেকে লোফালুফি খেলার জন্য গোল পাথর তুলে নিয়ে এল, প্যারালাল বার তৈরি করবারও চেষ্টা করেছিল কিন্তু পয়সার অভাবে তা সম্ভবপর হল না। অনেক ভেবে চিন্তে শরৎ বাঁশের 'বার' তৈরি করবার নির্দেশ দিল।

সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গে চার- পাঁচটি ছেলে বাঁশ কাটতে বেরোল। বাঁশের ঝাড়ে ঘষা খেয়ে হাত-পা একেবারে রক্তারক্তি। কিন্তু দলপতির নির্দেশ, একরাতেই 'প্যারালাল বার' তৈরি করা চাই, কাজেই যে করেই হোক তৈরি করা হল। পরদিন দুপুরে ছেলেরা উৎফুল্ল হয়ে খেলায় মেতে উঠল। চেঁচামেচি করা একদম বারণ ছিল। বাড়ির লোকেরা যাতে জানতে না পারে, সেইজন্য প্রাণরক্ষার মন্ত্র জপতে জপতে সবাই বাড়ি ফিরত। কিন্তু একদিন একটা ছেলে পড়ে গিয়ে বিপদ বাধালো। তার যথেষ্ট চোট লেগেছিল। তারপর এদের কপালে যা জুটেছিল তা বলে আর দরকার নেই। শরতের বিশ্বাস ছিল, সাঁতাব কাটা শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। বাড়ির কাছেই গঙ্গা, কখনও কখনও গঙ্গা দূরেও সরে যেত। সে বছর বর্ষায় ছোট ছোট ডোবাগুলো লাল ঘোলাজলে ভরে উঠল। এই ঘোলাজলে চান করার লোভ শরৎ কি সামলাতে পারে? কাজে কাজেই মণিমামাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন ডোবায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুর্ভাগ্যবশত সেদিন ছোট দাদামশায় অঘোরনাথ অসময়ে বাড়ি ফিরে মণিকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মণি কোথায়?'—'মণি আর শরৎ পুকুরে স্নান করতে গেছে।'

একথা শোনার পর অঘোরনাথ এমন একটা হুঙ্কার ছাড়লেন যে, সবার পিলে চমকে উঠল।

স্নান সেরে দুজনে যখন হাসতে হাসতে বাড়ি এল, তখন সবাই বাধা দেওয়া সত্ত্বেও অঘোরনাথ মণিকে এমন নির্দয়ভাবে মারলেন যে, পাঁচ–সাত দিন পর্যন্ত তার গা থেকে ব্যথা গেল না। শরৎ কিন্তু তখুনি সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল। দিনতিনেক পর দাদামশায় ঘোড়ায় চেপে কাজে বেরিয়ে যেতে তার দেখা পাওয়া গেল। মামারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কোথায় গিয়েছিলি রে?'

শরৎ জবাব দিল, 'আমি গুদাম ঘরে লুকিয়ে ছিলাম।'

'কি খেতিস সেখানে?'

'কেন! তোমরা যা খেতে তাই।'

'কে দিত?'

'ছোট দিদিমা।'

যখন ছোট দাদামশায় মণিকে বেদম প্রহার করছেন, তখন ছোট দিদিমারই পরামর্শে শরৎ ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। খেলাধুলোর সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনোর উপরেও তার তীব্র অনুরাগ ছিল। শুধু যে স্কুলের পাঠ্য বইই পড়ত তা নয়, বাবার লাইব্রেরি ঘরে যে–সব বই ছিল, তার যখন যেটা হাতে পেত, লুকিয়ে লুকিয়ে তা পড়ত। একদিন এমনি করেই একটা বই সে হাতে পেল যাতে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল। বইটির নাম 'সংসার কোষ'। বিপদে আপদে গুরুজনদের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার মন্ত্রও ছিল তাতে। শরৎ বন্ধুদের মন্ত্রটি লিখে নিতে বলল,–

'ওম্ হ্রীং হ্রীং দ্যাং দ্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।' শুধু গুরুজনদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াই নয়, সাপেদের কিভাবে বশ করতে হয়, সে মন্ত্রও বইটাতে ছিল। শরৎ মন্ত্রটি পরীক্ষা করবার জন্য উঠেপড়ে লাগল। কিছুদিন আগে তাকে একবার সাপে কামড়ায়, কোনোরকমে বেঁচে গিয়েছিল। তাই সে জনমেজয়ের মতো সর্পযজ্ঞ করতে মনস্থ করল। বইটাতে লেখা ছিল যে, একহাত লম্বা বেল গাছের শেকড় যে কোনো বিষাক্ত সাপের ফণার সামনে ধরলে নিমেষের মধ্যে সে সাপ নেতিয়ে পড়ে। যথেষ্ট উৎসাহে একটা বেলদণ্ড যোগাড় করল। সাপের কোনো অভাব ছিল না, তবে সেদিন সাপেরা বোধহয় মন্ত্রের খবর আগেই পেয়ে গিয়ে থাকবে, তাই অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাদের কারো দেখা পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত পেয়ারা গাছের তলায় আবর্জনার মধ্যে একটা গোখরো সাপের বাচ্চার খোঁজ পাওয়া গেল। আনন্দে শরৎ দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে খুঁচিয়ে সাপের বাচ্চাটাকে বাইরে আনার চেষ্টা করল। ছেলেদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাপের বাচ্চাটি ফণা তুলে ফোঁস করে উঠল। শরৎ তখুনি বেলগাছের গোড়াটি সাপের সামনে রেখে দিল। কিন্তু নির্জীব হওয়া তো দূরে থাক, সেই ক্ষুদে সাপটি বেলগাছের গোড়াটিতে বারবার ছোবল দিতে লাগল। এই দেখে ছোটরা খুব ভয় পেয়ে গেল। মণিমামা কোত্থেকে একটা লাঠি জোগাড় করে সনাতন পদ্ধতিতে সাপটির ইহলীলা শেষ করে দিল। মনে হয় তখনও পর্যন্ত 'বিলাসী'র মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে শরতের আলাপ হয়নি। সাপকে গাছের শেকড় দেখাবার আগে আরও একটা দরকারি কাজ করার ছিল। প্রথমে একটা গরম লোহার শিক দিয়ে সাপের মুখে ছেঁকা দিতে হবে, তারপর দাও বেলগাছের শেকড় বা সামান্য কোন কঞ্চি, সাপ প্রাণভয়ে পালাবে। পরবর্তীকালে 'শ্রীকান্ত' ও 'বিলাসী' উপন্যাসে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এই বিদ্যের ব্যাখ্যা খুব সরসভাবে করেছেন।

এইসব দুষ্টুমির মধ্যে হঠাৎই দেখা যেত দলের পাণ্ডা উধাও। কেউ হয়তো ডেকে উঠত, 'কোথায় গেলে শরৎদা?'

'এই তো এখানে।'

'কোথায়?'

খুঁজে খুঁজে সবাই যখন হয়রান, তখন কোত্থেকে সে নিজেই এসে হাজির হত। বাচ্চারা সবাই তাকে ঘিরে জিজ্ঞেস করত, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'তপোবনে।'

'তপোবন কোথায়? আমাদেরও দেখাও।'

তপোবন যে কোথায় সেকথা শরৎ কাউকে কোনোদিন বলেনি। সুরেন্দ্র মামার সঙ্গে শরতের খুব ভাব। বোধহয় সুরেন্দ্র ওর মায়ের দুধ খেয়েছিল বলেই। সুরেন্দ্রর মা সন্তানসম্ভবা ছিলেন। এদিকে শরতের একটি ছোট ভাই বাচ্চা বয়সে মারা যায়, তখন শরতের মা সুরেন্দ্রকে নিজের দুধ খাইয়ে পালন করেছিলেন। তাই যখন সুরেন্দ্র খুব কাকুতি মিনতি করল, তখন শরৎ না বলতে পারল না। তপোবনে নিয়ে যাবার আগে সুরেন্দ্রকে বলল, 'আমি তোকে নিয়ে তো যাচ্ছি কিন্তু তুই সূর্য, গঙ্গা, ও হিমালয়কে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা কর যে, এ জায়গার কথা আর কাউকে বলবি না?'

সুরেন্দ্র বলল, 'আমি সূর্যকে সাক্ষী রেখে বলছি এ জায়গার নাম কাউকে বলব না। আমি গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি কাউকে এ জায়গার কথা বলব না। আমি হিমালয়কে সাক্ষী রেখে বলছি, আর কাউকে এ জায়গার ঠিকানা দেব না।'

'তাহলে চল্।'

ঘোষ বাড়ির উত্তরে গঙ্গার কাছ বরাবর একটা ঘরের তলায় নিম ও করমচার গাছগুলি জায়গাটাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। নানারকম লতাপাতায় জায়গাটা এমনভাবে ঢেকে গিয়েছিল যে, সেখানে কারুর ঢোকা অসাধ্য। খুব সাবধানে এক দিকের লতাপাতা সরিয়ে শরৎ সেখানে গিয়ে ঢুকল। জায়গাটি বেশ পরিষ্কার, সবুজ সতেজ লতাপাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ এসে পড়ায় স্থানটিকে স্নিগ্ধ হরিৎ প্রকাশে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়—এ যেন কোন্ স্বপ্নলোকে আসা। একটা বড় পাথর সেখানে ছিল, তার উপর বসে পড়ে শরৎ সুরেন্দ্রকে ডাকল, 'আয়।' সুরেন্দ্র ভয়ে ভয়ে শরতের পাশে গিয়ে বসল। নীচে খরস্রোতা গঙ্গা, ওপারের দৃশ্য স্পষ্ট, মৃদুমন্দ হাওয়ার কাঁপন মনে পুলক জাগাচ্ছিল। সুরেন্দ্র মুগ্ধ হয়ে বলল, 'জায়গাটি তো ভারি সুন্দর।'

শরৎ বলল, 'হ্যাঁ, এখানে এসে বসে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে, কত কথাই না জানি ভাবি, অনেক বড় বড় চিন্তা মাথায় আসে।' সুরেন্দ্র বলল, 'সত্যি মনে হচ্ছে তপোবনে এসে পড়েছি। বুঝতে পেরেছি এবার অঙ্কে তুই একশোর মধ্যে একশো কি করে পেয়েছিস।' না জানি কতবার এই পবিত্র মৌন নিভৃত জায়গায় শরৎ এসে বসেছিল। দূর থেকে শিশুদের কলকাকলি গঙ্গার স্রোতের কল কল ধ্বনির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে কেমন রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করত। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য তার ক্লান্ত দেহমনে স্নেহের পরশ ছুঁইয়ে যেত, হয়তো তখনই সে মনে মনে শপথ করে থাকবে, 'আমি সূর্য গঙ্গা, হিমালয়কে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি সারাজীবন সৌন্দর্যের উপাসনা করব। অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরদিন লড়াই করব, কখনও কোনো ছোট কাজ করব না।' হয়তো বাড়িতে সে মনোমত নির্জনতা পায়নি। সামান্য শব্দও সেখানে এমন প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করত যে, মাথায় যেটুকু চিন্তার ছবি ফুটে উঠত সব অস্পষ্ট হয়ে যেত।

শরৎ শুধু অঙ্কে ফার্স্ট হয়েছিল তা নয়, ইংরেজি স্কুলের প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান পায়। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ইংরেজি শিক্ষার জন্য তাকে এক ক্লাস নিচুতে ভর্তি হতে হয়, ফলে অন্যান্য বিষয়গুলি তার পক্ষে খুব সহজ হয়ে পড়ে, তাই অনায়াসে ডবল প্রমোশন পেয়ে উঁচু ক্লাসে পৌঁছে যায়। পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ার দরুন বন্ধুদের মধ্যে তার প্রতিপত্তি বেশ বেড়ে যায় এবং গুরুজনেরাও আশ্বস্ত হন।

স্কুলে একটা ছোট লাইব্রেরি ছিল। শরৎ সে যুগের বিখ্যাত লেখকদের লেখা বইগুলি লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়ত। যুগসন্ধির সেই যুগে যখন কর্তাব্যক্তিরা চণ্ডীমণ্ডপের দালানে বসে চতুষ্পদী নিয়ে মেতে থাকতেন, তখন কিশোর বয়সের এই ছেলের দল লুকিয়ে চুরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বইগুলির পাতা ওলটাত। শরৎ শুধু পড়ত না, বোঝারও চেষ্টা করত। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সূক্ষ্ম অনুধাবন করার সহজ পদ্ধতি তার সহজাত। সব কিছু সে বড় নিকট থেকে দেখতে পেত।

একদিন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অঘোরনাথ অধিকারী গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন, শরৎ তাঁর কাপড়চোপড় নিয়ে পেছনে পেছনে চলেছে। একটা ভাঙা ঘরের ভিতর থেকে একটি স্ত্রীলোকের করুণ কান্না ভেসে আসছিল। অধিকারী মশাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কাঁদছে? কি হয়েছে ওর?'

শরৎ বলল, 'মাস্টারমশাই, এই স্ত্রীলোকটির স্বামী অন্ধ ছিল, লোকেদের বাড়ি বাড়ি ঝি-গিরি করে সে তাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কাল রাতে তার সেই অন্ধ স্বামী মারা গেছে। বড়ই দুঃখী বেচারী। দুঃখী লোকেরা বড়লোকদের মতো লোকদেখানো কান্না কাঁদে না। মাস্টারমশাই, এদের বুকফাটা এ কান্না সত্যিকারের কান্না।' একটা ছোট ছেলের মুখে চোখের জলের এত গভীর সূক্ষ্ম বিবেচনা শুনে অঘোরবাবু অবাক হয়ে যান। তিনি কলকাতায় থাকতেন। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি নিজের এক বন্ধুকে এই ঘটনাটি শুনিয়েছিলেন। বন্ধু বলেছিলেন, 'যে-ছেলে কান্নার এত বিভিন্ন রূপ চিনতে পারে, সে সাধারণ বালক হতে পারে না। বড় হয়ে সে নিশ্চয়ই মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও বিখ্যাত হবে।'

কিন্তু শরতের সহজাত প্রতিভা বোঝার মতো লোক গাঙ্গুলীবাড়িতে ছিল না। এই ভয়ংকর গোঁড়া আদর্শবাদী বংশের শুধু একজনের উপরেই নতুন যুগের হাওয়া লেগেছিল, সে ছিল কেদারনাথের চতুর্থ ভাই অমরনাথ। সেইযুগে সৌখিন অমরনাথ পায়রা পোষা ছাড়া আয়না চিরুনী, চুলের ব্রাশ ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। বাড়ির ছেলেরা অমরনাথকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। মুগ্ধ হওয়ার আর একটা কারণ ছিল অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ছোটদের হাতে প্রতিদিন পিপারমেন্ট বা ওই ধরনের কিছু না-কিছু দিতেন। বড় ভায়েরা অমরনাথের এই রকম আচরণের জন্য বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবং শেষ অবধি একদিন মাথায় টিকি রেখে বাকি চুল কেটে ফেলে গাঙ্গুলী বংশের মান তাঁকে বজায় রাখতে হয়। খুব শখ করে অমরনাথের ইংরেজি ফ্যাসনের চুল বাখার পর্বের এখানেই ইতি।

পড়াশোনায় অমরনাথের ভারি অনুরাগ ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' গাঙ্গুলীবাড়িতে ঢোকাবার সাহস করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচক। গাঙ্গুলীদের আদি বাড়ি হালিসহর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ার দূরত্ব বেশি ছিল না। ওই গ্রামের একটি মেয়ে এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছিল, কিন্তু যেহেতু গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, এ বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের এতটুকুও সম্মান ছিল না। নবযুগের বার্তাবাহক রূপে বরং এই পরিবারে তাঁর অসম্মানই বেশি ছিল। তবুও অমরনাথ লুকিয়ে চুরিয়ে 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে আসতেন। তাঁর কাছ থেকে ভুবনমোহিনীর হাত দিয়ে সেখান মতিলালের হাতে পৌঁছত। আবার সেখান থেকে কুসুমকামিনীর হাতে গিয়ে পড়ত।

দুর্ভাগ্যবশত অমরনাথ বেশিদিন বাঁচেননি। ছোটদের মনে অপরিসীম বেদনা দিয়ে অল্প বয়সেই তিনি মারা যান। তাঁর অভাব অনেকাংশে কুসুমকামিনী দেবী ও মতিলাল পূর্ণ করেন। কুসুমকামিনী সব থেকে ছোট দাদামশাই অঘোরনাথের স্ত্রী। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাইয়ের হাত থেকে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। চিরদিন যা হয়ে এসেছে, সে সময়ও মেয়েদের একমাত্র কাজ ছিল রান্নাবান্না করা, ভাঁড়ার গোছানো ইত্যাদি। তারপরও যদি সময় থাকত, তাহলে জীবনকে জীবন্ত করে তোলার জন্য কলহ করা বা ঘুমিয়ে সময় কাটানো, আবার ঘুম ভাঙার পর পরনিন্দা পরচর্চায় মেতে সময় নষ্ট করাই মেয়েদের একমাত্র কাজ ছিল। কুসুমকামিনী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। যেদিন তাঁর উপর রান্নাবান্নার ভার থাকত না, সেদিন তিনি বৈঠকখানায় বা ছাতের উপর একটি ছোটখাট গোষ্ঠীর আয়োজন করতেন। তিনি নিজে 'বঙ্গদর্শন' ছাড়া 'মৃণালিনী', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা', 'মেঘনাদবধ' ও 'নীলদর্পণ' পড়ে শোনাতেন। তাঁর গলার স্বর ও পড়ার কায়দা এমনই মর্মস্পর্শী ছিল যে সবাই তন্ময় হয়ে শুনত। ছোট্ট শরৎ অবাক হয়ে ভাবত লেখক না জানি কী অসাধারণ মানুষ! হয়তো তার মনে তখনও পর্যন্ত লেখক হওয়ার সাধ জাগেনি। বাড়ির ভিতরকার এই গোষ্ঠীতেই

সাহিত্যের প্রথম পাঠ নিয়েছিল শরৎ। তার বহুদিন পর 'বঙ্গদর্শনে' সে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' পড়েছিল। 'চোখের বালি' পড়ে কিশোর শরতের মনে যে গভীর আনন্দ হয়, তা সে কাউকে যেমন বলতে পারেনি, তেমনই কোনোদিন ভুলতেও পারেনি। এতদিন পর্যন্ত তার মন ভূতপ্রেতের গল্পে আতঙ্কিত থাকত। এই নতুন জীবনদর্শন, প্রকাশ ও সৌন্দর্যের যাদুর পরশ তাকে যেন অন্য এক জগতে পৌঁছে দিল। যেমন একদিন পুশকিনের রচনা পড়ে টলস্টয় বলেছিলেন, 'আমি পুশকিনের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। তিনি আমার পিতা। তিনি আমার গুরু।' শরৎও নিশ্চয়ই সেদিন বলে থাকবে, 'তাঁর কাছে আমার অনেক কিছু শেখার আছে। আজ থেকে রবীন্দ্রনাথ আমার গুরু।' সত্য সত্যই জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত শরৎ তাঁকে গুরুর মতই শ্রদ্ধা ও সম্মান করে গিয়েছিলেন।

আসলে মণি–শরতের শিক্ষার আদিপর্ব কুসুমকামিনীর পাঠশালায় হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক পড়া হয়ে গেলে সাহিত্যের পালা আসত। শৈশব থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি; অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের নির্মাণে কুসুমকামিনীর অবদান কোনোদিন ভোলবার নয়।

এই সাহিত্যগোষ্ঠীতে হঠাৎই একদিন বিক্ষোভের সুর শোনা যায়। নতুন হাওয়ার মানুষ এ বাড়ির একটি ছেলে রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পড়ে শোনায়। বাইরে থেকে পড়াশুনো করলেও এ বাড়ির বর্জিত সংগীত ও কাব্যে তার খুবই ঝোঁক ছিল। কবিতা শোনাবার জন্য বাড়ির সব মেয়েদের ডেকে পাঠায়। কবিতার মর্ম সেদিন কে কতখানি বুঝেছিল জানা যায়নি কিন্তু শরতের দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল। চোখের জল গোপন করবার জন্য তাকে বাইরে উঠে যেতে হয়েছিল।

৩

মামার বাড়িতে শরতের বেশিদিন থাকা হয়নি। তার বাবা শুধু স্বপ্নবিলাসীই ছিলেন না, আরো কয়েকটি দোষ তাঁর ছিল। তিনি তামাক খেতেন এবং ছোট বড় সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন। সে যুগে বড়দের সামনে ছোটদের হাসিঠাট্টাকে বেয়াদপি মনে করা হত। মতিলালের এসবে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ছোটদের দুষ্টুমিতে তিনি পরোক্ষে সাহায্যই করতেন। যদি কোনো ছেলেকে গুদামঘরে বন্ধ করে রাখার শাস্তি দেওয়া হত, তাহলে তিনি সুযোগ–সুবিধে মতো নীরবে তার খাবারটুকু পৌঁছে দিতেন। এবং যখন সে ছাড়া পেত, একটি ফুলের মালা পরিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করতেন। তাঁর হাতের তৈরি নানারকম কাগজের খেলনা শিশুদের বিশেষ প্রিয় ছিল। শ্লেট পেন্সিলে সুন্দর করে অক্ষর পরিচয় করাতেন। ছোটদের গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থাও করতেন। বাচ্চারা যখন হৈ হুল্লোড় করে গঙ্গায় ঝাঁপ দিত, তখন অনুভূতিপ্রবণ মতিলাল আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতেন। একে তো ঘরজামাই, তার উপর এরকম আচরণের জন্য মতিলালকে এই গোঁড়া প্রকৃতির সংসারে কেউই সুনজরে দেখতেন না। ফলে, নিঃস্ব রিক্ত এই মানুষটি কেমন যেন ছন্নছাড়া ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্ব নিয়ে মনমরা হয়ে থাকতেন। 'কাশীনাথ'-এর কাশীনাথও তো ঘরজামাই। মানসিক সুখ বলতে তারও কিছু ছিল না। কখনও কখনও কাশীনাথের মনে হত হঠাৎ কেউ তাকে জোর করে গরম জলের কড়ায় ফেলে দিয়েছে। সবাই মিলে পরামর্শ করে তার দেহটাকেও কিনে ফেলেছে। তার নিজের বলতে কিছুই নেই, এমন-কি শরীরটাও নয়।

এমনিভাবেই চলছিল, হঠাৎই একদিন একটি দুর্ঘটনা ঘটে। কেদারনাথের স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী টাঙ্গায় চড়ে কোথাও যাওয়ার পথে পড়ে গিয়ে[১] গুরুতর ভাবে আহত হন। ভাগলপুরের

১. ১৮৮৮

চিকিৎসায় কোনো ফল না পাওয়ায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতায় চিকিৎসা করানো মানে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন, অথচ পূর্বের মতো সংসারে আর্থিক সংগতিও ছিল না। ভায়েরা পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। অমরনাথ আগেই দেহ রেখেছিলেন, তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যার সময়ে বিবাহ না দিলে আবার অপমানের ভয়ও আছে। কেদারনাথ ভেবে ভেবে কূলকিনারা না করতে পেরে মতিলালকে ডেকে একদিন বললেন, 'তোমাদের এখানে থাকা আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। দেবানন্দপুরে গিয়ে কোন কাজের খোঁজ করো।'

নিরুপায় মতিলাল এবং ভুবনমোহিনী দুজনেই একথা শুনলেন। কাকেই বা অভিযোগ অনুযোগ করবেন! তাই হঠাৎই শরৎ একদিন দেখল সে আবার দেবানন্দপুরে ফিরে এসেছে। দেবানন্দপুরে ফিরে আসার আগে ভাগলপুরে মামাদের প্রতিবেশী মজুমদারের ছেলে রাজুর সঙ্গে পরিচয় হয়। এ পরিচয় শুধু সামান্য পরিচয় নয়, এর পিছনে লুকিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার এবং প্রতিযোগিতার ইতিহাস। শ্যামবর্ণ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা, আজানুলম্বিত বাহু, মুখে অল্প বসন্তের দাগ, শরীরে যতখানি বল, মনে তার দ্বিগুণ সাহস এই রাজু অর্থাৎ রাজেন্দ্রনাথ। পিতা রামরতন মজুমদার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ভাগলপুরে আসেন। পরে অবশ্য কোনো কারণে চাকরি ছেড়ে দেন। গাঙ্গুলীদের ঠিক পাশেই তাঁদের বাড়ি ছিল। এবং বাড়ি সংলগ্ন জমি-জায়গা নিয়ে দুটি পরিবারে তেমন বনিবনাও ছিল না। কিছু পোড়ো জমি জঙ্গল ও আগাছায় ভরে গিয়েছিল। মা-বাপের কঠিন অনুশাসনে ব্যথিত ছেলেরা এই জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিত। ধূমপান, গাঁজা- চরস এবং চোরাই মোষের দুধ খেয়ে দেহ নির্মাণের পর্ব এখানে পূর্ণ উদ্যমে চলত।

রামরতন মজুমদার নিজের সাত-ছেলের জন্য সাতটি বাড়ি তৈরি করেন। পুরোনো বাঙালী সমাজে তাঁর কোনো আদর ছিল না, তাদের কাছে ক্ষমাও তিনি পাননি, কারণ তিনি চিনেমাটির পেয়ালা-পিরিচে চা-খাবার খেতেন, মুসলমান বাবুর্চির হাতের জল খেতেন। ছোট ভায়ের বিধবার সঙ্গে কথা বলতে দ্বিধা ছিল না। মোজা পরতেন, দাড়ি রাখতেন, ক্লাবে যাওয়া, দর্শন চর্চা করা ইত্যাদির জন্য তাঁকে কেউ ভালো নজরে দেখতেন না। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পিতার স্বাধীন মনোবৃত্তি এবং খেয়ালখুশি মতো পথচলাকে রাজু চরমে পৌঁছে দিল। ঘুড়ি ওড়ানোর দ্বন্দ্বযুদ্ধে শরতের মতো রাজুও সিদ্ধহস্ত ছিল। কাজেই একে অপরকে হারানোর খেলায় মেতে উঠত। ঘুড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় ভালো জিনিস যোগাড় করা ধনীপুত্র রাজুর অসুবিধে হত না, কিন্তু শরতের পয়সা কোথায়? তাই সে ও দলের ছেলেরা ভাঙা শিশি-বোতলের কাঁচ ময়দার মতো গুঁড়িয়ে তাতে আরো কিছু মিশেল দিয়ে সুতোর মাঞ্জা তৈরি করত।

সেদিন শনিবার। সন্ধেবেলা শরতের গোলাপী ঘুড়ি আপন খেয়ালী পথে উড়ে চলল। হঠাৎই একটা সাদা ঘুড়ি ক্রমশ গোলাপী ঘুড়িটার কাছাকাছি এসে পড়ল। এ ঘুড়ি রাজুর। দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্যাঁচের উপর প্যাঁচ। দুদলই জয়ের কামনায় উত্তেজিত। 'এই গ্যালো গ্যালো' 'কাটলো রে' 'ভো কাট্টা'র কানফাটা চিৎকার হাওয়ায় ভেসে ভেসে কাঁপতে লাগল। আর হঠাৎই সবাই দেখল সাদা ঘুড়িটা কেটে গিয়ে এলোমেলো ভাবে মাটিতে এসে লুটিয়ে পড়ল। দলের যখন আনন্দের শেষ নেই, রাজু ততক্ষণে ঘুড়ির সাজ-সরঞ্জাম গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছে।

পরে অবশ্য এই দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আসে। অসাধারণ প্রকৃতি, অপূর্ব প্রত্যুৎপন্নমতি বালক রাজুর সব রকম সাফল্যই যেন করতলগত। অপরদিকে শরতের স্থির, ধীর শান্ত বুদ্ধি অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে পরম আগ্রহে রাজুকে নিজের বন্ধুত্বের জন্য আকুল করে তুলত। অবশেষে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে দুটি কিশোর একাত্ম হয়ে উঠল। বয়সে বড় রাজু শরতের সকল প্রকার দুঃসাহসিক কর্মের মন্ত্রগুরু হয়ে উঠল। সংগীত এবং অভিনয়প্রিয়তা দুজনকে বন্ধুত্বের আরো নিকটে পৌঁছে দিল। শরতের গলা ছিল অত্যন্ত মধুর। তৎকালীন সদাচার এবং অনুশাসনের খড়্গ বারবার এই মৈত্রীর বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে, কিন্তু তবুও তাদের বন্ধুত্ব ছিন্ন হতে পারে নি। সংসারে এমন কেউ ছিল না যে সান্ত্বনা ও সহানুভূতির দুটো কথা তাকে বলে। জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের এই তো ছিল

প্রশস্ত সময়, কাজেই স্বভাবতই মন ঘরের বাইরে প্রেরণার স্রোত খুঁজে বেড়াত। তাছাড়া শুরু থেকেই শরতের মধ্যে লুকিয়ে ছিল মহান হবার সম্ভাবনা।

৪

মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী মামুদপুরের বাসিন্দা। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পরিবারের স্বাধীনচেতা নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন। যদিও সে-যুগ ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের অত্যাচার এবং অবিচারের যুগ, কিন্তু তাঁকে কেউ কোনোদিন দাবিয়ে রাখতে পারে নি। চিরদিনই তিনি প্রজাদের পক্ষ নিয়ে লড়েছেন। একদিন কোনো এক জমিদার কোর্টে মামলায় তাঁকে সাক্ষ্য দিতে বলেন। বৈকুণ্ঠনাথ অত্যন্ত সহজভাবে বলেছিলেন, 'আমি কেমন করে সাক্ষ্য দিতে পারি বলুন? মামলার বিষয়ে তো আমি কিছুই জানি না।' জমিদার বলেছিলেন, 'সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যে জানার কিছু নেই।' মিথ্যে সাক্ষ্য তো আজও দেওয়া হয়। সেদিনও দেওয়া হত, কিন্তু বৈকুণ্ঠনাথ অনায়াসেই অস্বীকার করলেন, ফলে জমিদারের ক্রোধের ধকল তাঁকে সইতে হয়েছিল।

কারণ আর যাই হোক, একদিন তাঁকে আর বাড়িতে ফিরে আসতে হয়নি। মতিলাল তখন খুব ছোট। শিশুপুত্রকে কোলে করে বৈকুণ্ঠনাথের স্ত্রী সারারাত স্বামীর আসার পথ চেয়ে রইলেন, কিন্তু তিনি ফিরলেন না। সকালবেলায় একটি লোক এসে বলল, 'বৌমা বৌমা বড় অঘটন ঘটে গেছে। বৈকুণ্ঠনাথকে কেউ মেরে রেখে গেছে। তার শবদেহ শ্মশানঘাটে পড়ে রয়েছে।' বাক্‌হারা নিস্তব্ধ হতবুদ্ধি বিমূঢ়া বৌমা কোলের শিশু-সন্তানটিকে বুকের সঙ্গে আরো নিবিড় করে চেপে ধরলেন। ছিল না জ্ঞান হারাবার সামর্থ্য। জমিদারের আতঙ্কে হাহাকার করে বুকফাটা কান্নাও সে কাঁদতে পারে নি, তাহলে যে ছেলেকেও হারাতে হয়। গ্রামের প্রবীণদের পরামর্শে স্বামীর শেষকৃত্য সেরে, শোকবিহ্বলা নারী রাতারাতি দেবানন্দপুরে ভায়ের কাছে চলে আসে। একটু বড় হলে পর ভাগলপুরের কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনমোহিনীর সঙ্গে মতিলালের বিয়ে হয়। বহু বাঙালীর মতো সে-সময় কেদারনাথের পিতা রামধন গঙ্গোপাধ্যায় ঘোর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবিকার খোঁজে শেষে হালিসহর থেকে এখানে এসে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন ও পরিশ্রমী হওয়ার দরুন উচ্চ সরকারী পদ পেতে তাঁর দেরি হয়নি। এরপর সমৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠা মুক্তহস্তে তাঁকে বরণ করে নেয়। তখনকার দিনে আর্থিক সম্পন্নতার চেয়ে কৌলীন্য এবং বংশমর্যাদা বিবাহাদিতে আকাঙ্ক্ষিত ছিল। সদ্‌বংশ এবং কুলীন সন্তান হওয়ার জন্যই কেদারনাথ মতিলালের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন। তাঁর কাছে থেকেই মতিলাল এন্ট্রান্স পাস করেন।[১] এন্ট্রান্স পাসের পর কলেজে পড়ার জন্য তিনি পাটনা চলে যান। খুড়শ্বশুর অঘোরনাথ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু দুজনের স্বভাবে কোনো মিল ছিল না। মতিলাল অভাব এবং দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হন। মার অত্যন্ত আদরে ছোটবেলায় তার শিক্ষা-দীক্ষা ঠিক পথ ধরে এগুতে পারেনি। লেখাপড়ায় তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, কিন্তু তার থেকেও বেশি ছিল কল্পনায় ডুবে থাকা। 'আমায় কল্পনার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতে দাও। আমি সেই বিশ্ব-সংসারকে দেখতে চাই এ-সংসার যার শুধুমাত্র প্রতিবিম্ব', এই হল মতিলালের পরিচয়। অঘোরনাথ ঠিক এর বিপরীত, অত্যন্ত কর্মঠ, স্পষ্টবাদী, সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। এরকম ক্ষেত্রে কল্পনাপ্রিয় মতিলালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব ছিল না। কলেজ জীবনেও তিনি বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারেননি। দেবানন্দপুরে ফিরে চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন। তখনকার দিনে এন্ট্রান্স পাসের পর চাকরি পাওয়া খুব কঠিন

১ ১৮৭৩—তৃতীয় শ্রেণী।

ছিল না। মামা নিজের বাড়ির কাছেই কিছু জমি দিয়েছিলেন। কিছু টাকা যোগাড় করে একতলায় দুটি দক্ষিণমুখো ঘর ও বারান্দা তৈরি করেন। এবং এখানে থেকেই স্বাধীনভাবেই সংসার যাত্রা শুরু করেন। মতিলালের মা সাহসী সুগৃহিণী ছিলেন। এবং তাঁর স্ত্রী শান্ত প্রকৃতি, নির্মল চরিত্র এবং উদারচিত্তের মহিলা ছিলেন। তিনি সুন্দরী ছিলেন না কিন্তু বৈদূর্যমণির ন্যায় অন্তরের রূপে সত্যই রূপসী ছিলেন। তাঁর সাবলীল পাতিব্রত্য এবং প্রেমের ছায়ায় স্বপ্নবিলাসী যাযাবর স্বামীর ঘরকন্না নিরুদ্বেগে চলতে লাগল। এখানেই ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ অর্থাৎ ৩১ ভাদ্র ১২৮৩ বঙ্গাব্দ শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। মা-বাপের দ্বিতীয় সন্তান। চার বছর আগে একটি বোন, অনিলার জন্ম হয়। মা-বাবা বড় যত্ন ও আগ্রহে পুত্রের নাম রাখলেন 'শরৎচন্দ্র'।

দেবানন্দপুর বাংলার একটি সাধারণ গ্রাম। খাল, বিল, পুকুর, নারিকেল, কলাগাছ ও সবুজের সমারোহে ভরা একটি গ্রাম। গ্রামে ম্যালেরিয়ার আধিক্য ছিল। নবাবী আমলে ফারসী ভাষার এটি একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। প্রায় দেড়শো বছর আগের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় ফারসী ভাষা শেখার জন্য কিশোর বয়সে এখানে আসেন। দেবানন্দপুরের গণনা প্রাচীন সাতটি গ্রামের মধ্যে করা হত। তখন এটি ছিল একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। ভারতচন্দ্রের সময় এই গ্রামে হরিরাম রায় এবং রামচন্দ্র দত্তমুন্সী পড়াতেন। এঁর কাছ থেকেই তিনি ফারসী ভাষা শেখেন এবং দুটি পদ্য লিখে তাঁদের দুজনকে অমর করে গিয়েছেন।

এ তিন জনার কথা পাঁচালী প্রবন্ধে গাথা।
বুদ্ধিরূপ কৈল নানা জনা।।
দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দধাম।
হীরারাম রায়ের বাসনা।।
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গাথা।
হয়ে মোর কৃপাদায় পড়াইল ফারসী।

এই গ্রামেই শরতের বাল্যজীবন অত্যন্ত অভাবের মধ্যে আরম্ভ হয়। শরতের মা না-জানি কেমন করে সংসার চালাতেন। স্বামীকে তিনি চিনতেন, তাঁর কাছে অভিযোগ করা বৃথা। শুধু সংসারের শ্রী হয়ে তিনি থাকুন এটুকুই সার্থকতা। ভুবনমোহিনী জীবনে কোনোদিন স্বামীর কাছে গহনা বা কাপড়-চোপড়ের দাবি করেননি। নিজেকে উৎসর্গ করাই যেন ছিল তাঁর পরম ব্রত। যখন তিনি ভাগলপুরে ছিলেন, বাবা-কাকাদের সেই বৃহৎ পরিবারের সব-কটি ছেলেমেয়ের ভার তিনি স্বচ্ছন্দে তুলে নিয়েছিলেন। কে-কখন ফিরবে, কে-কখন যাবে, কে-কখন কী ধরনের খাবার খাবে, এরকম অসংখ্য কাজের ভিড়ে নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ পেতেন না। চারিদিক থেকে শোনা যেত—'ভুবন কোথায় রে? এই ভুবন, ওরে ও মেয়ে ভুবনমোহিনী।'

মতিলাল যেন একটি রঙিন ঘুড়ি। অনন্ত আকাশে শুধু দিশাহীন উড়তে চায়। আর ভুবনমোহিনী একটি বিরামহীন চক্র। সরলচিত্তের নারী বিশ্রামহীন কর্মে চরকির মতো ঘুরছেন। তাঁর কোমল মন সবার দুঃখেই কাতর। সবাই তাঁকে ভালোবাসত। বড়রা তাঁর সেবাপরায়ণতায় মুগ্ধ ছিলেন। ছোটরা তাঁর স্নেহের কাঙাল ছিল। শরৎ-সাহিত্য খুঁজলে এরকম চরিত্র অনেক দেখা যাবে। কথাশিল্পী শরৎ যখনই সুযোগ পেয়েছে, অকৃপণভাবে মায়ের ঋণ শোধ করেছে। কিন্তু যতই সরল ও উদার নারী হোন-না কেন, স্বামীর অকর্মণ্যতা তাঁকে দগ্ধ করে। তাই ভুবনমোহিনী যখন মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন, মতিলাল চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত বাইরে ঘুরে বেড়াতেন 'শুভদার' হারানবাবুর মতো।

৫

পাঁচ বছর বয়সে শরৎকে প্যারী (বন্দ্যোপাধ্যায়) পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু অত্যন্ত খেলুড়ে ও চঞ্চল প্রকৃতির শরৎ প্রতিদিনই স্কুলে কোনো না কোনো কাণ্ড বাধিয়ে আসত। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টুমি কিছুমাত্র কমেনি। সেদিন মাদুরে বসে দেখল যে, পণ্ডিতমশাই তামাকের ছিলিম সাজিয়ে কোথায় যেন গেছেন। তৎক্ষণাৎ শরৎ তামাক সরিয়ে তার জায়গায় ছোট ছোট ইঁটের টুকরো রেখে ভালো মানুষের মতো নিজের জায়গায় এসে বসল। পণ্ডিতমশাই ফিরে এসে ছিলিমে আগুন রেখে গড়গড়ায় টান দিলেন, কিন্তু কোথায় ধোঁয়া? কয়েকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে তিনি ছিলিম উল্টেপাল্টে দেখেন যে, তামাকের বদলে ইঁটের টুকরো। বুঝতে পারলেন এ কোনো ছাত্রেরই কীর্তি। রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি করে বলো এই ইঁটের টুকরো ছিলিমে কে রেখেছে?' কিছুক্ষণ কারুর মুখে কোনো কথা নেই। কিন্তু পণ্ডিতমশাই যখন ক্রোধে পাগলের মতো বারবার চিৎকার করতে লাগলেন, তখন একটি ছেলে ভয়ে শরতের নাম বলে ফেলল। ব্যাস্, আর যায় কোথায়! পণ্ডিতমশাই বেত নিয়ে তেড়ে মারতে এলেন। শরৎ তো অবস্থা দেখে এক লাফে ছুট্। পালাবার সময় কিন্তু সেই ছেলেটিকে একটি ধাক্কা দিতে ভোলেনি। ধাক্কা খেয়ে ছেলেটি পড়ে যায়। পণ্ডিতমশাই তাকে ওঠাতে গেলেন, ইতিমধ্যে শরৎ উধাও। ক্রোধে উন্মত্ত পণ্ডিতমশাই শরতের বাড়ি গিয়ে তার মাকে সব কথা শোনালেন। বাড়ি ফিরে শরৎ মায়ের হাতে প্রচণ্ড মার খেল। মা মাঝে মাঝে নিজের কপাল চাপড়ে বলতে লাগলেন, 'কী করবে এই ছেলে বড় হয়ে? কেমন করে চলবে এর....?' শাশুড়ী বোঝালেন, 'বৌমা, এত মার মেরো না ওকে। আমি বলছি একদিন ওর সুমতি হবে। এ ছেলে সত্যি খুব বড় হবে। সেদিন দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না। কিন্তু তুমি দেখো, আমার কথা মিথ্যা হবে না।' পণ্ডিতমশাইয়ের অভিযোগের উত্তরেও শরতের ঠাকুমা সেই একই উত্তর দিতেন, 'পণ্ডিতমশাই, ন্যাড়া একটু দুষ্টু বটে, তবে বড় হয়ে ও ভালো লোকই হবে।' অনেক সময় শরতের অনেক দুষ্টুমি না-দেখার ভান করতেন, কারণ পড়াশুনোয় শরৎ অত্যন্ত ভালো ছিল। দ্বিতীয়, পুত্র কাশীনাথের পরম বন্ধুও ছিল শরৎ। সেই স্কুলেই কাশীনাথের বন্ধুর বোনও পড়ত। না-জানি কেমন করে দুজনের বন্ধুত্ব হয়। তারপর থেকে একসঙ্গে বেড়ানো, পুকুরে নদীতে মাছ ধরা, নৌকো করে বেড়ানো, বাগানের ফলপাকড় চুরি করা, ঘুড়ির সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করা, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, সব রকম শিশুসুলভ কাজে সেই মেয়েটি শরতের সঙ্গিনী ছিল। তার আসল নামই বা কী ছিল কেউ জানত না কিন্তু সুবিধের জন্য তাকে সবাই ধীরু বলেই ডাকত। ধীরুর একটি শখ ছিল, করমচার সময় শরৎকে করমচার মালা তৈরি করে দিত। মাল্যদানের অর্থ সেই মেয়েটি তখনও পর্যন্ত জানত না। কিন্তু সময়ের দেবতা একদিন দুজনকে এ-রহস্য নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। দুজনের সম্পর্কও তো কম রহস্যময় ছিল না। গরমের দিন। একদিন হল কি শরৎ দেবদাসের মতোই পাঠশালার ঘরের একটি কোণে ছেঁড়া মাদুরে বসে ছিল। হাতে শ্লেট নিয়ে একবার চোখ খুলে, একবার বন্ধ করে পা-ছড়িয়ে বসে হাই তুলছে। হঠাৎই তার মনে হল ঘুড়ি ওড়াবার এটাই উপযুক্ত সময়। ক্ষণিকের চিন্তা কাজে লেগে গেল। পাঠশালায় তখন জলপানের ছুটি। বাচ্চারা নানা খেলার কলরবে মত্ত। শরৎ শাস্তি পেয়েছিল, তাই তার ছুটি ছিল না। একবার পাঠশালা থেকে বেরুলে আর সে ফিরত না। ক্লাসের মনিটার ভোলুর রক্ষণাবেক্ষণে পড়া তৈরির নির্দেশ ছিল তার উপর। শরৎ দেখল পণ্ডিতমশাই ঘুমোচ্ছেন আর ভোলু ভাঙা বেঞ্চিতে এমন কায়দায় বসে যেন ঠিক পণ্ডিতমশাই। শ্লেট পেন্সিল নিয়ে শরৎ ভোলুর কাছে গিয়ে বলল, 'এই অঙ্কটা বুঝতে পারছি না।' ভোলু গম্ভীর হয়ে বলল, 'দেখি শ্লেট দেখি।' ভোলু অঙ্ক কষায় মন দিয়েছে, অমনি একটা অঘটন ঘটল। হঠাৎ ভোলু বেঞ্চের পাশে

রাখা চুনের গাদায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আর শরতের টিকিটুকুও ত্রিসীমানায় দেখা গেল না। ধীরু এইসব দেখে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। পণ্ডিতমশাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। ভোলুর চেহারার অবস্থা তথৈবচ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত চুনকাম-করা ভূতের মতোই তাকে লাগছিল। কান্নাও তার বন্ধ হচ্ছিল না। পণ্ডিতমশাইয়ের বুঝতে দেরি হল না। বললেন, 'ওই শরৎ হারামজাদাই ধাক্কা মেরে পালিয়েছে।' ভোলু কোনোরকমে কেঁদে ককিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।' এরপর যেভাবে শরতের খোঁজ করা হল, তা কোনো ছোটখাট সৈন্য আক্রমণের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। নানা ধরনের আলোচনা করতে করতে বাঙ্গারা তাকে খুঁজছিল, কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারছিল না। যে কেউ তাকে ধরার চেষ্টা করছে, তাকেই শরৎ ইঁট ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। ধীরু সবকিছুই লক্ষ্য করছিল। সে একথাও জানত এ সময় শরৎ কোথায় থাকতে পারে। কিছুক্ষণ পর সে আঁচলে খানিকটা মুড়ি বেঁধে জমিদারদের আমবাগানে ঢুকল, শরৎ যেখানে একটি বাঁশের মাচায় বসে তামাক খাচ্ছিল। ধীরুকে দেখেই বলল, 'দে, কি এনেছিস?'

বলতে বলতে আঁচল থেকে মুড়ি তুলে খেতে শুরু করল। শরৎ খাচ্ছিল আর ধীরু পণ্ডিত-মশাইয়ের তর্জন-গর্জন শোনাচ্ছিল। হঠাৎই শরৎ বলে উঠল, 'জল এনেছিস?'

ধীরু বলল, 'না, জল তো আনিনি।'

শরৎ রাগ করে বলল, 'তো যা, এখন গিয়ে নিয়ে আয়।'

এভাবে একথা কথা বলাতে ধীরুর ভালো লাগল না, তাই বলল, 'আমি এখন আর যেতে পারব না, তুমি গিয়ে জল খেয়ে এসো।'

'আমি এখান থেকে যেতে পারব না, তুই গিয়ে নিয়ে আয়।'

ধীরু কিন্তু উঠল না।

রেগে গিয়ে শরৎ বলল, 'যা, আমি বলছি যা।'

ধীরু একথা শোনার পরও চুপ করে রইল। শরৎ ওর পিঠে একটা ঘুঁষি মেরে বলল, 'যাবি কি না?'

ধীরু কেঁদে ফেলল, ওঠবার সময় বলল, 'আমি তোমার মাকে গিয়ে এখুনি সব বলে আসছি। এ কথাও বলে দেব যে, তুমি তামাক খাচ্ছিলে।'

'যা বল গিয়ে, মরগে যা।' সেদিন শরৎ মার হাতে প্রচণ্ড মার খেলো। আর ধীরুও শরতের হাতের বেদম প্রহার পেল।

তবুও দুজনের বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি, ক্রমশ তা আরো গাঢ় হয়ে উঠেছিল। অনেকদিন পরে শৈশবের ওই সঙ্গিনীকে কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র নিজের কয়েকটি উপন্যাসের নায়িকা সৃজন করেন। 'দেবদাসের পারু', 'বড়দিদির মাধবী', এবং 'শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী' এসবই তো ধীরুরই পরিমার্জিত বিকশিত বিরাট রূপ। বিশেষ করে 'দেবদাসে' যেন নিজের শৈশবকেই মূর্ত করে তুলেছেন।

দিনের পর দিন কেটে যায়। এই দুটি বালক-বালিকার আমোদ-আহ্লাদের যেন শেষ ছিল না। সারাদিন রোদে ঘুরে বেড়ান, সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে মার-খাওয়া আর রাতে নিরুদ্বেগে ঘুমিয়ে পড়া। পরের দিন আবার সকাল থেকে বেড়িয়ে-বেড়ানো, সন্ধ্যায় তিরস্কার, রাতে শোওয়া। এমনি করে প্রতিদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত। ওদের আর কোনো সঙ্গী সাথী ছিল না, প্রয়োজনও বোধহয় ছিল না। সারা গ্রামে উপদ্রব করে বেড়ানোয় এই জুটি দুটিই যথেষ্ট ছিল। মাছধরা, নৌকো-চড়া ছাড়াও মাঝে-মাঝে শরৎ যাত্রাদলে গিয়ে ঠেকা দিত। মধুর গলার জন্য যাত্রাদলেরও উপকার হত। তাও যখন একঘেয়ে লাগত, তখন একটা গামছা কাঁধে করে বেরিয়ে পড়ত। এই বেরিয়ে পড়া বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা ছিল না বরং একেবারেই অন্য ধরনের ছিল। তাও যখন শেষ হয়ে যেত তখন ক্লান্ত চরণে, শ্রান্ত দেহ ও অবসন্ন মন নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসত। আবার পাঠশালায় যেত, 'পদ্যপাঠ' ও 'বোধোদয়ে' মনোনিবেশ করত। আবার একদিন দুষ্টু সরস্বতী কাঁধে চাপত। আবার শুরু হত যাত্রাদলে ঘোরা ফেরা,

আবার একদিন সর্বকিছু পিছনে ফেলে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা।

সেদিন সে সরস্বতী নদীর ঘাটের কাছে এসে দেখে যে একটা ডিঙিগ রয়েছে। ব্যাস্, অমনি তাতে চড়ে বসে তিন চার মাইল দূরের কৃষ্ণপুর গাঁয়ে পৌছল। কৃষ্ণপুরে রঘুনাথ বাবার প্রসিদ্ধ আখড়া ছিল। শরৎ সেখানে গিয়ে কীর্তন শুনত। শুনতে শুনতে রাত হয়ে যেত, বাড়ি ফেরা আর হয়ে উঠত না। পরের দিন মতিলাল খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে আসতেন। শরতের এ যাত্রাভিযান শুধু একদিনের ছিল মনে হয় না, হয়ত কোনো বড় যাত্রার এ-শুধু পূর্বাভাস। কখনও একা, কখনও বন্ধুদের সঙেগ প্রায়ই বেরিয়ে পড়ত।

এই সময়েই সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য গ্রামে একটি বাংলা স্কুল খোলেন। এখানে যদি মন লাগে, এই ভেবে শরৎকে এই স্কুলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু শরতের কার্যপ্রণালীতে কিছু রকমফের দেখা গেল না। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। এদিকে এই সময়েই মতিলাল ডিহরী-অন শোনে চাকরি পান। বাবার সঙেগ শরৎও কিছুদিন সেখানে ছিল। যদিও সারাটা সময় খেলাধুলো করেই কাটত। ডিহরী-অন শোনে একটা খাল ছিল, তার ধারে ঘিরনী কুড়িয়ে বেড়াত বা ফাঁস লাগিয়ে গিরগিটি ধরে বেড়াত। কখনও আবার ঘাটের উপর চুপটি করে বসে কল্পনায় ডুবে যেত। সবরকম দুষ্টুমির মধ্যেও তার অন্তর্মুখী স্বভাব নিরন্তর বিকশিত হচ্ছিল। ডিহরী অন শোনের এই অল্পমেয়াদী প্রবাসের কথা তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেননি। তাই 'গৃহদাহ'-তে এই নগণ্য জায়গাটিকে অমর করে গেছেন।

দেবানন্দপুরে ফিরে শরৎ আর-এক নতুন খেলায় মেতে উঠল। সরস্বতী নদী, ছোট্ট কূল উপচানো নদী। ঘাটগুলোও তার চওড়া নয়। কোমর অবধি জলে শ্যাওলা জমে থাকত। যেখানে শ্যাওলা কম, সেখানে ছোট ছোট মাছেরা খেলা করত। কঞ্চিতে আটার গুলি দিয়ে জলে ডুবিয়ে বসে থাকত। একদিন পাড়ার নয়ন বাগ্দী এসে ঠাকুমাকে বলল, 'মা, আমায় পাঁচটি টাকা দাও, তোমার নাতিকে দুধ খাইয়ে সে আমি শোধ করে দেব। একটা ভালো গোরু কিনব। বসন্তপুরে সম্পর্কে এক ভাই থাকে, সে বলে পাঠিয়েছে।' ঠাকুমা পাঁচটি টাকা দেওয়াতে নয়ন বাগ্দী প্রণাম করে যেতে হঠাৎই শরতের মনে পড়ল যে, বসন্তপুরে ছিপের জন্য ভালো বাঁশ পাওয়া যায়। ব্যাস্, অমনি নয়ন বাগদীর পিছু নিল। এক মাইল চলার পর নয়ন বাগদী শরৎকে দেখে রেগে গেল, আবার লোভও দেখাল, কিন্তু শরৎ কোনো কথাই গ্রাহ্য করল না। বাধ্য হয়ে নয়ন বাগদী জোর করে শরৎকে ধরে ঠাকুমার কাছে দিয়ে বলল, 'রাস্তা ভালো নয়। বিপদের ঝুঁকি আছে। গোরু সামলাব না একে সামলাব।' ঠাকুমা বিপদের কথা জানতেন, তাই শরৎকে বললেন, 'তুই যাবি না। আর যদি গিয়েছিস শুনতে পেয়েছি তাহলে পন্ডিতমশাইকে বলে দেব।' নয়ন চলে গেল। শরৎও পুকুরে নাইতে যাবে বলে ভালো করে সারা গায়ে তেল মেখে কাঁধে গামছা ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। নদীর ধার দিয়ে বন জঙগল আম কাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়ে প্রায় দু-আড়াই মাইল দৌড়ে চলে এল এবং যেখানে গ্রামের কাঁচা সড়ক গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে মিলেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরই নয়ন এসে হঠাৎই শরৎকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভারি অবাক হল। কিন্তু এতদূর এসে আর ফেরা যায় না হেসে বলল, 'বেশ দেবতা বেশ, চলো এবার। ভাগ্যে যা আছে সে না হয় দেখা যাবে।' বসন্তপুরে নয়নের পিসি শরৎকে খুব আদর যত্ন করলেন। নয়ন পেল গোরু আর বালক শরৎ পেল বাঁশের কঞ্চি। টাকাও পিসি ফেরত দিল। ফেরার সময় সন্ধে ঘনিয়ে এল। দু-ক্রোশ চলার পরই আকাশে চাঁদ দেখা গেল। রাস্তার দুপাশে বড় বড় অশ্বত্থ ও বটের গাছ অন্ধকারকে আরো ঘনীভূত করে রেখেছে। তারা যখন বড় রাস্তা থেকে কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল, তখন ঝোপ-জঙগলগুলো আরো ঘন নিবিড় হয়ে পড়েছে। এই জঙগলেই লেঠেলরা মানুষ মেরে তার সব-কিছু কেড়ে-কুড়ে পুঁতে রাখত। পুলিস এর ত্রিসীমানায় আসত না। গ্রামের কেউ পুলিসে খবরও দিত না, কারণ তাতে বিপদ আরো বেশি। বাঘের সামনে পড়েও দৈবযোগে কেউ কেউ বেঁচে যায় কিন্তু পুলিসের পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে নেই। যেতে যেতে হঠাৎই একটা চিৎকার ভেসে এল এবং সঙেগ সঙেগ লাঠিবর্ষণ আর তারপর সব স্তব্ধ।

নয়ন বলল, 'বেচারা শেষ হয়ে গেল। আমাদের এবার একটু সতর্ক হয়ে এগুতে হবে।' বালক শরৎ ভয়ে কাঁপতে লাগল। নিশ্বাস নিতেও ভয়। চারিদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন, ভালো করে কিছু দেখাও যায় না।

নয়ন চিৎকার করে বলল, 'খবরদার বলছি বামুনের ছেলে রয়েছে আমার সঙ্গে, যদি লাঠি ছোঁড়ো তো তোমাদের কাউকেই আর বাঁচতে দেব না।' কোথাও থেকে কোনো উত্তর এল না। কিছুদূর গিয়ে যে লোকটি চিৎকার করেছিল তার দেখা পাওয়া গেল। বেচারা একটি ভিখিরি। একতারা বাজিয়ে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াত। নয়ন আর থাকতে না পেরে বলল, 'নরকের কীট! তোরা শেষে একটা বৈষ্ণব ভিখিরির প্রাণ নিলি! ইচ্ছে করছে তোদেরও এমনি করে মেরে ফেলি।' এবার গাছের আড়াল থেকে জবাব এল, 'ধর্মের কথা রাখ্! বাঁচতে চাস তো পালা এখান থেকে।'

'হারামজাদা, কাপুরুষ সব! আমি পালাব তোদের ভয়ে?' এই না বলে নয়ন পকেট থেকে টাকা বার করে টনটন করে বাজিয়ে বলতে লাগল, 'দেখ্, আমার কাছে টাকা রয়েছে। সাহস থাকে তো কাছে আয়; নিয়ে যা। আমি নয়ন বাগদী। কোনো জবাব এল না। এবার নয়ন গালপেড়ে হেঁকে বলল, 'কিরে? আসবি, না আমি বাড়ি যাব?' তবুও কোনো উত্তর নেই। রাস্তার উপর কয়েকটা লাঠি পড়ে ছিল। নয়ন সেগুলো তুলে নিল এবং কিছুদূর এগিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, 'না ভাই, চোখের উপর বৈষ্ণব হত্যা দেখে এই হত্যাকারীদের শাস্তি না দিয়ে আমি যেতে পারব না।'

ছোট্ট শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি করবে?'

নয়ন বলল, 'আমি কি ওদের একটাকেও ধরতে পারব না? তারপর দুজনে মিলে লাঠির ঘায়ে তাকে মেরে ফেলব।' মারতে মারতে মেরে ফেলার কথায় বালক শরতের মন প্রসন্ন হল। বলল, 'নয়নদাদা, তুমি ওকে বেশ ভালো করে চেপে ধরে রেখো, আমি একলাই ওকে মেরে মেরে ফেলে দেব, কিন্তু যদি আমার ছিপ ভেঙে যায়, তাহলে?' নয়ন হেসে বলল, 'ছিপের মারে মরবে না ভাই। এই নাও সোঁটা।' এই বলে ভালো দেখে একটা লাঠি সে শরতের হাতে তুলে দিল। লেঠেলরা ভেবেছিল এরা এতক্ষণে চলে গিয়ে থাকবে, তাই ভিখিরিটার কিছু আছে কিনা খোঁজ নিতে বেরিয়ে এল।

নয়ন গাছের পিছনে লুকিয়ে ছিল। একজন দেখে ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কে? সেই লোকটির চিৎকারে আর সবাই তো পালিয়ে গেল, কিন্তু ধরা পড়ল সে নিজেই। নয়ন তাকে আচ্ছা করে বেঁধে বালক শরতের কাছে নিয়ে এল। লোকটি হাপুস নয়নে কাঁদছিল। মুখে কালো ভুষি মেখে কোনো কোনো জায়গায় চুনের ফোঁটা লাগিয়েছিল। রাস্তার উপর শুইয়ে তাকে টেনে কয়েকটা লাথি লাগাল, তারপর শরতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাও, এবার লাঠি মারো।' বালকের হাত-পা কাঁপছিল। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'আমার দ্বারা হবে না।'

নয়ন বলল, 'তোমার দ্বারা হবে না যখন দাও লাঠিখান্, আমিই শেষ করে দিই এরে।'

শরৎ মিনতির সুরে বলল, 'না নয়নদাদা, আর মেরো না।' ততক্ষণে সেই লোকটি, যে বোধ হয় দু-তিনদিন ধরে অন্নের মুখ দেখেনি, রাস্তার মাঝে এমন ভাবে পড়ে ছিল যেন মরেই গেছে। নয়ন নিচু হয়ে ওর নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখে বলল, 'না মরেনি, অজ্ঞান হয়ে গেছে। চলো ভাই, আমরাও চলি।'

৬

তিন বছর মামার বাড়ি ভাগলপুরে থাকার পর শরৎকে দেবানন্দপুরে ফিরে আসতে হয়। বারবার স্থান বদলের দরুন পড়াশুনোর ক্ষতি হত। বাউণ্ডুলেপনাও বাড়ত, শুধু লাভের মধ্যে অভিজ্ঞতার ঝোলা ভারী হত। ভাগলপুরে থাকাকালীন হাজার দুষ্টুমির মধ্যেও ভালো ছেলে হওয়ার উদ্যমও কিছু কম ছিল না তার। লেখাপড়ায় ভালোই ছিল। গাঙ্গুলী পরিবারের কঠোর

অনুশাসনের বিরুদ্ধে অন্তরে বিদ্রোহ জাগত, মনে প্রচন্ড ইচ্ছে হত 'আমি কারো চেয়ে ছোট হতে চাই না।' এই ইচ্ছের জোরেই ভালো ছেলেদের মধ্যে তাকে গণ্য করা হত। আত্মচিন্তন ও লেখার অভ্যেসও এই ইচ্ছের দাবিতেই করত। শরৎ সুন্দর সুপুরুষ ছিল না। চোখ দুটি ছাড়া তার আর কোন বিশেষত্ব ছিল না। চোখের দিকে চাইলে আর কেউ মুখ ফেরাতে পারত না। শ্যাম রঙ, রুগ্ন শরীর কিন্তু দৌড়বার সময় শক্ত পা-দুটো যেন হরিণের ক্ষিপ্রতা পেত। বেড়ালের মতো অনায়াসে গাছে চড়তেও পারত। তীক্ষ্ণ মেধা, কিন্তু কঠোর অনুশাসনের গন্ডির মধ্যে হাঁফিয়ে উঠে অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পথ বেছে নিত।

দেবানন্দপুরে সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতায় নিজেকে সে মাতিয়ে রাখল। এখানে অনুশাসনের বালাই ছিল না। কোনো রকমে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে[১] ভর্তি করা হল। দু-ক্রোশ পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হত। কাঁচা সড়ক, গরমে ধুলোয় ধুলোময়, বর্ষায় কাদায় ভরপুর। অভাবের দরুন স্কুলের মাইনেও সময়ে যোগাড় করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। গয়না বিক্রি করে এবং বাড়ি বাঁধা দেওয়া সত্ত্বেও অভাব মেটেনি। পেটেও তো কিছু দিতে হবে। তবুও কোনোরকমে সে প্রথম শ্রেণীতে[২] পৌঁছল। এদিকে পিতা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি পরীক্ষার ফি যোগাড় করতে পারলেন না। আর ফি না দিলে স্কুলেই বা যাবে কী করে? প্রথম প্রথম কোনো বন্ধুর বাড়ি একমুঠো ভাত খেয়ে স্কুলে যাবার পথে গাছের ছায়ায় দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে সময় কাটাত। এমনি করেই সে ছেলেদের দলের দলপতি হয়। লেখাপড়া তো বন্ধ হলই, পরিবর্তে হাতে এল দুমুখ-খোলা ছুরি। এই ছুরিখানা নিয়ে দিবারাত্র ঘুরে ঘুরে বেড়াত। শরতের ভয়ে দলের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে লাগল। পরের বাগানের ফল চুরি করে তা সে গরিব দুঃখীদের মধ্যেই ভাগ করে দিত। অপরের পুকুর থেকে মাছ চুরি করার অভ্যেস আগেও ছিল, এখন তা আরো বাড়ল। কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিবেশীরা শরতের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল কিন্তু তাকে ধরে শাস্তি দেওয়া ছিল তাদের ক্ষমতার বাইরে, অবশ্য ফল এবং মাছ চুরি ছাড়া আর কিছু সে করত না। দ্বিতীয়ত, তারই চুরির সামগ্রীতে বহু গরিব দুবেলা দুটো যা হোক খেতে পেত। গ্রামে গরিবের সংখ্যাই বেশি। একটি অতি দরিদ্র রুগ্ন লোক ছিল গ্রামে। রোগের চিকিৎসা করা ছিল তার সাধ্যের বাইরে। তাই একদিন লোকটি এই দলটির শরণাপন্ন হল। তৎক্ষণাৎ এরা প্রচুর পরিমাণে মাছ চুরি করে তা বিক্রি করে লোকটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। উপেক্ষিত অনাশ্রিত রুগীদের সে নিজেই দেখাশোনা করত। বহুবার অন্ধকার রাতে লণ্ঠন আর লম্বা লাঠিখানা নিয়ে শহর থেকে সে ওষুধ কিনে এনেছে, ডাক্তার ডেকে এনেছে। তাই কিছু লোক তাকে অপছন্দ করলেও বহু লোক সত্যিই মনে মনে তাকে ভালোবাসত।

তা বলে শরৎ চোর ছিল না। ঘরে নিদারুণ অভাব, তবুও কখনও সে নিজের চিন্তা করেনি। সত্যিই সে রবিনহুডের মতো দুঃসাহসী এবং পরোপকারী ছিল। মাঝরাতে নিবিড় অন্ধকারে যখন রাস্তায় কুকুরও বেরুতে ভয় পেত, তখন শরৎ চুপচাপ পূর্বনির্দিষ্ট বাগানে বা পুকুরে গিয়ে নিজের কাজ করে যেত। এই শুভ কাজে ওর কয়েকটি সঙ্গী ছিল। সদানন্দ তাদের অন্যতম। পুকুরের ধারে বাগানের পাশে উঁচু টিলার আড়ালে একটা গভীর খাদ ছিল। লুটের সামগ্রী সব এখানে এনেই জড়ো করত। তামাক খাবার সরঞ্জামও এখানে ছিল। এই দলের উৎপাত যখন চরমে পৌঁছল, তখন সদানন্দের অভিভাবকেরা তাকে শরতের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করলেন। মিলন কোনোদিন নিষেধের বাঁধন মানে না। তাই সাপও মরে অথচ লাঠিও ভাঙে না এমন একটা উপায় তারা খুঁজে বার করল। সদানন্দের বাড়ির ছাত ঘেঁষে একটা বড় গাছ ছিল। সেই গাছ বেয়ে শরৎ সদানন্দের ছাতে পৌঁছে যেত আর দুজনে মিলে খুব করে পাশা খেলত। তারপর নৈশ অভিযানে বেরিয়ে পড়ত। প্রাণভরে ঘুরে বেড়িয়ে ভালো ছেলেটির মতো নিজের

১. ১৮৮৯ বা ১৮৯০—বর্তমান সময়ে সপ্তম শ্রেণী।
২. বর্তমান সময়ে দশম শ্রেণী।

নিজের বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়ত। যখনই তারা যেটি ভাবত, অমনি তা সমগ্র মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে পূরণ করত। মাঝে মাঝে কোনো মাঝির নৌকো নিয়ে কখনও বা বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথ বাবাজীর আখড়ায় যেতে সে ভোলেনি। এখানেই কোথাও তার বন্ধু গহর থাকত। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের সেই আধপাগলা কবি, কীর্তনও ভালো গাইত। জানি না সেখানের কোনো বৈষ্ণবীর নাম কমললতা ছিল কি না, কিন্তু একথা খুবই সত্যি যে, কিশোর বয়সের এই বন্ধুটির ছাপ তার হৃদয়ে চিরদিন আঁকা ছিল। সাহিত্য সৃজনে কতবার না জানি এ চরিত্রটিকে তিনি নিজের লেখায় বাঁচিয়ে তুলেছেন।

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে কথাশিল্পী লিখেছেন—

'সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বন-বাদাড়ের মধ্য দিয়া এপথ-ওপথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্টেশন চলিয়াছিলাম। অনেকটা ছেলেবেলায় পাঠশালে যাবার মত। ট্রেনের সময় জানি না, তাগিদও নাই—শুধু জানি ওখানে পৌঁছিলে যখন হউক গাড়ি একটা জুটিবেই। চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময়ে মনে হইল সব পথগুলাই যেন চেনা। যেন কতদিন এপথে কতবার আনাগোনা করিয়াছি। শুধু আগে ছিল সেগুলা বড়, এখন কি করিয়া যেন সংকীর্ণ এবং ছোট্ট হইয়া গেছে; কিন্তু ঐ না খাঁয়েদের গলায়-দড়ের বাগান। তাই ত বটে। এ যে আমাদেরই গ্রামের দক্ষিণপাড়ার শেষ প্রান্ত দিয়া চলিয়াছি। কে নাকি কবে শূলের ব্যথায় ঐ তেঁতুল গাছের উপরের ডালে গলায় দাঁড় দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু প্রায় সকল গ্রামের মত এখানেও একটা জনশ্রুতি আছে। গাছটা পথের ধারে, ছেলেবেলায় চোখে পড়িলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত এবং চোখ বুজিয়া সবাই একদৌড়ে স্থানটা পার হইয়া যাইতাম।

'গাছটা তেমনই আছে। তখন মনে হইত ঐ অপরাধী গাছটার গুঁড়িটা যেন পাহাড়ের মত, মাথা গিয়া ঠেকিয়াছে আকাশে। আজ দেখিলাম সে বেচারার গর্ব করিবার কিছু নাই, আরো পাঁচটা তেঁতুলগাছ যেমন হয়, সেও তেমনি—জনহীন পল্লীপ্রান্তে একাকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহু বর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মত চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছ? ভয় করে না ত?

'কাছে গিয়া পরম স্নেহে একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে মনে বলিলাম, ভালো আছি, ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়। সায়াহ্নের আলো নিবিয়া আসিতেছিল। বিদায় লইয়া বলিলাম, ভাগ্য ভালো যে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। চললাম বন্ধু।'

এই কথাগুলো লেখার সময় শৈশব যেন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনানো শরতের জন্মগত প্রতিভা ছিল। পনেরো বছর বয়সে সে এ-বিদ্যেয় অত্যন্ত পটু হয়ে যায়। গ্রামে গ্রামে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্যই স্থানীয় জমিদার নন্দগোপাল মুন্সী শরৎকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর পুত্র অতুলচন্দ্র সে সময় কলকাতায় এম. এ. পড়ছিল। শরতের গল্প বলার বিদ্যেয় সে-ও অত্যন্ত প্রসন্ন হত এবং ছোট ভায়ের মতো তাকে স্নেহ করত। কখনও কখনও থিয়েটার দেখাতে কলকাতাতেও নিয়ে যেত। কখনও কখনও বলত, 'তুমি যদি এরকম গল্প লিখতে পার, তাহলে আমি তোমায় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে থিয়েটার দেখাব।'

থিয়েটার দেখাবার পর আবার বলত, 'আচ্ছা, তুমি এর গল্প লিখতে পারবে?'

শরৎ এমন গল্প লিখে নিয়ে আসত যে, অতুল চমকে যেত।

এই রকম লিখতে লিখতে শরৎ একদিন মৌলিক লেখায় হাত দিল। সেদিন কোন্ তিথি ছিল? কোন্ সময় কোথায় বসে যে লেখা শুরু করেছিল সে কথা কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু সেই গল্পটির নাম ছিল 'কাশীনাথ'। কাশীনাথ শরতের গুরুভাই ছিল। তাকেই নায়ক খাড়া করে এই গল্প লেখা সে শুরু করে। কিন্তু সে নামেই শুধু নায়ক। নায়কোচিত রূপ গুণ তার ছিল না, কিন্তু ঘরজামাই কেমন হয়, তা সে নিজের পিতাকে শ্বশুরবাড়িতে থাকাকালীন দেখেছে। গল্পের

শেষটুকুও মনে হয় কোনো জানা বা দেখা ঘটনা। বোধহয় তখন গল্পটির কলেবর ছোট ছিল। পরে ভাগলপুরে গিয়ে গল্পটিকে নতুন করে লেখে । 'কাকবাসা' ও 'কোরেলগ্রাম' এ দুটি গল্প সে সময়ের লেখা। আরো কয়েকটি গল্প সে নিশ্চয়ই লিখেছিল কিন্তু কালের ক্রূর দৃষ্টি এড়িয়ে এই দুটিই টিঁকে গিয়েছিল। ছোট থেকেই শরতের মননশীলতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিল। সে যা দেখত তার গভীরে যাবার চেষ্টা করত। এই অভিজ্ঞতাই তার প্রেরণা ছিল। গ্রামে ছিল একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে। বালবিধবা। নাম তার নীরু। বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কোনো কলঙ্ক তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। অত্যন্ত পরোপকারী, ধর্মশীলা, কর্মনিষ্ঠ। এই নারী রোগে সেবা, দুঃখে সান্ত্বনা, অভাবে সাহায্য, প্রয়োজনে ঝি-গিরি, যে-কোনো কাজেই ছিল দ্বিধাহীন। গ্রামে বোধহয় এমন কোনো ঘর ছিল না যে তার সেবা ও সাহায্য নেয়নি বা পায়নি। শরৎ তাকে দিদি বলে ডাকত। দিদিও শরৎকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এ মিল শুধু বোধহয় দুঃখকাতর মনের মিল। এই দিদির যখন বত্রিশ বছর বয়স তখন হঠাৎ তার পদস্খলন হয়। গ্রামের বিদেশী স্টেশন মাস্টার তার জীবনকে কলঙ্কিত করে কোথাও পালিয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা কিন্তু তার সমস্ত সেবা উপকার ভুলে গেল। মর্মান্তিক হৃদয়হীনতায় নীরুকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। এমন-কি তার সঙ্গে কথা বলাও লোকে পাপ মনে করত। লজ্জা, অপমান, আত্মগ্লানির ধিক্কারে বেচারী অসহায় হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য তো ভেঙে গেলই, একেবারে মরণাপন্ন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছল। তার মুখে একফোঁটা জল দেবার জন্য কেউ এগিয়ে এল না। কেউ উঁকি দিতেও এল না। যেন নীরু বলে এই গাঁয়ে কেউ কোনোদিন ছিল না। শরতের উপরেও ওদিক না-মাড়াবার নির্দেশ ছিল, কিন্তু শরৎ জীবনে কোনোদিন কারো নির্দেশ মেনে চলেনি। রাতে লুকিয়ে গিয়ে দেখে আসত। পায়ে হাত বুলিয়ে সান্তনা ও মমতার স্পর্শ রেখে আসত। কোথা থেকে একটা কি দুটো ফলও নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসত। গ্রামের লোকেদের হাতে এভাবে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয়েও নীরুদিদি কারও বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেননি। নিজের লজ্জাতেই তিনি মরমে মিশে গিয়েছিলেন। নিজেকে অপরাধী মেনে নিয়ে এ শাস্তি তিনি মাথা পেতে হাসিমুখে সইছিলেন। হয়তো এই-ই নিয়ম। শরতের অনুভূতিপ্রবণ মন বুঝতে পেরেছিল, ভুলের মাশুল তিনি নিজেকে নিজেই দিচ্ছেন। গ্রামের লোকেরা শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। তাই তাদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন, নিজেকে নয়। যখন তিনি মারা গেলেন, তার লাশও কেউ ছুঁল না। ডোমে তার শবদেহটি বনে-বাদাড়ে কোথায় ফেলে এল। শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেল তার নিষ্প্রাণ দেহটিকে। আর এখানেই শরৎ 'বিলাসী' গল্পের কায়স্থ মৃত্যুঞ্জয়কে সাপুড়ে হতে দেখেছিল। তাদের স্কুলেই সে পড়ত, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর পর আর সে পড়েনি। এক কাকা ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। অথচ সেই কাকাই ছিল তার পরম শত্রু। তার বড় বাগানটির প্রতি কাকার লোভ ছিল। মরে তো আপদ চোকে, এই ভেবে সে অসুস্থ অবস্থাতেও মৃত্যুঞ্জয়কে দেখেনি। বেচারা মরেই যেত, যদি না একটা বুড়ো ওঝা ও তার মেয়েটি দেখাশোনা করত। এই মেয়েটির নাম ছিল বিলাসী। এই সেবার মধ্যে দিয়েই সে মৃত্যুঞ্জয়ের অনেক কাছে এগিয়ে এসেছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে বিয়ে করে। কিন্তু সমাজবিদ্‌রা এ-অন্যায় কেমন করে সইবে? তাই তারা মৃত্যুঞ্জয়কে সমাজ-বহির্ভূত করেন। তাতেও সে ভ্রূক্ষেপ করেনি। যথেষ্ট লাঞ্ছনা, অপমান এমন-কি প্রহার পর্যন্ত করা হয়। তবুও সে প্রায়শ্চিত্ত করেনি বা বিলাসীকে ত্যাগও করেনি। দূরের জঙ্গলে গিয়ে থাকা শুরু করল। সেখান থেকেই সাপ ধরে খেলা দেখিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করত। মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি, বড় বড় চুল, গোঁফ দাড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের আর কাঁচের মালা। কিন্তু কে বলবে যে, এ সেই কায়স্থদের ছেলে মৃত্যুঞ্জয়!

শরৎ লুকিয়ে-চুরিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যেত। সাপ ধরা বা সাপের বিষ নামানোর মন্ত্রও তার কাছ থেকে শিখে নেয়। একদিন একটা বিষাক্ত সাপ ধরার সময় সাপটি মৃত্যুঞ্জয়কে কামড়ে দেয়। শত চেষ্টাতেও তাকে বাঁচানো গেল না। সাতদিন পর্যন্ত মৌন থেকে বিলাসী আত্মহত্যা করেছিল।

এর বহু বছর পর কথাশিল্পী শরৎ লিখেছিলেন, 'বিলাসীকে যাহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী—অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি, কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে। .... শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোন একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এই মাত্র বলিতে পারি।'[১]

এ ধরনের ঘটনার তো শেষ ছিল না। এ সব দেখেই তার মনে হয়েছিল মানুষের অন্তরে যে দেবতা আছে—কেমন করে নিজেরাই তার এত অনাদর করে? এই প্রশ্ন তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে দেয় তীব্রতা ও সংবেদনা আর এই সংবেদনাই তাকে গল্প-লেখকে পরিণত করে। গল্প লেখার প্রেরণা সে অন্য একটি পথ ধরেও পায়। লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার ভাঙা আলমারি খুলে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আর 'ভবানীপাঠ' ইত্যাদি বইও পড়ে। এগুলো স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছিল না। মন্দ ছেলেদের যোগ্য অপাঠ্য বই একথাই শরৎ জানত। তাই চৌর্যবৃত্তি করে বইগুলি তাকে পড়তে হয় এবং বন্ধুদেরও পড়ায়। তাছাড়া মনে মনে গল্প রচনা করে অপরকে শুনিয়ে যথেষ্ট খ্যাতিও সে লাভ করেছিল।

বাবার লেখা গল্পগুলির কোনোটাই সম্পূর্ণ ছিল না। খুব উৎসাহ নিয়ে সেগুলি পড়ত কিন্তু গল্প শেষ হবার আগেই বাবা শেষ হয়ে সে পথ অবরুদ্ধ করে গিয়েছিলেন। অসন্তুষ্ট হয়ে ভাবত, 'বাবা এ লেখাগুলো কেন অসম্পূর্ণ রাখলেন? যদি শেষ পর্যন্ত লিখতেন তাহলে কেমন হত?'

মনে মনে এগুলির শেষ চিন্তা করে ভাবত, 'যদি আমি এই গল্পটি লিখতে পারতাম!'

বাবার এই অসমাপ্ত লেখাই শরৎকে প্রেরণা যোগাত। অভিজ্ঞতালাভের পথ তো অশেষ। সুমধুর কণ্ঠস্বর, আবার বাঁশি বাজাতেও পারত খুব সুন্দর। একদিন বিখ্যাত সলিসিটার গণেশচন্দ্র মহাশয় কোথা থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন। দেখেন যে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় একটি তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে বসে রয়েছে। জামাকাপড় হতদরিদ্র। অত্যন্ত স্নেহে কাছে ডেকে কথাবার্তায় জানতে পারলেন যে, ছেলেটি তাঁরই এক বন্ধুর নাতি। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর পিতা অক্ষয়নাথ তাঁর বন্ধু ছিলেন। সম্পর্কে শরতের দাদামশায়। কলকাতা পৌঁছে শরৎকে অক্ষয়নাথের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

দেবানন্দপুরে থাকাকালীন শরৎ একবার বেশ কিছুদিনের জন্য পুরী যায়। একটি পরিবারের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভদ্রমহিলাটি শরতের থেকে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। শরৎকে স্নেহও করতেন। ভদ্রমহিলার স্বামী বিদেশে চাকরি করতেন। একবার তিনি খুব অসুস্থ হন। তখন শরৎ তার সহজাত স্বভাব অনুযায়ী সেবা করে। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির দরুন নিদারুণ গ্লানি নিয়ে শরৎকে বাড়ি থেকে চলে যেতে হয়। চলার ক্লান্তিতে সে অবসন্ন হয়ে পড়ে। না আছে খাওয়ার সংস্থান, না থাকার সুবিধে, ফলে ভয়ানক জ্বরে পড়ে একটা গাছের তলায় তাকে অসহায় ভাবে আশ্রয় নিতে হয়। সে সময়ে এক বিধবা তাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। বোধহয় আর্ত হয়ে একটু জল চেয়ে থাকবে বা তার গোঙানি শুনে মহিলাটি কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে চমকে ওঠেন। বলেন,'হে ভগবান! তোর যে বড় জ্বর!' মহিলাটি শরৎকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। দিনকয়েক স্নেহপূর্ণ সেবা-শুশ্রূষার পর আরোগ্য লাভ করে শরৎ আবার জ্বরে পড়ে। বিধবা মহিলাটির এক ভগ্নীপতি ও একটি দেওর ছিল। একদিকে বৌদির

১. 'শরৎ সাহিত্য', পঞ্চম ভাগ। পৃঃ ১২১ ('বিলাসী' গল্প)

উপর দেওরের ঝোঁক, অপরদিকে ভগ্নীপতি ভাবত শ্যালিকার উপর তারই একমাত্র অধিকার। মহিলাটি কিন্তু কারও কাছেই থাকতে রাজী না। একদিন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে শরৎকে বললেন, 'তুমি তো ভালো হয়ে গেছ। চলো, তোমার সঙ্গে আমিও ঘুরে আসি।' দুজনে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল। এই বেরিয়ে পড়ার মধ্যে ছিল শুধু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু যেই তারা কিছুদূর এগিয়েছে, অমনি সেই বিধবার দুই প্রেমিক সেখানে পৌঁছে কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে শরৎকে বেধড়ক মেরে ক্রন্দনরতা বিধবাটিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। এরপর তার যে কী হল, তা শরৎ কোনোদিন জানতে পারেনি। কিন্তু একথা সেদিন বুঝতে পেরেছিল যে, একে অপরের প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও মন্দ লোকদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা ঐক্য থাকে কিন্তু সৎলোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন বিচ্ছিন্ন। কথাশিল্পীর বিখ্যাত উপন্যাস 'চরিত্রহীন'–এর আধারটুকু বোধহয় এই ঘটনাগুলোই। এগুলোই উপন্যাসটি রচনার উপাদান যোগায়।

পুরীর পথে আবার তার যাত্রা শুরু হল। পথের আতিথ্যে এমন বিকৃত কুৎসিত চেহারা নিয়ে সে বাড়ি ফিরল যে তাকে চেনাই দায়। জনশ্রুতিতে শোনা, বিখ্যাত গণিতবিদ্ পি. বসুর বাড়িতে শরৎ আতিথ্য গ্রহণ করে। দু–একবার চোর ডাকাতের পাল্লায় পড়ে। হয়তো অত্যন্ত দুঃসাহসী হওয়ার দরুনই নানা গুজব তার বিষয়ে শোনা যেত। মনের কথা কাউকে কোনোদিন বলত না। অভিনয়ে তো দক্ষ ছিলই, মিথ্যে কথা সত্যি বলে চালিয়ে দিতে সমান পটু ছিল।

এদিকে বাড়িতে ঠাকুমা গত হয়েছিলেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে সংসারের মান বজায় রাখতেন। এখন যেন বিরাট এক শূন্যতা। ধার পাওয়ার তো শেষ আছে! হয়তো 'শুভদা'র কৃষ্ণা পিসির মতোই কেউ বলেছিল, 'তোমার বাবাকে কিছু উপায় করতে বলো, না হলে আমি দুঃখী মানুষ আর টাকাকড়ি কিছুই দিতে পারব না।'

এই ভাবেই অভাব, অপমান ও দারিদ্র্য সইবার শক্তিও ভুবনমোহিনী ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছিলেন। যাবারও কি ছাই কোন চুলো আছে? মা–বাবা তো কবেই স্বর্গে গেছেন।[১] সংসার ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন। ভায়েদের আর্থিক সংগতিও উৎসাহজনক নয়। তবুও দেবানন্দপুরে থাকা যখন অসহ্য হয়ে উঠল, তখন ভয়ে ভয়ে ছোটকাকা অঘোরনাথকে একটি চিঠি লিখিয়ে পাঠালেন। অঘোরনাথ লিখলেন, 'চলে এসো।' এরপর শরৎ আর দেবানন্দপুরে ফিরে আসেনি। মা ও ঠাকুমার চোখের জল ও রক্তে ভেজা এ গ্রামের পথঘাট। দারিদ্র্যের যে মর্মান্তিক নিদারুণ ছবি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র 'শুভদা' উপন্যাসটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন, মনে হয় এই অভিজ্ঞতার জোরেই তা সম্ভব হয়েছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার বীজ এই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই অঙ্কুরিত হয়। এই প্রথম সে সংগ্রাম ও কল্পনার একত্র পরিচয়লাভ করে। এ গ্রামের ঋণে সে চিরঋণী।

৭

শরৎ যখন আবার ভাগলপুরে ফিরে এল[২] ততদিনে তার বন্ধুরা সবাই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে ভর্তি হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া দেবানন্দপুরের স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আনানোর পয়সাও ছিল না। এদিকে,ভর্তি না হলে এ–বছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে পারবে না, দারুণ দুশ্চিন্তা। সৌভাগ্যবশত স্কুলের এক শিক্ষক শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা শ্রীবেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় শরতের দাদামশায়ের বন্ধু ছিলেন। এই সম্পর্কে সে পাঁচকড়িবাবুকে মামা বলে ডাকত। হেডমাস্টার শ্রীচারুচন্দ্র বসু বড়ই সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের কৃপাতেই শেষপর্যন্ত শরৎ স্কুলে ভর্তি হয়। এখানে এসে সে যেন একেবারেই বদলে গেল। কারও থেকে ছোট ভাবা তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, হীনমন্যতা

১. মা ১৮৯১। পিতা ১ জানুয়ারি,১৮৯২
২. ১৮৯৩

তাকে কষ্ট দিত। তাই পরীক্ষায় পাসের জন্য রাত জেগে পড়া তৈরি করতে লাগল। ঘুম না আসার জন্য অনেকবার করে কফি খাওয়া শুরু করল।

পুরোনো বন্ধুরা আবার তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। রাজু এদের মধ্যে অন্যতম। নীলা নামে একটি নতুন বন্ধুও তাদের জুটল। রাজু চন্দন কাঠের একটা বাক্সকে কী ভাবে যেন বইয়ের আলমারি বানাল। তিনপায়ার একটা ভাঙা চেয়ার ও একটা ছোট টেবিল যোগাড় করে পড়াশোনার পরিপাটি ব্যবস্থা করা হল। তক্তপোষের উপর বিছানার দারিদ্র্য, গায়ে দেবার একটা চাদর দিয়ে সযত্নে ঢেকে রাখা হত। খাটের নীচে একটা গড়গড়াও থাকত। খাটের মধ্যে দিয়ে বালিশের পাশে গড়গড়ার নলটা বার করে লুকিয়ে টান দিত। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জননী ভুবনমোহিনী সারারাত প্রদীপ জ্বালাবার তেল জুগিয়ে উঠতে পারেন না। বন্ধু-বান্ধবেরা মোমবাতি দিয়ে যায়। আর, এককোণে একটা স্টোভ, একটি ছোট টিনের কেৎলি, একটি ছোট কুঁজো আর মুখঢাকা গেলাস একটি।' এগুলোই শরতের সম্পত্তি ছিল। এ দৈন্য শরতের মনকে সংকীর্ণ করতে পারেনি। তার বিদ্যা-অভিযান মহা-সমারোহে রাজপুত্রের মতোই চলত। নীলা আসত। তামাক সাজিয়ে বলত, 'খা।' তামাক খেতে খেতেই দুই বন্ধুর গল্প চলত। সেদিন খুব ভোরে নীলা এসে শরৎকে জানলা দিয়ে ডাকতে গিয়ে দেখলে যে, শরৎ ঘুমিয়ে আছে আর চাদর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ঘাবড়ে গিয়ে সে ডাকল, 'শরৎ, এই শরৎ।'

ঘুম কাতর চোখ দুটি মেলে শুয়ে শুয়েই সে জবাব দিল, 'শুয়ে আছি। ভেতরে চলে আয়।' নীলা জিজ্ঞেস করল, 'তোর অসুখ করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'রক্তবমি করেছিস!'

'দূর পাগল!'

'তাহলে চাদরে এত রক্তের দাগ কেন?' চমকে উঠে শরৎ দেখে যে সত্যিই রক্ত। বলল, 'ব্যাটা বেজির কাণ্ড। আবার আজ ইঁদুর মেরেছে।' নীলা এদিক ওদিক তাকিয়ে চমকে উঠল, বলল, 'খুব বেঁচে গেছিস রে, শরৎ। তোমার বেজি ব্যাটা গোখরো সাপ মেরেছে।' সারা বাড়িতে হল্লা ছড়িয়ে পড়ল। ভুবনমোহিনী মা মনসার পুজো দিলেন। প্রসাদ নিয়ে শরৎ বলল, 'যার জন্য প্রাণ বাঁচলো, তাকে তো মা তুমি কিছুই দিলে না।'

মা বললেন, 'নীলাকে তো প্রসাদ দিয়েছি।'

'নীলা বুঝি সাপ মেরেছে!'

'হায়রে কপাল! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম।' সঙ্গে সঙ্গে মা দুধকলা মেখে বেজির খোঁজে চললেন।

শরৎ বলল, 'মা, বেজি কি তোমার কলা খাবে? ওর মাছ চাই।'

তৎক্ষণাৎ মা বেজির জন্য দুধ ও মাছের ব্যবস্থা করলেন। সময়ে ঘুম না ভাঙার জন্যও পড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হত শরতের। একদিন নীলা একটা টাইমপিস নিয়ে এল। শরৎ সজল চোখে বলল, 'নীলা, তুই আমায় এত ভালোবাসিস্ কেন রে?' 'সে তো আমি জানি না, ভাই। সবাই একথা জিজ্ঞেস করে। একজন কেন অন্যজনকে ভালোবাসে আমি ঠিক বলতে পারব না।' শরৎ বলল, 'তোর মন বড় নরম। অপরের দুঃখকে তুই অন্তর দিয়ে বুঝিস। তুই সবার মতো নয়। সেদিন আমায় বাদাম পেস্তা এনে দিলি, আর কাউকে দিলি না কেন? তোর মধ্যে নারীসুলভ একটা মন রয়েছে।'

নীলা কপট ক্রোধে বলল, 'পাজি কোথাকার, আমায় নারী বলছিস?'

দুজনেই হেসে উঠল। নীলাও ভালো গান গাইতে পারত। একটা ভালো এসরাজও ছিল তার। পরীক্ষার পর এসরাজটিকে শরৎ নিজের কাছে এনে রাখে। যে ঘরটিতে ছেলেবেলায় বাচ্চাদের আটকে রেখে শাস্তি দেওয়া হত, সে ঘরটিকেই শরৎ সংগীতশালা বানালো। একদিন ভোর-বেলাতে ওর ঘর থেকে গানের আওয়াজ আসাতে ছেলেমেয়েরা আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল।

সুরেন্দ্রনাথ দরজার কড়া ধরে নাড়তে শরৎ বাইরে এসে বলল, 'তাড়াতাড়ি চলে আয়। ছোট দাদামশাই জানলে আর রক্ষে নেই।' সুরেন্দ্র ঘরের ভিতর এসে বসল। শরৎ এসরাজ বাজিয়ে গাইতে লাগল, 'মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী।'

কিছুক্ষণ শোনার পর সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, 'এটা কার, শরৎ?'

'আমার।'

'কিনেছিস?'

'না।'

'তাহলে?'

'নীলা দিয়েছে।'

'একেবারেই দিয়ে দিয়েছে?'

'দেখবার জন্য দিয়েছে।'

এই বলে এসরাজটিকে শরৎ অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলল। বলল, 'কাউকে বলিসনি, তোকেও শিখিয়ে দেব।' 'নীলা শরৎকে সত্যিই খুব ভালোবাসত। কিন্তু বেশিদিন সে বাঁচেনি। পুলিসে চাকরি করত। হঠাৎই কলেরা হয়ে মারা যায়। সেই প্রথম বন্ধুটির বিচ্ছেদ তার মনে একটা গভীর দাগ রেখে গিয়েছিল।'[১]

সামনে পরীক্ষা, বাধারও যেন আর শেষ নেই। বড়মামা ঠাকুরদাসের মেয়ের কালাজ্বর হয় আর স্বভাবদোষে শরৎ সব ভুলে সেবা-শুশ্রূষায় মেতে উঠল, তবুও মেয়েটি বাঁচেনি। শরৎ অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিল, মনে হয়েছিল পরীক্ষায় সে বুঝি আর উত্তীর্ণ হতে পারবে না। পরীক্ষার ফিসও যোগাড় করা হয়নি। ভুবনমোহিনীরও দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। বড় ভাই ঠাকুরদাসের উপর অফিসের তহবিল গোলমাল করার অভিযোগে মামলা চলছিল। পরে অবশ্য তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। খরচেরও আর শেষ ছিল না। ছোটভাই বিপ্রদাসের আয় অল্প, সংসারের ভার তার উপর। তবুও সাহস করে ভুবনমোহিনী তাঁকেই বললেন। উত্তরে তিনি বললেন, ঘরে তো পয়সা নেই। কোথাও থেকে ধার করতে হবে। সে সময়ে ধার নেওয়ার জায়গা ছিল খঞ্জরপুরের গুলজারিলালের বাড়ি। স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ সেই মহাজন 'ভাগলপুর শাইলক্' নামে বিখ্যাত ছিল। বিপ্রদাস সরকারী-চাকুরে ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করা সহজ ব্যাপার। তবুও সুদ নিয়ে যথেষ্ট হৈ-হুজ্জত করে অবশেষে চার পয়সা মাসিক সুদের হারে বিপ্রদাস টাকা ধার পেলেন। এই টাকার জন্যই শরৎ পরীক্ষায় বসতে পায়।[২] পরীক্ষার পর যেন সে মুক্ত বিহঙ্গ। রাজুর সঙ্গেই বেশির ভাগ সময় কাটাত। রাজু তখন পড়ালেখা ছেড়ে কাঠের কারবার দেখত। তার যেমন সুন্দর হাতের লেখা ছিল, তেমনই সে সুন্দর কাঠের খেলনা তৈরি করতে পারত। অদ্ভুত চরিত্রের এই রাজু শক্তিমান, বংশীবাদনে দক্ষ, ভালো অভিনেতা, কিন্তু নানা জনে নানা কথা তার বিষয়ে বলে। প্রতিভাশালী বংশে তার জন্ম, তাই সর্বতোমুখী প্রতিভা অনায়াসেই তার আয়ত্তে আসে। এই প্রতিভাই আবার তাকে কোনো জায়গায় কোনো একটা বিষয়ে টিঁকে থাকতে দিত না। নতুন অনুভূতির পেছনে তার মন ছুটত – গাঁজা, মদ, বেশ্যালয় সব-কিছুতে থাকা সত্ত্বেও তার অন্তঃকরণ গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র ছিল বদমাশ সে ছিল না, ছিল শুধু দুঃসাহসী। যোগ ও আনন্দে সে পূর্ণ থাকত—যেমন গঙ্গাজল সব-কিছুকেই করে তোলে পবিত্র। নিজের একটা নৌকো ছিল, সেটাতে করেই রাজু ঘুরে বেড়াত। কখনও কখনও অন্ধকার রাতে, ভরা-গঙ্গায় শরৎকে বলত, 'চল, নৌকো চড়ে বেড়িয়ে আসি।' শরৎ ভয় পেত কিন্তু রাজু যে তার গুরু, অমান্যই বা করে কেমন করে? গত বছর ফুটবল খেলার মাঠে হঠাৎ দাঙ্গা বেধে যায়। তখন লাঠির জোরে রাজুর দলই শরৎকে বাঁচায়। সাপের কামড়ে অচৈতন্য হয়ে যখন সে

১ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় — 'শরৎ পরিচয়', পৃঃ ১০৭

২ এই পরীক্ষা সোমবার ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ আরম্ভ হয়।

পড়ে ছিল, তখনও এই রাজুই খরস্রোতা গঙ্গায় উজান ঠেলে ওঝা ডাকতে ছুটে গিয়েছিল। রাজুর প্রতি শরতের কৃতজ্ঞতার আর শেষ নেই। ব্যাস্—খরস্রোতা গঙ্গায় ছোট্ট নৌকাটি ছেড়ে দিত, আর নৌকোয় ভেসে ভেসে একটা দ্বীপে এসে পৌঁছত। এখানে গঙ্গা পুব থেকে উত্তরে বয়ে গেছে। জেলেরা এখানেই মাছ ধরত। তারা সব একত্রে থাকত, দেহেও তাদের অসীম শক্তি। একদিন রাজু বলল, 'চল্, আজ মাছ চুরি করি।'

'মার খাবি যে।'

জবাবে রাজু বলল, 'সে চিন্তা তোকে করতে হবে না। দেখা যাবে,চল্।'

দুজনে সেই দ্বীপে পৌঁছে মাছধরার অজুহাতে বসে রইল। তারপর জেলেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়তেই প্রায় দশ – বারো সের মাছ তুলে নিয়ে পালাল। জেলেরা টের পেয়ে তাড়া করতেই দুজনে ততক্ষণে অড়হর ডালের খেতের ভিতর ঢুকে পড়ল। জল কম ছিল, নৌকো থেকে নেমে দুজনে নৌকোটি টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। সেই জায়গায় বড়বড় সাপ ছিল। রাজু সহসা শিউরে উঠতেই শরৎ জিজ্ঞেস করল

'কী হল, দাদা?'

'কিছু নয়, সাপ।'

শরৎ ভয় পেয়ে বলল, 'সাপ!'

রাজু হাসল। বলল, 'আরে ভয় কি? সাপ নিজেকে রক্ষা করবে, আর আমরা নিজেদের। পৃথিবীর নিয়মই এই।'

বস্তুত অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল তার। কেউ অন্যায় করলে শাস্তিও নিজের হাতে দিত। সে সময় কলের জলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বৌ–ঝিরা সবাই গঙ্গা থেকে জল তুলে নিয়ে আসত। স্নান–পাঠও গঙ্গার ঘাটেই হত। মেয়েদের জন্য আলাদা ঘাট হওয়া সত্ত্বেও কখনও কখনও অসভ্য লোকদের টিটকিরি ও কুৎসিত ইঙ্গিতের দরুন মেয়েরা অসুবিধেয় পড়ত। একদিন এইরকমই হাসি–মস্করা করতে করতে মেয়েদের গায়ে তারা জল ছিটোতে লাগল। রাজু কোত্থেকে এ দৃশ্য দেখে কোনো কথা না বলে একটি লোককে তারই গামছা গলায় বেঁধে গঙ্গার জলে একবার ডোবায়, একবার ওঠায়। আবার ডোবায়, আবার তোলে। ক্রমাগত এই নিদারুণ শাস্তির ফলে বেচারী কেঁদে অনুনয় করে বলে, 'ক্ষমা করে দাও, এই হাত জোড় করে বলছি।'

'আর কখনও এদিকে আসবে?'

'না, না, আর কখনও এদিক মাড়াব না।'

'ভগবানের দিব্যি গেলে বলো।'

'ঠাকুরের দিব্যি। আর কোনোদিন এপথে আসব না।'

'যা, মাফ করলাম।'

মোক্ষদা স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। বড়ই অল্প বেতন পেতেন তাই শিক্ষকতা ছাড়াও কিছু কিছু অন্য কাজও করতেন। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে দূর থেকে গোরা সাহেবের ঘোড়ার গাড়ির খুরের শব্দ শুনতে পান। অন্ধকারে দূরত্ব ঠাহর করতে পারেননি। কিন্তু বুঝতে পারলেন পিঠের উপর চাবুকের বর্ষণ চলছে। চমকে মুখ তুলে চাইতে–না–চাইতেই সাহেবের গাড়ি বিলীন হয়ে গেল। রাজু এই কাহিনী শোনার পর বলল, 'মাস্টার মশাই, আপনি বাড়ি যান। আর কালকের জন্য স্কুল থেকে ছুটি নিন। পরশু যা হবে তা আপনি শুনতেই পাবেন।'

পরের দিন সন্ধেবেলায় একটা বড় দড়ি নিয়ে রাজু ও শরৎ দলবল নিয়ে সেই ছায়াপথে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঐ পথ ধরেই সাহেব রোজ ক্লাবে যেতেন। কিছুক্ষণ পরেই টমটমের শব্দ পাওয়া গেল। রাজু সঙ্গীদের সাহায্যে সড়কের দুধারের গাছের গোড়ায় দড়ি বেঁধে দিল। সাহেবের এ–সব কল্পনা করার কথা নয়। রোজকার মতো সেদিনও তেমনই বিক্রমে ঘোড়ায় চেপে আসছিলেন। ব্যাস, আর যায় কোথায়! ঘোড়া গেল দড়িতে জড়িয়ে আর সাহেব ছিটকে মাটিতে

আছড়ে পড়ল। রাজু তো এই-ই চাইছিল। মনভরে সাহেবকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বলল, 'আর কখনও নির্দোষ পথচারীকে মারবে?'

'কোনদিনও নয়।'

'বলো, আমাকে ক্ষমা করো।'

'ক্ষমা করো।'

'যাও বাড়ি যাও।'

সাহেব চুপচাপ চলে গেল। কিন্তু এ-ঘটনার জন্য তিনি এতই লজ্জিত হয়েছিলেন যে, ভাগলপুরে আর থাকেননি। বদলি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।[১] মাঘ মাসে ভাগলপুরে খুব শীত পড়ত। এই শীতের সময় বাংলা পন্ডিতের স্ত্রী মারা যান। পণ্ডিতমশাই নিজেও রুগ্ন ছিলেন। একটি ছেলে, সেও নিতান্ত ছোট। দাহ-সংস্কার কেমন করে হবে সমস্যা। কোন স্কুলের হেড মাস্টার মশাই এ-সব ক্ষেত্রে অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করতেন। তাঁকে খবর দেওয়াতে তিনি নিজের অনুচরদের নিয়ে দাহ করার ব্যবস্থা করলেন। এই শ্মশান যাত্রীদের মধ্যে রাজু ও শরৎ অন্যতম। তাদের মাঘের শীতেরও ভয় ছিল না, না ছিল অন্ধকারের। সেদিন ঘোর অমাবস্যা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শ্মশান ঘাটও প্রায় দু-ক্রোশ দূরে। শবযাত্রা শুরু করবে এমন সময় টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। লন্ঠন তেমন সুলভ ছিল না। হাঁড়িতে ফুটো করে তার ভিতর তেলের প্রদীপ বসিয়ে পথ নির্দেশ করা হচ্ছিল। বড় বড় পা ফেলে মুখে 'হরিবোল' ধ্বনি দিতে দিতে তারা এগোচ্ছিল। কিন্তু বৃষ্টি আরো জোরে পড়াতে নিমেষে পথঘাট সব জলমগ্ন হয়ে গেল। লাশও জলে ভিজে ভারী হয়ে উঠল। সবাই ভাবল, মৃতদেহটির তেঁতুল গাছের তলায় খানিকক্ষণ নামিয়ে রেখে একটু বিশ্রাম করা যাক। এদিকে শিলাবৃষ্টি হতে লাগল। বসে থাকাও আর যায় না। কিন্তু মৃতদেহটির কী ব্যবস্থা করা যায়; ফেলেই বা কী করে যাওয়া যায়? তখন রাজু বলল, 'আপনারা সবাই যেতে পারেন। আমি একাই থাকব।' বহুক্ষণ পর বৃষ্টি থামলে সবাই ফিরে এসে দেখল, মৃত দেহটি ঠিক রাখাই আছে, শুধু রাজুর পাত্তা নেই। সবাই ভাবল, রাজু বেশ ধাপ্পা দিয়ে কেটে পড়ল। কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগেই সবাই দেখল যে, মড়াটা ধীরে ধীরে নড়ে উঠল। লোকেরা ভয়ে চিৎকার করে ছুট লাগালো, কিছুদূর এগিয়ে হাতে পইতে নিয়ে রামনাম জপ করতে লাগল। এদিকে লাশ নড়তে নড়তে প্রায় দাঁড়াবার জোগাড়। রামনামের তীব্র স্বর আরও তীব্র হয়ে উঠল, আর মড়াও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। 'পালা-পালা' চিৎকার করে তারা সব পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু অট্টহাসির শব্দে পেছন ফিরে দেখে, শবের চাদরের ভিতর থেকে রাজু হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে।

'বাঃ বেশ ছেলে! দীর্ঘজীবী হও। এই তো পুরুষের ধর্ম।' রাজুর এ-সব দুঃসাহসিক কাজের সঠিক বিবরণ কারও কাছে নেই কিন্তু এ কথা সত্যি যে, রবিনহুডের মতো চরিত্রও তার কাছে ম্লান মনে হয়। তার অমিত সাহস বোধহয় তার অজস্র দয়া-মায়ার ভিত আঁকড়ে বেড়ে চলছিল। অভাবী লোকের সে বন্ধু ছিল, আর দুর্বৃত্তের সে ছিল যেন সাক্ষাৎ যম। মৃত্যু-ভয়ও তার ছিল না। বংশীবাদন ও সন্ন্যাসবৃত্তি দুটিতেই তার সমান দক্ষতা ছিল।

ছোটদের জন্য যে গল্পগুলি শরৎচন্দ্র লেখেন তার পেছনে এমন ঘটনার অবদান অনেক। তাঁর বৈঠকী গল্পে এমন ঘটনার অনেক নমুনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'রাজু বেশি লেখাপড়া করেনি বটে, কিন্তু তার গুণ ছিল অশেষ। ঐ বয়সে ঐ ধরনের অতবড় একটা আদর্শ মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।'[২] শরৎও কম দুঃসাহসী ছিল না। রাজুর সাহচর্যে সে আরও দুর্দমনীয় নির্ভীক হয়ে উঠেছিল। ভাগলপুরে সে সময়ে খুব চুরি ডাকাতি হত। রাতে অস্ত্র নিয়ে সবাই সতর্ক হয়ে থাকত। রাজুর এক ভাই মণীন্দ্রনাথ তখন কলেজে পড়ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলছিল তাই

---

১. এই ঘটনাটির নানান বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু মূলত এটিই সত্য ঘটনা।

২. গোপাল চন্দ্র রায়—'শরৎচন্দ্র', পৃঃ ২৯৫

রাত জেগে তাকে পড়াশোনা করতে হত। তাদের বাড়িটি গঙ্গার ধারে বটগাছের পাশে ছিল। পড়ার ঘরটি গাছ ঘেঁষে ছিল। আশেপাশে আগাছা কাঁটাবন তাতে সাপ ও বিছের সংখ্যাও ছিল অগুণতি। একদিন পড়তে পড়তে মণীন্দ্রনাথ জানলায় কোনো আওয়াজ শুনতে পান। সতর্ক হয়ে উঠে দেখেন জানলার কাছ বরাবর একটি মানুষের মাথা যেন লুকোতে চাইছে। বন্দুক হাতে নিয়ে বোতাম টিপতে যাবেন, এমন সময় কে যেন বলে উঠল, 'মণি মণি! করছ কী? বন্দুক চালিয়ো না। এই যে আমি।'

'আমি কে?'

'আমি শরৎ।'

মণি একেবারেই অপ্রস্তুত। একটু পরে মণি জিজ্ঞেস করল, 'হা ভগবান! এই শেষ রাতে ভয়ংকর জঙ্গলের মধ্যে কী করছিস তুই?' 'কিছুই নয়। তোমাকে ভয় দেখাতে এসেছিলাম।' রাত প্রায় দুটো বেজে গেছে। বিষাক্ত সাপ বিছের ভয় ছিল না তার। দুঃসাহসে রাজুরই সমগোত্রীয় কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত তার কোনো শরিক ছিল না। মাথার বড় বড় চুল দেখে কেউ কেউ টিপ্পনী কাটত শরৎ বড় চুল রেখে রবীন্দ্রনাথের মতো কবি হতে চাইছে।

রবীন্দ্রনাথ ততদিনে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন, তাই নতুন কেউ সাহিত্যের ক্ষেত্রে পা দিলে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের উপমা দেওয়া হত। 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী' শরতের পড়া ছিল। উপন্যাস বা সাহিত্যে এর পরও কিছু থাকতে পারে, একথা সেদিন সে ভাবতে পারেনি। 'বাসা' বা 'কাকবাসা' শরতের প্রথম উপন্যাস।[১] মামা সুরেন্দ্রনাথ লুকিয়ে শরতের লেখা ধরে ফেলেছিল । ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখত শরৎ লিখে চলেছে। পরে অবশ্য গল্পটি শরতের পছন্দ হয়নি। বাপের মতোই গল্পটি পড়বার পর মনে মনে ভেবেছিল, এটা কি রবীন্দ্রনাথের মতো হয়েছে? না, হয়নি। তবে আর লিখেই বা কী হবে? লিখি যদি তবে তাঁরই মতো লিখব, নইলে নয়।

তারপর একদিন গল্পটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। 'কাশীনাথ' উপন্যাসটিকেও শরৎ যোগ্য মনে করেনি। দেবানন্দপুরে যাবার সময় কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছিল, ভাগলপুরে এসে সেগুলোই কেটেকুটে বাড়াচ্ছিল। 'কোরেল গ্রাম' গল্পটিও দেবানন্দপুরে শুরু করেছিল। কিন্তু এই নামে গল্পটি কোনোদিন ছাপা হয়নি।[২] লেখার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছিল, মনে মনে চিন্তা করত,এ সংসারের যা কিছু দেখছি, শুনছি তাকে কি কোনো রূপ দেওয়া যায় না? প্রথম প্রথম এ গল্প সে গল্প থেকে চুরি করে লিখত। কিন্তু জীবনের পাঠশালায় অভাবের অগ্নিযজ্ঞে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল; সেই অভিজ্ঞতাই তার লেখনীকে শক্তি যুগিয়েছিল। একবার সাধুদের দলে যোগ দেয়, সেও বোধহয় অভিজ্ঞতা লাভের নেশাতেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানা ধরনের গল্প শুনিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেসও করত, 'কেমন লাগছে রে?' বেচারী বাচ্চারা সত্যিই কিছু বুঝতে পারত কি না কে জানে! কিন্তু এই অদম্য সাহসী গল্পবিশারদকে অনায়াসে বলত, 'খুব ভালো লাগছে, দাদা।'

রাজলক্ষ্মীও তো 'শ্রীকান্তের' বিষয়ে সেই কথাই বলেছে, 'আশ্চর্য কি আনন্দ? নিজের মনের কথা চাপতে চাপতে আর গল্প বানিয়ে বলতে বলতে এ বিদ্যের উনি একেবারে মহামহোপাধ্যায় হয়ে গেছেন।[৩]

৮

এইভাবে সাহিত্য সৃজন এবং দুঃসাহসী ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই একদিন প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন এড়িয়ে শরৎ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়[৪] এবারে কলেজে

---

১. ১৮৯৪
২. 'কোরেল গ্রাম' পরবর্তীকালে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।
৩ 'শ্রীকান্ত', চতুর্থ পর্ব।
৪. ১৮৯৪

পড়ার পালা। কিন্তু চিরদিনের সেই অভাব। ফিস দেবার টাকা কোথায়? প্রবেশিকা পরীক্ষার ফিস দেবার ক্ষমতা যার ছিল না, কলেজে পড়বার সামর্থ্য তার কোথা থেকে আসবে? কিন্তু মার যে বড় সাধ, ছেলে আমার বড় হবে। কারো কাছেই তিনি নত হননি। শেষ পর্যন্ত ছোট দিদিমা কুসুমকামিনী শরৎকে রক্ষা করেন।

স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে বাড়ির ছোট ছেলেদের পড়াবার ভার শরতের উপর দিলেন। পরিবর্তে সে পেত কলেজের মাইনে এবং বইপত্রের খরচ। মামাদের সবাইকে পড়াবার পর সে নিজে পড়তে বসত। রাত প্রায় একটা বেজে যেত। ঘুমে চোখ ঢুলে আসত। ভোরে ওঠা কোনোদিনই তার ভালো লাগত না। মাঝে–মাঝে রাজুর সঙ্গে নৌকো করে নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়ত। ফিরতে রাত হয়ে যেত। সকাল বেলাই আবার মামারা পড়তে আসত। শুয়ে শুয়েই গড়গড়ায় টান মেরে পড়াত। মাঝে–মাঝে ঘুমে চোখ বুজে আসত। তবুও এরকমভাবেই চলে যাচ্ছিল। সেদিন কলেজে প্রথম বর্ষের বিজ্ঞানের পরীক্ষা ছিল। ছাত্রদের সবাইকে ডেকে শরৎ বলল, 'কাল আমার পরীক্ষা, আজ আমি পড়ব। আমায় কেউ বিরক্ত কোরো না। যা জিজ্ঞেস করবার, কাল সকালে জিজ্ঞেস কোরো।' সবাই চলে যেতে দরজা–জানলা সব বন্ধ করে মোটা–মোটা বিজ্ঞানের বই নিয়ে পড়তে বসল। সকালে ছাত্রের দল ঠিক সময়ে হাজির হয়ে দেখে যে ল্যাম্প জ্বলছে আর শরৎ একমনে পড়ে চলেছে। এদের হট্টগোলে চমকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মানা করেছিলাম না আজ রাতে আমায় কেউ বিরক্ত কোরো না, কাল আমার পরীক্ষা, যাও আমি পড়াতে পারব না। কেউ যদি একটা কথা শোনে।'

বেচারীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন এক মামা–ই সাহস করে বলল যে, সে তো কালকের কথা, এখন ভোর হয়ে গেছে।

জানলা খুলতেই সোনালী রোদে ঘর ভরে গেল। পড়াশোনায় এমনই মগ্ন ছিল যে কোনো হুঁশ ছিল না তার। তাই তো পরীক্ষার খাতা দেখে অধ্যাপক মশাই অবাক হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন শরৎ নিশ্চয় বই থেকে নকল করেছে। এজন্য নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরি করে শরৎকে দিয়ে বলেন, 'এই প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।' মুখে মুখেই তৎক্ষণাৎ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শরৎ অধ্যাপক মহাশয়কে আরো অবাক করে দিয়েছিল। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল তার। তবুও খেলাধুলো এবং রাজুর সঙ্গে অনির্দিষ্টভাবে বেড়িয়ে বেড়ানো, আতুর দুঃখীর সেবা ইত্যাদিতেই বেশির ভাগ সময় তার কাটত। পড়াশোনার সময় অতি অল্পই ছিল। এই সব দেখে শুনে ভুবনমোহিনী বড়ই ব্যথা পেতেন, কিন্তু কোনো উপায়ই তাঁর জানা ছিল না। ক্রমশ ভালো ছেলেদের তালিকা থেকে শরতের নামটি ধূসর হতে থাকে।

এই সময়েই শরতের মায়ের মৃত্যু হয়।[১] নিদারুণ দারিদ্র্যে এই সরলপ্রাণা সতী–মা কেমন করে স্বপ্নবিলাসী অকর্মণ্য স্বামী ও সংসারের প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে হয়েও বধূরূপে কোনোদিন এতটুকু সুখও পাননি। সারা জীবনটাই তাঁর সংসারের পেট ভরানোর খেলাতেই হারিয়ে গেল। ক্ষুধার্ত সংসারের ক্ষুধা মেটাবার জন্য নিয়তিতাড়িতা যথার্থ হিন্দু পতিব্রতার মতোই একে একে নিজের সব গহনাগুলি বিক্রি করে দেন। বারংবার বাবা ও কাকাদের কাছে আশ্রয় ও অন্নভিক্ষা করেছেন—হয়তো এই আশায় বুক বেঁধে যে, বড় ছেলে শরৎ মানুষের মতো মানুষ হবে। জানি না কতবার তিনি অসীম স্নেহে পুত্রকে বুকে চেপে বলেছেন, 'শরৎ, বাবা আমার। আমি জানি শত দুষ্টুমি সত্ত্বেও তুই বড় ভালো ছেলে। তুই মন দিয়ে পড়াশোনা কর্। আমি তোকে সাহায্য করব।' কিন্তু জীবনের শেষ লগ্নে বোধহয় এ আশাও তাঁর ভেঙে গিয়েছিল। অসময়ের বার্ধক্য, চতুর্দিকের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা তাঁর প্রাণটুকু শুষে নিল। জীবনের কোন এক তিক্ত মুহূর্তে যখন মন অত্যন্ত অশান্ত ও চঞ্চল হয়ে

১. সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

উঠত, তখন স্বামীর উপরে কটু মন্তব্য করে ফেলতেন। তবুও আত্মভোলা কুঁড়ে স্বামীটিকে তো হিন্দুরমণীর ঐকান্তিক ভালোবাসাই দিয়েছিলেন। 'শুভদা'ও তো তাই করেছিল। 'স্বামীসুখ সে একদিনের জন্যও পায় নাই, অন্তত তাহার মনে পড়ে না। সে—স্বামীর মুখে অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া দিতে যে তাহার কত আনন্দ; কত তৃপ্তি, তাহা সে নিজেই অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে না; আনন্দে চোখের কোণে জল আসে।'[১]

আর 'শ্রীকান্ত'–র অন্নদাদিদি, সে চরিত্র যতই স্বাভাবিক হোক, তবুও যতবারই সে অন্নদাদিদির সতীত্বের মহিমা বলতে চেয়েছে, ততবারই যেন মা তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছেন। শ্রী ইলাচন্দ্র যোশীজীর প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'অন্নদাদিদির উপর সত্যিই আমার ভারি শ্রদ্ধা। আমার জন্মগত সংস্কার হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এটুকু অনায়াসে বলতে পারি তার একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য আমার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করেনি, বরং তার প্রেম প্লাবিত আত্মার মুক্ত–প্রবাহ মুগ্ধ করেছে।'

ভুবনমোহিনী এই প্রেম-প্লাবিত আত্মার প্রতিমূর্তি ছিলেন। সমগ্র শরৎ– সাহিত্যই এই প্রেমপূরিত আত্মার মুক্ত প্রবাহে সিঞ্চিত। 'মা' ডাকে যে কমনীয়তা, ত্যাগ, বাৎসল্য ও বিরাট দায়িত্ব লুকিয়ে আছে—তাকেই মূর্ত করতে ভুবনমোহিনী নিজের সব শক্তি ব্যয় করেছিলেন। তাঁর বাৎসল্য, স্নেহ শুধু যে পেটের সন্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, আর তাই শরৎও নারায়ণী, বিশ্বেশ্বরী, হেমাঙ্গিনী, বিন্দু সকলকেই সন্তান–স্থানীয়ের প্রতি মাতৃস্নেহের মহত্ত্বে মহিমান্বিত করেছেন।

ভুবনমোহিনী পিত্রালয়ে আজীবন শুধু এই মাতৃস্নেহ নিয়েই সবাইকে কাছে টেনেছেন। বোধহয় সেই কারণেই শরৎ শত দুষ্টুমি সত্ত্বেও মাকে গভীরভাবে ভালোবাসত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস হবার পর মা বলেছিলেন, 'তোকে তারকেশ্বরে যেতে হবে, তোর চুল দেব, মানত করেছিলাম।'

খুব শখ করে বড় বড় চুল রেখেছিল শরৎ। এগুলো কেটে ফেলতে হবে, কল্পনা করতেও কান্না পাচ্ছিল। কেমন দেখতে লাগবে তাকে ন্যাড়া মাথায়? 'না—না—এ চুল আমি কাটাব না, এত ভক্তি আমার নেই।' মা বললেন, 'কাটাস্ না! আমি অন্য ব্যবস্থা করব।'

'কী করবে, মা?'

'নাপিত ডেকে নিজের চুলগুলো কাটিয়ে বাবা তারকেশ্বরকে পাঠিয়ে দেব।'

একটি কথাও না বলে সেই রাতেই শরৎ তারকেশ্বরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

ভুবনমোহিনী যদি মতিলালের সহধর্মিণী না হতেন তাহলে বোধহয় বেশিদিন তাঁকে বাঁচতে হত না।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। শরতের রোদ মিইয়ে এসেছে। সুতো বাঁধা চশমা চোখে দিয়ে মতিলাল বহুক্ষণ ধরে একমনে বই পড়ে চলেছেন। ভুবনমোহিনী নিজের মনেই তামাক সেজে নিয়ে এলে মতিলাল কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'তুমি কেমন করে জানলে যে আমার তামাক খেতে খুব ইচ্ছে করছিল?'

ভুবনমোহিনী আদরভরা চোখ দুটি স্বামীর দিকে মেলে বলতেন, 'কেমন করে যে বুঝতে পারি সে কি আমিই জানি!'

মতিলাল খুশি হয়ে বলে উঠতেন, 'শুনছ, একটা বাতি দিয়ে যাও তো।'

ভুবনমোহিনী বলতেন, 'সারাদিন ধরে মাথা নিচু করে পড়ছ, যাও একটু বেড়িয়ে এসো।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও মতিলালকে বেড়াতে যেতে হত। বাড়িতে শরৎ ছাড়া ছিল আরও ছোট দুটি ভাই প্রভাস ও প্রকাশ এবং একটি ছোট বোন সুশীলা। আদর করে সুশীলাকে সবাই মুনিয়া বলে

১. 'শুভদা'

ডাকত। বড়দিদি অনিলার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মারা যেতে এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে মতিলাল সত্যিই যেন পঙ্গু হয়ে পড়লেন। অনেক কারণে শ্বশুরবাড়িতে থাকা আর সম্ভব হল না। 'দেবদাস'-এ শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'মাতুলের আশ্রয় সে অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছে,-সেখানে তাহার কিছুতেই সুবিধা হইত না।'

শ্বশুরবাড়ি থেকে অনেক দূরে খঞ্জনপুরের কোন এক পাড়ায় গিয়ে মতিলাল থাকতে লাগলেন। কিন্তু যিনি কোনোদিন উপায় করতে শিখলেন না, তিনি কেমন করে সংসার প্রতিপালন করবেন? কাজেই হতাশা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ভুবনমোহিনীর অকালমৃত্যু শুধু যে মতিলালকে ভেঙে দিয়ে গেল তা নয়, শরতের জীবনটাও যেন ভেঙে গেল। 'মা যদি আরও কিছুদিন বাঁচতেন, তা হলে আমাদের সংসার অনেক ভাল হতে পারত। আমার লেখাপড়া তাঁর আগ্রহ আর চেষ্টায় যা কিছু হয়েছে। আমাদের সংসার ভেঙে গেল মার অকাল মৃত্যুতে।'[১]

৯

যে সময় শরৎ জন্মগ্রহণ করে সে-যুগ ছিল জাগৃতি ও প্রগতির যুগ। ১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামের পরাজয় এবং সরকারের দমননীতির দরুন খানিকটা শিথিলতা এসে পড়ে কিন্তু সে যেন দারুণ ঝড়ের পূর্ব-প্রশান্তি। সংগ্রাম আবার নতুন করে শুরু হল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' সংগ্রামেরই অভিব্যক্তি। এই উপন্যাসটি আধুনিক বাংলাকে নতুন করে জন্ম দিয়ে সারা দেশকে প্রেরণার শক্তি জুগিয়েছিল। অপরদিকে ১৮৫৭র সংগ্রাম বিফল হওয়ার দরুন মানুষের দৃষ্টি রাজনৈতিক হট্টগোল থেকে সরে সামাজিক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সামাজিক আন্দোলন ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন কখনও সফলকাম হতে পারে না। সেজন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে সারা দেশ সামাজিক আন্দোলনের ডাকে মুখর হয়ে উঠল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রকট হল। তাঁরা মানসিক স্বাধীনতার এমনই বীজ বপন করলেন যাতে দেশের চেতনা যেন একটি নতুন পথ খুঁজে পেল। নানান রূপে নিজের অস্তিত্ব-প্রকাশে মেতে উঠল।

এ-বিষয়ে বাংলা সবার অগ্রণী। রামমোহন রায় রাষ্ট্রচেতনার জনক। তাঁরও দৃষ্টি প্রথমে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। এর কারণ বোধহয় সে-সময় পশ্চিমের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রসার দেশে ব্যাপকরূপে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসারে শাসক অপেক্ষা পাদরিরাই প্রত্যক্ষরূপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ এই পাদরিদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। তাদের প্রভাবেই বাংলার সমাজচেতনার উত্থান এবং বিকাশ হয়। চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়তো রামমোহনের ছিল না কিন্তু ধর্ম প্রচারের জন্য শিক্ষা এবং সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার জন্য হিন্দু ধর্মের কু-রীতি ও প্রথা লোকের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বহু বিচক্ষণ ব্যক্তির মনে ধর্ম সংস্কারের প্রশ্ন জাগে। তখনকার যুগে ব্যক্তি ও সমাজের মূলাধার ছিল একমাত্র ধর্ম। ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজ সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে না। সেজন্য রামমোহন রায় ধর্ম সংস্কারের প্রতি সচেষ্ট হন। নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা, একেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদকে হিন্দু ধর্মেরই একটি শুদ্ধরূপ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তিনি 'আত্মীয় সভা'[২] স্থাপন করেন। এই সভায় ধর্মচর্চা ছাড়া জাতিভেদ সমস্যা, সহমরণ, কুলীন প্রথা, পঙ্‌ক্তিভোজ, নিষিদ্ধ খাদ্য সমস্যা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীপ্রথা ইত্যাদি সামাজিক কু-প্রথার উপর বিচার করা হত। এইভাবে সমাজ সংস্কারের ধারা ক্রমশ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে, এবং ব্রাহ্ম-সমাজ, প্রার্থনা-সমাজ, আর্য-সমাজ এবং থিয়োসফিকাল সোসাইটি ইত্যাদি

১. সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—'শরৎ পরিচয়', পৃঃ ১৬৮
২. ১৮১৫

সংস্কারও উদয় হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এগুলি সেই সময়েরই অবদান।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর ৪৩ বছর পর শরতের জন্ম। যখন সে দিশাহারা হয়ে পথের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং অন্তরের সাহিত্যপ্রেমের তীব্র ব্যথা তাকে কুরে-কুরে খাচ্ছিল—তখনও অবশ্য সমাজ-সংস্কারকদের প্রদীপ্ত বৌদ্ধিক স্বাতন্ত্র্য ও দেশপ্রেমে চতুর্দিক আলোকিত ছিল। এই মহামন্থনের প্রভাব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পড়ে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতীয় নারীর কষ্ট নিবারণ করার চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ হল, বিধবা বিবাহের প্রবর্তন। বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার মূলেও তিনি কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অবশ্য বহুদিন পর্যন্ত শুধু বিচারোত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। পরে ব্রাহ্ম সমাজ স্ত্রী শিক্ষা এবং স্ত্রী স্বাধীনতার উপর জোর দেন; তখন সামাজিক কুপ্রথাগুলি ধীরে ধীরে দূর হতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলেই সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট[১] অধিনিয়ম পাস হয়। স্ত্রী-জাতি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি পায়।

বাংলা দেশে এই নবচেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের অবদান যথেষ্ট। যদিও কলেজটি স্থাপিত হয় শরতের জন্মের ৬০ বছর আগে,[২] তবুও কালক্রমে এটি বাংলাদেশের পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এই কলেজের শিক্ষক হেনরি ডিরোজিও অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বেকন, রুশো, টম-পেন-এর মত নতুন যুগের মনীষীদের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করান ও 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের' স্থাপনা করে দার্শনিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের উপর আলোচনা আরম্ভ করেন। এই সংস্থার যাঁরা মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের নিয়েই 'ইয়ং বেঙ্গল' তৈরি হয়। পুরোনোপন্থীরা এদের দেখলে আতঙ্কিত হতেন। এখানে একথা বললেন হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, একদিকে যুবকদের মধ্যে স্বতন্ত্র বিচারধারা এবং অগ্রগতির আলো জ্বলে উঠলেও, অপরদিকে পশ্চিমের কুসংস্কারগুলির প্রতিও তারা আকৃষ্ট হয়। কিছু লোক খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করেন। উত্তেজিত যুবকেরা মদ খাওয়া আরম্ভ করে এবং মা-বাপের কাছে প্রথাহীন ও শালীনতা বিরোধী আচরণ ক'রে এটাই দেখাতে চাইত, তারা তাঁদের থেকে কতটা আলাদা এবং প্রগতিশীল। মদ খাওয়ার এই প্রবৃত্তিকে বহুদিন পর্যন্ত প্রগতির লক্ষণ মনে করা হত। দেহে ভারতীয় এবং মনে ইংরেজ, এদের নিয়ে দেশে অসন্তোষও কিছু কম ছিল না। সে সময়ের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, হিন্দু কলেজে কিছু নতুন ধরনের মানুষ নির্মাণ করা হচ্ছে। এই কলেজের দরুন সমাজে ধর্মীয় চিন্তাধারায় যে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়েছে, তার একাংশও কি মিশনারীদের আন্দোলনের দ্বারা হয়েছে?

এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতে নবজাগরণের হাওয়া ওঠে কিন্তু তাকে রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ বলা যেতে পারে না। কলকাতা ইংরেজি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত বাঙালীরা ভাবুক হওয়ার দরুন ভালো বক্তা এবং লেখক হবার ক্ষমতা রাখতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং কুমারী তরু দত্তের নাম এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কিন্তু এ-আন্দোলনে জনতার অন্তরের যোগ ছিল না। তাই প্রত্যক্ষরূপে শুধু সমাজের একটা ছোট্ট অংশ এই আন্দোলনে উদ্বেলিত হয় এবং বাকিরা পুরোনো গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে রইলেন। যে-সকল লোক এই সংস্কারপন্থীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, পুরোনোপন্থীরা তাঁদের একঘরে করে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করেন। এই সমাজ সংস্কারের সুর বিহারে অনেক পরে ধ্বনিত হয়। সেখানকার প্রবাসী বাঙালীদের একটি সংখ্যালঘু দল এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এই-সব বাঙালী ভদ্রলোকদের মেয়েদের পাঠশালায় পড়তে যেতে দেখে বিহারীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। তারা সোচ্চারে বলত—

১ ১৮৭২
২ ১৭৯৬

বাঙালীদের কোনো জাত নেই। মাছ মাংস খায়, মেয়েদের বাইরে পড়তে পাঠায় ইত্যাদি। শুধু বিহারীরাই বা কেন? এই সমাজ সংস্কারকে বাঙালী সমাজও তো ভালো চোখে দেখেনি। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে তারা আচ্ছন্ন ছিল। বিধবা বিবাহ, জাতি বিচার, কৌলীন্য, ধর্মের বাহ্যাড়ম্বর ইত্যাদিতে তাদের ভাবনা, চিন্তা বড়ই সংকুচিত ছিল। প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামীর কথায়, 'যে সংসারে বিধবা নাই, সে সংসারে সদাচার এবং দেবসেবা ইত্যাদি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য গৃহে বিধবার একান্ত প্রয়োজন। ইহা ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি এবং একটি বিশিষ্ট দান। একথা হৃদয়ঙ্গম করা সত্যিই বড় কঠিন।'

নবজাগরণে যারা বিশ্বাস করত, তাদের কেউ সুনজরে দেখত না। মেয়েরা পদে পদে অপমানিতা হত। তারা ঘরের কোণে চুপটি করে পড়ে থাকত। পুরুষের ছায়া মাড়ালেও তারা কলঙ্কিতা হত। অপর দিকে কুলীন প্রথা তাদের জীবনকে আরো অভিশপ্ত করে তুলত। অনেক কারণে যে মেয়েদের বিয়ে হত না, কিছু টাকার বদলে কুলীন বামুন (পাচক) পিঁড়েয় বসে তাকে উদ্ধার করত। তারপর থেকে মাথায় সিঁদুর পরে এই সধবারা সারা জীবন স্বামীর প্রত্যাশাহীন প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিত। একদিকে সংস্কারের আতঙ্ক, অপরদিকে ধর্মের দালালদের চাপে পড়ে সাধারণ মানুষ দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

সমুদ্রযাত্রা করা তখনকার দিনে পাপ মনে করা হত। ছোট ভায়ের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলাও পাপ। নাচ, গান, নাটক-করা, ক্লাব-পার্টি সব-কিছুকেই পাপের পর্যায়ে ফেলা হত। ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙালী, বিহারের মুঙ্গের ইত্যাদি শহর অপেক্ষা বেশি গোঁড়া ছিল। আর এই পুরোনো দলে দলনেতা ছিলেন শরতের দাদামশাই কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শাস্ত্রসম্মত আচার-বিচার তাঁর প্রিয় ছিল। অত্যন্ত নিয়মের সঙ্গে তিনি তা পালনও করতেন। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে স্বাধীন চিন্তাধারার যুগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন আচার সংহিতা ক্রমশ প্রভাবহীন হয়ে পড়ছিল। নতুনের রূপও তেমন স্পষ্ট ছিল না। অরাজকতার এই আবহাওয়ায় বাঙালী সমাজ দুভাগে ভাগ হয়ে যায়।

১০

ভাগলপুরে শরৎ যখন দ্বিতীয়বার ফিরে এল, দলাদলি তখন চরমে। পুরোনোপন্থীদের বিরুদ্ধে যে দল গড়ে উঠেছিল, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর তার নেতা ছিলেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তীক্ষ্ণমেধা এবং অধ্যবসায়ের জোরে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পনেরো-কুড়ি বছর বয়সেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সরকার থেকে 'রাজা' উপাধি পান। তাঁর ফিটনের সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার হাতে ঘোড়-সওয়ারে সেপাই দৌড়ত। তিনি খুবই উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রত্যেকটি শুভ কাজেই তাঁর সহযোগিতা পাওয়া যেত।

শোনা যায়, একবার তাঁর উন্মাদ রোগ হয়। স্বাস্থ্যলাভের আশায় তিনি ইওরোপে যান। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার পর বাঙালী সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করে। এমন-কি কারো বাড়িতে যদি তাঁকে আমন্ত্রণ করা হত, তাহলে অন্য নিমন্ত্রিতেরা সেখান থেকে বিদায় নিতেন। এই বহিষ্কার-আন্দোলনের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে শরতের দাদামশায় কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও ছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল যে, রাজা শিবচন্দ্র বিদেশে গিয়ে নিজের ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিয়ে এসেছেন। প্রথম প্রথম রাজা শিবচন্দ্র সমাজকে অবহেলা করতে চাননি। যে-কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তবুও তাঁর ইচ্ছা কার্যকর হয়নি।

এই ঘটনার পর হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়চিত্ত হন। দুটি দলই ঈর্ষা ও বিদ্বেষের আগুনে জ্বলছিল এবং গোটা সমাজটাই যেন এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার উপক্রম করছিল। গঙ্গোপাধ্যায়দের প্রতিবেশী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে

থাকতেন। দুটি পরিবারে এরকম দলাদলির দরুন সমাজে নানান কথা উঠল। কেউ কেউ কেদারনাথের কাছে গিয়ে হিন্দুধর্মের গৌরব গান করতে লাগল, অপরদিকে রাজা শিবচন্দ্রের দলে মিশে অন্যদল পুরোনোপন্থীদের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ করতে লাগল। গাঙ্গুলীবাড়ির তরুণ কিশোরদের ও-বাড়ি যাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু প্রায়ই দেখা যেত, এই নিষেধ কেউই মানছে না। অপরপক্ষে এদের বাড়ির ছেলেদের অবজ্ঞা না করে তাদের সবাই ভালোই বাসত। ছোট ছেলেদের ঘুড়ি কিনে দিত। তামাক বা চুরুট খাবার জন্য তরুণদের বেত্রাঘাত করা হত না। সামান্য কৌতূহলবশত এ ধরনের অপরাধকে ক্ষমার চোখেই দেখা হত। সাপ খেলা, বাঁদর নাচ, পুতুল নাচ সবই শিশুদের দেখতে দেওয়া হত। সন্ধেবেলায় যাত্রাদলের নাচগানের আওয়াজে বাচ্চারা বিচলিত হয়ে পড়ত। শাসনের লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ গাঙ্গুলীবাড়ির ছেলেরা অসহায় লোলুপ দৃষ্টিতে নীরবে চেয়ে থাকত। যাত্রা দেখার অধিকার তাদের ছিল না। এই যাত্রা দলটির নাম ছিল 'নব-হুল্লোড়'। এতে কেউ বেহালা শিখত, কেউ বা তবলায় চাঁটি বসাত, কেউ বাঁশিতে মিষ্টি সুর তুলত, কোথাও বা নূপুরের রিনিরিনি শোনা যেত। কোথাও গড়গড়ার ধোঁয়ার সঙ্গে শ্লোকের ধ্বনি শোনা যেত—

'তাম্রকূটম্ মহাদ্রব্যম্ স্বেচ্ছয়াপীয়তে যদি,
টানে টানে মহাফলম মর্ত্যে দিব্য মহৎসুখম্'

অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবনেও কোনোরকম নিষেধ ছিল না। বৃদ্ধ, যুবক, বালক সবাই এই নব হুল্লোড়ে যোগ দিতে পারত। শরতের মন কিন্তু এই মৌনমধুর আমন্ত্রণকে বেশিদিন উপেক্ষা করতে পারল না। লুকিয়ে লুকিয়ে সেখানে যেতে আরম্ভ করল এবং যখন বেশ জানাজানি হয়ে গেল, তখন বুক ফুলিয়েই যাওয়া শুরু করল। গাঙ্গুলীবাড়ির কঠোর অনুশাসনও তাকে বেঁধে রাখতে পারল না। নিষেধ অমান্য করায় সে আনন্দ পেত। বাঁশি, বেহালা, হারমোনিয়াম, তবলা সবই সে বাজাতে পারত। 'চরিত্রহীনে'র সতীশকে তো এই বিদ্যায় নিপুণ দেখা যায়। ক্রমশ শরৎ ওই দলের পাণ্ডায় পরিণত হয়। রাজুও এই দলটির ডান হাত ছিল।

যাত্রাদলের শখ তো শরতের ছোটবেলা থেকেই ছিল, কিন্তু অন্তর যেন এই স্থূল আনন্দে সায় দিত না। এতে যেন সূক্ষ্মরসের বিরাট অভাব। যাত্রা করাও কোনো হাসি ঠাট্টার ব্যাপার ছিল না। দশ-বারো ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করার পরই যাত্রা জমে। শুধু নির্বিকার হয়ে কাজ করাও সহজ নয়, নেশার দরকার হয়। অর্থের অভাবে ভালো মদের ব্যবস্থা না হওয়াতে গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদিতেই সন্তুষ্ট থাকত হত।

ক্রমশ যাত্রার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যেতে লাগল। ভাগলপুরের বাঙালী সমাজে থিয়েটারের প্রচলন হয়। থিয়েটার দেখে সবাই আনন্দ পেত। ভালোমন্দ যেমনই নাটক হোক-না কেন দর্শকদের প্রচণ্ড ভিড় হত। তবুও বাড়ির ছেলেরা কেউ নাটকে যোগ দিত না। একদিন অভিনয়ে একটি নারীর ভূমিকায় এক যুবকের মধুর কণ্ঠের সংগীতে দর্শক অভিভূত, এমন সময়ে হঠাৎ যুবকটির পিতা দর্শকদের ভিড় ঠেলে তর্জন গর্জন করে মঞ্চের উপর গিয়ে দাঁড়াতে, অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্নে তৈরি মোমবাতির আলোদান কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ল। ফরাশে আগুন লেগে মঞ্চ জ্বলে উঠল আর সেই আগুনে দর্শকেরা দেখলেন, পিতা পুত্রকে নির্মমভাবে প্রহার করছেন! থিয়েটারের আর শেষ রক্ষা হল না। এই আর্য থিয়েটার ছিল বয়স্কদের। রাজু আর শরৎ নিজেদের চেষ্টায় আর-একটা নতুন থিয়েটার-দল তৈরি করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' মঞ্চস্থ করে। এই নাটকে মৃণালিনীর ভূমিকায় শরৎ অভিনয় করেছিল। যদিও অভিনয়ের হাতে-খড়ি রাজুর হাতেই হয়, তবুও দর্শকেরা সেদিন মৃণালিনীর ভূমিকায় শরতের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়; কিন্তু অভিভাবকদের প্রবল বিরোধিতার দরুন অভিনয় করা তাকে ছাড়তে হয়। কয়েক বছর আগে 'আদমপুর ক্লাবে' নতুন করে আবার ওই দলটি গড়ে ওঠে। রাজা শিবচন্দ্রের

একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র এই দলটির প্রাণ ছিল। সংগীত এবং নাটকে তাদের অসাধারণ রুচি ছিল। রাজু ও শরৎ ছিল এই দলের উৎসাহী সদস্য। এরা সদলবলে কলকাতায় গিয়ে নাটক ইত্যাদি দেখে আসত, পরে সেই অনুযায়ী নিজেদের সংশোধন করত। সতীশচন্দ্রের পুত্রের অন্নপ্রাশনোৎসবে কলকাতার বিখ্যাত 'মিনার্ভা' থিয়েটারের অভিনেতারা ভাগলপুরে এসে রাজবাড়ির রঙ্গমঞ্চে 'আলিবাবা' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। শরৎ এই নাটকে মুস্তাফার ভূমিকায় এমন অভিনয় করে যে, দর্শকেরা তাকে চিনতে পারেনি। এই সময়ে সম্পর্কে রাজা শিবচন্দ্রের শালা বাংলা স্কুলের অধ্যাপক কান্তিচন্দ্রের মৃত্যু হয়। প্রতিশোধের এতবড় সুযোগ পুরোনোপন্থীরা ছাড়লেন না। তাঁরা শবযাত্রায় যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। শেষ পর্যন্ত আদমপুর ক্লাবের সদস্যরা মিলে শেষকৃত্য সম্পন্ন করে। যারা এই শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিল, তাদের সবাইকেই জাতিচ্যুত করা হয়। সারা শহরে এমনই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যে, ফলে প্রতিটি সংসারে দলাদলি শুরু হয়ে যায়। যারা দুর্বল অভাবী, তারা মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু শরতের বাবা এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন রইলেন, কাজেই সে সময় শরৎ ছাড়া পেলেও পরে তাকে অশেষ লাঞ্ছনা সইতে হয়। গাঙ্গুলীবাড়িতে খুব জাঁকজমক করে জগদ্ধাত্রী পুজো হত। প্রবাসী বাঙালী সবাই এই পুজোয় যোগ দিত; কিন্তু এই দলাদলি ও রেষারেষির ফলে রাজা শিবচন্দ্রের লোকদের আর এই পুজোয় নেমন্তন্ন করা হত না। শরৎকে লোকে আনন্দোৎসবেও যেমন আদর করে ডাকত, আপদ বিপদেও তেমনি তাকে আশা নিয়ে ডাকা হত। রাত জেগে রুগীর সেবা করা, সময়ে অসময়ে শ্মশানে গিয়ে দাহ-সংস্কার করা, বিবাহ বা পুজোয় আগন্তুকদের দেখাশোনা অভ্যর্থনা করা—সব কাজেই সে সমান পটু ছিল। পাড়ার বারোয়ারী পুজো এবং মামার বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোয় ভোগ খাওয়াবার ভার তার উপরেই ছিল। কিন্তু এবার জগদ্ধাত্রী পুজোয় মামার বাড়ি থেকে তার ডাক এল না।[১] ডাকের প্রয়োজনও ছিল না, শরৎ নিজে থেকে গিয়েই সেখানে কাজেকর্মে লেগে গেল। ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছিল। খাবার পরিবেশন করতে করতে সবাই ঘোরাঘুরি করছিল। কিন্তু শরৎকে দেখামাত্রই দলপতি গর্জন করে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। মেজ দাদামশাই মহেন্দ্রনাথ দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, দাদা?' দলপতি চিৎকার করে উঠলেন, 'কি হল? বলি কি হয়নি? এই শরৎ হারামজাদা কান্তির দাহ সংস্কার করে এসেছে। এখন আবার আমাদের খাবার পরিবেশন করছে! আমাদের জাত মারতে চায়,—পাজী—হারামজাদা!'

সকলে হায় হায় করে উঠল। মহেন্দ্রনাথ এসে শরৎকে বললেন, 'শরৎ, তোমার পরিবেশন করা চলবে না।' রাগ দুঃখ অপমান ও অভিমানে শরতের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। হাতের পাত্রটি মাটিতে নামিয়ে রেখে সেখান থেকে চলে গেল। মর্মাহত শরৎ কয়েকদিন বাড়িও ফেরেনি, না জানি কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

১১

সে বছর শরৎ পরীক্ষাতেও[২] বসতে পারেনি। টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ফাইনাল পরীক্ষায় বসার অনুমতি পাওয়া যেত। টেস্ট পরীক্ষার সময় একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। বিজ্ঞানে শরৎ বরাবরই ভালো ছিল। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে আধঘন্টার ভিতরে উত্তরপত্র তৈরি করে তারপর বন্ধুদের সাহায্যে লেগে গেল। প্রশ্নের উত্তর কাগজে লিখে দারোয়ানের হাত দিয়ে বন্ধুদের কাছে পাঠাতে লাগল। জল খাওয়ানোর অজুহাতে দারোয়ান বার বার ছেলেদের কাছে ঘুরঘুর করতে লাগল। পরীক্ষকের কেমন সন্দেহ হতেই দারোয়ানের পিছু পিছু শরৎকে

১ ১৩ নভেম্বর, ১৮৯৬
২. ১৮৯৬

হাতেনাতে ধরে প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে যান। শাস্তিস্বরূপ প্রিন্সিপাল শরৎকে ফাইনাল পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিলেন না। এ অপরাধের এই-ই উপযুক্ত শাস্তি।

যখন পরীক্ষার ফল বেরুল, তখন শরতের নাম তাতে পাওয়া গেল না। কীই বা করবে শরৎ, অপরাধী তাই সে অসহায়। কিন্তু পড়াশোনায় ভালো হওয়ার দরুন অন্যান্য অধ্যাপকেরা প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে মিনতি করেন শরৎকে পরীক্ষায় বসতে দেবার জন্য। প্রিন্সিপাল মহাশয় নিজে এর জন্য কম দুঃখিত ছিলেন না। তাই তিনি ফিস জমা দেবার একদিন আগে শরৎকে ডেকে বললেন, 'কাল কলেজে গিয়ে পরীক্ষার ফিস জমা দিয়ে আসবে।'

কিন্তু একদিনে পরীক্ষার ফিস জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। মা আগেই মারা গিয়েছিলেন, পিতা চিরদিনের যাযাবর। পয়সা রোজগার করতে কোনোদিনই শিখলেন না। অন্যদিকে নিজের মামা অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। সম্পর্কে যাঁরা মামা হন, তাঁরা হয়তো সাহায্য দিতে পারেন, না দিলেও দোষ দেওয়া যায় না। উপরন্তু শরৎ তাঁদের দলের বিরুদ্ধে রাজা শিবচন্দ্রের দলে যোগ দিয়েছিল। তৎকালীন মানদণ্ডে তার চরিত্রও ভালো ছিল না। সেইজন্য মামাদের সংসারে তার কোনো দাবিই ছিল না। এইভাবেই পয়সার অভাবে শরতের পড়াশোনা এখানেই শেষ হল। নাটক, থিয়েটার, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদিতেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখল। রাজুর সঙ্গে বেপরোয়া ঘুরে বেড়ানো আরও বাড়ল। এমন-কি বেশ্যালয়ে যেতেও দ্বিধা করেনি। মন্সুরগঞ্জে কালিদাসী নামে এক ধনী নর্তকী থাকত। নিজের দোতলা বাড়ি ছিল। ধর্মে তার খুব মতি ছিল, মিষ্টি সুরে ভালো কীর্তনও গাইতে পারত। কীর্তনের লোভেই রাজু রোজ সেখানে যেত। শরতের কলেজ যাবার পথ এদিকেই ছিল, কাজেই দুজনের একজোটে যাবার বেশ সুবিধে ছিল। শোনা যায়, কালিদাসী এদের দুজনকেই খুব স্নেহ করত। আজ মীমাংসা করা দু:সাধ্য যে, উনিশ বছরের শরৎ কালিদাসীর সঙ্গে বর্জিত নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদ পেয়েছিল কি না। কিন্তু একথাও সত্য যে, কণ্ঠের মাধুর্য আর বাকপটুতার জন্য মেয়েরা তার প্রতি আকৃষ্ট হত। তথাকথিত কুকর্মের ফলে কুলীন সমাজে দিনদিন শরতের মর্যাদা কমে আসছিল, কাজেই অকুলীনদের মাঝেই তাকে শরণ নিতে হয়। আর যথার্থ মানুষের খোঁজও সে এখানেই পায়। বিরাট এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে অনুভূতি হল, মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে অনেক বড়।

'দেবদাস' লেখা সে লুকিয়ে আরম্ভ করেছিল। মনে হয়, 'দেবদাস'এ সে নিজের প্রেমের বেদনাকেই স্পষ্ট করতে চেয়েছিল। অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও 'দেবদাস' শরতের অসফল এবং সরল প্রেমেরই আত্মস্বীকৃতি। এর সব-কটি চরিত্রই বাস্তব। ছেলেবেলায় যাকে সে খুব ভালোবাসত, সে স্কুলের বন্ধু ধীরু, সেই তো দেবদাসের পার্বতী; ধর্মদাসের চরিত্র যেন মামার বাড়ির সেবক মুশাইকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। চন্দ্রমুখীর উপাদান জুটিয়েছে একটি নর্তকী। শরৎচন্দ্র স্বয়ং নর্তকীটির ঋণ স্বীকার করেছেন। বয়সকালে গল্পটি তিনি নানা বন্ধুদের নানান রূপে শুনিয়েছেন। কিন্তু শরতের অনন্য অনুরাগী বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন যে, এটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। শরৎ স্বয়ং একটি বন্ধুর সঙ্গে সেখানে গান শুনতে গিয়েছিল। বন্ধুটি জমিদারদের বাড়ি কাজ করত। তার কাছে সেদিন প্রায় কয়েক হাজার টাকা ছিল। বহুক্ষণ নাচ গান হবার পর মদের ফোয়ারা চলল। ক্রমশ মদ খাওয়ার মাত্রা এমনই বেড়ে চলল যে, শেষ পর্যন্ত অনেকে মাতাল অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। বন্ধুটি বারবার টাকা বার করে নর্তকীকে দেয় আর বলে, 'আরো নাচো, আরো মদ দাও।' পরে বন্ধুটি মদে চুর হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। শরৎও জ্ঞান হারায়। পরের দিন সকালে বন্ধুটির চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায়। বন্ধু হাহাকার করছিল, 'হায়, আমার এখন কি হবে? আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে।' শরৎ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, চেঁচাচ্ছ কেন?'

জবাবে বন্ধু বলে, 'আমার কাছে তিন হাজার টাকা ছিল, খুঁজে পাচ্ছি না। তুই কি লুকিয়ে রেখেছিস?'

শরৎ বলল, 'আমি কেমন করে লুকোব? আমিও তো তখন থেকে বেহুঁশ, তোর চেঁচানিতে

এই মাত্র ঘুম ভেঙে গেল।' বন্ধু কেঁদে ফেলল, বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। এ টাকা তো জমিদারের। এ টাকা ফেরৎ না দিলে চাকরি তো যাবেই, উপরন্তু জেলে যেতে হবে। ভেবেছিলাম শ' দুই তিন খরচ হবে, সে না হয় ক্রমশ শোধ দিয়ে দেব। কিন্তু এত টাকা এখন আমায় ধারই বা কে দেবে? এ আমি কি করলাম?'

এই বলে সে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। কিন্তু কাঁদলে কি আর টাকা ফেরত পাওয়া যায়? দুজনে মিলে যথেষ্ট খোঁজাখুজি করেও টাকার হদিশ পেল না। মনে সন্দেহ হল, নর্তকীটি টাকা সরায়নি তো? বলার সংগে সংগেই নর্তকীটি ঘরে ঢোকে। তাকে দেখা মাত্রই বন্ধুটি আরো জোরে কেঁদে উঠল। সব ঘটনা তাকে শোনাল। নর্তকী অত্যন্ত শান্তস্বরে বলল, 'তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছিল যে, বেশ্যাবাড়ি এত টাকা নিয়ে ঢুকেছিলে? এখানে দু-চার টাকার জন্য লোকে প্রাণে মেরে ফেলে আর তোমার কাছে তো হাজার হাজার টাকা ছিল। বারবার সবার সামনে টাকা বার করে আমায় দিচ্ছিলে... এ কি কাণ্ড? সকলের লক্ষ্য তোমার পকেটের উপর ছিল। সবাইকে বিদায় দিয়ে নেশায় মত্ত শরীরটাকে তুলে মাথার নীচে যখন বালিশ দিলাম, তখন আমাকে বলতে কিছু বাকি রাখনি। থাক্, সে-সব তো আমায় রোজই শুনতে হয়। তোমাদের শুইয়ে যেই উঠতে যাচ্ছি, দেখি টাকাগুলো পড়ে রয়েছে। আমি আঁচলে বেঁধে কোমরে জড়িয়ে নিলাম। কি জানি যদি আমারই কু-দৃষ্টি পড়ে। এ পাড়ার কত দুর্নাম! কত রকমের বদমাশ গুণ্ডা আসে। তারা তো সবাই জেনে গিয়েছিল যে, তোমাদের কাছে টাকা আছে। বাড়ির আশে পাশে সারা রাত ঘুরে বেড়িয়েছে। কখন এখান থেকে বেরুবে আর তারা সব কেড়েকুড়ে নেবে। ভয়ে সারারাত আমি ঘুমুতে পারিনি। আগুন জ্বালিয়ে ঝি-এর সংগে গল্প করে রাত কাটিয়েছি।' এই বলে টাকাগুলো বার করে বন্ধুটিকে দিয়ে বলল, 'দেখ! সব ঠিক আছে তো? ভালো করে গুনে গেঁথে নাও। আর কখনও এমন বোকামি কোর না।'

টাকা দিয়ে চলে যেতেই শরৎ তার যাওয়ার পথের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ভাবল, অনায়াসেই এ-টাকা সে হজম করতে পারত। তার কাছ থেকে টাকা ফিরিয়ে নেবার দু:সাহস কার হত? কিন্তু কত বিরাট মহৎ এই রমণী! পথভ্রষ্টা হয়েও অন্তরের সদবৃত্তিগুলি তার নষ্ট হয়নি। বাইরের রূপটাই মানুষের আসল পরিচয় নয়। অনেক সতীনারীর দ্বারাও অনেক কুকর্ম হয়। চুরি, জাল-জোচ্চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য কোনো কিছুতেই তারা পিছু হঠে না কিন্তু এই দ্বি-চারিণীরা শত প্রতিকূল আবহাওয়াতেও হৃদয়ের দয়া, মায়া, মমতাকে শুকিয়ে ফেলেনি।

এই নর্তকীই তো কালিদাসী। 'দেবদাস' লেখার সময় এর কাছেই তো শরৎ যেত। চন্দ্রমুখীর চরিত্রের সংগে কালিদাসীর চরিত্রের কী ভয়ংকর মিল! সব-কিছু দান করে শেষে সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়। পুজো-পার্বণে কারো কারো বাড়িতে গান শোনাতেও যেত। কেউ যদি তাকে কিছু দিতে চাইত, তখন সে বলত, 'ভগবান আমায় এত দিয়েছিলেন তাই আমি রাখতে পারিনি। আর আমার কিছুই চাই না।'

কালিদাসীই যে চন্দ্রমুখী এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। চুণীলাল বলেছিল, 'না-না, নোট-ফোটের লোক আলাদা—সে তুমি নও।' (দেবদাস)। যত ধর্মপ্রাণা নারীই হোক-না কেন, আসলে তো সে একটি নর্তকী।

শরতের মামার বাড়ির কেউই এ আচরণ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁদের চোখে সে ক্রমশ উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন হয়ে পড়ছিল। তাই মামার বাড়ি যাওয়া তার পক্ষে আগের মতো আর সহজ ছিল না। অন্দরমহলে ঢোকবার সময় গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকতে হত—বয়স্কা বোনেরা তার সামনে আর বেরুত না। মামার বাড়ির লোকেদের প্রসন্ন করার জন্য নিজের আচরণকে সে সংযত করেনি। একদিন ছোট দাদামশায় আদেশ দিলেন, 'শরৎ যেন এ বাড়িতে আর না ঢোকে।' যারা প্রতিভাশালী তাদের পক্ষে এ ধরনের অবহেলা ও তিরস্কার বোধহয় কতকটা প্রাপ্য রূপেই ধরা হয়। ইংরেজ কবি শেলীর বিদ্রোহী মনোভাবের দরুন তাঁর মা তাঁর বোনদের বলেছিলেন, 'শেলীর সংগে তোমরা বেশি কথাবার্তা বোলো না। সে ধর্মেও বিশ্বাস করে না, বিবাহেও তার বিশ্বাস নেই।'

হঠাৎ একদিন দেখা গেল রাজু কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।[১] কোনোদিন আর সে ফিরে আসেনি। বহুবছর পর শ্রীকান্তের রচয়িতা লিখেছেন, 'আজ সে বাঁচিয়া আছে কিনা জানি না। কারণ বহু বৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যূষে ঘরবাড়ি বিষয় আশয়, আত্মীয় স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে।' শরতের জীবন যেন বিরাট এক শূন্যতায় ভরে গেল। এই শূন্যতাই ছিল তার জীবনের প্রেরণা।

'মৃণালিনী'র পর আদমপুর ক্লাবে 'বিল্বমঙ্গল' ও 'জনা' নামক নাটক দুটি মঞ্চস্থ করা হয়। 'বিল্বমঙ্গলে'র চিন্তামণি এবং 'জনা'য় জনার ভূমিকায় শরৎ অভিনয় করে। শরতের অভিনয়ে গাম্ভীর্য, সংযম, তেজস্বিতা ও শোক প্রকাশের এমনই হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিমা ছিল যে, কলকাতার ক্ষমতাময়ী অভিনেত্রীদের অভিনয়ও এত হৃদয়গ্রাহী হত না। পাগলিনী ও গিরিজার অভিনয় করে রাজু প্রশংসিত হয়। পাগলিনীর ভূমিকায় রাজুর অভিনয় স্মরণ করে ষাট বছর[২] পরও কেউ কেউ রোমাঞ্চ অনুভব করত। এ ভূমিকায় সে যেন সত্যই পাগল হয়ে উঠত। একদিন নিজের শিশু ভাইপোকে কোলে নিয়ে গাছের ডালে বসে পাগলীর অভিনয় শুরু করে দেয়। দেখতে পেয়ে লোকেরা ভয় পেয়ে যায়, না জানি কখন বাচ্চাটি কোল থেকে ছিটকে পড়ে। রাতে বাবার হাতে রাজু বেদম প্রহার খেল, আর ভোররাতেই রাজু চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল। শোনা যায় সে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। সন্ন্যাসবৃত্তির উপর ইদানীং সে আকর্ষণ অনুভব করত। বহির্জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে যেন অন্তর্জগতে লীন হয়ে গিয়েছিল সে। গঙ্গার ঘাটের কাছে ছোটদের শ্মশানের কাছে বিশাল এক অশ্বত্থ গাছের উপর একটা কাঠের ধ্যানঘর তৈরি করেছিল। শরৎ ছাড়া আর সকলেরই এ-জায়গায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে অতি সাবধানে সেই ঘরটাতে ঢুকতে হত। অত্যন্ত সংকীর্ণ সেই জায়গাটুকুতে বসে ঈশ্বরদর্শনের চিন্তায় রাজু থাকত বিভোর হয়ে। ক্রমশ কথা বলা ছেড়ে মৌন হয়ে থাকত। অনশনে তার দিন কাটত। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও মেলামেশা বন্ধ করে দিল, শুধু বাচ্চাদের খুব ভালোবাসত। তাদের কাউকে নিয়ে গাছের উপরে চড়ে বসত। পিতা নিজের সন্তানকে কোনোদিনও চিনতে পারেনি, তাই সন্তানও চিরদিনের মতো অসীম বিশ্বে কোথায় হারিয়ে গেল।

পরে অবশ্য অনেকে বলত, হরিদ্বারে নাকি তাকে দেখতে পাওয়া গেছে। উদাসীপন্থীদের আখড়ায় একবার এক সাধুকে বাংলায় গান গাইতে দেখে এক মহিলার[৩] সন্দেহ হয়। গলার স্বর কেমন যেন চেনা মনে হওয়াতে ভালো করে লক্ষ করে দেখেন যে সাধুটির পিঠে জড়ুলের চিহ্ন। তা দেখে তিনি নিশ্চিত হন যে, এ রাজু ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। ভিতরে গিয়ে তিনি বললেন, 'আরে রাজু? তুই এখানে সাধু সেজে বসে আছিস আর ওদিকে তোর মা-র পাগলের মতো অবস্থা।'

রাজু তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল। খবর পেয়ে মা হরিদ্বারে এলেন কিন্তু ততক্ষণে রাজু সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। সব খোঁজাই ব্যর্থ হল। রাজু চলে যাওয়াতে শরতের মনে বেদনার শেষ ছিল না। যখনই তার কথা মনে পড়ত, বুকটা মুচড়ে উঠত। রাজু যে তার বড় প্রিয় বন্ধু। তার কাছেই তো শেখে, সংসারে সবেরই মূল্য হয়তো মিথ্যে হতে পারে কিন্তু মানবীয় করুণা কোনো অবস্থাতেই মিথ্যে ও ব্যর্থ হতে পারে না।

সেবার জগদ্ধাত্রী পুজোর আগের দিন মামার বাড়িতে যাত্রার আয়োজন হয়েছিল। কলকাতা থেকে বেশ নামকরা দল এসেছিল। পাড়া-প্রতিবেশী দল বেঁধে যাত্রা দেখতে এল। শরৎও এককোণে মগ্ন হয়ে যাত্রা দেখছিল, হঠাৎ রাজু এসে হাজির। খুব ব্যস্ত হয়ে শরতের কানে কানে বলল, 'চল্ ওঠ্।'

---

১ ১৮৯৭
২ ১৯৫৯
৩ ১৯৫৯ সালে লেখক উক্ত মহিলার ছেলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

গুরুর আদেশ। শরৎকে উঠতে হল। বাইরে এসে বলল, 'ওই পাড়ার তারাপদর ছেলেটা এই মাত্র কলেরায় মরে গেল, তিন বছরের ছেলে কিছুতেই বাঁচানো গেল না। মা-বাপ তো পাগলের মতো কান্নাকাটি করছে। একটি মাত্র সন্তান। কিন্তু এ-রোগের মড়া বেশিক্ষণ ফেলে রাখা চলবে না, এখুনি শ্মশানে যেতে হবে। পাড়ার সবাই যাত্রা দেখতে ব্যস্ত। এখন তুই-ই চল্ আমার সঙ্গে।'

দুজনে তারাপদর বাড়ি পৌঁছে মা-বাপ দুজনকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রায় অর্ধেক রাতে মড়া নিয়ে শ্মশানে চলল। কিছুদূর এগিয়ে শরৎ বলল, 'সঙ্গে বাতি নিলে ভালো হত।' রাজু উত্তর দিল, 'ভালো তো হত। কিন্তু এখন পাই কোত্থেকে? আর দেবেই বা কে? আমার কাছে দেশলাই আছে, দরকার পড়লে ওতেই কাজ চলবে।' গঙ্গার ধারেই শ্মশান। যেমন বড় তেমনই ভয়াবহ। বহুদূর পর্যন্ত মানুষের কোনো বসতি ছিল না। চতুর্দিকে বালি আর বালি, দূরে কোথাও এক-আধটা খেজুর গাছ বা কাঁটা বন। শ্মশানের ঠিক মাঝখানে একটা খড়ের ঘর ছিল। ঝড় জলে বা বিশ্রামের দরকার হলে লোকে এর ব্যবহার করত। অনেকের ধারণা ছিল এতে ভূত আছে। দিনের বেলাতেও কেউ সে ঘরে ঢুকত না। রাজুর এ-সবে ভ্রূক্ষেপ ছিল না কোনোদিন, তাই সোজা ঘরটার ভিতরে ঢুকে পড়ল। শরৎও পিছু পিছু এল কিন্তু ভয়ে তার থরহরি-কম্প অবস্থা। রাজু লাশটি মেঝেয় নামিয়ে রেখে বলল, 'বহুক্ষণ বিড়ি খাওয়া হয়নি, আগে একটা বিড়ি খেয়ে নি।'

শরৎ কিছু বলবার আগেই অন্ধকারে শোনা গেল 'আমাকেও একটা বিড়ি দিবি।' ভয়ে শরতের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। রাজু জিজ্ঞেস করল, 'কে?' সঙ্গে সঙ্গে দেশলাইটি জ্বেলে দেখল ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে একটা লোক পড়ে আছে। রাজু এমনই ধাতুতে গড়া, ভয় না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'আমি একজন গঙ্গাযাত্রী।'

এবার লক্ষ্য করে দেখা গেল ছেঁড়া কাঁথার ভিতর প্রায় আশি বছরের এক বৃদ্ধ শুয়ে আছে। রাজু তাকে একটা বিড়ি দিতে তাতে তৃপ্তির সঙ্গে এমন একটা টান দিল যেন অমৃত। বলল, 'বাবা, বাঁচালে তুমি আমায়। কদিন থেকে পড়ে আছি এখানে তবুও মৃত্যু নেই। সঙ্গে আমার দু'নাতি আর পাড়ার এক প্রতিবেশী এসেছে। আমি মরছি না দেখে বড় বিরক্ত হয়ে উঠেছে আমার উপর। আজ তারা যাত্রা দেখতে গেছে। বলছে, ভেবেছিলাম বুড়ো তাড়াতাড়ি মরবে কিন্তু গঙ্গার হাওয়া খেয়ে বুড়ো তো আরো চাঙ্গা হয়ে উঠল। জানি না আমার কী গতি হবে! গঙ্গাযাত্রী হয়ে বেরিয়ে এসেছি, এখন তো আর বাড়ি ফেরাও যাবে না।'

রাজু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'কেন বাড়ি ফিরতে পারবেন না? আপনি বেশ সুস্থ আছেন। বলুন আপনার বাড়ি কোথায়? আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি নইলে সঙ্গীরা গলা টিপে মেরে ফেলবে।'

মৃত্যু-পথযাত্রী ককিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ বাবা, ওরা বার বার সেই কথাই বলে ভয় দেখাচ্ছে। কি জানি কখন সত্যি গলা টিপে দেয়।' রাজু প্রথমে মৃত-শিশুটিকে মাটিতে পুঁতে স্নান করে নিল, তারপর শরৎকে বলল, 'আমি এই বুড়োকে কাঁধে নিচ্ছি, তুই ওর ছেঁড়া কাঁথাপত্তর নিয়ে চল।'

সেই ওস্তাদ সাপুড়ে আর অন্নদাদিদি যেন রাজুর পুজোর জিনিস। সমাজ-বহিষ্কৃতা কে সেই নারী? কেউ কি সঠিক জানত? কিন্তু এ কথা সত্যি যে, তার স্বামী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। সমাজের নির্দেশ অমান্য করেও অন্নদাদিদি স্বামীকে ছাড়তে পারে নি। সাপের খেলা দেখিয়ে কত আর আয় হত, পেট ভরে অন্নও জুটত না। রাজু আর শরৎ নিজেদের স্বভাবে সাধ্যমত সাহায্য করত। একদিন এই দিদিকে অপমান করার দরুন ওস্তাদকে ধরে পিটিয়ে ছিল।

এ গল্পের কোনো আদি অন্ত ছিল না।

এদিকে শরৎ লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মতোই খেয়াল খুশির পথ ধরে দিন কাটাত। অন্যদিকে বাপ যাযাবর বৃত্তির শেষ সীমা অতিক্রম করে গেছেন। বাড়িতে আরও তিনটি সন্তান, তাদের সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার মতো ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। পুরোনো ধারকর্জ শোধ দিতে পারেননি। গাঁয়ের বাড়িখানা বাঁধা রেখেছিলেন, তারও সময় পেরিয়ে যখন ডিক্রি জারি হল তখন বাধ্য হয়ে মাত্র দুশো-পঁচিশ টাকায় ছোটমামাকে বাড়িটি বিক্রি করে দেন।[৫] উপোস করে মরা ছাড়া তাঁদের জন্য আর কোনো পথ খোলা ছিল না। শরৎ তখন শিশু নয়, একুশ বছরের পূর্ণ যুবক। দোষেগুণে লোকেদের সে প্রিয়ই ছিল। বাড়ির এই দুর্দশা তার মনকে অবশেষে বিচলিত করে, শেষ পর্যন্ত সত্যিই সে চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

সে সময় সাঁওতাল পরগনায় সেট্‌লমেন্টের কাজ হচ্ছিল। বেনেলি এস্টেটের তরফ থেকে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এস্টেটের দেখাশোনা করত। এরই সহকারী-পদে শরৎ নিযুক্ত হয়। কাজটি তার রুচিমাফিকই ছিল, প্রায়ই বাইরে যেতে হত। তাঁবুতে থাকা আর গান বাজনা, শিকার করা ইত্যাদি বড় কর্মচারীদের প্রধান কাজ ছিল। কখনও কখনও সেখানকার রাজকুমার মজলিসে যোগ দিতেন। দুঃসাহসী শরৎ ক্রমশ বন্দুক চালাতে শিখল। উড়ন্ত পাখিকে গুলি করে মারতে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভালো গল্প শোনাবার ক্ষমতা, মধুর কণ্ঠে গান গাওয়া, ভালো বন্দুক চালানো, এ-সব গুণের জন্য সবাই তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। বেড়াতে তাব চিরদিনই ভালো লাগত। বেড়াতে বেড়াতে কখনও কখনও বক্রেশ্বরের শ্মশানে গিয়ে পৌঁছত। জায়গাটি তার বড় প্রিয়ই ছিল। শিবমন্দিরের কাছেই কী সুন্দর মনোরম নির্জন শ্মশানটি। তার উদাসী মনকে এই নির্জনতা যেন কাছে টানত। চতুর্দিকে নরমুণ্ড, গাছের ডালে অসংখ্য উল্টোমুখো বাদুড় ঝুলছে। তারই মাঝে সেই বিরাট নিস্তব্ধতা ভেদ করে বাদুড় ছানার কান্না তাঁর উদাসী মনটাকে কিছুতেই ভীত ও বিচলিত করতে পারত না।

সেদিন রাজকুমারের উপস্থিতিতে মজলিস যেন আরো জমে উঠেছে। সেট্‌লমেন্টের বড় বড় অফিসারেরা এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে। অনেক টাকার আর্জিতে খুশি হয়ে পাটনা থেকে এক বাঈজী এসেছে। ভারি সুন্দর এই বাঈজীটি আর তেমনই মিষ্টি তার গানের গলা। শরৎও নিমন্ত্রিত। যদিও সে কোনো উঁচু পদে কাজ করত না। তার মিষ্টস্বরের জন্য রাজকুমার তাকে ডেকে বললেন, 'আজ তোমাকে গাইতে হবে, শরৎ।'

সংগীতশাস্ত্রের বিচারে তার গান হয়তো নির্ভুল না হতে পারে, কিন্তু গলার মাধুর্য মনকে স্পর্শ করল। বাঈজী পর্যন্ত তার গানের প্রশংসা করল। নাচে, গানে বাঈজী খুবই পটু ছিল। মনের সবটুকু মমতা ও মাধুর্য নিয়ে মজলিসে বীণ বাজাল কিন্তু তার মর্ম এ মজলিসে কেই বা বুঝবে? শরৎই কেবল রাগিণীর মর্ম বুঝতে পারল। মুক্তকণ্ঠে সে বাঈজীর বীণাবাদনের প্রশংসা করল। বাঈজী প্রশংসায় বিহ্বল হয়ে পড়ল। দিশাহারা এই গুণী যুবকটির উপর সহানুভূতি ও মমতায় তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। অল্পকালের পরিচয় পরস্পরকে কাছে টেনে আনে। কথাপ্রসঙ্গে বাঈজী বলল, 'আমি টাকার জন্য গাই, গানই আমার পেশা, কিন্তু আপনি কেন এদের মোসাহেবি করেন? আপনি গুণী লোক, আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।'

শরৎ চাকরি ছেড়ে দেয়। শুধু বাঈজীর আগ্রহেই যে চাকরি ছাড়ে, এ কথা সত্য নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের কাছ থেকে যে চঞ্চল, অস্থির প্রকৃতি পেয়েছিল, তারই তাড়নায় কোথাও সে বেশিদিন স্থির থাকতে পারেনি। চাকরি ছাড়ার একটা কারণ এই ছিল যে, একজন জ্যোতিষী তাকে বলেছিল, চল্লিশ বছর বয়সে সে রাজার মতো খ্যাতি লাভ করবে। আর ষাট বছরের পরে যদি বেঁচে থাকে তাহলে দীর্ঘায়ু হবে।

৯ নভেম্বর ১৮৯৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী—'দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র', 'ভারতবর্ষ' ১৯৩৮—চৈত্র ১৩৪৪

এছাড়াও হয়তো অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। বস্তুত ছোট থেকেই সে নিজের চতুর্দিকে একটা রহস্যের বেড়াজাল বিছিয়ে রাখত। নিজের সম্বন্ধেও নানা ধরনের গল্প রচে বেড়াত। চাকরি ছাড়ার প্রতি বাঈজীর আগ্রহ বানানো গল্পও হতে পারে। তবুও কুসংগ, স্বেচ্ছাচারিতা, দুঃসাহসপূর্ণ প্রবৃত্তির তাড়না সত্ত্বেও তার সাহিত্য সাধনা মৌন মন্থর গতিতে এগুচ্ছিল। সারাদিন বেড়িয়ে রাতের অন্ধকারে লেখায় ডুবে যেত, এমন-কি চাকরিরত অবস্থাতেও লেখার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথম প্রথম কবিতা লিখত কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিতা লেখার ধৈর্য তার রইল না। নিজের রুচি ও পছন্দমত গল্প লিখত। বারবার কাটত, আবার লিখত। নতুন শব্দ ও নতুন কথা সংযোজনের প্রতি তীব্র অনুরাগবশত লেখা সে কোনোদিনই ছাড়েনি। কবিতার ছন্দ মেলাবার ব্যর্থ হয়রানি তাকে কবিতা লেখা থেকে বিমুখ করে। কোনো কবিতাই সে সম্পূর্ণ করেনি। 'অমিত্রাক্ষরে' একটি ছোট কবিতা লিখেছিল, যার প্রথম লাইনটি হল–'ফুলবনে লেগেছে আগুন।' কবিতাটিতে সে সুপ্রভা এবং ইন্দ্রা নামে দুই নায়িকার মনোভাব বিশ্লেষণ করেছিল। সুপ্রভার বিষপানে মৃত্যু হয় এবং এই পরাজয়ের মধ্যে দিয়েই তার জয় হয়। সে যুগে শরতের মতো দিশাহারা ভাবুক যুবকের কাছে এর বেশি আর কী আশা করা যায়? সে যুগ তো রবীন্দ্রযুগ। তাই যুগোপযোগী কবিতাই রচনা করতে চেয়েছিল। শরতের মতোই আনাতোলে ফ্রাঁসের মতো বিশ্বের অনেক সাহিত্যিক প্রথম প্রথম কবিতা লিখতে প্রয়াসী হন। শেষ পর্যন্ত শরৎ কবি হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু গদ্য রচনার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে যেন তাব কবি মনই কথা কয়েছে।

সে সময় শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ইংরেজির প্রতি এমন অনুরাগ ছিল যেমন একদিন ল্যাটিনের প্রতি ইংলন্ডের ছিল। সে সময়ের বাঙালীরা চিঠিপত্রও ইংরেজিতে লিখত। শরৎ এ প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে। ইংরেজিতে চিঠি লেখা যেমন পছন্দ করত না, তেমনি অন্য কাউকে লেখার উৎসাহ জোগাত না। তরুণ মামাদের মনে বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগ শরতের জন্যই জন্মায়। এরা সবাই মিলে বাংলাভাষায় হস্তলিখিত 'শিশু' নামে সচিত্র মাসিক পত্রিকা বের করে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিল দশ বছরের শিশুমামা গিরীন্দ্রনাথ। এর প্রধান লেখক এবং পৃষ্ঠপোষক ছিল স্বয়ং শরৎ। গিরীন্দ্রনাথের হাতের লেখা বড়ই সুন্দব ও স্পষ্ট ছিল। পত্রিকাটির বাংলা ও ইংরেজি কবিতাগুলি শিশুদের অনুরূপই ছিল। বাঁদরের সংগে ছন্দ মিলিয়ে চাদরের তুলনা ছিল তার চরম উপলব্ধি।

বাঁদর বাঁদর
ছিঁড়ল কেন চাদর।
বাঁদর রুপি রুপি
পরেছিস কেন টুপি।
বাঁদর বাঁদর কেন
খেয়েছিস ফেন।
রামসিংহ ছটকে
পড়ল ডোবায় পটকে।
লোক রতনে
করলে যতনে
রাম সিংহ গেল মরে।।

ইংরেজি কবিতাও প্রায় এরকমই ছিল।

এ লায়ন কিল্ড এ মাউস
দেন ওয়েন্ট টু হিজ হাউস।
নাউ ক্রাইড হিজ মাদার
অ্যান্ড দেয়ারফোর ক্রাইড হিজ সিস্টার।

এধরনের কাজে তখনকার দিনে কেউ উৎসাহ দিতেন না। 'শিশু' পত্রিকাটির কয়েকটা সংখ্যা যথাক্রমে ছাপা হল, কিন্তু গাঙ্গুলী পরিবারে সাহিত্য-প্রেম তবুও জাগল না। অধ্যাপকেরাও বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এসব করে কি হবে? এর চেয়ে ভালো করে ইংরেজিটা শিখে নাও।' 'শিশু' পত্রিকাটিতে শরতের কয়েকটি রচনা ছাপা হয়। 'বোঝা' গল্পটি শরৎ তার প্রিয় মামা সুরেন্দ্রনাথের নামে ছাপে। সে সময় সে ভাগলপুরে ছিল না।[1] ফিরে এসে শোনে যে সে নাকি ভালো গল্প লিখতে পারে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি গল্প লিখতে পারি!' বন্ধুরা বলল, 'বাঃ, তোর "বোঝা" গল্পটি তো ভারি চমৎকার।' সুরেন্দ্রও 'বোঝা' গল্পটি পড়ে বুঝল এ শরতেরই কীর্তি। তবুও জিজ্ঞেস করল, 'এ সব কি? নিজের গল্প আমার নামে কেন ছাপিয়েছিস?'

শরৎ হেসে জবাব দিল, 'ছাপিয়েছি তাতে তোর কোনো ক্ষতি হয়েছে?'

এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রবৃত্তি শরতের কতখানি ছিল। পড়াশোনাও লুকিয়ে সবার চোখ এড়িয়ে করতে ভালোবাসত। উপন্যাস ছাড়াও বহু বিজ্ঞান বিষয়ক বই তার পড়া ছিল। ডিকেন্স, থ্যাকারে ও শ্রীমতী হেনরি উড তার প্রিয় লেখক ছিল। এই সময়েই 'শুভদা'[2] উপন্যাসটি লুকিয়ে লিখেছিল। উপন্যাসখানিতে নিজের বাড়ির চরম দারিদ্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, দৈন্য, হতাশা 'শুভদা'তে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া এ ধরনের উপন্যাস লেখা সম্ভবপর নয়।

শরৎ একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে তোলে[3]। কিন্তু কোন কারণে গোষ্ঠীর সাহিত্যিক কর্মতৎপরতা শিথিল হয়ে পড়ে। শরৎ এই গোষ্ঠীর পুনর্জন্ম দেয়। প্রধান পদে শরৎ নিযুক্ত হয়, আর সদস্যগণের মধ্যে ছিল মামা সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও বন্ধু যোগেশ মজুমদার ও বিভূতিভূষণ ভট্ট। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য বাইরে থাকার জন্য পরে এই গোষ্ঠীতে যোগ দেয়। বিভূতিভূষণের বোন নিরুপমা দেবীও এই গোষ্ঠীর সদস্যা ছিল। বাল্যবিধবা নিরুপমা তখনকার দিনে সংকীর্ণতা এবং গোঁড়ামির জন্য প্রত্যক্ষরূপে এই সভায় যোগ দেবার অধিকারিণী ছিল না। যে-যুগে ছেলেরাই যখন লুকিয়ে চুরিয়ে সাহিত্য করত, সে যুগে মেয়েদের যোগদানের প্রশ্ন তো অবান্তর। কিন্তু তবুও নিরুপমা লিখত এবং ভায়ের সাহায্যে তার লেখা বিচারার্থে গোষ্ঠীতে পাঠাত। সেদিন হয়তো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, এই ছোট্ট সাহিত্যিক গোষ্ঠী থেকে ভবিষ্যতের অনেক সার্থক সাহিত্যিক জন্ম নেবে। যে সময় সাহিত্যাকাশে রবীন্দ্রনাথ সূর্যের মতো প্রকাশমান, সে সময় এরা লুকিয়ে চুরিয়ে পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাকে সত্যে পরিণত করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেক বছর পরে[4] শরৎ গিরীন্দ্র মামাকে লিখেছিল,'-আমার দুঃখপূর্ণ জীবনের সুখের স্মৃতি শুধু এই সাহিত্যসভা। বাড়ির সবাই যখন আমাকে খুঁজতেন, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যেতেন, তখন কিন্তু আমি লুকিয়ে সাহিত্য চর্চায় মগ্ন থাকতুম। কি জানি কেন, সেদিনগুলোর কথা একদম ভুলতে পারিনি।'

বিভূতি ও নিরুপমা সাবজজ শ্রীনফর ভট্টের সন্তান ছিলেন। প্রতিষ্ঠিত এই পরিবারের সঙ্গে শরতের পরিচয় হয় নিরুপমার মেজভাই ইন্দুভূষণের মাধ্যমে। কলেজে একসঙ্গেই পড়ত। ইন্দুভূষণের সাহায্যে বিভূতি আর নিরুপমার লেখা শরতের কাছে পৌঁছত, আবার শরতের লেখাও এবাড়িতে এসে পৌঁছত।

ভট্ট পরিবারের বাড়ির কাছে পশ্চিমদিকে বিরাট একটা গোরস্থান ছিল। কোনো কোনো দিন গভীর রাতে গোরস্থান থেকে গানের মূর্ছনা হাওয়ার তরঙ্গে ভেসে এবাড়িতে এসে পৌঁছত-

'আমি দুদিন আসিনি, দুদিন দেখিনি
অমনি মুদিলি আঁখি।'

১. ১৮৯৮
২. রচনাকাল ২০ জুন,১৮৯৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর,১৮৯৮
৩. ৪ আগস্ট,১৯০০ শনিবার।
৪. ১৮ মার্চ,১৯১৩

কখনও কখনও নদীর ধার থেকে বাঁশির মিষ্টি সুর শোনা যেত। 'চরিত্রহীনে' সতীশ যখন রেলগাড়িতে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল, তখন যেন পৃথিবীর বুকে ঘুমিয়ে পড়া জ্যোৎস্নার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আর উপেন্দ্রও হাই তুলে ঘুম জড়ানো স্বরে বলেছিল, 'নাঃ, যদি শিখতে হয় তো সানাই বাজাতে শিখব।' ইন্দুভূষণও গান ভালোবাসত তাই শরতের সঙ্গে সৌহার্দ্য বেড়ে ওঠে। প্রায়ই সে শরতের কাছে গান শুনত। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের এই গানটি তার বড়ই প্রিয় ছিল—'গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল, আঁধার আজি কুঞ্জবন।' ভট্টপরিবারে সম্পন্নতা ও আভিজাত্যের অহংকার ছিল না তাই অনায়াসে এ বাড়ির প্রত্যেকের কাছ থেকে শরৎ অত্যন্ত আদর ও ভালোবাসা পায়।

বাড়ির বাইরে যতই শিথিলতা থাকুক অন্দরমহলে কিন্তু কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ছিল। এ বাড়িতে দাবাখেলার বেশ রেওয়াজ ছিল আর তার সঙ্গে সঙ্গে চা, পান, তামাক সবই চলত। ইন্দুভূষণ ও শরৎ এই খেলায় বেশ পটু ছিল। বিভূতি বয়সে এদের থেকে ছোট ছিল। শরতের সঙ্গে বিভূতির বন্ধুত্বের কাহিনীটি বেশ কৌতুককর। বড় ভাই বিভূতির কবিতার খাতাখানি শরৎকে পড়তে দিয়েছিল। একদিন বিভূতির সামনেই শরৎ কবিতার খাতা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'কী লেখা এ-সব? খালি অনুবাদ তাও এত ভুল? নিজের লেখা কিছু নেই তোমার কাছে?'

বিভূতি খানিকটা অবাক, দুঃখিত হয়েছিল এ কথায়; কিন্তু তখন যে বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়, মৃত্যু পর্যন্ত তা ভঙ্গ করতে পারেনি। শরতের মতো বিভূতিরও পড়াশোনার শখ ছিল। পাশ্চাত্য দর্শন পড়ে বিভূতির মনে হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা প্রোটোপ্লাজম। তখনকার দিনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যুবকদের মদ্যপানের মতোই প্রগতির সূচক মনে করা হত। শরৎ নিজেও এপথেরই পথিক। বিভূতি যেমন মেধাবী, তেমনই বন্ধুবৎসল ছিল। হয়তো এ কারণেই শরৎ ও বিভূতির মধ্যে ছিল এত ভাব।

তখনকার দিনে সাহিত্যচর্চা আজকালকার মতো খোলাখুলিভাবে হত না। অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে একাজ তাদের করতে হত। সপ্তাহে একদিন কোনো নির্জন স্থানে তারা সবাই এক হত। তারপর হয়তো সরকারী স্কুলের পাশের বড় নালাটায় পা ঝুলিয়ে বসে প্রবন্ধ পাঠ বা আলোচনা করত, অথবা কোনোদিন কোনো মাঠে গাছতলায় বসে বা উঁচু কোনো মাটির ঢিবির উপর বসে এই তরুণেরা অন্তরের বিদ্রোহ প্রকাশ করত। গোরস্থানও এ থেকে বাদ পড়েনি। শরতের নেতৃত্বে না জানি কতবার অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাতে সবাই মিলে এই গোরস্থানে বসে তার গান শুনত। ভট্টপরিবারের বাড়ির পাশে যে গোরস্থান ছিল, তাতে বেশ বড় একটা মকবরা ছিল। মাঠের মতো বিরাট তার ছাত। একটি চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলে পৃথিবীর চোখে তারা অদৃশ্য হয়ে যেত। আড্ডা জমাবার উৎকৃষ্ট জায়গা ছিল এটি।

একবার সুরেন্দ্র ছাতে উঠে একেবারে অবাক হয়ে যায়। বসন্তকাল। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যারাতে গোরস্থানের বিরাট ছাত জ্যোৎস্নায় আলোকিত। গঙ্গার উত্তরে হাওয়া বয়ে আসছিল। তারই মধ্যে মাদুর বিছিয়ে এক এক দল এক এক কাজে ব্যস্ত। কেউ নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে, কেউ হারমোনিয়াম নিয়ে সংগীতচর্চায় ব্যস্ত। কেউ আবার সাহিত্য সাধনায় বিভোর। এরই মধ্যে চা ও জলখাবার আসত। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তামাকের গুড় গুড় আওয়াজ ও সিগারেটের ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠত।

এই সাহিত্য-গোষ্ঠী পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শরতের উপর ছিল। কোনো রচনা নির্বাচনের ভারও ছিল তার উপরেই। সদস্যেরা সাত দিনের ভিতর নিজেদের লেখা এনে সভায় শোনাত। প্রত্যেকটি রচনা সম্বন্ধে বিচার পরামর্শ সভাপতি শরৎ স্বয়ং করত। লেখার ভুল সংশোধন করে নম্বর দিত। কবিতা লেখায় সবার প্রথম ছিল নিরুপমা। অনেকে তাকে হিংসে করত। লোকেরা কানাকানি করত যে, নিরুপমার প্রতি শরতের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে। অথচ নিরুপমার সঙ্গে শরতের কোনো সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। নিরুপমাও দাদার বন্ধু হিসেবেই শরৎকে শ্রদ্ধা করত। শরৎ কিন্তু খুব উৎসাহ নিয়ে নিরুপমার কবিতাগুলি দেখত

এবং ভাব ও আবেগের যে কৃপণতা বা অভাব সে কথা বিভূতিকে বলেছিল, 'একই ভাব বারবার না লিখে বুড়ি যদি চিন্তা করে অন্য ধরনের কবিতা লেখে তাহলে উন্নতি করতে পারে।' শরতের এই অভিযোগকে বিভূতি কবিতায় বদল করে নিরুপমাকে শোনাল,

'আরো যাও, আরো যাও দূরে
থামিও না আপনার সুরে।'

নিরুপমা অবশ্য এরকম অভিযোগে প্রেরণা ও উৎসাহই পেয়েছিল। শরৎকে খুশি করার জন্য সে আরও পরিশ্রম সহকারে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করে। শরৎ কবিতাগুলির চতুর্দিকে কাটাকাটি করে অনেক কিছু বদলে দিত। একদিন শরৎ বিভূতিকে বলল, 'বুড়ি যদি চেষ্টা করে, তাহলে গদ্যও লিখতে পারবে।'

নিরুপমার অবশ্য বিশ্বাস হয়নি যে, সে কোনোদিন গল্পও লিখতে পারবে। শরতের সব লেখাই সে অভিভূত হয়ে পড়ত, এবং দু-তিন বছরের ভিতর সে শরতের লেখা 'বাসা,'[1] 'বোঝা', 'কোরেলগ্রাম,'[2] 'অনুপমার প্রেম', 'কাশীনাথ', 'চন্দ্রনাথ', 'শিশু' (বড়দিদি), 'হরিচরণ', 'বাল্যস্মৃতি', 'শুভদা' এবং 'দেবদাস' সব পড়ে ফেলেছিল। কিছুদিন আগে মেজবৌদি তাকে একটা বড় খাতা দিয়েছিলেন। খাতাটিতে অতিসুন্দর হরফে লেখা ছিল 'অভিমান'।[3] এটি শরৎকৃত মিসেস হেনরি উডের 'ইস্টলীনে'র ছায়ানুবাদ। শরতের মনে মনে অভিমানের যে ঝড় তাকে ক্ষতবিক্ষত করছিল, সেই আবেগেই সে এটি অনুবাদ করে। বইখানি পড়ে নিরুপমা মুগ্ধ হয়ে যায়।

ঠিক এই সময়েই শরৎ মেরী কোরেলির উপন্যাস 'মাইটি এ্যাটম'-এর অনুবাদ 'পাষাণ' নামে শুরু করেছিল। এ বইখানিও নিরুপমা পড়ে। বইটিতে একজন পরমাণুবাদী নাস্তিক পিতার সন্তানের মানসিক সংঘাতের যে যন্ত্রণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তা নিরুপমাকে অভিভূত করে তোলে। এভাবে শরতের লেখার প্রভাব অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাকে গদ্য রচনার প্রতি প্রেরণা জোগায়।

১৪

এই সময় নিরুপমার অন্তরঙ্গ বান্ধবী, সুপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুরূপার সম্পর্কীয় ভাই সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরে পড়তে আসত। সৌরীন্দ্র ছিল বিভূতির সহপাঠী, দুজনে ভাবও খুব। প্রায়ই পরস্পরের বাড়ি যাওয়া-আসা চলত। ক্রিকেট খেলাও পুরোদমে চলত। একদিন[4] সৌরীন্দ্রর হাতে চোট লাগে। খেলা তার পক্ষে অসম্ভব। বিভূতি তার হাতে একটা খাতা দিয়ে বলল, 'নে, তুই বরং বসে বসে এই গল্পগুলো পড়।' খাতাখানি খুলে সৌরীন্দ্র অবাক হয়ে দেখে যে, প্রথম পাতায় মুক্তাক্ষরে লেখা 'বাগান' আর অন্য পাতাতে ইংরেজিতে লেখা নামের প্রথমাক্ষর, এস-টি, সি, ন্যারা। এস-টি মানে শরৎচন্দ্র, সি, মানে চট্টোপাধ্যায় আর ন্যারা মানে ন্যাড়া। খাতার লেখা গল্পগুলি পড়ে নিরুপমার মতো সৌরীন্দ্রও মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শরতের সঙ্গে তখনও তার পরিচয় হয়নি। প্রায় একমাস বাদে নিরুপমার কোনো ব্রত উপলক্ষ্যে বাড়িতে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সৌরীন্দ্রও সেখানে নিমন্ত্রিত। গিয়ে দেখে যে বৈঠকখানায় একটা বড় টেবিলের সামনের একটা চেয়ারে অতি ক্ষীণকায় একজন বসে। যেন বহুদিনের রুগী। মাথায় অবিন্যস্ত রুক্ষ স্বল্প লম্বা চুল, এলোমেলো একটু দাড়ি। সামনে মোটা একটা বই খুলে তন্ময় হয়ে পড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে মাথায় হাত বুলিয়ে কি জানি ভাবছে।

১. শরৎ এটি স্বয়ং নষ্ট করে দেয়।
২. পরবর্তীকালে এটি আবার লেখা হয় এবং 'ছবি' নামে প্রকাশিত হয়।
৩. এটি শরতের বাল্যসখা কেদারনাথের কাছে ছিল। রচনাকাল—১৮৯৮-৯৯।
৪. ১৮৯৯ – এর শেষ দিকে।

সৌরীন্দ্র অবাক হয়ে বসলে পরে বিভূতি ডাকল, 'শরৎদা।' হঠাৎ শরৎ বিভূতির দিকে চাইলে, বিভূতি বলল, 'শরৎদা, এই আমার বন্ধু সৌরীন্দ্র। দারুণ রৈবিক অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। তোমার গল্প পড়ে সেদিন কিন্তু সৌরীন্দ্র সমালোচনা করেছিল।' সৌরীন্দ্রর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল শরৎ। দীপ্তিময় তীক্ষ্ণ সে দৃষ্টির প্রতি মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হয়। সৌরীন্দ্র সংকুচিত ও লজ্জিত হল।

শরৎ সৌরীন্দ্রকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি গল্প লেখ?'

সৌরীন্দ্র বলল, 'না।'

বিভূতি বলল; 'সৌরীন্দ্র কিন্তু বেশ ভালো কবিতা লেখে।'

শরতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে বসে সৌরীন্দ্র অস্বস্তি বোধ করছিল, একটু অনামনস্কও হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি গল্প লেখ না কেন?'

সৌরীন্দ্র বলল, 'লিখতে পারি না তাই লিখি না।'

শরৎ বলল, 'এ কেমন করে হয়? পদ্য লিখতে পারো আর গল্প লিখতে পারো না? একটু চেষ্টা করেই দেখো না। গল্প কেমন হয় বা কাকে গল্প বলা হয়, এ জ্ঞান তো তোমার আছে। বিভূতির কাছে আমার গল্পের যে সমালোচনা তুমি করেছ, সে আমি শুনেছি এবং এও বুঝেছি যে, গল্প সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান বেশ গভীর। তুমি গল্প লেখো। অন্তত চেষ্টা করো।'

নিমেষের মধ্যে সৌরীন্দ্রর সকল লজ্জা, সংকোচ কেটে গেল, বলল, 'লিখব।' ক্রমশ দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি হত। শরৎচন্দ্র 'শিশু' (বড়দিদি) গল্পের শেষের দুলাইন এ ভাবে লিখেছিল, 'পরলোকে সুরেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে মাধবীকে একটু স্থান দিও ভগবান।' সৌরীন্দ্রমোহন আপত্তি করে বলেছিলেন, 'তুমি লেখক, কোন চরিত্রের উপর তোমার এতখানি মমতা থাকা উচিত নয়।'

এই কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে ভারি তর্ক হয়। শরৎ কিছুতেই সৌরীন্দ্রমোহনের কথা মানতে রাজী হয়নি। কিন্তু সে ঘটনার প্রায় দু মাস পরে সে বলেছিল, 'তুমি শুনে খুশি হবে সৌরীন্দ্র, শেষের ওই দুটো লাইন আমি কেটে দিয়েছি।'

ভাগলপুরে বেশিদিন সৌরীন্দ্রমোহনের থাকা হয়নি। পরের বছরেই সে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল,[১] যাবার সময়ে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্প নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সেই রচনাগুলিও ক্রমশ ছাত্র সমিতিতে পড়া হয়। ছাত্র সমিতির সদস্যরা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া এত সুন্দর গল্প আর কেউ লিখতে পারে না।' এই সাহিত্য-গোষ্ঠীর আর একজন সদস্য ছিলেন সতীশচন্দ্র মিত্র। একদিন একটি বাঁধানো খাতার (মাসিক পত্রিকা আকারে) উপর নাম দেন তিনি 'আলো'। তার নীচে সম্পাদকের স্থানে লেখেন, সতীশচন্দ্র মিত্র ও যোগেশচন্দ্র মজুমদার। এ পরামর্শ যেহেতু শরৎ দিয়েছিল, তাই খাতার পাতাগুলি ভরার ভার তার উপরেই পড়ে। তার বিশ্বাস ছিল যে, সাহিত্যরসিক বন্ধু-বান্ধবদের উৎসাহ পেয়ে এই পত্রিকাখানি দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। প্রায় পনেরো দিনের মাথায় সতীশচন্দ্র মারা যান। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে বন্ধুরা খুবই বেদনা পেয়েছিল, তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য একটা কিছু করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। গিরীন্দ্র প্রস্তাব দেয় যে, পত্রিকাখানিই 'ছায়া' নাম দিয়ে আবার ছাপা হোক। গিরীন্দ্রের প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়।[২] সম্পাদক হন যোগেশচন্দ্র মজুমদার। কিন্তু তাঁকে তুষ্ট করা খুব শক্ত ব্যাপার। বিভূতিভূষণ তাঁর সম্বন্ধে কবিতা লিখে ফেলল,

এই কুঞ্চিত কেশ, মার্জিত বেশ, ক্রিটিক যোগেশ ক্রুদ্ধ
বলে দীনতার ছবি এই সব কবি কারাগারে হবি বন্ধ।

এ পত্রিকার জন্য শরৎ কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছিল। 'ক্ষুদ্রের গৌরব'[৩], নামে একটি প্রবন্ধ

---

১. ১৯০১

২. ২৩ এপ্রিল, সোমবার ১৯০০

৩. এতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর ছাপ আছে। জুলাই, ১৯০১

এবং 'আলো ও ছায়া' নামে একটি লঘু উপন্যাস এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

লেখক বেশ-কয়েকজন ছিল কিন্তু লেখিকা কেবল একজনই ছিল, অন্তঃপুরচারিণী বিধবা নিরুপমা। তার লেখা এই পত্রিকায় 'শ্রী দেবী'র নামে প্রকাশিত হয়। সে-সময় কবিতা ছাড়াও সে গদ্য লিখতে আরম্ভ করে। কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ওদিকে সৌরীন্দ্র কলকাতায় 'তরণী' নামে একটি পত্রিকা বের করে। সম্পর্কে শরতের মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার বন্ধু ছিল। দুটি পত্রিকার মধ্যে ডাকযোগে আদান-প্রদান হত। একে অপরের খুব সমালোচনা করত। 'ছায়া' দলের সদস্যরা একটি বোর্ড তৈরি করেছিল, যাদের কাজ ছিল 'তরণীর' সব লেখা পড়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা লেখা। তারপর সম্পাদক মশাই এমন কৌশলে তার সম্পাদনা করতেন যে, গল্প বা প্রবন্ধের মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু বিষটুকু থেকে যেত। অবশ্য 'তরণী'র তরফ থেকেও সেরকমই তেতো জবাব আসত। কেউ কাউকে এতটুকু খাতির করত না। কিন্তু শরৎ এ-সব ব্যাপারে রস পেত না, ক্রমাগত লেখাই তার মুখ্য কাজ ছিল।

১৫

এমন একটা সময় আসে যখন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভীপ্সা মূর্ত রূপ নিতে শুরু করে। যদি কোনোরকম বাধা পথরোধ করে দাঁড়ায়, তাহলে অভিব্যক্তির অন্য পথ সে খুঁজে নেয়। ঠিক এইরকমই এক পরিস্থিতিতে শরতের জীবন চরম উপেক্ষা ও অনন্ত আশার আলোছায়ায় কাটছিল। না ছিল সাধ্য, না ছিল স্নেহময় হাতের বরাভয়। সহানুভূতি ও প্রেরণার অমৃত বাণী শোনাবারও কেউ ছিল না, মায়ের মৃত্যুর পর জীবনে মধুর বলতে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু শরতের নিজের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যার ফলে অতিশয় ভাবপ্রবণতা থাকা সত্ত্বেও জীবনে কোথাও তাকে হার মানতে দেয়নি। নিজের রাগ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, অভাব ও আদর্শের অভিব্যক্তির পথ সে খুঁজে পেয়েছিল এবং সেটুকুই তার মনে জুগিয়েছিল বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছাশক্তি। সৃষ্টিকার্যের এই দিনগুলিতে সে প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে ছিল। এ-বয়সে প্রায় সব তরুণদের মনই প্রেমের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। নানান ধরনের ভাবনা চিন্তায় মন ও মস্তিষ্কে আলোড়ন ওঠে। কত বৈচিত্র্য ও কতই বা বিরোধাভাস! রক্ত-মাংসের প্রেমিকা না থাকলেও কাল্পনিক প্রেমিকার সঙ্গেও সে ভূমিকা পালন করা যায়। একদিন সুরেন্দ্রমামার সঙ্গে শরৎ তার বাড়ি গিয়েছিল, কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে এ বাড়িরই একজন ছিল, সবই চেনা, গল্প আর শেষ হয় না। বেশ রাত হয়ে গেলে সুরেন্দ্র বলেছিল, 'চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' পথ চলতে চলতে আবার গল্পে মেতে উঠল, শেষ পর্যন্ত শরৎ বলল, 'চল মামা, আমি তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।'

আর সেদিন সেই রাত দুজনের পথে পথেই কেটে যায়। সেদিন যেন শরতের সরস্বতী জিহ্বায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। কথায় কথায় শরৎ বলেছিল, 'সত্যি আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি।'

সুরেন্দ্র অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ, তোমার কাছে কোনোদিন কিছু লুকিয়েছি নাকি?'

'সে কে?'

'না, না, সে কথা বলব না।'

'বেশ, তার নাম কি তাই বল?'

'তার নাম, নীরদা।'

শরৎ সেদিন এ-ও বলেছিল যে, একবার কোনো কাজে বেনিলি রাজ্যে তাকে যেতে হয়। পথেই সে নীরদার প্রেমে পড়ে। এ গল্প যেন সেই 'ঠাকুরমার ঝুলি'র রাজকুমারের। পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে শরৎ রাতের অন্ধকারে সাঁওতাল পরগনার দিকে পাড়ি দিত, তার প্রেমিকা যে

সেখানে থাকে। তার মনে সর্বদা একটাই চিন্তা—নীরদা রাত জেগে তার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। হঠাৎ সে ঘোড়াসুদ্ধ নদীতে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা বলে কি সে থেমেছিল নাকি? ভিজে কাপড়ে বায়ুবেগে সে উড়ে গিয়েছিল।

সুরেন্দ্র ভারি অবাক্ হয়ে এই গল্প শুনছিল। নীরদাকে সে কোনোদিন দেখেনি। কেউ তাকে দেখেনি। তবে এ নিয়ে অনেকেই বলাবলি করত। কেউ কেউ বলত, শরৎ নাকি একটি ইহুদি মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছে। অনেকে নাকি নানান জায়গায় সেই মেয়েটির সঙ্গে তাকে একান্তে কথা বলতে, ও বাঁশি বাজাতে দেখেছে। কিন্তু বড় আশ্চর্যের কথা যে, এ দৃশ্য একে অন্যকে কোনোদিনই দেখাতে পারেনি। তার প্রেম এত মৌন, এত রহস্যময় ছিল যে, তার তাপটুকু অন্যে স্পর্শ করতে পারত কিন্তু তার রূপ কোনোদিন চোখে দেখা যেত না। কল্পনার রাজ্যে অতি সংগোপনে নীরদা এমনভাবে তার কাছে আসত, যেন ঘুমের ঘোরে চলছে। শরৎ লিখত, সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখত, বলত না কিছুই। এ নীরবতা যখন শরতের অসহ্য হয়ে উঠত, তখন হঠাৎ নীরদা কাছে এসে বসে বলত, 'কি লিখেছ শোনাও তো?' শরৎ তাকে পড়ে পড়ে শোনাত, জোরে জোরে তার নিশ্বাস ওঠা-পড়া করত। নীরদা মৃদু হেসে অভাগার কাঁধে নিজের মাথাটি রাখত। তখন তাকে তন্ময় হয়ে বাঁশি শুনিয়ে সে মুগ্ধ করে দিত। কখনও কখনও বা তার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যেত। নীরদা তাকে খুঁজতে বেরুত। খুঁজে পেতে ধরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সবচেয়ে ভালো বিছানায় শোবার ব্যবস্থা করে দিত। তার জন্য নিজের হাতে তামাক সেজে দিত, সন্দেশ তৈরি করে খাওয়াত। তারপর খাটের পাশেই মাটিতে মাদুর পেতে শুয়ে তার কথা শুনত, অন্তহীন কল্পনা রাজ্যের কথা....। কখনও বা অভিমান করে নীরদা উঠে চলে যেত। বলত, 'তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তুমি তো কিছুই করো না।'

'আমি .... আমি .... স্রষ্টা। একদিন ....'

'স্রষ্টা!' সে হেসে ফেলত, 'স্রষ্টা খিদের যন্ত্রণায় মরে। বখাটে, চরিত্রহীন, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে কেমন করে হতে পারে? বংশ মর্যাদার কথাও তো....।'

'বংশ মর্যাদা? বংশ মর্যাদায় আমি বিশ্বাসী নই। লোক-দেখানো বংশ মর্যাদার দোহাই দিয়ে দুটো প্রাণ তুমি নষ্ট করতে পার না।' তারপর রেগে গিয়ে বলত, 'তুমি একথা কেমন করে বলতে পারলে? তুমি এত আত্মাভিমানী তা তো জানতাম না। আমি তোমায় চাই না, একেবারেই চাই না, তোমার যা ইচ্ছে হয় করো....।' 'রাগ করলে? আমি জানি তুমি আমায় ভালোবাস না, আমি চাইও না যে কেউ আমায় ভালোবাসুক। শুধু আমিই তোমায় ভালোবাসতে চাই....।' নীরদার সঙ্গে এইরকমভাবে তার মান-অভিমানের পালা চলত। কিন্তু কবে ও কখন তা কেউ জানত না। সবাই শুধু একটা কথাই জানত যে, শরৎ দুশ্চরিত্র। এই নীরদা ছেলেবেলার বন্ধু ধীরুও হতে পারে। কত গল্পই বা এই নামটির সঙ্গে যোগ হয়ে গিয়েছে। শোনা যায়, শরৎকে বিয়ে করার জন্য সে পাগল ছিল। আবার একথাও শোনা যায় যে, বিধবা হওয়ার পর শরতের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

গল্প আর গল্প, আসল সত্য কোনোদিনই ধরা পড়েনি। কিন্তু ধীরুর কথা থাক্, নীরদার আর একটা নাম রাজলক্ষ্মীও হতে পারে, আবার নিরুপমাও নীরদা হতে পারে। সেও তো শরতের লেখা পড়ে অভিভূত হয়ে যেত, শরৎও তার লেখা কবিতার প্রশংসা করত। এই প্রশংসার মাধ্যমে মনে মনে প্রেমের অঙ্কুর সব বাধা বিঘ্ন ঠেলে হয়তো জেগে উঠেছিল। একদিন বাড়িতে সে একাই ছিল। বাইরের বৈঠকখানায় শরৎ বসে ছিল। প্রায় সে সেখানে বসে লিখত বা পড়ত। সারাদিনে বেশির ভাগ সময়ই তার সেখানে কাটত। সেদিন হঠাৎ সে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল 'এই, কেমন আছ?'

অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা বিধবা মেয়েটি হঠাৎ শরৎকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। সেই একটি ক্ষণে যেন সহস্র যুগ একসঙ্গে সমাহিত হয়ে গিয়েছিল। কোনরকমে সাহস সঞ্চয় করে বলেছিল, 'তুমি এখান থেকে চলে যাও। এখানে আসা তোমার উচিত হয়নি।'

'বুড়ি……'

'……'

'. . . .'

'যাও, তা না হলে……'

শরৎ মাথা নিচু করে সেখান থেকে চলে এসেছিল। এ ঘটনার দরুন নিরুপমা তাকে ক্ষমা করেনি। নিজের দাদার কাছে অভিযোগ করে বলেছিল, 'তোমার বন্ধু কেমন লোক? বাড়িতে কেউ নেই, তবু সে আমার সংগে কথা বলার জন্য এসেছিল।'

দাদা শরতের সতীর্থ। সে ভেবেছিল, দরিদ্র নিরীহ ও তৎকালীন মানদণ্ডে, দুঃসাহসী, অমিতাচারী শরতের এ সাহস কেমন করে কোথা থেকে এল? কি হবে তাহলে নীতিপরায়ণ সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই বিধবা মেয়েটির……? কিন্তু এদের দুজনের কি বিবাহ হতে পারে না? না, না, না, এ বড়ই দুঃসাহসের কাজ। সে-যুগে যদিও বিধবা-বিবাহের জন্য প্রচুর আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু সমাজ তা স্বীকার করেনি। তা হলে এ-প্রস্তাব কেমনভাবে স্বীকৃত হবে? হয়তো এ কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। সব-কিছুই উর্বর কল্পনালোকে ঘটেছিল, অথবা…. সে যাই হোক, যৌবনের সেই প্রথম প্রেম তার ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে তার অন্তরে লীন হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের জন্য।

যদিও নিরুপমা তার লেখা পড়ে অভিভূত হয়েছিল কিন্তু তৎকালীন সামাজিক কঠোরতার মধ্যে তার মনের কথা জানার কোনো উপায় ছিল না। জানার চেষ্টাও হয়ত অপমানজনক মনে করা যেতে পারত। সমাজপতিরা মাথা উঁচু করে নির্মম স্বরে হয়তো বলত, 'তুমি উচ্চকুলের বিধবাকে অসম্মান করতে চাও। যে মেয়ে পরপুরুষের ছায়া পর্যন্ত দেখেনি, সে কেমন করে প্রেম করতে পারে? এ কথা ভাবাও যে পাপ।'

কিন্তু একতরফা প্রেম, সে-ও তো কম শক্তিশালী নয়। আপনার মাঝেই সে চিরমধুর। সফলতাই প্রেমের একমাত্র পরিচয় নয়। মনে মনে কারুর জন্য নিজেকে বিসর্জন দেওয়া যায় না কি? এই বেদনাকে স্নেহ বল, প্রেম বল, বয়সের দোষ বা, যাই বল-না কেন, প্রেমের অস্তিত্বকে, এ কথা বলে অস্বীকার করা যায় না। তাতে প্রেমের প্রচণ্ড তৃষ্ণা, কিন্তু তৃপ্তির কোনো পথ খোলা নেই। এই অতৃপ্তি বেদনা হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শরতের অন্তরে সমাহিত হয়ে গিয়েছিল। তার অভিব্যক্তি 'দেবদাস' 'বড়দিদি'তে দেখতে পাই। এই উপন্যাস দুটিতে অসফল প্রেমের সেই ব্যথাই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। নীরদা হোক বা নিরুপমা, 'দেবদাসে'র পারু হোক বা 'বড়দিদি'র মাধবী, সবাই এক ব্যর্থ প্রেমের প্রতিমা। নিরুপমা তাকে চলে যেতে বলেছিল, সুরেন্দ্রনাথ আসতে মাধবীও ছোটবোন প্রমীলাকে বলেছিল, 'প্রমীলা, মাস্টার মশাইকে বাহিরে যাইতে বলো।'

মাধবী কিন্তু নিরুপমার মতো অত নির্মম নয়। সে যেতে বলেছে কিন্তু মিষ্ট ভাবে মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে ঘরের এককোণে সরে গিয়ে। পরে লজ্জা পেয়ে সুরেন্দ্রনাথের আদর-যত্ন একটু আলগা করে দিয়েছিল।

এ-সব উপন্যাসের কথা হলেও ভিত্তিহীন নয়। শরতের অভিজ্ঞতার যথার্থতায় আধারিত।

অনেক বছর পর অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধা কবি রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন, 'যদি কোনোদিন সম্ভব হয় তোমায় একটা গল্প শোনাব। শুনে গল্পের মতই অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বাস্তব সত্য আমার জীবনে আর কিছু নেই।'

এই গল্প কি নিরুপমার গল্প নয়? এর যথার্থতা জানার কোনো পথই আজ আর খোলা নেই। কিন্তু এটুকু সবাই জানে, প্রেমে অকৃতকার্য হয়ে শরৎ আত্মহত্যাও করতে পারেনি, সন্ন্যাসী হতেও পারেনি কিন্তু স্রষ্টা হবার পথ নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছিল। জীবনের মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত করার পথ তার সামনে উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। নীরদা বা নিরুপমার সংগে মিলন তার ব্যক্তিগত তৃপ্তির কারণ হয়তো হতে পারত, কিন্তু সেই বিরহ এক ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পীর জন্ম দিয়েছিল। বিরহবোধ জীবন ও যৌবনের আবেগ—বুদ্ধি তার থই

পায় না, হৃদয় দিয়েই তার স্বরূপ চেনা যায়। শরৎ সাহিত্যে সেই বিরহবোধ মুখরিত হয়েছে। আদর্শ ও যথার্থ সমস্যা ও সমাধান সব-কিছুই হৃদয়রসের সঞ্জীবনীতে ডুবে রয়েছে।

আর-একদিক দিয়ে তার এ প্রবৃত্তি বল পায়। 'বঙ্গদর্শন'-এ 'চোখের বালি' পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের যুগান্তকারী রচনায় বিধবার ভালোবাসাকে ভাষা দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আদর্শরক্ষার জন্য তাকে হত্যা করেননি। স্পষ্টভাবে তিনি বলেছিলেন- কোনো বিশেষ অবস্থায় কোনো বিধবা নারী যদি কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়, তাতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীর প্রণয়কে সার্থক না করে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে হত্যা করিয়েছিলেন। সেজন্য শরৎ বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনোদিন ক্ষমা করেননি। রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত মননের জন্য তাঁকে সারাজীবন ধরে গুরুর আসনে বসিয়ে এসেছেন।

শরতের অন্তরের সংগ্রামের মূলে এই দুই সাহিত্যস্রষ্টা প্রথম থেকেই আসন পেতে বসেছিলেন।

১৬

সংসারের প্রতি শরতের কোনোদিনই কোনোরকম আসক্তি ছিল না। যখন চাকরি করত তখনও নয়, যখন চাকরি ছেড়ে দিয়েছে তখনও নয়। সংসারের কুৎসিত রূপের থেকে মুখ ফিরিয়ে কল্পনার জগতে সে বাঁচতে চেয়েছিল। দুর্দান্ত অভাবের মধ্যেও তার সৌন্দর্য পিপাসা ম্লান হয়ে যায়নি। জীবনে সে যে পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খল ছিল, তার ঘরখানি সেই পরিমাণেই ছিল সাজানো গোছানো। ঘরে দড়ির একটা খাট, একটা ফোল্ডিং টেবিল ছিল। জিনিস দুটো পেয়েছিল নিজের মামা ঠাকুরদাসের কাছ থেকে। চেয়ার রাজু নিজের হাতে তৈরি করে দিয়েছিল। টেবিলে তার প্রিয় লেখক হেনরি উড, মেরী কোরেলি, লিটন ও ডিকেন্সের বই সাজানো থাকত। লেখার সব সাজ-সরঞ্জাম সাজানো-গোছানো থাকত। কিন্তু সৌন্দর্যবোধের সাহায্যে পেটের আগুন নেভানো যায় না, কল্পনার সাহায্যে সংসার চলে না, সে চায় বৈষয়িক সামগ্রী। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থা তার ছিল না। কিন্তু তা নিয়ে তার ও তার বাপের কোনো উদ্বেগ বা ভাবনা ছিল না।

বিক্রয়যোগ্য যাবতীয় জিনিস বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আত্মীয় ও বন্ধুরা কতদিন আর সাহায্য করতে পারে। ধার চাওয়ারও একটা শেষ আছে। আর তারা যে শ্রেণীর লোক ছিলেন তাতে, ভিক্ষা দেওয়ারও সাহস কারো ছিল না। বাগান থেকে তরিতরকারী সংগ্রহ করে আনলেই তো পেট ভরবে না। তাই কখনও কখনও তাকে ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাতে হত-'হে ভগবান, কিছুদিনের জন্য আমার জ্বর করে দাও, যাতে দু-বেলা খাওয়ার চিন্তা না করতে হয়।'

নিজের অকর্মণ্যতা লুকোবার জন্য ভগবানের আড়াল দিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। পিতা-পুত্র দুজনেই দায়িত্বহীন, জ্ঞানহীন হয়ে শুধু সৌন্দর্য সাধনায় ডুবে থেকে অসহ্য ক্ষুধার দাবি অস্বীকার করতে চাইত। ছেলে সাহিত্য-সাধনায় ব্যস্ত, ওদিকে কল্পনাবিলাসী বাপ এই অবস্থাতেও নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর পাথর সঞ্চয় করে রাখত। শরৎ জানত যে, বাবা তার শখের জিনিসগুলি সর্বদা তালাচাবি দিয়ে রাখতেন। শরতের তখন পয়সার বড় দরকার। ওই অবস্থাতেও সে পরকে সাহায্য করা ছাড়েনি। একদিন ভাবল, বাবা এই পাথরগুলো নিয়ে কীই বা করবেন, তার চেয়ে কারুর কাজে যদি লাগে সেই ভালো।

বাপের নজর এড়িয়ে একদিন সব-কটি পাথর বের করে নিল। এ-কথা বেশিদিন চাপা থাকেনি। গরিবের সংসারে সেই তো একমাত্র সম্পত্তি। মতিলাল স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন। শেষে শরৎকে ডেকে বললেন, 'এই ছোঁড়া, তুই পাথরগুলো নিয়েছিস ?'

শরৎ উত্তর দিয়েছিল,'হাঁ, নিয়েছি।'

'কেন নিয়েছিস ?'

'আমার পয়সার দরকার ছিল। আর পাথরগুলো কোনো কাজে লাগছিল না।'

বাপের রাগের আর সীমা, পরিসীমা রইল না। অসহায় দুর্বল মানুষ যখন রেগে ওঠে, তখন সে সব সীমার বাইরে চলে যায়। অত্যন্ত কড়া কথায় মতিলাল শরৎকে ভর্ৎসনা করে বল্লেন, 'তোর লজ্জা করে না? জোয়ান ছেলে, কিছু করতে পারিস না? সবাই খিদেয় মরছে আর তুই কিনা কটা পয়সার জন্য আমার শখের জমানো পাথরগুলো নিয়ে গেলি?'

শরৎ অবাক হয়ে বাপের দিকে তাকিয়ে ছিল। সন্তানের জন্য স্বপ্নদর্শী বাপের মনে বড় দয়ামায়া ছিল। সবরকম দুষ্টুমি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বাবা তাকে কোনোদিন দুটো কড়া কথা বলেননি, আর আজ সামান্য নিষ্প্রাণ পাথরের জন্য এমন কটু কথা তিনি বলতে পারলেন? শরতের ভাবুক মনে বড় বেদনা হল। সেই মুহূর্তে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু তার গৃহত্যাগের এইটিই একমাত্র কারণ নয়। বাড়িতে একটি ঝি ছিল, সে রান্নার কাজ ও ছোট ভাইবোনেদের দেখাশোনা করত। ঝি-টি কখনও কখনও মারধোর পর্যন্ত করত। এই নিয়ে বাপের সঙ্গে শরতের একদিন কথা কাটাকাটি হয়। বাবা ঝি-এর পক্ষ নেন। বাড়ির অবস্থার কথা ভাবলে তাঁকে অবশ্য দোষও দেওয়া যায় না। ঝি-এর সাহায্যেই কোনোরকমে সংসার চলছিল। কিন্তু শরৎ একথা মানতে রাজী ছিল না। তার মনে হয়েছিল বাবার উপর ঝি-এর অনুচিত প্রভাব রয়েছে।[১] কিন্তু কীই বা তার করার ছিল? সে নিজেও কতকাংশে এজন্য দায়ী, তাই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

শরতের কোনো কাজের পিছনে কোনো একটা কারণ থাকত না। যদি নাও থাকত লোকেরা মনে মনে গড়ে নিত। তাই তার গৃহত্যাগের একটা কারণ এ-ও শোনা গিয়েছিল যে, তার প্রেমিকা তাকে ঠকিয়ে কোথাও চলে গেছে; আর বিরহ ব্যথায় ব্যাকুল শরৎ প্রতিজ্ঞা করে বসেছে—আমি তাকে খুঁজবই।

যে কারণেই হোক, কিছু পাবার ব্যথায় ব্যথিত দিশাহারা শরৎ আর একবার নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিল।[২]

১৭

শ্রীকান্তের মতোই ঘুরতে ঘুরতে একদিন শরৎ দেখে যে, আমবাগানের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তখুনি সেখানে গিয়ে দেখে যে, একজন খাসা সন্ন্যাসীর আশ্রম। প্রকাণ্ড ধুনী জ্বলছে, ঘটিতে চায়ের জল চাপানো হয়েছে। একজন সাধু চোখ খুলে বসে রয়েছেন, কাছেই গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম ছড়িয়ে রয়েছে, দুধের জন্য একটি গোরু ও ছাগল রয়েছে। উট ও টাট্টু ঘোড়াও আছে। ভাঙ ছাঁকবার ব্যবস্থাও আছে। শরৎ এগিয়ে গিয়ে সাধুর পা ছুঁয়ে বিনম্র গলায় বলল, 'আমি গৃহত্যাগী মুক্তির পথান্বেষী, হতভাগ্য শিশু। দয়া করে আপনার চরণ সেবার আজ্ঞা দিন।' সাধু হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'বেটা, বাড়ি ফিরে যা। এ পথ বড়ই দুর্গম।'

শরৎ করুণ সুরে বলল, 'বাবাজী, কত পাপী, তাপী মানুষ আপনার মতো সাধুর চরণ ধরে মুক্তি পেয়েছে, আমি কি আপনার চরণে থেকে মুক্তি পেতে পারি না?' বাবাজী প্রসন্ন হলেন, 'তুই ঠিক বলছিস, আচ্ছা বেটা, ভগবানের যখন তাই ইচ্ছা তাহলে এখানেই থেকে যা।'

শরৎ সেই গুরুজীর দলে স্থান পেল। গাঁজা তৈরি করতে সে ওস্তাদ ছিলই, বাবাজীকে প্রসন্ন করতে তার দেরি হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে দীক্ষা নিয়ে গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষের মালা প'রে সে বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। বেশ কদিন পর্যন্ত চেলাগিরি করে বাবাজীর সঙ্গে সে ঘুরে

---

১ শরৎচন্দ্র যখন বিখ্যাত হয়ে ভাগলপুরে আসেন, সেই ঝি-টি দেখা করতে এলে তাকে তিনি প্রচুর টাকা-পয়সা দিয়েছিলেন।

২. জুলাই, ১৯০১-এর পর। কারণ সেই তারিখে তাঁর একটি লেখা 'ক্ষুদ্রের গৌরব' হস্তলিখিত পত্রিকা 'ছায়া'তে পাওয়া যায়।

বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোনো এক জায়গায় বেশিদিন থাকা তার অসহ্য ঠেকত, তাই একদিন দলছাড়া হয়ে পড়ল। এক ভক্ত পরিবারের সংগে তার পরিচয় হয়, সে সময় বসন্তের ভারি প্রকোপ। সেই পরিবারের সবার বসন্ত হয়। শরৎ নিজ স্বভাবানুযায়ী তাদের সেবায় মেতে ওঠে। ধীরে ধীরে তারা ভালো হয়ে উঠল—শরতের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। শরৎকে তারা তাদের সংগে যেতে বলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় শরৎ জ্বরে পড়ে। আর সেই ভদ্র পরিবারের লোকেরা তাকে একা অসুস্থ অবস্থায় এমনভাবে ফেলে চলে যায় যেন শরতের সংগে কোনোদিন কোনো পরিচয় ছিল না। জ্বর নিয়েই সে স্টেশনের দিকে রওনা দেয়। পথে এক বুড়ো বিহারী তাকে দয়া করে নিজের গাড়িতে বসিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। তাকে নিজের সংগে যাওয়ার কথাও বুড়ো বলে।

কতক্ষণ স্টেশনে সে পড়ে ছিল, কেমনভাবে সুস্থ হয়েছিল, সে কথা কেউ জানে না। এটুকু শুধু মনে ছিল যে একটি গরিব বাঙালী ছেলে নিজের ছেঁড়া বিছানা তাকে পেতে দিয়ে গিয়েছিল। গরম দুধ এনে বলেছিল, 'ভয়ের কিছু নেই, ভালো হয়ে যাবে। বাড়ির ঠিকানা বলো, আমি টেলিগ্রাম করে দেব।'

কিন্তু শরৎ কাউকে কিছু বলেনি, ভালো না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থেকে গিয়েছিল। সেই ছেলেটি ও স্টেশনের অন্যান্য লোকেরা সবসময় তার দেখাশোনা করেছিল। যখন চলাফেরা করার সামর্থ্য হল তখন মজঃফরপুরে চলে যায়। সেখানে একটা ধর্মশালায় ওঠে। তখনও পর্যন্ত তার পরনে সন্ন্যাসীর বেশই ছিল, কারণ এ বেশে ভিক্ষে পেতে অসুবিধে হয় না।

একদিন বাঙালীদের ক্লাবে গিয়ে সে বিশুদ্ধ হিন্দিতে বলে, 'মুঝে এক পোস্টকার্ড চাহিয়ে, আউর কলম ভী। চিঠ্‌ঠি লিখনা চাহতা হুঁ।'

পোস্টকার্ড কলম নিয়ে ক্লাবঘরের একটা কোণে বসে সে চিঠি লিখতে আরম্ভ করে। চারপাশে বাচ্চা ছেলেরা ঘোরাফেরা করছিল। সন্ন্যাসীকে চিঠি লিখতে দেখে সবাই কৌতূহলের সংগে উঁকি মারছিল। তারা দেখে, অত্যন্ত সুন্দর বাংলা হরফে সন্ন্যাসী চিঠি লিখছে।

এক-কান থেকে দশ-কান হতে হতে ক্লাবের সদস্যদের কানেও এ কথা পৌঁছল। সবার মনেই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহল হয়। প্রমথনাথ ভট্ট নামে একটি যুবক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বাংলায় জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?'

শরৎ হেসে জবাব দিয়েছিল,'আমি বিহারী, ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাই।'

তার হাসিতেই রহস্য ধরা পড়ে। প্রমথ বলেছিল, 'বেশ যা হোক। আপনি মোটেও বিহারী নন, বাঙালী। এবার এই ছাতুখোরদের ভাষা ছেড়ে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলুন।'

তারপর সন্ন্যাসী-বেশ চুলোয় গেল, কিন্তু অপরিচিত লোককে সে 'বিহারী' বলেই নিজের পরিচয় দিত আর ধর্মশালাতেই থাকত। একদিন ধর্মশালার ছাতে বসে তন্ময় হয়ে গান গাইছিল। সেই সময় এক তরুণ নিশানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে মিষ্টি গানের সুর শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার বাড়ির সবাই গান-পাগল, প্রায় প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো গায়ক ডেকে এনে বাড়িতে মজলিস বসানো হত। নিশানাথ তখুনি ধর্মশালায় গিয়ে শরৎকে বলেছিল, 'আপনি ভারি সুন্দর গান করেন তো? কোথায় বাড়ি আপনার?'

শরৎ বলেছিল, 'আমি ভাগলপুর থেকে এসেছি, আমার নাম শরৎচন্দ্র।' নিশানাথ বলেছিল, 'ভাগলপুর! সেখানের শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাতনী অনুরূপা দেবী আমার বৌদি হন।'

শরৎ বলেছিল, 'আমি তাঁকে চিনি, বিভূতির বোন নিরুপমার তিনি বন্ধু। সৌরীন্দ্রমোহনও আমার বন্ধু।'

নিশানাথ খুব খুশি হয়ে শরৎকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসে। বড় ভাই শিখরনাথকে বলেছিল, 'ইনি ভাগলপুরের শরৎচন্দ্র, ভারি মিষ্টি গানের গলা।' শিখরনাথ হেসে বলেছিলেন, 'আর ইনি খুব ভালো গল্প লিখতে পারেন। তোমার বৌদির মুখে এর কথা আমি আগেই শুনেছিলাম।'

শরৎ সেদিন থেকেই নিশানাথের বাড়ি রয়ে গেল। প্রতিদিন গানের আসর বসত। সুগায়ক হিসেবে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তার কত বছর পরেও শিখরনাথ সে

কথা মনে করে বলতেন,'আহা, ওই গানখানা শরৎ কী সুন্দরই না গাইত !এখনো কানে বাজে।'

এইভাবে দুমাস যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, কেউ বুঝতে পারল না। অনাথের মতো মজঃফরপুরে এসে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই বন্ধুবান্ধব ছাড়া একটি বিহারী যুবক, মহাদেব সাহুর সঙ্গে শরতের পরিচয় হয়। সে ধনী জমিদারের ছেলে, বাংলা লেখাপড়া ও বাঙালীদের মতোই কাপড়চোপড় পরত। শরতের মিষ্টি গলা ও কথা বলার অদ্ভুত ক্ষমতায় সে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল।একদিন শরৎ বলেছিল, 'একবার আমি রানাঘাটে পুলিসের হাত থেকে একটি অবিবাহিতা মেয়েকে উদ্ধার করেছিলাম।' মহাদেব সাহুর এক বন্ধু হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সত্যি ?'

'খাঁটি সত্যি।'

কিন্তু মহাদেব সাহুর বন্ধু রানাঘাটে গিয়ে খোঁজ-খবর করে জানতে পারে যে, গল্পটি শরতের মন-গড়া। সে যাই হোক, তার মন-গড়া গল্প শুনে লোকে মুগ্ধ না হয়ে পারত না। যত সহজে সে লোককে গল্প শুনিয়ে আনন্দ দিত, ঠিক ততখানিই সহজভাবে রুগীর পরিচর্যা, মৃতদেহ দাহ করার মতো শক্ত কাজও করতে দ্বিধা করত না।

কিছুদিনের মধ্যেই শরৎ ও মহাদেব সাহু এমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল যে, মদ খাওয়া ও বেশ্যার বাড়ি যাওয়া, সব কাজ একসঙ্গেই দুজনে করত। দুজনে মিলে আবার শিকার করতেও যেত। সাহু খুব ভালো বিলিয়ার্ড খেলতে পারত, শরৎ কিন্তু এ-খেলা শিখতে পারেনি। মোসাহেবের দল সারা দিনরাত সাহুকে ঘিরে পড়ে থাকত। সাহুর দাক্ষিণ্যে মদের নেশা অবশ্য বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু মদ খেয়ে শরৎ মাতাল হয়েছে, এ কথা কেউ শোনেনি বা দেখেনি। মিষ্টি করুণ সুরে বাঁশি বাজিয়ে শুধু মানুষজন নয়, সমস্ত পরিবেশকে সে মাতিয়ে রাখত।

মহাদেব সাহু বাঁশি শুনতে খুব ভালোবাসত। মদ ও বেশ্যার পিছনে জলের মতো টাকা ওড়াতে লাগল। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারা একথাই বলতে লাগলেন, 'ভাগলপুরের একটি বাঙালী ছেলে মহাদেবকে নষ্ট করে ফেলছে।'

অন্য দলের লোকেরাই বা নীরবে এ অপবাদ সইবে কেন ? তারাও বলে বেড়াতে লাগল, 'সাহু, শরৎকে বদ করে তুলেছে।' দুই দলের পরস্পরের প্রতি এই দোষারোপ দুই বন্ধু যে জানত না এমন নয়, কিন্তু তারা কোনো কিছুরই পরোয়া করত না। মনে মনে তারা হাসত, কারণ দুজনেই জানত যে, পরিচয় হওয়ার অনেক আগে থেকেই তারা সব-কিছু শিখেছে। অপরের কাছে শেখার মতো তার কিছুই বাকি ছিল না। দুজনের বন্ধুত্বের দরুন সাহু পেয়েছিল মনের মতো এক বন্ধু, আর শরতের পয়সার দুঃখ ঘুচেছিল। মহাদেব সাহু শরৎকে নিজের আদর্শ মনে করত। শরৎ ঈশ্বর মানত না। দেখাদেখি সাহুও বলতে লাগল, 'শরৎদা যখন বলেছে ঈশ্বর নেই, তখন সত্যিই ঈশ্বর বলে কেউ নেই। আমিও ভগবান আছে বলে বিশ্বাস করি না।'

সাহুর সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে রাত হয়ে যেত। শিখরনাথের বাড়িতে এ নিয়ে আপত্তি ওঠে। বাড়ির গিন্নি শরৎকে খুবই স্নেহ করতেন, অনেক রাত পর্যন্ত তার আসার পথ চেয়ে বসে থাকতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শরতের মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ বেরোয়, সব সময় তেমন হুঁশও থাকে না। শিখরনাথকে এ কথা জানাতে সেদিন শিখরনাথ শরৎকে বলেছিলেন, 'তোমার এত দেরি করে বাড়ি ফেরা আর মদ খাওয়া, বাড়ির লোকেদের পছন্দ নয়, তোমার একটু সাবধান হওয়া দরকার।'

শিখরনাথের বাড়ির লোকেরা সংগীত-প্রিয় হলেও বড় ধর্মপ্রাণ ছিল। শরৎ নিজের ভুল বুঝতে পারে। সে আর শিখরনাথের বাড়ি ফিরে যায়নি। একটা মেসে গিয়ে ওঠে, কিন্তু পকেটে পয়সা কোথায় ? শেষ পর্যন্ত সে মহাদেব সাহুর কাছে চলে যায়। তখন থেকেই তার খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা সব সাহুর সঙ্গেই হত।

প্রেমের ব্যথায় তখনো সে অস্থির। তার প্রেমিকা নীরদা তার প্রতি রাগ করে ভাগলপুর ছেড়ে চলে গেছে এবং আবগারী এক দারোগার সঙ্গে এখানে এসে রয়েছে। সেই কথা শুনেই শরৎ নাকি

মজঃফরপুরে গিয়েছিল। একদিন সে নীরদাকে খুঁজেও পেয়েছিল কিন্তু নীরদা তার দিকে চেয়েও দেখেনি।

কিন্তু প্রেম অন্ধ। তখনও শরতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নীরদা তাকে ভালোবাসে। যখন তখন সুযোগ পেলেই শরৎ তার পিছু নিত। বিরক্ত হয়ে একদিন নীরদা দারোগাকে বলে দেয়। দারোগাবাবু সেদিনই শরৎকে ধরে বেশ উত্তম-মধ্যম দেয়। এমন মার মেরেছিল যে বহুক্ষণ পর্যন্ত সে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিল। তারপরও নীরদার ভালোবাসা সম্বন্ধে শরতের ভ্রম মিটেছিল কি না, কিংবা আগাগোড়াই এ-গল্প একটা বিরাট ভ্রম, তা জানা যায়নি। তবে মজঃফরপুরে থাকাকালীন নারী সাহচর্যের তার অভাব হয়নি। পুঁটি নামের একটি সুন্দরী বেশ্যাকে ডেকে সাহু প্রতিদিন নাচগানের জলসা করত। দুই বন্ধু প্রাণভরে আনন্দ করত।

সে সময়েই রাজবালা নামে একটি অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে শরতের পরিচয় হয়। তার জীবন-কাহিনী বড়ই রোমাঞ্চকর। তার বাবা বিধুভূষণবাবু একজন উকিল ছিলেন। বাড়ি থেকে পালানো একটি বাঙালী বউকে তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিছুদিন পর সেই মেয়েটির ভালোবাসার মানুষ তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। শেষে উকিল ভদ্রলোক মেয়েটিকে বিয়ে করেন। তাদের দুই ছেলে ও চার মেয়ে হয়। মেয়েরা সবকটিই ভারি চমৎকার দেখতে। কিন্তু তাদের মধ্যে রাজবালা সবচেয়ে সুন্দরী ছিল। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ধবধবে ফর্সা রঙ, শরীরের গড়নে শক্ত বাঁধুনী, তীক্ষ্ণ নাক, আর মিষ্টি স্বভাব। ছেলেদের সঙ্গ তার বেশি ভালো লাগত। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অস্থির-মতি পুরুষদের সে হৃদয়বল্লভা হয়ে উঠেছিল। কাজে কাজেই শরৎ ও মহাদেব সাহুর সঙ্গেও তার পরিচয় হওয়া এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রাজবালার রূপে শরৎ মুগ্ধ হয়ে উঠল। শরতের মজঃফরপুরের জীবনকে সবরকমে বোহেমিয়ান বলা যেতে পারে। শিকার করা, বেশ্যাসঙ্গ ও মদ এ সবের প্রাচুর্য যেখানে, সেখানে আর কীই বা আশা করা যেতে পারে? শরৎ দেখতে সুন্দর ছিল না, স্বাস্থ্যও ভালো ছিল না, তাছাড়া টাকা পয়সাও ছিল না। কিন্তু এমন কিছু গুণ ছিল নিশ্চয়ই যার দরুন সবার সে প্রিয় ছিল। বিশেষ করে মেয়েরা তার বাক্‌চাতুর্যে আকৃষ্ট না হয়ে পারত না।

কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে থেকে একান্ত নিঃসঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসার শক্তি ছিল তার অপরিসীম। অন্তরের বৈরাগী সত্তা তাকে দূরে টেনে নিয়ে যেত, বহুদূরে কোন্ নির্জন নদীতীরে, ঘন্টার পর ঘন্টা সে একলা বসে থাকত, লিখত। না জানি কত লেখাই সে এ ভাবে লিখেছিল। 'ব্রহ্মদৈত্য' গল্প তারই মধ্যে একটি।

অসমাপ্ত 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপিখানা তার কাছেই ছিল। এই উপলক্ষেই প্রমথনাথের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। প্রমথনাথ বর্ধমান জেলার ছেলে, মজঃফরপুরে কাকার কাছে থেকে পড়াশোনা করেছিল। এবারে সে কাকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কালান্তরে এই বন্ধুত্ব কয়েকটি বিষয়ে আদর্শ প্রমাণিত হয়।

বন্ধু-বান্ধব ছাড়া এখানকার অন্যান্য লোকেদের সঙ্গেও সে অবাধে মিশত। তাদের মধ্যে বেশ্যা, সাধু সন্ন্যাসী, জমিদার, উকিল, সংগীত-প্রেমিক, ও ছোট জাতের লোক, সব রকমেরই মানুষই ছিল। তাদের সবার কথা সে শুনত। তাদের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত ও একান্তে বসে লিখত। কখনও সে লোকেদের রেখাচিত্র লিখে শোনাত। এই রেখাচিত্রগুলিতে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থাকত। সাধারণ মানুষের পক্ষে যা অসম্মান ও কলঙ্কের বিষয়, সাহিত্যিকের সেটুকুই ক্ষমতা। বিশ্বকবি লিখেছিলেন—

'জীবনমন্থন বিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।'

এই বোহেমিয়ান জীবনের শেষ কোথায় গিয়ে হত জানি না কিন্তু হঠাৎ ভাগলপুর থেকে টেলিগ্রাম আসে– 'তোমার বাবা মারা গেছেন, তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

ভাগলপুর থেকে যখন শরৎ চলে গিয়েছিল, সংসারের আর্থিক অবস্থা সেদিনও শোচনীয় ছিল, আর চলে যাবার পর তা আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। মতিলাল পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াত। ছেঁড়া চটি, সারা শরীর নোংরা মলিন, মাথার চুলে জট পড়েছে, পেটে অন্ন নেই, হাতে পয়সা নেই, এ অবস্থায় কল্পনা-বিলাসী লোকের পাগল হওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

সেই সময় মতিলালের খুড়শ্বশুর অঘোরনাথ ভাগলপুরে আসেন। দুজনে সতীর্থ ছিলেন। মতিলাল তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য শ্বশুর বাড়িতে যান। শীতের সময়, মতিলালের গায়ে কোন কাপড় ছিল না। যদিও অঘোরনাথ বাপ ও ছেলে কারো প্রতিই প্রসন্ন ছিলেন না কিন্তু ছোটবেলার বন্ধুর এ দুর্দশা দেখে তার মন বেদনায় ভরে ওঠে। তিনি বলেছিলেন,'তুমি এ বাড়ি থেকে চলে গেলে কেন হে, মতিলাল?'

'ভালো লাগল না, ছোটকাকা।'

'এত শীতে, গায়ে কাপড় দাওনি কেন?'

'নেই যে।'

'শরৎ কোথায়?'

'ঝগড়া করে কোথায় নিরুদ্দেশ।'

'আজকাল কিছু কাজকর্ম আছে?'

'না।'

'কী করে চলে?'

এ-কথার মতিলাল কোন জবাব দেননি। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়েছিল। যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন নিজের গায়ের কাপড় তাঁকে পরিয়ে হাতে একটি নোট গুঁজে দেন। মতিলালের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বললেন,'কদিন আছেন, ছোটকাকা?'

'কালই যাব।'

মতিলাল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছিলেন, 'আর হয়তো দেখা হবে না, ছোটকাকা– বয়স হচ্চে তো আমাদের।'[১]

সত্যি সত্যিই আর তাঁদের দেখা হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই অজস্র ভালোবাসায় ভরা পৃথিবীর অযোগ্য, স্বপ্নদর্শী মতিলাল, প্রতিকূল পরিবেশের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে স্বর্গে গেলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শরৎ খুবই দুঃখ পেয়েছিল। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে সে চলে এসেছিল, আর বোহেমিয়ান জীবনের দিনগুলোতে, কে বলতে পারে কবার সে বাপের কথা ভেবেছিল। আজ বাবা নেই, তাঁর অগাধ ভালোবাসার কত কথাই না মনে পড়ছিল। সেই মুহূর্তে সে ভাগলপুর রওনা হয়।

শরতের অবর্তমানে মণীন্দ্রনাথ মতিলালের শেষকৃত্য করেছিল। শ্রাদ্ধের সময়ও সে-ই সাহায্য করেছিল। সে শরতের সহপাঠী কিন্তু আচারনিষ্ঠ গাঙ্গুলী বংশের যথার্থ ছেলে। শরতের জীবনকে সে ঘৃণার চোখে দেখত, তবু যে ব্যক্তির শ্রাদ্ধের প্রশ্ন ছিল সে গাঙ্গুলী বংশের জামাই। সেই বংশের অনুরূপ শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত, তাই সে সাহায্য করেছিল।

মা আগেই গিয়েছিলেন, বাবাও আর রইলেন না। বড় বোন পরের ঘরে। তিনটি ছোট ভাই বোন আর সে নিজে। নিজের জন্য তার তেমন চিন্তা ছিল না, কিন্তু এই অসহায় অবোধ শিশুদের নিয়ে সে এখন কী করে? ছোট বোন সুশীলাকে বাড়িওয়ালী খুব ভালোবাসত, সুশীলাকে সে নিজের

১. সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—'শরৎ পরিচয়'।

কাছে নেয়। ছোট ভাই প্রভাস এগার-বারো বছরের ছিল, শরৎ তাকে আসানসোল নিয়ে গিয়েছিল। তার এক বন্ধু সেখানে রেলে কাজ করত। কাজ শেখার জন্য প্রভাসকে সে বন্ধুর বাড়ি রেখে আসে।

বাকি রইল প্রকাশ, তাকে কার কাছে রাখে? কেউ তার নিজের নয়। অনেক ভেবেচিন্তে সে ছোট দাদামশায় অঘোরনাথের শরণাপন্ন হয়। শরতের প্রতি তিনি বড়ই অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু দিদিমার ভরসাতেই শরৎ সেখানে যাবার সাহস করেছিল। এই ছোট দিদিমা কতবার কতরকম বিপদে শরৎকে রক্ষা করেছিলেন। প্রকাশকে সঙ্গে করে সে জলপাইগুড়ি যায়। দাদামশায়ের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে। অঘোরনাথ প্রথমে রাগ করেন কিন্তু একে তো মতিলাল মারা গিয়েছিল, অপরদিকে স্ত্রীর অনুরোধ ও আগ্রহের দরুন ছোট দাদামশায় আর না বলতে পারেনি।

ছোট দিদিমা আর একবার শরৎকে বাঁচালেন। দাদামশায় উপেক্ষার সঙ্গে আর দিদিমা স্নেহের সঙ্গে বললেন, 'এখন থেকে বাড়ির সব দায়িত্ব তোমার উপর। এবার একটা কিছু তোমার করা উচিত।' শরৎ বলল, 'তাই করতে যাচ্ছি।' ভাইবোনের দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বিহারকে শেষ নমস্কার জানিয়ে সে জীবিকার উদ্দেশে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছল। কয়েকজন মামা সেখানে থাকতেন। উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরতের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সাহিত্যের প্রতি তার বেশ অনুরাগ ছিল। আর একজন মামা লালমোহন গাঙ্গুলী কলকাতায় ওকালতি করতেন। ভাগলপুর কাছারির মামলার আপীল সে সময় কলকাতায় হত। লালমোহন মামা সেখানেই প্র্যাকটিস করতেন। তার কাছে থেকেই শরৎ চাকরির চেষ্টা করবে এ ব্যবস্থাই ঠিক হয়। একজন বয়স্ক লোকের পক্ষে নিজের খরচপত্রের জন্য অভিভাবকদের কাছে হাত পাততে দ্বিধা হওয়াই স্বাভাবিক। এই দ্বিধা কাটানোর জন্য সে হিন্দির দরখাস্তগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করত। তার বদলে কিছু পয়সা সে পেত। আইন আদালতের ভাষা তার তত আয়ত্তে ছিল না তাই এ কাজে তার মনও বসত না। বাড়ির তরিতরকারি তাকেই বাজার থেকে নিয়ে আসতে হত, সাধারণ চাকরের মতো আরও কয়েকটা কাজ তাকে করতে হত। অপমানজনক কথাও তাকে শুনতে হত। বাড়ির অন্দর মহলে যেতে হলে ভাগলপুরের মতো এখানেও তাকে গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকতে হত। একদিন সে মামার চুলের ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ তিনি এসে পড়েন। ক্রোধের সীমা হারিয়ে ফেললেন, একবার শরতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তারপর সেই ব্রাশখানা হাতে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যেন বলতে চাইলেন, 'যে ব্রাশ তুমি একবার ব্যবহার করেছ, তা আর আমার যোগ্য রইল না।'

এই নিদারুণ ঘৃণা ও অপমানের জন্য তার মন বেদনায় ভারি হয়ে ওঠে। প্রায়ই সে ভাবত অপরের বাড়িতে এত অপমান সয়ে থাকার চেয়ে, রাস্তাঘাট, জঙ্গল, মরুভূমি অনেক ভালো। শরতের বড় বোন কলকাতার কাছেই গোবিন্দপুরে থাকত। শরতের ইচ্ছে ছিল সেখানে গিয়ে থাকে। গিরীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি থেকে মনে হয় সেখানে সে গিয়েও ছিল।[১] তখন সেখানে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া বিবাদ চলছিল। তাই মুখুজ্জে মশাই শরতের জন্য কিছুই করতে পারেননি। স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি তো জান এ পল্লীগ্রাম, শরতের এখানে থাকা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। গ্রামের লোকেরা সমালোচনা করবে।' 'তাহলে····?' ভায়ের প্রতি করুণায় অনিলার মন ভরে ওঠে। কিন্তু সে কিছুই করতে পারেনি।

মুখুজ্জেমশায় বলেছিলেন, 'তাকে বলো আর কোথাও গিয়ে থাকুক, খরচপত্রের ব্যবস্থা আমি করে দেব।' মুখুজ্জেমশায় সাহায্য করেওছিলেন। কিন্তু কলকাতায় থাকা শরতের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজের মেসো অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা তার মনে হয়। তিনি রেঙ্গুনে অ্যাডভোকেট ছিলেন। কয়েক বছর আগে

১. ২৪ ডিসেম্বর, ১৯০২

সেবার তিনি ভাগলপুরে এসেছিলেন। মতিলালকে বলেছিলেন, 'ছেলেকে কলেজে কেন পাঠাচ্ছ? আমার সঙ্গে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দাও। পড়াশোনা করে উকিল হতে দেরি হবে না। ভবিষ্যতে ভালোমত উপার্জন করতে পারবে।'

অনেক কারণে সে-সময় শরতের যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজ তার সামনে জীবিকার প্রশ্ন বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলকাতার বহু লোক বর্মা সম্বন্ধে তাকে অনেক রকম গল্প শুনিয়েছিল। বলেছিল, অমুক লোক বর্মায় চাকরি করে পয়সাওয়ালা হয়ে গেছে। পয়সাকড়ি সেখানের রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে থাকে, শুধু কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষা। জাহাজ থেকে নামলেই সাহেবরা বাঙালীদের কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে চাকরি দেয়।

এ-সব কথা শুনতে শুনতে শরতের ভবঘুরে মন তাকে বর্মা যাবার জন্য উৎসাহিত করে তুলেছিল। সে সময় অঘোরনাথ কলকাতায় এসেছিলেন এবং লালমোহনের বাড়িতেই উঠেছিলেন। বর্মা সম্বন্ধ এমন সব রোমান্টিক গল্প তিনি শরৎকে শোনালেন যে মনে মনে সে ঠিক করে ফেলে—বর্মা সে যাবেই।

এইরকম অনিশ্চিত ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তার মৌন সাহিত্য সাধনা নীরবে চলছিল। 'চরিত্রহীন' লেখা শুরু হয়েই গিয়েছিল, কিন্তু মনে হয় সে সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না, এমন-কি সৌরীন্দ্রমোহনও নয়। ভাগলপুরের এই পুরোনো বন্ধু এখানেই থাকত ও প্রায় প্রতিদিন সন্ধেয় সে শরতের কাছে আসত। তারপর দুজনে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ত। দুজনে মিলে খুব সাহিত্য আলোচনা করত।

একদিন সৌরীন্দ্র বলল, 'শরৎ! স্টার থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক 'সাবিত্রী' অভিনীত হচ্ছে, তুমি নিশ্চয়ই দেখো।' শরৎ নাটকটি দেখে এসে সৌরীন্দ্রমোহনের উপর খুব এক চোট নিল। বলল, 'বাপরে বাপ! তোমার কি করে এই নাটক ভালো লাগল? সত্যবান না-মরা পর্যন্ত তেমন মন্দ হয়নি, অমৃত মিত্র মাণ্ডব্যর অভিনয় ভালোই করেছেন। কিন্তু সত্যবানের যা চেহারা তাকে সাবিত্রীর ছোট ভাই মনে হচ্ছিল। সত্যবানের শব কোলে নিয়ে সাবিত্রী গান গেয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওই অবস্থায় কেউ গান গাইতে পারে?'

সৌরীন্দ্র বলল, 'তুমি ওটাকে ঠিক সুর-লয়-তালের গানই বা ভাবছ কেন? ওই অবস্থায় মানুষ চিৎকার করে কাঁদে। তুমি কোথায় গেলে গো? আমার এখন কি হবে? ইত্যাদি, ইত্যাদি। শোকের সেই আবেগকে নাট্যকার গানের ছন্দ ও সুরে ব্যক্ত করেছেন।'

শরৎ বলল, 'তাই যদি হয় তাহলেও পর পর দুটো গান গাইবে? একটাই তো যথেষ্ট। আমার খুব খারাপ লেগেছে। গান গাইলে তো করুণ রসের শ্রাদ্ধ করা হয়। সামান্য ট্রাজেডিও উৎপন্ন করা যায় না।'

শরতের মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্ট এখানের পাথুরেঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদে কাজ করছিল। প্রায়ই তার কাছে গিয়ে সে নিজের লেখার বিষয়ে আলোচনা করত। সে-ও দেখা করতে আসত। একদিন হঠাৎ গিরীন্দ্র বলল, 'শরৎ, তুমি কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য গল্প লিখছ না কেন? পঁচিশ টাকা পুরস্কার।'

শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'এই কুন্তলীন পুরস্কারটি কি জিনিস?'

গিরীন্দ্র বলল, 'এখন স্বদেশী আমল, দেশপ্রেমিকরা স্বদেশী বস্তুকে খুব উৎসাহ দিচ্ছে, দেওয়াও উচিত। 'কুন্তলীন' একটি সুগন্ধি কেশতৈল। বউবাজারের এইচ. বসু এর নির্মাতা। তেলের প্রচারের জন্য তিনি এই প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন। নামকরা বিখ্যাত লেখকেরা গল্পের মান নির্ণয় করবেন। পরে এ গল্পগুলো বই হিসাবেও ছাপা হবে।'

শরৎ বলল, 'স্বদেশীর ব্যাপার সে তো ভালো কথা কিন্তু গল্প লেখা তা-ও আবার পুরস্কারের জন্য, আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। এতবড় লেখকদের মধ্যে আমায় কে মান দেবে?' গিরীন্দ্র বলল, 'তুমি জান না, সত্যিই তুমি খুব ভালো গল্প লেখ। একটা গল্প তুমি লেখোই-না, দেখো, ঠিক পুরস্কার পাবে।'

কিন্তু চিরদিনের স্বভাবমত তখুনি সে গল্প লিখতে রাজী হয়নি। মামারা যতই আগ্রহ করেন, সে ততই 'হ্যাঁ না' করতে করতে সময় নষ্ট করতে লাগল। শেষে গল্প দেবার শেষ দিনটি এসে পড়ল। গিরীন্দ্র আবার বলল, 'তুমি গল্প লিখছ না কেন? পুরস্কার না হয় না-ই পেলে। গল্প লেখো।'

অবশেষে শরৎ গল্প লিখতে রাজী হল। সেদিন সে যে গল্পটি লিখেছিল তার নাম ছিল 'মন্দির'। গল্প শেষ হতে হতে সন্ধে হয়ে এল; গিরীন্দ্রকে সঙ্গে করে তখুনি সে কুন্তলীন কার্যালয়ে গিয়েছিল।

কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক বসু মহাশয় বলেছিলেন, 'শেষের দিনটি শেষ ক্ষণে গল্প নিয়ে এসেছ?' শরৎ বলেছিল, 'যদি সময় ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে গল্প নেবার জন্য আমি অনুরোধ করব না।'

বসু মহাশয় হেসে বলেছিলেন, 'না, না, নেব না কেন? শেষ ক্ষণটিতে তো এসেই পড়েছ।'

গল্প দিয়ে শরৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। গল্পের উপর সে নিজের নাম দেয়নি, পুরস্কার সে পেতে পারে এ বিশ্বাস তার ছিল না। পুরস্কার না-পাওয়ার লজ্জা ও বেদনা সে সইতে পারত না, সেই ভয়ে নিজের নামের বদলে সুরেন্দ্রনাথের নাম লিখে দিয়েছিল। সুরেন্দ্রকে বলেছিল, 'আমি এই গল্পটা তোমার নামে পাঠিয়েছি, যদি ভাগ্যজোরে পুরস্কার পাই তা হলে, মোহিত সেন দ্বারা প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী আমায় পাঠিয়ে দিও।'

হয়তো নামের জোরেই প্রতিযোগিতার ফলাফল যখন ঘোষণা করা হয় তখন দেখা যায় যে প্রথম পুরস্কার বাঙালীটোলা, ভাগলপুরের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পেয়েছে। বন্ধুরা সুরেন্দ্রনাথকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাল। কিন্তু সুরেন্দ্রর মন গ্লানি ও লজ্জায় ভরে ওঠে। সে জানত যে, এই যশ ও সম্মান তার প্রাপ্য নয়। কিন্তু এ-যার প্রাপ্য, সেই শরৎ তো কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছে। দেড়শো গল্পের মধ্যে প্রথম হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কিন্তু উদাসী শরৎ তো চিরদিন নিজেকে আড়ালে রেখেই আনন্দ পেত।

রেঙ্গুন যাওয়ার কথা সে কাউকে জানায়নি। তার মনে সন্দেহ ছিল যে, বন্ধুবান্ধবেরা কেউই তাকে যেতে দেবে না। কিন্তু না গিয়েই বা সে কী করবে! সম্পূর্ণ ধূসর জীবন সামনে পড়ে রয়েছে, আছে ছোট ছোট ভাই-বোনদের দায়িত্ব, কাদের উপর এ-ভার সে ছেড়ে দেবে? যেমন করেই হোক উপার্জন তাকে করতেই হবে। শুধু দেবী মামাকে[১] সে নিজের যাবার কথা জানিয়েছিল। গাড়ি ভাড়া তার কাছে ছিল না। কারো কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে একদিন ভোর চারটের সময় সে ভবানীপুরের বাড়ি থেকে স্টীমার ঘাটের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়ল। দেবী মামা একা তার সঙ্গে ছিল। ভাড়া দেবার পর পকেটে তার একটি কি দুটি টাকা মাত্র ছিল। ভারতবর্ষে আবার কোনোদিন ফিরে আসতে পারবে কি না, এ কথা ভাববার মতো মানসিক অবস্থাও তার ছিল না।

এই পলায়নের সঙ্গে শরতের জীবন-নাটকের একটা অঙ্ক সমাপ্ত হয়। ছাব্বিশ বছর বয়স পেরিয়ে যৌবনের সূর্য মধ্যাকাশে এসে পৌঁছেছিল, কিন্তু হিমশীতল ঘন-কুয়াশায় তা ঢাকা ছিল। 'শ্রীকান্তে'র মতো অপরের ইচ্ছায় অপরের বাড়িতে থেকে বছরের পর বছর সে নিজের দেহকে কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে কোনো মতে টেনে নিয়ে গেছে, কিন্তু মন? তাকে সে কোন্ রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছিল, কোনো দিন আর সে মন সে ফিরে পায়নি।

এইভাবেই সেই উচ্ছৃঙ্খল বখাটে অল্পশিক্ষিত, নিঃসম্বল ব্যক্তি এক বন্ধুহীন, লক্ষ্যহীন প্রবাসের পথে বেরিয়ে পড়েছিল।

মায়ের মৃত্যুর পর, 'তুই খেয়েছিস কিনা' একথা জিজ্ঞেস করবারও তার কেউ ছিল না। পথ চেয়ে বসে থাকার কেউ ছিল না। কারো মনে এ ইচ্ছাও হত না যে, জিজ্ঞেস করে তার পরনের কিছু

১. দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আছে কি না? নিজের খেয়াল খুশিতে অভিনয়, গান-বাজনা, তামাক-খাওয়া ইত্যাদিতে নিজেকে ভুলিয়ে রাখত। সেজন্য অপমান তাকে সইতে হত। মামার বাড়িতে এ-সব কাজ দূষণীয় মনে করা হত। নিজের অসম্মান যে সে বুঝতে পারত না তা নয়, কিন্তু জানত যে, ধর্মগ্রন্থে যে আচার, সংহিতার বর্ণনা করা হয়েছে সে সব সময়োপযোগী নয়। যেমন যেমন যুগ বদলায়, আচার সংহিতাও বদলে যায়। তাই হয়তো সব রকম অপমান আসলে তার মনে শক্তি জুগিয়েছিল। তার দিশাহারা মনের ভিতর যে সৌন্দর্য ও সাহিত্য-সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তার পূর্ণ বিকাশে নিজস্ব জীবন তার পরিপূর্ণ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। দুঃখ শুধু উপভোক্তা হিসেবে সে সহ্য করেনি, দ্রষ্টার চোখ দিয়ে অনুভবও করেছিল।

দাসত্বের মুক্তি-নেতা রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের সঙ্গে শরতের তুলনা করা হয়তো সংগত নয়, কিন্তু প্রারম্ভিক জীবনে কয়েকটি প্রকৃতি তাদের দুজনের প্রায় একই ধরনের ছিল। শারীরিক শক্তি প্রদর্শন, আমোদ-প্রমোদ, অধ্যয়ন, গল্প বলার কৌশল ও ভালোবাসার বেদনা সম্বন্ধে দুজনেরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। লর্ড চার্নউড লিখেছেন, ...সে অরাজক বিচারধারা-সম্পন্ন কয়েকজন লেখককে অধ্যয়ন করেছে, যাদের মধ্যে টমাস পেন, ওয়ালটেয়র এবং বোলনে প্রমুখ ছিলেন.... মুর্গীর লড়াই, শারীরিক শক্তি প্রদর্শন, কুড়ুল, হাতুড়ি বা করাতের বিদ্যায়, তামাশা-মস্করা করার ইচ্ছে ইদানীং খুব বলবতী।.... নির্জনপ্রিয়তা ও নিজের মধ্যে নিজেকে লীন করার প্রবৃত্তি তার বেড়ে গিয়েছিল।.... লিঙ্কনের জীবনে প্রিয়তমার মৃত্যুর স্থায়ী প্রভাব দেখা যায়।

শরতের প্রিয়তমার মৃত্যু হয়নি কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছিল। এ বিচ্ছেদ তার জীবনে ভয়ংকর স্থায়ী প্রভাব ফেলে। কোথাও সে লিখেছিল—'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।'

সেজন্যই কি সে অতদূরের পথে পা বাড়িয়েছিল?

দ্বিতীয় পর্ব

দি শা ন্বে ষ ণ

শ্রীকান্তের মতোই ছোট্ট একটা লোহার ট্রাঙ্ক ও যৎসামান্য বিছানা-পত্র নিয়ে শরৎ যখন জাহাজ-ঘাটায় পৌছল, তখন লোকে লোকারণ্য। বিরাট আকারের মোট-ঘাট বোঁচকা নিয়ে যাত্রীরা সপরিবারে সারা রাত জেটিতে এই আশায় বসে ছিল যে সকালে জাহাজে সুবিধে মতো একটু জায়গা পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার লোকেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজে চড়ার আগে ডাক্তারী পরীক্ষা হচ্ছে। কে জানে কেমন পরীক্ষা? সন্দেহজনক স্থানগুলিতে যখন ডাক্তার হাত দিচ্ছিল তখন ভয়ে লোকের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল এই ভেবে যে, কোনো প্লেগের রুগী যাত্রীর সারিতে মিশে নেই তো? কারণ এই রোগ তখন বোম্বাই থেকেই বর্মায় ছড়িয়েছিল।

ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এবার জাহাজে চড়ার পালা। জাহাজে চড়ার ব্যাপারটাও একটু অদ্ভুত ধরনের। কাঁটা-দেওয়া চক্রাকার একটা মেশিন সর্বক্ষণ আগু পিছু ঘুরছে। উপরে গিয়ে তারপর নীচে জাহাজের গর্ভগৃহে নামতে হত, তারপর নিজের নিজের জায়গা দখল করে কম্বল সতরঞ্চি বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা করতে হত। শরৎ এখানে জায়গা পেল না, একেবারে উপরে গিয়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। বসার যেটুকু জায়গা পেয়েছিল সেখান থেকেই যা কিছু দেখল, জানল তাকে এককথায় ভারতদর্শন বললে মিথ্যে বলা হবে না।

শুধু কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার তো নয়, একভাবে প্রায় চারদিন শরৎ মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিল। যাত্রীদের মধ্যে এমন কতকগুলো লোক ছিল যারা প্রায়ই জাহাজে যাওয়া আসা করে থাকে। আবার কিছু লোক চাকরি-বাকরির চেষ্টায় বর্মা যাচ্ছিল। অনেকেই আবার হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি ও অনুশাসনের ভয়ে ভাব-ভালোবাসার লোকের সঙ্গে পালাচ্ছিল। কিন্তু এ-সব থেকেও ভয়ংকর ছিল সাইক্লোনের অভিজ্ঞতা।

শরতের অবশ্য সাইক্লোন সম্বন্ধে সঠিক কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। প্রথমে অল্প অল্প বৃষ্টি, তারপর হাওয়ার বেগের সঙ্গে বৃষ্টি জোরে জোরে পড়তে লাগল। মুষলধারে বৃষ্টি, জোর হাওয়া, গভীর অন্ধকার, তার সঙ্গে জাহাজের দোলানি, সমুদ্রের বিশাল ঢেউ—সব মিলিয়ে মনকে ব্যাকুল করে তুলছিল। ঠিক সেই সময়েই এমন একটা ভয়ংকর আর্তনাদ শোনা গেল যেন হাজার হাজার রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকার করছে আর পৃথিবীকে দুপায়ের তলায় থেঁৎলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ভয়ানক সামুদ্রিক হাওয়ার ঝাপটায় বাঁচাই দায় হয়ে উঠল। তার বিশাল ঢেউ জাহাজটাকে যেন গিলে ফেলবে। এক-একটা ঢেউ জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ছে আর চকমকির মতো কিছু একটা জ্বলে উঠছে। অন্ধকারে জলরাশি দেখার উপায় ছিল না। কিন্তু চকমকির আলোয় ভয়ংকরী সমুদ্রের আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছিল। হঠাৎ জাহাজের মধ্যে শোনা গেল যাত্রীদের প্রাণ ফাটানো চিৎকার। সমুদ্রের দুর্নিবার মহাতরঙ্গ জাহাজের বুকে এমনভাবে আছড়ে পড়ল যে, জাহাজ একেবারে জলে জলময়। মনে হল সবাই বুঝি ডুবেই যাবে কিন্তু তাণ্ডব যখন কমে এল তখন জাহাজের চতুর্দিকে তাকিয়ে মনে

হল মহাপ্রলয়ের চেয়ে কিছু কম ক্ষতি হয়নি। মাথা গোঁজার মতো একটু আশ্রয়ের জন্য মানুষ ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে জীব-জন্তু, পশু-পক্ষীরও আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল, সব মিলিয়ে সে এক এলাহি কান্ড। সারারাত মানুষের ধাক্কায় মানুষ শিল নোড়ায় মসলা-পেষার মতো পেষাই হতে লাগল। কয়েকজন আবার বমি করে ফেলল, পরিবেশ দুর্গন্ধময় হয়ে উঠল। খালাসি ও মেথর দিয়ে ডাক্তার জায়গাগুলো যতখানি সম্ভব পরিস্কার করাবার চেষ্টা করছিলেন।

এক বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে দিয়ে শরৎ রেঙ্গুন পৌছল। যখন রেঙ্গুন পোর্টের নিকট জাহাজ পৌছল, তখন সকলের মুখে মুখে করেনটিনের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। রেঙ্গুন পৌছবার পর জাহাজের খালাসি ডেকের উপর এসে চিৎকার জুড়ে দিল, 'রঙ্গম্ শহর, রঙ্গম শহর, সবাই তৈরি হয়ে নাও, করেনটাইনে যেতে হবে।' ওখানে না গিয়ে শহরে কেউ ঢুকতে পারবে না। প্লেগের দরুন বর্মা সরকার খুবই সজাগ। শহর থেকে আট মাইল দূরে কাঁটা বেড়া দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বানানো হয়েছিল। জাহাজের সব যাত্রীকে শহরে যাবার আগে এই কুঁড়ে ঘরে আট দশ দিন করে থাকতে দেওয়া হত। অবশ্য শহরে কারো কোনো পরিচিত লোক থাকলে নানা কৌশলে বেরিয়ে আসা যেত। শরৎ কাউকে খবর দেয়নি, উঁচু শ্রেণীর যাত্রীও সে ছিল না। কাজে কাজেই করেনটাইনে তাকে যেতেই হল। অভিজ্ঞতাই যার জীবনের সম্পদ, আর অনুভূতির রসেই যে সর্বদা স্নাত, তার পক্ষে করেনটাইনে থাকা খুব একটা দুঃখের ব্যাপার ছিল না। অন্তত জাহাজের মতো সাইক্লোন এখানে ছিল না, আর ছাগল-ভেড়ার মতো গাদাগাদি করে থাকতেও হত না। করেনটাইনে থাকার মেয়াদ শেষ হলে একদিন দাঠাকুরের হোটেলে কাটিয়ে , সম্পর্কে মেসোমশায় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে শরৎ ভিখিরির মতো গিয়ে পৌছল। উস্কোখুস্কো চুল, নোংরা জামাকাপড়, ছেঁড়া কামিজ, খালি পা, কাঁধে গামছা, তাছাড়া এতদিন নিজে রেঁধে বেড়ে খাওয়ার ফলে চেহারা আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল। বাড়ি পৌছে মেসো অঘোরনাথকে দেখতেই শরৎ কেঁদে ফেলল। চোখের জলেই মেসোকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মেসো তো অবাক ! জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে শরৎ ! তুই হঠাৎ কেমন করে এলি ?'

শরৎ বলল, 'আমায় করেনটাইনে আটকে রেখেছিল।'

মেসো অবাক হয়ে বললেন, 'তুই আমার নাম করলি না কেন ? কত লোক আমার নাম করে বেরিয়ে আসছে আর তুই মুখ্যুর মতো করেনটাইনে পড়ে থাকলি ?'

অঘোরনাথ রেঙ্গুনের একজন নামকরা অ্যাডভোকেট। তাছাড়া তিনি ছিলেন শহরের একজন ধনী এবং সম্মানিত ব্যক্তি। যেমন সুন্দর তাঁর চেহারা ও ব্যক্তিত্ব, তেমনই ছিলেন তিনি খোলা মনের মানুষ। প্রতি শনিবার তাঁর বাড়িতে খুব খাওয়াদাওয়া ও গান-বাজনার আসর বসত। সব জাতির ভদ্র সম্মানিত ব্যক্তিরা আসরে যোগ দিতে আসতেন। অঘোরনাথের স্ত্রী সেখানকার আদবকায়দায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বাজার হাট তিনি নিজেই করতেন। জ্যাকেট সেমিজ, জুতো-মোজাও পরতেন। এই রকম একটা সৌখিন কেতাদুরস্ত সংসারে শরৎ অনাথের মতো গিয়ে পড়ল। মাসি ও মেসো দুজনেই অত্যন্ত ভালোবাসা এবং আত্মীয়তার সঙ্গে শরৎকে আপ্যায়ন করেছিলেন। এ-সংসারে ভাগলপুরের অবহেলা ও উপেক্ষা যেমন ছিল না, তেমনই ছিল না ভবানীপুরের অপমান ও উপদেশ। মেসো বললেন, 'সবার আগে তুই বর্মী ভাষাটা শিখে আইনের বইগুলো পড়া আরম্ভ করে দে। তারপর তো তুই আমার মতো উকিল হয়ে যাবি। এরই মধ্যে তোর একটা চাকরির ব্যবস্থাও করে দেব।'

১ জানুয়ারি, ১৯০৩

তিন মাসের মধ্যেই বর্মা-রেলের অডিট অফিসে শরৎ চাকরি পেয়ে গেল। বাড়িতে মাসতুত বোনকে সংগীত শিক্ষাও দিতে লাগল। দুঃখের দিন হঠাৎ যেন উবে গেল। কিন্তু চিরদিনের দুর্ভাগ্য, কদিনের সুখ নিমেষে কেড়ে নিল। রেলের চাকরি দেড় বছরের বেশি টেঁকেনি আর বর্মী ভাষার পরীক্ষাতেও শরৎ কৃতকার্য হতে পারেনি। উকিল হওয়ার সাধ ও স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু সহজাত মিস্ট স্বভাব ও গুণের জন্য বর্মার মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে সে বেশ প্রিয় হয়ে ওঠে। শরতের মিস্ট কন্ঠ, কথা বলার ভঙ্গি, নানা ধরনের বানানো গল্প-বলা ও সেবাপরায়ণতায় সবাই তাকে সুনজরে দেখত। শরতের গান শুনবার জন্য শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অঘোরনাথের বাড়িতে আসতেন। এখানেই বিশ্বপর্যটক গিরীন্দ্রনাথ সরকারের[১] সঙ্গে শরতের পরিচয় হয়। গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরতের ঘনিষ্ঠতা শুধু সংগীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, খাওয়া-দাওয়া এবং পানের ব্যাপারেও দুজনে দুজনের দোসর ছিল। হঠাৎই একদিন বাড়ি ফিরে শরৎ দেখে যে, মেসোর নিউমোনিয়া হয়েছে। মাসি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সারারাত ধরে কয়েকদিন অক্লান্ত সেবা করেও মেসোকে বাঁচানো গেল না।[২] আবার, শরতের সহায়-সম্বলহীন নিরাশ্রয় জীবন আরম্ভ হল। শরতের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো নিয়ে নানান ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। শরৎ নিজেও বুঝতে পেরেছিল রেঙ্গুনে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কোনো-না-কোনো মামা আসবেনই আর আবার সেই উপেক্ষা আর অবমাননার জীবন। তার চেয়ে তাদের আসার আগেই এখান থেকে সরে পড়া ভালো। মাসির সঙ্গে মণীন্দ্রনাথ এলেন। লোকমুখে শুনলেন, শরৎ অসুস্থ অবস্থায় কোনো হাসপাতালে আছে। এমন রোগ যে, সবার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। মণিমামা শরতের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য মন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সহজেই বুঝলেন রোগটা কী ধরনের। তিনি শরতের সঙ্গে দেখা করবারও চেস্টা করলেন না। এর কিছুদিন বাদে লালমোহন মামাও এসেছিলেন, তিনি শরৎকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। বোনকেও তিনি শরতের বিরুদ্ধে এমনভাবে বোঝালেন যে, মাসির বাড়িতে শরতের আর থাকা হল না। কারণ আর যাই হোক, এরপর শরৎ আর কোনোদিন মাসির বাড়িতে পা দেয়নি।

২

মাসির বাড়ি ছাড়ার পর থেকে শরৎ আবার ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে কারো বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকত আবার হয়তো হঠাৎই রেঙ্গুন ছেড়ে পেগু বা উত্তর বর্মায় পালিয়ে বেড়াত। বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতো (পোঙ্গী) একদেশ থেকে অন্যদেশ ঘুরে বেড়ানোর নেশা বাঁশির নেশার মতোই তাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু নিজেকে নিয়ে ভাবলে তো আর চলবে না। দেশে ছোট ছোট ভাইবোনদের নিরাশ্রয় অসহায় অবস্থায় ছেড়ে এসেছে, তাই পাঁচ-ছয় মাস উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটাবার পর এগজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস্ অ্যাকাউন্টস[৩]-এর অফিসে মাসিক ত্রিশ টাকায় একটা অস্থায়ী চাকরি নিল।

পাবলিক ওয়ার্কস্ অ্যাকাউন্টস, বর্মার ডেপুটি এগজামিনার শ্রীমণীন্দ্রকুমার মিত্র এগজিকিউটিভ ইনজিনীয়ারের কার্যালয়ে অ্যাকাউন্টস দেখাশোনার ব্যাপারে পেগু এসেছিলেন। শরৎ সে-সময় সম্পর্কে তাঁরই এক ভাইয়ের বাড়িতে থাকত। শরতের গান সে বড় ভালোবাসত। একদিন মিত্রমহাশয়ের সম্মানে সান্ধ্য-ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক বন্ধুবান্ধবও সে নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। শরতের গান শোনার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে ছিল।

---

১. শরতের বর্মা প্রবাসকালীন বিষয়ে ইনি একটি পুস্তক লিখেছিলেন, যা এখন অপ্রাপ্য। যদিও তাঁর লেখায় অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা পাওয়া যায়।

২. ৩০ জানুয়ারি, ১৯০৫

৩. জুলাই, ১৯০৫

কে–একজন বলে উঠল, 'শরৎদা, ওই গানটা গাও না, ভাই।–ওহে জীবনবল্লভ, সাধন দুর্লভ।' শরৎ বার বার আপত্তি করা সত্ত্বেও কেউ তাকে ছাড়ল না, গান তাকে গাইতেই হল। সভা সমাজে আসার মতো এই একটিই গুণ ছিল তার। শরৎ একটার পর একটা গাইতে লাগল আর মিত্রমহাশয় মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। মিত্রমহাশয় খুবই সরলপ্রাণ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। মুগ্ধচিত্তে তিনি বললেন, 'শরৎদা, আপনার গলায় নিশ্চয়ই যাদু আছে, কী মিষ্টি গলা আপনার!' শরৎ মৃদু হেসে চুপ করে রইল, কিন্তু এই গানের সূত্র ধরেই ক্রমশ দুজনে গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। মিত্রমহাশয়ের দয়াতেই শরৎ চাকরিটি পায় কিন্তু মাসখানেক পরে শরৎ পেগু চলে যায়। সেখানে এগ্জিকিউটিভ ইনজিনীয়ারের পেগু ডিভিসনের অফিসে কাজ পায়।[১] সেখানে চতুর্থ শ্রেণীর পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টে অ্যাকাউন্টশিপের পরীক্ষা দেয় কিন্তু সফল হতে পারেনি।

একের পর এক অনেকগুলো অস্থায়ী চাকরি করে। মাঝে মাঝে আবার বেকারও থাকতে হয়েছিল। এই অবসর সময়ে বাঁশি বাজাত, দাবা খেলত, শিকার করত, আবার কখনও গেরুয়া বস্ত্র পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতো দিশাহীন যাত্রার পথে বেরিয়ে পড়ত। যখন ক্লান্তি বোধ করত রেঙ্গুন ফিরে আসত। বর্মায় একবার প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পোঙ্গী অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু হতে হয়। সেটা সাতদিনের জন্যও হতে পারে আবার কেউ কেউ আজীবনও পোঙ্গী থেকে যেত। পোঙ্গীর এই পোশাকে যথেষ্ট সম্মান পাওয়া যেত, আচরণেও যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকত, যেমন সিনেমা দেখা বা চুরুট খাওয়ার নিষেধ ছিল না। শরতের পোঙ্গী হওয়ার প্রতি বিশেষ একটা ঝোঁক ছিল। লম্বা লম্বা চুল ও দাড়ি রাখতে ভালোবাসত, ভাবত বাউলদের মতো হাতে একতারা নিয়ে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শেষ পর্যন্ত মিত্রমহাশয়ের কৃপায় এগ্জামিনার[২] পাবলিক ওয়ার্কস্ অ্যাকাউন্টসের রেঙ্গুন অফিসে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে একটা স্থায়ী চাকরি শরতের ভাগ্যে জুটে যায়। ভালো কাজের দরুন তিনমাস পরে মাসিক বেতন ৫০ টাকা থেকে ৬৫ টাকা করে দেওয়া হয়। এই চাকরি পাবার পর মনে হত শরতের অনিশ্চিত বোহেমিয়ান জীবনের বোধহয় পরিসমাপ্তি ঘটল। দশ বছর পর শরৎ যখন এই চাকরিতে ইস্তফা দেয় তখন তার বেতন প্রায় ৯০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল, আর তার অফিস বিভাগও অ্যাকাউন্টস জেনারেলের কার্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে সময় মণীন্দ্র মিত্রের বাড়িতেই শরৎ থাকত। সংগীত ও দর্শনচর্চায় কেউই ক্লান্তি বোধ করত না। এছাড়া মিত্র মহাশয়ের ছেলেমেয়েদের শরৎ সংগীত-শিক্ষাও দিত।

রেঙ্গুনে বাঙালীদের আলাদা একটা ক্লাব ছিল, 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাব'। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় সেখানে সংগীত, নাটক ও অধ্যয়নের আসর বসত। ক্লাবের অধিকাংশ সদস্যই সরকারী কর্মচারী ছিলেন। শরৎ এই ক্লাবের বিশিষ্ট গায়ক ছিল। তার গলায় রবীন্দ্রসংগীত শুনে ভাবুক শ্রোতারা ভাবে বিভোর হয়ে পড়ত। নীলকণ্ঠ, নিধুবাবু, দাশরথি রায় ইত্যাদি প্রাচীন কবিদের গান ছাড়াও বৈষ্ণব পদাবলী ও ভজনও সে ভালো গাইতে পারত। বাউল গান ও কীর্তন তার গলায় যেন মধুবর্ষণ করত। সেদিন সে জ্ঞানদাসের এই পদটি গাইল:

'তোমার গরবে গরবিনী রাই
রূপসী তোমার রূপে।'

মনে হল যেন ওর রুগ্ন শীর্ণ গলাখানি সংগীতের ভারে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। প্রাণের সবটুকু

১. অগাস্ট, ১৯০৫
২. এপ্রিল, ১৯০৬

বেদনা ও সরসতা নিয়ে সে গাইছিল। তার মর্মের ক্রন্দন গানের ভিতর দিয়ে সবার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। ওই একটি পদের জোরে শরতের কত ভক্তই না জুটে গিয়েছিল। অফিসের বন্ধু-বান্ধবরাও শরৎকে ছাড়ত না। মেসে কারো একটা হারমোনিয়াম পড়ে ছিল ধুলোয় ভর্তি, সেটাকেই ঝেড়ে মুছে বন্ধুরা শরতের হাতে তুলে দিল। বলল,'শরৎদা, আজ তো গাইতেই হবে।'

শরৎ গাইল:

'শ্রীমুখপঙ্কজ দেখব বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।।'

বন্ধুরা এই গানটি কোনো ভালো গাইয়ের মুখে শুনেছিল। সংগীতশাস্ত্রের দৃষ্টিতে হয়তো সে গায়কের গান শ্রেষ্ঠ হতে পারে কিন্তু যেখানে প্রাণের স্পর্শ মাখানো সংগীত, সেখানে শরৎ নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতম গায়ক। তাই আজ সকল শ্রোতার চোখ অশ্রুসজল।

বহু বছর পর 'শেষ প্রশ্নে'র স্রষ্টা শিবনাথের সম্বন্ধে বলেছেন, 'শিবনাথ মদ্যপায়ী মাতাল হওয়ার জন্য কলেজ থেকে বিতাড়িত, বেশ্যালয়েও সে মাঝে-মধ্যে যায়, তথাপি সে উঁচুদরের গায়ক, তাই এতগুলি সব গুণ থাকা সত্ত্বেও বড় বড় মজলিসে তার ডাক পড়ে।' শিবনাথ কি শরতের নিজেরই ছবি নয়? সুগায়ক হিসেবে শিবনাথের চেয়ে শরতের খ্যাতি কিছু কম ছিল না। গানের জন্যই সে অনেকের বন্ধু ও বহুজনের সান্নিধ্যে আসে। এই সময়েই 'পলাশীর যুদ্ধ' বইটির লেখক নবীনচন্দ্র সেন রেঙ্গুন আসেন। 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে' তাঁর সম্মানার্থে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। মণীন্দ্রনাথ শরৎকে অনুরোধ করেন, 'এই সভার অভ্যর্থনা-সংগীত কিন্তু তোমাকেই গাইতে হবে, শরৎদা।' গান শরৎ গেয়েছিল ঠিকই কিন্তু সবার অলক্ষ্যে পর্দার পিছনে বসে। বন্ধুদের সামনে গাওয়া সে এক ব্যাপার, আর বিশাল সভায় জনসমুদ্রের সামনে গান গাওয়া বা কিছু বলা শরৎ সবিনয়ে এড়িয়ে যেত। নিজেকে লুকিয়ে রাখার ঝোঁক দিন দিন তার বেড়েই যাচ্ছিল। সে দাম্ভিক ছিল না কিন্তু আত্মবিশ্বাসের অভাব তাকে পলায়নবাদী করে তুলেছিল। তাই লুকিয়ে-পালিয়ে বেড়িয়েই সে স্বস্তি অনুভব করত। পর্দার আড়ালে বসে গান গাইলেই কণ্ঠের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় না, তাই পর্দার আড়ালে গাওয়া শরতের সে কণ্ঠস্বরে সভার সবাই সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল। স্বয়ং সেনমশাই বিভোর হয়ে শুনেছিলেন সে গান। একটি রবীন্দ্র-সংগীতও সেদিন শরৎ শুনিয়েছিল। সভার শেষে সেন মশাই বলেছিলেন, 'আমি গায়কের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' শরৎ ততক্ষণে কিন্তু পালিয়ে বেঁচেছে। নবীনচন্দ্র সেন অবশ্য তাতে দমেননি। বলেছিলেন, 'এমন মধুর গলায় বাংলা গান খুব কমই শুনেছি, যেখান থেকে পারো তাকে একবার খুঁজে আনো।'

বারংবার অনুরোধ উপরোধ করা সত্ত্বেও শরৎ কিছুতেই সেনমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়নি। অবশেষে যখন জোর করে তাকে কোনোরকমে রাজী করানো গেল, তখন অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সেনমশাই যেখানে উঠেছিলেন, শরৎ সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে দেখল যে, সেন মশাই বৈঠকখানায় বসে রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে কথা বলছেন। দেখামাত্রই শরৎ পিছন ফিরে দৌড় মারল। শব্দ পেয়ে সবাই বাইরে এলেন। চকিত বিস্ময়ে সেনমশাই দেখলেন, এক পাটি জুতো সিঁড়িতে পড়ে রয়েছে আর শরৎ খালি পায়েই দৌড়চ্ছে। শেষ পর্যন্ত একদিন শরৎকে সেন মশায়ের বাড়িতে আসতেই হল। তিনি বলেছিলেন, 'আপনার গান-শোনার জন্য আমি চাতকের মতোই পিপাসিত।' শরৎ বলল, 'আমি তো গান শোনাতে আসিনি। আপনার ছেলে নির্মলচন্দ্র ভালো গাইতে পারে, আমি তার গান শুনতে এসেছি।' কবি নবীনচন্দ্র সেন বলেছিলেন, 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কি নির্মলচন্দ্রের তুলনা চলে?' রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী

রামকৃষ্ণানন্দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বললেন, 'আজ এখানে নির্মলচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সবাই উপস্থিত রয়েছে, আমি কিন্তু শরৎ-সুধাই পান করতে চাই।'

তবুও শরৎ নির্মলচন্দ্রের গাইবার পরই গাইল:

'আমার রিক্ত শূন্য জীবনে সখা বাকি কিছু নাই।
দাও বাঁচিবার মত তার বেশি নাই চাই।।'

কবিবর সেলমশাই বিভোর হয়ে শুনছিলেন, বললেন, 'আপনার গানের প্রভাবে অন্তরে যেন চিরসুন্দরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমি তো জানতাম না রেঙ্গুনে এমন একটা রত্ন লুকিয়ে আছে। আজ আপনাকে রেঙ্গুন রত্ন"উপাধি দিলাম।' এই উপাধির মর্যাদা শরৎ কি শেষ পর্যন্ত রাখতে পেরেছিল? উপেক্ষা আর অবমাননার আঘাতে কণ্ঠের মাধুর্যও সে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। সংগীতের প্রতি কেমন একটা অরুচি ধরে গিয়েছিল। কখনও যদি গাইতে বসত একটা গান গাইবার পরই উঠে পড়ত। বন্ধুরা বলত, 'শরৎদা, একি করছ? ঘাটে এসে তরী ডোবালে! অন্য গান না-ই বা গাইলে, এটা তো শেষ করো।'

কিন্তু কারো অনুরোধ সে রাখেনি। তার অস্থির চঞ্চল স্বভাব সংগীতের রসটুকু কখন শুষে নিল, লোকে ক্রমশ ভুলেও গেল শরৎ কোনো এক সময়ে খুব ভালো গাইতে পারত। চিরদিনই স্বাস্থ্যহীন, গাইতে গাইতে অবসন্ন হয়ে পড়ত। ক্রমশ যেন সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে নির্লিপ্ত একাকিত্ব তাকে পেয়ে বসল। নিরিবিলিতে বসে পড়াশুনো করতে তার ভালো লাগত, কেউ সেদিন হয়তো কল্পনা করতেও পারেনি যে, এই পলায়নের পিছনে তার মনে লেখক হওয়ার মৌন সাধনা লুকিয়ে ছিল।

৩

শরৎ নিজেকে নিরীশ্বরবাদী মনে করত ও সব রকম দুর্গুণ এবং বিলাসিতা সত্ত্বেও তার মন ছিল সত্যিই বৈরাগী। পড়াশুনোর ঝোঁক তার বরাবরই প্রবল ছিল, তাছাড়া পড়ার ব্যাপারেও কোনো বাছ-বিচার তার ছিল না। সমাজ শাস্ত্র, যৌনবিজ্ঞান, ভৌতিকশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, সব বিষয়ই সমান অনুরাগের সঙ্গে পড়ত। মণীন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের নিয়ে প্রচুর আলোচনা হত। দর্শনশাস্ত্রের প্রতি এই অনুরাগের জোরেই রেঙ্গুনের স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে। প্রথম প্রথম সে মিস্ত্রিপল্লীর লোকেদের সঙ্গে কীর্তনে যোগ দিতে যেত, পরে তাদের সঙ্গে ঈশ্বরচর্চাও করত। সেদিন হঠাৎই শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা স্বামীজী, ঈশ্বরকে আপনি দেখতে পান না কেন?'

স্বামীজী বললেন, 'ঠাকুর বলেছেন, সমুদ্রের ভেতর রত্ন লুকিয়ে রয়েছে, তবে তা পেতে হলে যত্নের প্রয়োজন। তেমনই ঈশ্বর আছেন তবে তাঁকে জানতে হলে সাধনার প্রয়োজন। শ্যাওলা ঢাকা পুকুরের জল নিতে হলে শ্যাওলা সরিয়েই নিতে হবে, ঠিক সেই রকমই মায়ায় বন্ধ চোখের পাতা না খুললে ঈশ্বর দর্শনও পাওয়া যায় না। সবার আগে মোহমুক্ত হতে হবে।'

শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'মোহ বা মায়া কী বস্তু?'

স্বামীজী বললেন, 'বিষয়বস্তু আর কামিনী কাঞ্চনে লিপ্ত থাকাই মোহ। এই মোহের আবরণ ছিঁড়ে সরল চিত্তে তাঁকে ডাকলে নিশ্চয় তাঁর দয়া পাওয়া যাবে।'

শরৎ বলল, 'শুনেছি, তিনি তো মঙ্গলময় তবুও পৃথিবীতে এত দুঃখদুর্দশা কেন?'

স্বামীজী হেসে জবাব দিলেন, 'এই সংসারে যাকে আমরা দুঃখ বলি সে তো বাস্তবিকই কোনো দুঃখ নয়, সে তো দুঃখেরই দীক্ষা। সুখের ছোঁয়া পেলেই লোকে দুঃখকে ভুলে যায়। কিন্তু ব্যথা বা দুঃখ আছে বলেই তো বোঝা যায় দুঃখই এই পৃথিবীর প্রিয় বস্তু, নইলে আমরা তাঁকে মনেই বা রাখব কেন।'

শরৎ খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকার পর বলল,'অদৃষ্ট আর পুরুষকারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'

স্বামীজী বললেন, 'পূর্বজন্মের অর্জিত ফলের নামই অদৃষ্ট, যদিও বর্তমান জীবনের অনেক কিছুই তার সঙ্গে জড়িত থাকে; চলতি কথায় যাকে আমরা কর্ম বলে থাকি। দেবতা আর পুরুষকার একই জিনিস। এক ছাড়া অপরের গতি নেই। এই জন্যই দেবতার সাধনায় পুরুষকারের প্রয়োজন। আবার তেমনই পুরুষকারের সাধনায় দেবতা বা ভগবদ্‌কৃপা আবশ্যক।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শরৎ জিজ্ঞেস করল,'গেরুয়া কাপড় না পরেও কি সন্ন্যাসী হওয়া যায়?'

স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'কেন যাবে না? ধর্মের সম্বন্ধ তো মনের সঙ্গে। গেরুয়া ধারণ না করেও মন মুক্ত হতে পারে। মনের জন্যই মানুষ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কাজেই প্রথমে মন মুক্ত হওয়া দরকার, তারপর তো বাইরের সাহায্য। মন যদি উপযুক্ত হয় তবেই গেরুয়া তার সাহায্যকারী হয়, নইলে লোক দেখানো ভড়ং ছাড়া আর কিছু হয় না।'[১]

এই ধরনের কথাবার্তা আলাপ–আলোচনা প্রায়ই হত। মনে হয় প্রচুর বিলাসিতার মাঝেও শরতের বৈরাগী মন নীরবে ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়ে থাকত।

এই সময়ে রেঙ্গুনে হঠাৎই প্লেগ ভয়ংকরভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মিত্রমহাশয়ের বাড়িতে খুব ইঁদুর মরতে লাগল। তিনি ঘরবাড়ি ছেড়ে শহর থেকে দূরে কোথাও চলে গেলেন। শরৎ সঙ্গে গেল না, অফিসের অন্য বাবুদের সঙ্গে মেসে গিয়ে উঠল। প্লেগের মহামারী এমনই দুর্দান্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কারও আর পরের দুঃখ চিন্তা করার অবসর ছিল না। সবাই ভয়ে পালাচ্ছিল। রুগী একাই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। বরাবরের অভ্যেসমত এবারও এই দারুণ দুঃসময়ে শরৎ দুঃখী আতুর জনের পাশে এসে দাঁড়াল, যতবড় সাহসীই হোক–না কেন 'প্লেগ' এই মারাত্মক শব্দ শোনামাত্রই পরম প্রিয়জনকেও ছেড়ে লোকে প্রাণভয়ে পালায়, কিন্তু শরৎ হাসিমুখে নিতান্ত অপরিচিতের পাশে পরম নির্ভয়ে গিয়ে দাঁড়াত। বরফ ও ওষুধ কিনে আনত। রাজুর মানসিক করুণার পাঠশালায় যে শিক্ষা সে পেয়েছিল, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা সে ভোলেনি। এই সব দিনের ব্যক্তিগত কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা পরে 'শ্রীকান্ত'–এ ফুটে উঠেছে। শরৎও একদিন জ্বরে পড়ল, মেসের বন্ধু আগেই জ্বরে পড়েছিল। তবুও দুজনে একে অপরের মাথায় আইসব্যাগ দিচ্ছিল। বন্ধুর অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। কখনও জ্ঞান ফেরে, বেশির ভাগ সময়ই অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। সেই অবস্থায় শরৎকে নিতান্ত আপনার ভেবে পরম বিশ্বাসে বলেছিল, 'আমার ট্রাঙ্কে কয়েকটা গিনি আছে, আমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়ো। ঠিকানাও বাক্সে পাবে।' শরৎ ভেবেছিল মেসের অন্য বন্ধুরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, কিন্তু এল না। ভয়ে ভয়ে পাশের ঘরে শরৎ উঁকি দিয়ে দেখল বালিশে মাথা দিয়ে পাশাপাশি দুজন ঘুমোচ্ছে, হাজার চেঁচালেও এ ঘুম তাদের আর ভাঙবে না। ফিরে এসে দেখল বন্ধু তখনও মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে, অল্পক্ষণের মধ্যেই পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে রাতে শরতের আর শোওয়া হল না। পরের দিন বন্ধুর বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠানো, পুলিসে খবর দেওয়া এবং শবদাহের ব্যবস্থা করতে করতে সন্ধে হয়ে এল। নিজের শরীর তেমন সুস্থ ছিল না; কোথায়ই বা যাবে? তবে শরতের জ্বর প্লেগের জ্বর ছিল না, কয়েকদিন পরেই সে সুস্থ হয়ে ওঠে। অসুস্থ অবস্থায় এই কদিন কোথায় কেমনভাবে কেটেছে সঠিক খবর কেউ জানতে পারেনি।

১. গিরীন্দ্রনাথ সরকার—'ব্রহ্মদেশে শরৎ'।

মিস্ত্রিপাড়ায় নিচু শ্রেণীর লোকরা থাকত। শরৎ প্রায়ই এই মিস্ত্রিপাড়ায় যেত। শরতের মনের দুরপনেয় হীনমন্যতা, সভ্যসমাজ-বহির্ভূত এই-সব ছোট শ্রেণীর লোকেদের মাঝে এসে আনন্দ পেত। দেশেও সে জাতি বহিষ্কৃত ছিল, তার আত্মীয়স্বজন তাকে নিজের বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করতেন। ভদ্র ও প্রতিষ্ঠিত লোকেরা তাকে চরিত্রহীন ভাবত, ঘৃণা করত, অধার্মিক ও অধঃপাতে যাওয়া লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে তারা ঘৃণাবোধ করত। অবচেতন মনে হয়তো শরৎ তথাকথিত সভ্য সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ তুলতে চাইত, তাই সমাজে যারা হেয়, নিচু, তাদের প্রতিই সে আকৃষ্ট হত। এ ধরনের বিচিত্র প্রবৃত্তি অবশ্য শরতের লেখায় প্রধান সহায় হল। অফিসের পর সোজা স্থানীয় নামকরা বার্নার্ড লাইব্রেরিতে গিয়ে চুপচাপ পড়াশোনা করত। লাইব্রেরিতে তার কোনোরকম বিধিনিষেধ ছিল না। কোন্ আলমারির কোন্ তাকে কোন্ বই আছে সব তার নখদর্পণে ছিল। প্রত্যেকটি বই-ই তার পড়া হয়ে গিয়েছিল। বইগুলোকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতোই ভালোবাসত। প্রিয় লেখক টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা' ও 'রেজারেকশন' বই দুখানি তার বড় প্রিয় ছিল। 'আনা কারেনিনা' প্রায় বার-পঞ্চাশেক পড়েছিল। এই সাধনার ছাপ তার লেখায় স্পষ্ট দেখা যায়। 'নারীর মূল্য', 'নারীর ইতিহাস', এই রচনাগুলির সামগ্রী সে এখান থেকেই আহরণ করে। রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতা ফেরার সময় শরৎ বলেছিল, 'এই বার্নার্ড লাইব্রেরির জন্যে রেঙ্গুন ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে হয় না, কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এত স্বাধীনতা আমি কোথায় পাবো?' 'পথের দাবী'র কবির বিষয়ে সব্যসাচী বলেছিল, 'তোমরা কেউ ওকে জানো না, ভারতী, ওর মত সত্যকার গুণী সহসা কোথাও তুমি পাবে না। ওই ভাঙা বেহালাটি মাত্র পুঁজি করে ও যায় নি এমন জায়গা নেই। তাছাড়া ভারি পণ্ডিত। কোথায় কোন্ বইয়ে কি আছে, ও ছাড়া জেনে নেবার আমার আর দ্বিতীয় লোক নেই।'

শরৎকেই বা কে চিনতে পেরেছিল? এই সময় শরৎ 'চরিত্রহীন' লেখায় ব্যাপৃত ছিল, যদিও ভারতবর্ষে থাকাকালীনই সে বইখানি লিখতে শুরু করে। 'চরিত্রহীন'-এ যে মেসের বর্ণনা পাওয়া যায়, সে অভিজ্ঞতা রেঙ্গুনে থাকাকালীনই সে আহরণ করেছিল। 'চরিত্রহীন'-এর নায়ক সতীশ মেসে থাকত। সারা দিন কাজকর্মের পর লণ্ঠন জ্বেলে সে যখন লিখতে বসত মেসের তখন সবাই বিরক্ত হত। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলত, 'দেখ, দেখ, ইনি ভবিষ্যতে লেখক হবেন, তাই অর্ধেক রাতে লণ্ঠন জ্বালিয়ে লিখতে বসেছেন। উহুঁ, পঞ্চাশ টাকা মাস মাইনের কেরানী লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। শখের বলিহারি যাই!' বন্ধুরা শরৎকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত, বাতি নিবিয়ে দিত, কখনও কখনও রাগারাগিও হয়ে যেত। নানান কারণে তিতিবিরক্ত হয়ে শরৎ মিস্ত্রিপাড়াতেই বসবাস করতে মনস্থ করল। মিস্ত্রিপাড়া শহর থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে 'বোটাটাং পোজান ডং' রোডের কাছে ছিল। ধান, কাঠ ও ঢালাইয়ের অনেকগুলো কারখানা এখানে থাকার দরুন অনেক বাঙালী মিস্ত্রির বসবাস এখানে ছিল। রাস্তার ধারে ধারে এদের বাড়িঘর ছিল, দূরে একটা বড় খোলা মাঠও পড়ে ছিল। মাঠের অপর কোণ ঘেঁষে অর্ধচন্দ্রাকারে পোজাং ডং-এর শুরু। বড় সুন্দর সে দৃশ্য, চেয়ে দেখার মতই। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে এ দৃশ্য শরৎ তন্ময় হয়ে দেখত। মিস্ত্রিপাড়াতে থাকার দরুন অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক কমে এল। শুধু কয়েকজন বন্ধু ছাড়া মিস্ত্রিপাড়ায় কারিগরেরাই তার বন্ধু হয়ে উঠল। কলকারখানার জনমজুরদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি লড়াই ঝগড়া বেধে যেত আর শরৎকে তাদের মোড়ল হতে হত। ছুটির দরখাস্ত লেখা, বাড়িতে চিঠি লিখে দেওয়া, দেশে মনিঅর্ডার পাঠানো, সবই শরৎকেই করে দিতে হত। আবার এরা যখন অসুখে পড়ত হোমিওপ্যাথী ব্যাগটি সঙ্গে করে ঘরে ঘরে তাদের পরিচর্যা করতে বেরিয়ে পড়ত। এই সময় শরতের বন্ধু বঙ্গচন্দ্র দে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুজনে বহুদিন মেসে একসঙ্গে ছিল, বড় প্রিয় বন্ধু। বঙ্গচন্দ্র পূর্ববঙ্গীয়, প্রতিষ্ঠিত পরিবারের ছেলে। বিশেষ অধ্যয়নশীল ব্যক্তি, ইংরেজি পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হত। কিন্তু একদিকে জ্ঞানপিপাসাও যেমন তার তীব্র ছিল, শরীরের পিপাসাও তার অত্যন্ত উগ্র ছিল। হাস্যপরিহাসে যেমন মেতে উঠত, তেমন মদ্যপানেও সে আকণ্ঠ ডুবে থাকত। স্বভাবের এই মিলের জন্যই

দুজনের বন্ধুত্বের বাঁধনও শক্ত ছিল। শরৎচন্দ্র প্রায় তাঁকে গেঁয়ো বাঙাল বলে রাগাত, বঙ্গচন্দ্রও খুব রাগারাগি করত। বঙ্গচন্দ্র নবীনচন্দ্রের ভক্ত ছিল আর শরৎচন্দ্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। দুজনের কবিতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে তর্ক লেগে যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন শরৎ কবিগুরুর এই কবিতাটি শোনাত,

'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল
সুধা সাগরের তীরেতে বসিয়া,
পান করে শুধু হলাহল।'

বঙ্গচন্দ্র আর কিছু না বলে নীরব হয়ে যেত। পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার মধ্যে রেষারেষি সর্বজনবিদিত। তবুও দুজনের মধ্যে ক্ষণেকের জন্যেও কখনও মন কষাকষি হয়নি। রাগারাগি, হাসিঠাট্টা, খাওয়া-দাওয়া, পান করা, গভীর দর্শনচর্চা—সবই হত। বঙ্গচন্দ্র শরতের প্রতিভাকে চিনতে পেরেছিল। শরৎ বঙ্গচন্দ্রের গভীর জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তবুও নিবিড় মানবতাই দুজনের বন্ধুত্বের প্রধান কারণ হয়েছিল। তাই বঙ্গচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শরৎ তক্ষুনি মেসে গিয়ে পৌঁছল। রোগ সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আশেপাশের বন্ধুরা ওকে ছেড়েই পালিয়ে গিয়েছিল। শরৎ কিন্তু প্রাণ দিয়ে সেবা করে। সামান্য সুস্থ হলে বন্ধুকে নিজের বাসায় নিয়ে এল। বন্ধুর জন্য ওষুধ আনা, গরম জলের সেঁক দেওয়া, সাবু বার্লি তৈরি করে খাওয়ানো সবই একহাতে করত। মাঝে মধ্যে হাসিঠাট্টা করেও আবহাওয়াকে হালকা করার চেষ্টা করত। কিন্তু এত করেও বন্ধুকে সে বাঁচাতে পারেনি। শরতের কোলে মাথা রেখেই চিরদিনের মতো সে চোখ বুজেছিল। প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু শরৎকে কাতর করে তোলে, এ মৃত্যু বড় মর্মান্তিক হয়ে তার বুকে বেজেছিল। গান, বাজনা, হাসিঠাট্টা যেন চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল। শুধু সেই চিরদিনের একাকীত্ব, মনন ও সাহিত্য-সৃজন তার দোসর হল। বৈরাগী মন বিবাগী হয়ে গেল।

৪

বরাবরের অভ্যেসমত রাতে দেরি করে ফিরে দরজা খুলতে গিয়ে শরৎ দেখল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। অবাক হয়ে ভাবল, ভিতরে কে থাকতে পারে? কী জানি, ঘরে চোর ঢুকল নাকি? জোরে একবার ধাক্কা দিল কিন্তু বাস্তবিকই দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

শরৎ ডাকল, 'ভেতরে কে?'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একবার নয়, বারকয়েক ডাকার পর একটা কাতরানি শুনতে পাওয়া গেল, সামান্য শব্দ করে দরজা খুলে গেল। বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে শরৎ দেখল, ঝড়ে-ওড়া শুকনো পাতার মতোই দাঁড়িয়ে কাঁপছে যজ্ঞেশ্বর মিস্ত্রির মেয়ে শান্তি। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়ছে। চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কী ভেবে শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে শান্তি? তুমি এখানে এমন করে কেন এসেছ?' অনেক আশ্বাস দেওয়ার পর একটু সুস্থির হয়ে শান্তি বলল, 'বাবা পয়সা নিয়ে একটা মাতাল বদমাশ বুড়ো ঘোষালের সঙ্গে আমার বিয়ে পাকা করে ফেলেছেন। আজ নেশায় পাগল হয়ে আমার সঙ্গে বদমাইশি করতে এসেছিল, সেই ভয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে আপনার ঘরে আমি পালিয়ে এসেছি.....।' এই বলে শরতের পায়ের উপর পড়ে শান্তি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমায় রক্ষা করুন, আমায় আপনি বাঁচান।'

ভাববার আর কীই বা ছিল! শান্তি তার আশ্রয়ে এসেছে, শরৎ কেমন করে পিছিয়ে যাবে, তাই বলল, 'তুমি ভয় পেয়ো না, শান্তি। আজকের রাত তুমি এখানেই শুয়ে পড়ো। আমি আর

কোথাও যাচ্ছি। সকালে এসে তোমার যা হোক একটা উপায় নিশ্চয়ই করব।' শরৎ জানত, যজ্ঞেশ্বর মিস্ত্রির বাড়ি মাতালদের আড্ডা। যত সব নেশাখোর গেঁজেলরা তার সংগী। ঘরে বউ নেই। শান্তি বেচারীকেই তাদের ফাইফরমাস খাটতে খাটতে নাজেহাল হতে হয়। এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি হলে চক্কোত্তি মশাই শান্তিকে নির্মম প্রহার করত। 'পথের দাবী'তে ভারতী এমনই এক বাঙালী মিস্ত্রির বাসায় গেছে, সেই প্রৌঢ় মিস্ত্রি পিতল ঢালাইয়ের কাজ করত। মদ খেয়ে কাঠের মেঝেয় পড়ে কাউকে খারাপ গালমন্দ দিচ্ছিল। ভারতী জিজ্ঞেস করল, 'মানিক, কার উপরে রাগ করেছ? সুশীলা কই? আজ দুদিন সে পড়তে যায় না কেন?'

মানিক কোনোরকমে বেসামাল অবস্থা আয়ত্তে এনে উঠে দাঁড়াল, আর ভালোভাবে তাকিয়ে ভারতীকে লক্ষ্য করে বলল, 'দিদিমণি? এসো, বসো। সুশীলা কী করে তোমার ইস্কুলে যাবে বলো? রাঁধা-বাড়া, বাসন মাজা, মায় ছেলেটাকে সামলানো পর্যন্ত—বুক ফেটে যাচ্ছে, দিদিমণি। যোদো শালাকে আমি খুন না করি তো আমি কৈবর্ত থেকে খারিজ। বড় সাহেবকে এমনি দরখাস্ত দেব যে শালার চাকরি খেয়ে দেব।'

শান্তির প্রতি অজান্তেই শরতের মন সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল। সকাল বেলায় শান্তির বাপকে ডেকে শরৎ বলল, 'শুনলাম শান্তির বিয়ে তুমি বুড়ো ঘোষালের সঙ্গে ঠিক করেছ?'

যজ্ঞেশ্বর বলল, 'হ্যাঁ।'

'ঘোষাল তো শান্তির যোগ্য বর নয়, একে বুড়ো তায় নেশাভাং করে।'

চক্রবর্তী কঠিন স্বরে বলল, 'আমি গরিব লোক, এই বিদেশে এর চেয়ে ভালো পাত্র কোথায় পাব? ঘোষালের পয়সা আছে, মেয়ের খাওয়া পরার দুঃখ থাকবে না। নেশা করে তার কী হয়েছে, নেশা তো আমিও করি, আপনিও করেন। আর বয়সের কথা যদি বলেন তো, পুরুষমানুষের আবার বয়স দেখে নাকি কেউ?'

চক্রবর্তী মিস্ত্রির ব্যাখ্যা শুনে শরৎ হেসে ফেলল, তাকে বোঝাবারও অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। চক্রবর্তী নিজের মতে অটল হয়ে রইল। শেষে শরৎ বলল, 'ঘোষালের কাছে যদি আপনি ধারী হন, আমি তা শোধ করে দেব।'

চক্রবর্তী বলল, 'তাতে আর কি হল? মেয়ের বিয়ে তো আমায় দিতেই হবে। আর বাবুমশায় এতই যদি আপনার প্রাণে দয়া মায়া থাকে, তাহলে এই গরিব ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে নিজেই বিয়ে করে আমার জাতিকুল বংশের মান-মর্যাদা রক্ষা করুন না।'

চক্রবর্তীর কথা শুনে শরৎ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। নিজের বিয়ের কথা তার মাথাতেই আসেনি, বিয়ে সে করতেও চায় না। বোধহয় কৈশোরের ব্যর্থ প্রেম এখনও সে ভুলতে পারেনি। তাই চক্রবর্তীর কথার জবাব না দিয়ে চুপচাপ সেখান থেকে চলে গেল, কিন্তু চিরদিনের মতোই তার মন একটা মেয়ের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টায় অনেক জায়গায় কাকুতি-মিনতি করল, অনেকের হাতে-পায়ে ধরল কিন্তু একটা যোগ্য বর খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত চক্রবর্তীর বাসায় গিয়ে শরৎ বলল, 'আমি এ বিয়ের জন্য তৈরি, চক্রবর্তী মশাই।'

শান্তির সঙ্গে শরতের এই বিয়ে কোন্ রীতি ও নিয়মে সম্পন্ন হয়েছিল, রেঙ্গুনের ক'ঘর কুলীন বাঙালী এই বিয়েতে যোগ দিয়েছিল, তার সঠিক লিখিত প্রমাণ কারও কাছে নেই। লোকেদের ধারণা, আদপে শরৎ বিয়েই করেনি বরং ছোট জাতের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘর করেছে। এইরকমভাবে কোনো মেয়েকে নিয়ে পড়ে থাকাকে লোকে খাঁটি চরিত্রহীনতাই মনে করেছিল।

যাই হোক-না কেন, তার এতদিনের অব্যবস্থিত জীবনে নারীর পদার্পণ ঘটল, নারীর কোমল স্পর্শে শরতের জীবনের গতি আনন্দের স্রোতে গিয়ে ভিড়ল। নারী তার জীবনে আসেনি তা নয়, তবে সংসারী হওয়ার এই তো তার প্রথম সুযোগ। বিয়ের পর জীবনের অর্থই যেন তার বদলে গেল, সে আর একা নয়। তার প্রিয়তমা স্ত্রী তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে, কারণ আজ সে শুধু

স্বামীই নয়, তার স্ত্রীর ত্রাণকর্তা। না জানি কত দুঃখের দিন কাটিয়ে এটুকু সুখের মুখ সে দেখতে পেয়েছিল। দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্প করত, দুজনের চোখে দুজনে কি জানি কী খুঁজত। অফিসের বন্ধুরা তাকে স্ত্রৈণ বলত, শরৎ কিন্তু কিছু বলত না। শুধু কারো কোনো অসুখ হলে, মিস্ত্রিপাড়ার কেউ ডাকলে নিজের হোমিওপ্যাথী ওষুধের ব্যাগটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত কিংবা যখন লেখার প্রেরণা পেয়ে বসত তখন লেখার সাধনায় ডুবে থাকত। এছাড়া শরতের সংসার 'শান্তি'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর এক বছর পর সংসারে একটি নতুন প্রাণীর আগমন হয়। শিশুর কলকাকলীতে বাড়ি মুখর হয়ে উঠল। ভালোবাসা ও সহানুভূতির অভাবে যে এতদিন আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভদ্রসমাজে যার স্থান জোটেনি, সমাজের নগণ্য মানুষের আশ্রয়ে যাকে বারবার ছুটতে হয়েছে, তারই গৃহপ্রাঙ্গণ যখন স্ত্রীর ভালোবাসা ও সন্তানের হাসি কলরবে মুখর হয়ে উঠল, তখন স্বেচ্ছাচারী মানুষটার মন না জানি কী এক অপ্রত্যাশিত আনন্দে ভরে উঠেছিল।

কিন্তু বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে থেকে হেসেছিল—তাই নতুন করে সংসার পাতার দু'বছরের মধ্যেই রেঙ্গুন শহরে আবার প্লেগের মহামারী দেখা দিল। চারিদিকে হাহাকার, অগণিত মৃতদেহ, এক দুর্বিষহ আবহাওয়ার মধ্যে একদিন শান্তিও জ্বরে পড়ল। এই উগ্র জ্বরের সঙ্গে শরতের পূর্বপরিচয় ছিল। বহু রোগীর সেবায় তার অনুভূতি দক্ষ হয়ে উঠেছিল। সহজেই বুঝতে পারল, প্লেগ শান্তিকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। প্রতিবেশীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল কিন্তু সকলেরই তো দুঃসময়, কেই বা এগিয়ে আসবে। বন্ধু গিরীন্দ্র সরকারের কাছে গিয়ে শরৎ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'ভাই গিরীন, বড় বিপদে পড়েছি। শান্তি ভয়ঙ্কর জ্বরে ছটফট করছে।'

'কী বলছ, শরৎদা? কাকে দেখিয়েছ?'

'এখনও পর্যন্ত তো ডাক্তার ডাকাই হয়নি, মাসের শেষ, হাতে বিশেষ কিছু নেই।'

'তুমি ভেব না। আমি অপূর্ব ডাক্তার বা ডাক্তার দে-কে সঙ্গে নিয়ে এখুনি আসছি।'

সে সময় গিরীন্দ্রনাথ সরকার একটি সৎকার সমিতি গড়েছিল। এই সৎকার সমিতি রুগীর চিকিৎসা ও মৃত্যুর পর দাহকার্যে সাহায্য করত। শরৎ বলল, 'তুমি সৎকার সমিতি গড়ে বড় পুণ্য করেছ, ভাই। এই বিপদে আমায় রক্ষা করো।' তারপর হতাশ হয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল। বলল, 'সবই ভাগ্য, ভাই। যা লিখিয়ে এসেছি, তাই তো হবে।'

গিরীন্দ্রনাথ সরকার শরৎকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। সমিতির আলমারি খুলে রুগীর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ও ওষুধপত্র দিয়ে বলেছিল, 'তুমি বাড়ি যাও আমি আসছি।'

কিছুক্ষণ পর ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সরকার যখন শরতের বাসায় পৌঁছল, শান্তি তখন একটা তক্তপোষের উপর শুয়ে চাদরে মুখ ঢেকে ছটফট করছিল, প্রাণটুকু গলার কাছে যেন কোনোরকমে আটকে আছে। একটি বুড়ি তার শিয়রে বসে পাখার বাতাস করছিল। ডাক্তার রোগিণীকে দেখামাত্রই বুঝলেন, এ প্লেগের রুগী, বাঁচার বিন্দুমাত্রও আশা নেই। ডাক্তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। শরৎ আরও ভেঙে পড়ল, কাতর অনুনয়ে বার বার ডাক্তারের কাছে শান্তির প্রাণভিক্ষা চাইছিল। শরতের অবস্থা দেখে সবার দুঃখ হচ্ছিল কিন্তু করারই বা কী ছিল? সান্ত্বনা দিয়ে করণীয় যা কিছু বলে-কয়ে যে যার ফিরে গেল। শরৎ আবার রোগিণীর শিয়রে গিয়ে বসল। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে শান্তির জ্ঞান ফিরে এসেছিল। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল, 'আমার জন্য তুমি অনেক দুঃখ পেলে, ক্ষমা করে দিয়ো।'

আর্দ্র কণ্ঠে শরৎ বলেছিল, 'এ কথা বোলো না, আমার বড় ভয় করে।'

শান্তি বলল, 'ছি, ভয় কিসের? আমায় আশীর্বাদ করো, তোমার পায়ের একটু ধুলো আমায় দাও।' শরৎ বুঝতে পেরেছিল, আর আশীর্বাদ করার মতো কিছু নেই, সব শেষ। সকল প্রয়াস ও প্রার্থনা ব্যর্থ করে দিয়ে পৃথিবীর সব দুঃখকষ্টকে তুচ্ছ করে শান্তি পরলোকে চলে গেল। স্ত্রীর প্রাণহীন বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে শরৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। প্লেগের রুগী মরেছে জানলে

প্রতিবেশীরা কেউই সে সময়ে প্রাণভয়ে এগিয়ে আসত না। শরতের এই দুঃসময়ে সাহায্যকারী কেউ ছিল না। ভদ্র বাঙালী সমাজকে সে নিজেই এড়িয়ে চলত, তাই তারাই বা আসবে কেন? শুধু বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সাহায্যে একটি কুলী জোগাড় করে ঠেলাগাড়ি করে শান্তির শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। শ্মশানে এক সন্ন্যাসী থাকতেন, শরতের নিঃসঙ্গতা ও সঙ্গতিহীনতা বুঝতে পেরে তিনি স্বয়ং চিতা নির্মাণ করে শব দাহ করার ব্যবস্থা করলেন। স্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে শরৎ শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মেয়েদের মতো চিন্তা করত, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমি স্বামী ছিলাম, আজ আর কেউত নই। ছোট শিশুর মতোই কাঁদত। বন্ধুরা শরতের ব্যথায় সমব্যথী কিন্তু শরতের মন একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল। কৈশোর জীবনের ব্যর্থ প্রেমের মতোই এই দুঃখ তার জীবনে গভীর এবং স্থায়ী রেখাপাত করে। লেখা, অধ্যয়ন, ছবি আঁকা সব-কিছু ছেড়ে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। ছোট বাচ্চাটাও মহামারীর হাত থেকে রেহাই পায়নি। জীবনের অফুরন্ত পাওয়া হঠাৎ যেন এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল, শুরু হল আবার সেই পুরোনো নিঃসঙ্গ জীবন।

অনেক বছর পরে বন্ধুর জোয়ান ছেলে যখন মারা যায়, তার মাকে শরৎ বলেছিল, 'দিদি, তবু তো তুমি এত বছর ছেলের মুখ দেখলে।আমি তো মাত্র এক বছরের মধ্যেই সে সুখে চিরদিনের মতো বঞ্চিত হয়ে রইলাম।'

বন্ধুরা পরামর্শ দিল, 'কিছুদিন বাইরে ঘুরে আয়।' শরতের সম্পূর্ণ জীবনটাই তো একটা যাত্রা, এক দিশাহীন, উদ্দেশ্যহীন যাত্রা। বরাবরের মতো এবার আর সে ইচ্ছেমত বেড়াতে পারল না, কারণ অফিসে নির্ধারিত সময় পর্যন্তই ছুটি পাওয়া যায়। কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আবার সে কর্মস্থলে ফিরে আসে। দুঃখ তো বলে বেড়িয়ে লাভ নেই, তাকে সইতে হয়, তবেই তা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ মৃত্যুশোক তার জীবনে গভীরতা ও ব্যাপকতা এনে দিয়েছিল। শরৎ বাসা ছেড়ে পাশেই অন্য বাসা বদল করেছিল। পুরোনো বাসার সবটুকুতেই যে তার অল্পমেয়াদী দাম্পত্যজীবনের ছবি আঁকা ছিল।

৫

বহুমুখী প্রতিভাধর ধনী রবীন্দ্রনাথের মতো শুধু সাহিত্যই নয়, সংগীত ও চিত্রকলার প্রতিও শরতের তীব্র অনুরাগ ছিল। যদিও এক্ষেত্রে তার অনুভূতি তেমন গভীর ছিল না, তবুও এমন সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, কয়েক বছর সে চিত্রকলার সাধনায় মনোনিবেশ করেছিল।

তিন বছর পরে বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা জানিয়ে প্রিয়বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টকে শরৎ একখানি চিঠি লেখে[১],-'আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকি আছে। বছর তিনেক আগে যখন"হার্ট ডিজিজ" এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া"অয়েলপেন্টিং"শুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি অয়েলপেন্টিং সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে। এখন আমার কি করা উচিৎ যদি বলিয়া দাও ত, তোমার কথামত দিনকতক চেস্টা করিয়া দেখি। নভেল, হিস্ট্রি, পেন্টিং—কোন্‌টা? কোন্‌টা আবার শুরু করি বলতো?'

মনে হয় এই অগ্নিকান্ডের পর ছবি আঁকার প্রতি তার তেমন রুচি আর ছিল না। শুধু মহাশ্বেতার চিত্র যা আগুনে পোড়েনি সেটাই পুরো করেছিল।[২] মনে হয় সে সময় আরো কয়েকটা ছবি এঁকেছিল। শরতের বন্ধু ও সহকর্মী যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন, 'এক রবিবারে গিয়া দেখি, ইজেলের উপর কাপড় ঢাকা একখানা ছবি।'

১ ২২ মার্চ, ১৯১২
২ ১৮ মার্চ, ১৯১৩, গিরীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি।

'ওখানা কী, শরৎদা?'

প্রশ্ন শুনিয়াই সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা তুমিই বল আগে কী ওখানা?'

'কী আর হবে—ছবি।'

'বড় তো বললে ছবি।..... ছবি ছাড়া ওখানা আর কী হতে পারে? কার ছবি যদি বলতে পার তো বুঝি তোমার অনুমানের জোর।'

'যদি বলি নারদমুনির- ?'

'হ্যাঁ তাই। এই দ্যাখ' বলিয়াই ছবির উপর হইতে কাপড়ের ঢাকনাটা সরাইয়া দিলেন। আমি তো দেখিয়া অবাক। সত্য সত্যই যে সেই বুড়োর ছবি। গ্রাম্য পুকুরের পাড়ে এলোমেলো গাছপালা, তারই মধ্যে দিয়া আঁকাবাঁকা ভাঙাচোরা রাস্তা, তারই পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া একটি বৃদ্ধ। যে একবার ওই নারদমুনিকে দেখিয়াছে, সে কদাপি এমন কথা বলিবে না যে, এ আর কারও ছবি। বার্ধক্য ও দারিদ্র্যের উপর নৈরাশ্যের কেমন গাঢ় ছায়াপাত হইয়াছে, সেটিই দেখিবার বিষয়।'

সরকার ছবিটা দেখছিল ঠিক সেই সময়েই বুড়ো এসে হাজির। সিঁড়িতে পা দিয়েই হাঁকল, 'দেবতা ঘরে আছে?'

শরৎ তখুনি নীচে নেমে গিয়ে বড় যত্নের সঙ্গে হাত ধরে বুড়োকে উপরে নিয়ে এল। তারপর সেই ছবিটি তার সামনে এনে রাখল। দেখামাত্রই বৃদ্ধের কোটরে বসা দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'দেবতা, এতও আপনার মাথায় আসে?'

প্রত্যুত্তরে শরৎ বলল, 'দ্যাখ নারদ, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। কাজটা ভাবছ খুব শক্ত? না, তা নয়। রোজ সকালবেলা আমার এখানে ঘণ্টাখানেকের জন্যে আসতে পার? চা-টাও খেতে পারবে, আর আমার এই ছবি আঁকাও দেখতে পারবে।'

চায়ের নামে বুড়োর জিভে জল এসে গেল। শরৎ এক পেয়ালা চা তার হাতে এনে দিয়ে বলল, 'বড়ই কষ্ট হয়েছে, নাও, চা খাও।'

বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের হয়েছে তো, দেবতা?'

শরৎ বলল, 'ওহে, দেবতাদের কি আর ওটি বাকি থাকতে আছে? তুমি এখন খেয়ে নাও চট করে। নইলে ঠান্ডা হয়ে যাবে।' সরকার জিজ্ঞেস করল, 'এ শিক্ষার গুরু কে, শরৎদা?'

নিজের কপালখানা দেখিয়ে জবাব দিল, 'এ গুরু আমি নিজে।'

প্রকৃতির ছবি আঁকা অপেক্ষা মানব-আকৃতি আঁকার প্রতিই শরতের বেশি ঝোঁক ছিল। তার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ শারীর-বিজ্ঞান জানা না থাকলে মানব-আকৃতি আঁকা যায় না। যদি কোনো আকৃতি জীবন্তই না হয়, তাহলে আর তাকে ছবি বলা যায় কী করে? মনে হয় শরৎ বিখ্যাত চিত্রকার ভিনসেন্ট ভ্যান গগ্-এর কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিল। ভ্যান গগ্ বলেছিলেন, 'মানব শরীরের পূর্ণজ্ঞান না থাকলে সুষ্ঠু মানব আকৃতি আঁকা সম্ভব নয়। কারণ তা শুধু অনুকরণই হবে, যথার্থ হবে না।'

একদিন সরকারকে শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বলো তো সরকার, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় পেন্টার কে?'

সরকার বলল, 'র‍্যাফেল বড় পেন্টার।'

'উঁহু—হল না। র‍্যাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্জেলো বড়। তবে বড় বড় আর্ট ক্রিটিকদের মতে, তিসিয়ান সবচেয়ে বড় পেন্টার।'

তিসিয়ান সম্বন্ধে শরতের খুব উঁচু ধারণা ছিল। ইতালীয় চিত্রকলাকে শরৎ নিজের মতে শ্রেষ্ঠ মনে করত। তারপরের স্থান ফ্লেমিস, ডাচ ও ব্রিটিশ চিত্রকলার ছিল। 'ছবি' গল্পে শরৎচন্দ্র বাথিনকে অমর করে রেখেছে। বাথিনের কাছ থেকেই সে শিল্পকলার প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। সাধারণত বাঙালীরা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে ভালোবাসে কিন্তু শরৎ এর ব্যতিক্রম। অফিস ছাড়াও অবাঙালীদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ও মেলামেশা ছিল। শিল্পী বাথিনও

শরতের এমনই এক বন্ধু। একবার সতীশচন্দ্র দাসকে[১] সঙ্গে করে শরৎ বাথিনের বাড়ি দেখা করতে যায়। তিনি লিখেছেন, 'সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আলোকের সুবন্দোবস্ত নাই, রাস্তাঘাটেরও কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না, সন্ধ্যাতে ঠাকুর ঘরের আরতি নাই, শঙ্খধ্বনি নাই। আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, "একি শরৎদা, কোথায় নিয়ে এলে বলো দেখি?" শেষকালে কি গুন্ডা বদমাশের হাতে প্রাণটা খোয়াব"?'

'শরৎদা বলিলেন, "না হে না, এসো-না আমার সঙ্গে। গুন্ডা বদমাশের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমাকে আমাকে মারতে আসবে।"

"তুমি যাহ বল না দাদা, এমন বিশ্রী জায়গায় লোকে বেড়াতে আসে? তাও আবার অন্ধকার রাত্রে? যদিও আমরা পল্লীগ্রামের লোক, এ যে পল্লীরও বাড়া?" অনুমানে বুঝিতে পারিলাম বর্ষাকালে রাস্তায় চলাও কষ্ট, এখনো এক-একখানা ইষ্টকখণ্ড পড়িয়া মাটির সঙ্গে আটকাইয়া রহিয়াছে। শরৎদার মুখে কথা নাই, আমিও অনন্যোপায় হইয়া পেছন ধরিয়া চলিলাম বটে, কিন্তু বস্তীর কুকুরের কথা মনে পড়িয়া আমার বুক শুকাইয়া গেল। বর্মীদের দুই-চারিটা কাঠের বাড়ি রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কেরসিনের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে গৃহপালিত কুকুরগুলি বর্মীদের ঘরের দাওয়ায় শুইয়া নতুন আগন্তুককে দেখিতে পাইয়া প্রভুর মুখপানে ও আগন্তুকের পানে এক-একবার তাকাইয়া মনিবের আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। এদেশের কুকুরগুলো এমন সাংঘাতিক, কোনো প্রকার সাড়া শব্দ না দিয়া পেছন দিক হইতে লোককে আক্রমণ করে। আমি আগেও দু-একবার এ-বিপদে পড়িয়াছিলাম। আমি শরৎদাকে বলিলাম, "শরৎদা, বস্তীর বর্মীদের কুকুরগুলি কিন্তু বড় সাংঘাতিক—"

'কথাটা বলিতে-না-বলিতেই শরৎদা বলিলেন, "ভয় নেই, তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে। পশু হলে কি হবে, তারাও লোক চেনে।" কিছুদূর যেতে-না-যেতেই সামনের একটা কাঠের বাড়ির সম্মুখে গিয়েই শরৎদা দাঁড়াইলেন। শরৎদাকে দেখিয়াই একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক তাদের নিজের ভাষায় শরৎদাকে ডাকিতেই, তিনিও বর্মীদের ভাষায় কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। পাশে একটি বর্ষীয়সী মেয়েও বসিয়া ছিল, স্ত্রীলোকটি আবার কি বলিতেই মেয়েটি বাহির হইয়া গেল। আমরা দুখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। স্ত্রীলোকটি শরৎদার সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিল, ঠিক যেন কত-কালের পরিচিত নিজেদের আত্মীয় বন্ধুর ভিতরের একজন। কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি শরৎদার বন্ধুকে আনিয়া হাজির করিয়া দিলেন। বহুদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা হইলে যেরূপ আদর অভ্যর্থনা ও নানাপ্রকার দুঃখ দৈন্যের পালা আরম্ভ হয়, তাদের দুজনের মধ্যেও সেরূপ পালা আরম্ভ হইয়া কিছুক্ষণ পরে অনুযোগের পালা আরম্ভ হইল। এবার আরম্ভ হইল অভ্যর্থনার পালা। ক্রমান্বয়ে টেবিলে নানাপ্রকার খাদ্যবস্তু আসিয়া সজ্জিত হইতে লাগিল। শরৎদা চুপি চুপি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাবে?" আমি তো দেখেশুনেই অবাক, বলে কি? যাদের খাদ্যের কোনো বিচার নাই, তাদের সঙ্গে খেয়ে কি শেষকালে জাতটা হারাব? আমি নিজের জাত কুল বজায় রাখিয়া হিন্দুয়ানী মতে চা রুটি কতক ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। কিন্তু এদিকে শরৎদা তাঁর বন্ধু, বন্ধুর স্ত্রী ও মেয়েটিকে লইয়া এক টেবিলে বসিয়া গল্পগুজব করিতে করিতে আহার করিতে লাগিলেন।

'আমি বলিলাম, "শরৎদা, এবার উঠে পড়ি, ঘরে গিয়ে পৌঁছুতে রাত অনেক হবে।" শরৎদা বন্ধুর হাতে হাত মিলাইয়া উঠিয়া পড়িলেন, বন্ধুটি গলির মোড় পর্যন্ত একটা আলো লইয়া আসিয়া আমাদিগকে বড় রাস্তায় পৌঁছাইয়া দিয়া গুড নাইটের পালা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাস্তায় চলিতে চলিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শরৎদা, এরা কে, এদের সঙ্গে এত বন্ধুত্বভাব হলো কী করে? বোধহয় এক অফিসেই কাজ করে, না?"

১ ইনি শরতের বর্মা প্রবাস সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিখেছেন ('শরৎ প্রতিভা')।

'শরৎদা বলিলেন, "না হে না, এ লোকটি চিত্রবিদ্যায় ওস্তাদ। ঘরেতে যে-সব চিত্র দেখলে এরি হাতের তৈরি, আমার সঙ্গে আলাপ পেগুতে।"

'আমি আবার বলিলাম, "বন্ধু হিসাবে না হয় দেখা করতে এলে দাদা, কিন্তু সঙ্গে খেলে কী করে?"

'এবার শরৎদা হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "পাগল আর কাকে বলে? এরাও যে হিন্দু জাতির শাখা। এ জাতিটা বড় ধর্মভীরু, আর লাজ-লজ্জা এদের ভেতরে মোটেই নেই। দু-দিন আলাপ হতে-না-হতেই এরা লোককে আপনার করে নিতে পারে। হিংসা, ঘৃণা, লজ্জা এদের ধর্মের বিরুদ্ধে"।'

ছবি আঁকার দিকে শরতের ঝোঁক বাবার কাছ থেকেই পাওয়া। মতিলালও ভালো শিল্পী হতে পারতেন কিন্তু জীবনে কোনো কাজেই তিনি টিকে থাকতে পারেন নি। বাপের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন ও সাধনা শরতের মধ্যে বিকশিত হতে চাইত। বাখিনের সহযোগিতায় শরৎ কয়েকটি সুন্দর চিত্র এঁকেছিল। তার মধ্যে 'মহাশ্বেতার' ছবিটি এত ভালো হয়েছিল যে, বন্ধুরা বলেছিল, 'তোমার ছবি প্রদর্শনীতে পাঠাও না কেন?'

খ্যাতি এবং প্রচার দুইই শরতের স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাই বন্ধুদের অনুরোধ রাখতে পারেনি। তার শিল্পসাধনার বিষয়ে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন, 'আলো ও ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু ইহাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে করিবার মতো নয়। বাস্তবিকই তাহার মধ্যে এ্যানাটমির জ্ঞান, পারস্পেক্টিভ এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের আইডিয়া সমস্তই বিদ্যমান ছিল। শিল্পীর বর্ণজ্ঞানও যে নিতান্ত কম ছিল, তাহাও বলিতে চাহি না। মোটের উপর একসঙ্গে নিসর্গচিত্র ও মনুষ্যচিত্র মিলাইয়া যাহা হয় ঠিক তাই, এই তপস্বিনী মহাশ্বেতার চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, প্রকৃতির খেয়ালী সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।

'বর্ষার দিনে অচ্ছোদের তীর ঝাপসা দেখাইতেছিল, ওপারে মেঘভারাবনত আকাশ আরও অস্পষ্ট, ইহার একপাশ দিয়া লাজুক সূর্য একটুখানি উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। তীরে তরুতলে এলোকেশী সদ্যস্নাতা তপস্বিনী মহাশ্বেতা রোরুদ্যমানা প্রকৃতিদেবীরই যেন একখানা জীবন্ত আলেখ্য।'

ছোট ঘরের একটা কোণে ছবিটি রাখা থাকত। আলো-আঁধারে ঘেরা অপরিসর সেই ছোট্ট ঘরের কপাট খুললে যেটুকু আলো ঘরে এসে পড়ত সেই আলোতেই ছবিটি চোখে পড়ত। এইভাবেই শরৎ সরকারমশাইকে ছবিটি দেখিয়েছিল। তিনি লিখেছেন, 'সকল উন্নত কলার মধ্যেই সেই চির সুন্দরের আনন্দঘন রসমূর্তিরই বিকাশ সাধনের চেষ্টা। বাস্তবিকই একটুখানি উদার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, আপাত কুৎসিত জিনিসটিও সুন্দর বলিয়া মনে হয়। অবশ্য শরৎবাবু যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছিলেন সেটি নগ্ন সৌন্দর্যের চিত্র নয়। নগ্ন হইলেও বোধ হয় কুৎসিত বলিতে পারিতাম না এই কারণে যে, তাহার সহিত পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের কেমন চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল। ছবিটি শরতের বিশেষ প্রিয় ছিল। গিরীন মামাকে লিখেছিল,' 'ছবিটি এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। যদি বলতো সম্পূর্ণ করি। আমার তো বাড়ি ঘর কিছুই নেই, তোমার আছে। ছবিটি আমারও বিশেষ প্রিয়, এটি যাতে নষ্ট না হয় তাই তোমার কাছে রাখতে চাই।'

এসব সত্ত্বেও তার শিল্প সাধনা একমুখী ছিল, কোনো ছবিই উঁচুমানের ছিল না, তবুও মনের মধ্যে ছিল ব্যাকুল ইচ্ছা আর শিল্পের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। লেখকরূপে শরৎ যখন খ্যাতির শিখরে তখন কলকাতা আর্ট কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সিংহর বাড়িতে তাঁর আঁকা 'মা ও ছেলের' ছবি দেখে সেও পেন্সিল স্কেচে ছবিটি এঁকেছিল। সতীশচন্দ্রের পুত্রের আঁকা 'হর-পার্বতীর' ছবি দেখে সেও হর-পার্বতীর স্কেচ এঁকেছিল। ছবিগুলি আজও কোথাও সুরক্ষিত আছে।

১. ১৮ মার্চ, ১৯১৩

রেঙ্গুন যাবার সময় শরৎ নিজের যাবতীয় লেখা বন্ধুদের কাছে রেখে গিয়েছিল। 'বড়দিদি' তারই মধ্যে বেশ বড় গল্প। গল্পটি সুরেন্দ্রনাথের নিকট ছিল। যাবার সময় শরৎ বলে গিয়েছিল, ছাপবার দরকার নেই, তবু যদি ছাপানো হয় তাহলে 'প্রবাসী' ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকায় তার অনুমতি বিনা যেন গল্প না দেওয়া হয়। ভাগলপুরের মুন্সেফ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। 'প্রবাসী'র সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় ছিল, তিনি সুরেন্দ্রনাথের 'সাহিত্য সংহার' সভার সদস্যও ছিলেন। সেই সভায় শরৎচন্দ্রের গল্প পড়া হয়। শরতের গল্প জ্ঞানেন্দ্রবাবুর খুব ভালো লাগাতে 'বড়দিদি' গল্পটি 'প্রবাসী'তে ছাপাবার জন্য নেন। সে সময়ে শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী 'ভারতী' পত্রিকা বার করেছিলেন। বেশির ভাগ সময়ই লাহোরে থাকতেন তাই তাঁর একজন সম্পাদকের দরকার ছিল। এই কাজের জন্য সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা হয়। সৌরীন্দ্রমোহন শরতের বন্ধু ছিল। 'বড়দিদির' একটা কপি তার কাছে ছিল। সে গল্পটি সরলা দেবীকে পড়তে দেয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু 'বড়দিদি' 'প্রবাসী'তে ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা জানা যায়নি, তবে সরলা দেবীর কাছে গল্পটির প্রশংসা করেছিলেন সরলাদেবী বলেছিলেন, 'চমৎকার। এটি দাও, 'ভারতী'তে ছাপতে। এক সংখ্যায় শেষ না করে তিন চার সংখ্যায় শেষ করো। লেখকের নাম প্রথমে চেপে রেখো; শেষের সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশ করো। লোকে ভাববে, রবীন্দ্রনাথের লেখা। এ লেখার জোরে আমাদের দৈন্য খেসারৎ হয়ে যাবেখন।' সৌরীন্দ্র বলল, কিন্তু 'বড়দিদি' যে ছাপতে দেব ছাপবার জন্য লেখকের অনুমতি নিইনি।' সরলা দেবী বললেন, 'চিঠি লিখে অনুমতি নাও।'

'তার উপায় নেই। তিনি এখন বর্মায়। তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। আমরা বহুকাল তার কোন খবর পাইনি। অজ্ঞাতবাসে আছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।'

সরলা দেবী বললেন, 'যেখানেই থাকুন। এ গল্প ছাপা হলে সে সংবাদ তিনি কারো না কারো মুখে শুনবেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া গল্প ছাপার দায়িত্ব তুমি নিতে পারবে না?' একথা শুনে সৌরীন্দ্রমোহনের বুক গর্বে ভরে ওঠে, বলল, 'খুব পারব। তিনি পাবলিসিটি চান না, বলতেন লিখে আনন্দ পাই। তোমরা পড়ো সেই ঢের। কাজ কি ছেপে? তা ছাড়া কে বা পড়বে আমার গল্প?' সরলা দেবী বললেন, 'এত বড় শক্তিসম্পন্ন লেখকের shyness ভালো নয়। দাও ছেপে - তুমি দায়িত্ব নাও।'

সৌরীন্দ্রমোহন রাজী হয়ে তিনটি সংখ্যায় গল্পটি ছাপাবার ব্যবস্থা করল। দুর্ভাগ্যবশত তৃতীয় কিস্তিটি কোনো কারণে খোয়া যায়। এবার কি হবে? ভাগলপুরে বিভূতি ভূষণ ভট্টকে লিখলে সে জানালো, শরতের লেখা গল্পগুলো আছে সুরেনের কাছে। সৌরীন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে লিখল, 'বড়দিদি'র শেষাংশের কপি হারিয়েছে। তুমি যদি কপি করে না পাঠাও, তা হলে 'ভারতী'র জীবন সংশয়াপন্ন।' 'ভারতী'র সেই সংখ্যাটি' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সাহিত্যিক মহলে সাড়া পড়ে গেল। এত সুন্দর লেখা কার হতে পারে? সাবলীল মিষ্ট ভঙ্গি, ভাষার কী অপূর্ব বাঁধন। এ-তো বাংলার প্রতিটি ঘরের কাহিনী কেউ যেন বড় নিপুণ হাতে কাগজের উপর তুলে ধরেছে। সাহিত্যরসিকরা ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথই ছদ্মনামে গল্পটি লিখেছেন। এত সুন্দর উৎকৃষ্ট লেখা আর কারই বা হতে পারে? 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের মতও তাই ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, নতুন কোনো গল্প আপাতত তিনি লিখছেন না। 'ভারতী'তে 'বড়দিদি'র প্রথম কিস্তি পড়ে মজুমদার মশায় অবাক হয়ে গেলেন। পত্রিকার একটি কপি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের

---

১ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—'শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য'।

২ 'ভারতী' বৈশাখ, (এপ্রিল-মে, ১৯০৭)।

কাছে গিয়ে বললেন, 'উপন্যাস লিখবেন না বলেছিলেন, এই তো লিখছেন 'ভারতী'তে—নাম না দিয়ে।' রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'উপন্যাস তো আমি লিখছি না, হতে পারে আমার কোনো কবিতা এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করে ছাপা হয়েছে?' অবাক হয়ে শৈলেশ বললেন, 'কবিতা টবিতা নয়, রীতিমত উপন্যাস।'

'উপন্যাস? কি বলছ শৈলেশ? আমি উপন্যাস লিখলাম আর তা 'ভারতী'তে ছাপাও হয়ে গেল। নিশ্চয় কোথাও কোনো ভুল হয়ে গেছে।'

বিরক্ত হয়ে শৈলেশ, 'ভারতী'তে ছাপা 'বড়দিদি'র অংশটুকু পকেট থেকে বার করে বললেন, 'নাম না দিলেও আপনি নিজেকে লুকোতে পারবেন না। এবার আপনি কি আর না বলতে পারবেন?'

শৈলেশের অভিযোগের তীব্রতার দরুনই হোক বা 'বড়দিদি'র প্রারম্ভিক অংশের দু-চার লাইনের আকর্ষণেই হোক রবীন্দ্রনাথ নীরবে অংশটুকু পড়লেন। বললেন, 'সত্যিই ভারি চমৎকাব লেখা, এ আমি লিখিনি, অন্য কারুর লেখা। কিন্তু যিনি লিখেছেন তিনি অসাধারণ শক্তিশালী লেখক। তাঁর ওই একটি মাত্র গল্প প্রকাশ করে নিঃশব্দে নেপথ্য-বাস শুধু অনুচিত নয়—নিষ্ঠুর হবে।'

ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরাও গল্পটি পড়লেন। প্রত্যেকের মনে একই প্রশ্ন, লেখক কে? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব জামাই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতী'র সম্পাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি সৌরীন্দ্রকে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'বড়দিদি'র লেখক কে?' তারপর অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে সৌরীন্দ্রর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৌরীন্দ্রর কাছে শরতের সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সৌরীন্দ্রনাথ সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে শেষে বলেছিল, 'শরতের লেখা এ ধরনের অনেক গল্প আছে।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'জমা করে রেখেছ কেন? ছাপো দেশের মঙ্গল হবে।'

সৌরীন্দ্র বলল, 'কিন্তু সে তো এখানে নেই, রেঙ্গুনে কোথায় থাকে তাও আমার জানা নেই। তার অনুমতি ছাড়া কেমন করে ছাপা যায়?' রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'যা হোক কিছু করে তার খোঁজ করো, ধরে আনো তাকে। বাংলাদেশে ওর জোড়া আর লেখক পাবে না।'

টলস্টয়ও নিজের প্রথম গল্প 'শৈশব' এল এন এর ছদ্মনামে লিখেছিলেন। গল্পটি পড়ে সেন্ট পীটার্সবার্গের সাহিত্যিক-জগতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল।

একজন লেখক তো বাড়ি বাড়ি গিয়ে গল্পটি শোনাত; আর তুর্গেনিভ সেই অজ্ঞাত লেখকের এমনই প্রশংসা করেছিলেন যেমন শরতের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ করলেন। তিনি সম্পাদককে লিখেছিলেন, 'নিঃসন্দেহে সে প্রতিভাসম্পন্ন লেখক। তাকে লেখো যে, লেখা যেন না ছাড়ে। আর এ কথাও জানিয়ে দিয়ো তাকে আমার প্রণাম জানালাম, সঙ্গে প্রশংসা ও শুভেচ্ছা পাঠালাম।'

'বড়দিদি' গল্পটির প্রশংসা রেঙ্গুনে বসে শরতের কানে পৌঁছল, কিন্তু স্বভাববশতই কারোর কাছে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেনি। তৃতীয় কিস্তিতে যখন ছাপার অক্ষরে শরতের নাম দেখা গেল, তখন বন্ধুদের মনে সন্দেহ হল, এ আমাদের পাগলা শরৎ নয় তো? একজন তো শরৎচন্দ্রকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই "বড়দিদি"র লেখক?' শরৎ একটু কঠিন স্বরে বলল,-"ভারতী"তে আমি আমার কোন লেখা পাঠাইনি।'

কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে সে কিছুই লুকোয়নি। যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে সে সব-কিছুই জানিয়েছিল, বলেছিল, 'এ আমার অল্প বয়সের লেখা। সুরেন্দ্রর কাছে রেখে এসেছিলাম, মনে হয় গল্পটি পত্রিকায় সে-ই পাঠিয়েছে।' 'বড়দিদি' বের হওয়ার পর শরৎ হাইড্রোসিল অপারেশন করাতে কলকাতা এসেছিল। প্রায় মাস চারেক[১] সে কলকাতায় ছিল। খুব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও

১ নভেম্বর, ১৯০৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯০৮

বিশেষ প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেনি। মনে হয়, রেঙ্গুনে থাকাকালীন নিজ আচরণের জন্য বন্ধুদের কাছে যেতে চায়নি। বন্ধুদের এড়িয়ে গেলেও বিবাহযোগ্যা মেয়ের বাপেরা তাকে খুবই বিরক্ত করতে আরম্ভ করে। একটি চিঠিতে[১] শরৎ লিখেছে, 'আমার দুঃখের দিনে তাঁহারা যে কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু আজ নিশ্চিন্ত হইয়া বাকি দিন কটা কাটাইয়া দিবার যেই সময় আসিয়াছে, অমনি দয়া করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহারা কোন্ অজ্ঞাত স্থান হইতে যে বাহির হইতেছেন, নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার তো নাই।'

কলকাতায় এসে কোনো বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি শরৎ কখনোই উঠত না। কোনো অখ্যাত পল্লীতে গিয়েই উঠত। এই অখ্যাত নোংরা গলির বদনামী মেয়েদের মধ্যেই সে নারীত্বের সন্ধান খুঁজে পেয়েছিল। না-জানি কত অভাগিনী নারীর ইতিহাস সে সঞ্চয় করেছিল। তাদের কাছেই সে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করে। নিজমুখে এ সব কথা বলতে কোনোদিন সে কুণ্ঠাবোধ করে নি। তার এরকম স্বভাবের জন্যই বোধহয় কেউ আশ্চর্য হয়নি যে, 'বড়দিদি'র এত প্রশংসা হওয়া সত্ত্বেও সে সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে দেখা করা উচিত মনে করেনি। শুধু যাওয়ার সময় ছোট ভাই প্রভাসচন্দ্রকে বলেছিল, 'ভারতী'র যে কটা সংখ্যায় 'বড়দিদি' বের হয়েছে, সেগুলো কিনে যেন সে পাঠিয়ে দেয়।

কলকাতায় থাকাকালীন বন্ধুদের সঙ্গে কেন সে দেখা করেনি, এ সম্বন্ধে রেঙ্গুন থেকে একটি চিঠি বিভূতিভূষণ ভট্টকে লেখে, 'অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি—প্রার্থনা করিতেছি যেন এখানি তোমার হাতে পড়ে। আমার সমস্ত দুষ্কৃতি ভুলিয়া সবটুকু স্নেহের চক্ষে পড়িয়ো ভাই, যেন এ লেখা আমার সাথক হয়। তোমাদের চিঠি লিখিতে লজ্জা করিতেছে—ভয় হইতেছে যে, এই বানান ভুল এলোমেলো লেখা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিবে, আর মনে করিবে ছেলেবেলায় এই লেখা কেমন করিয়াই বা ভালবাসিতে। এমনি অদৃষ্ট আমার যে, বোধহয় মাসচারেক কলিকাতায় থাকিয়াও তোমাদের দেখিতে পাইলাম না। তুমিও কলিকাতায় আসিলে, অথচ এমনি ভুল করিলে যে দেখা হইল না। এখন মনে হইতেছে যে, কোনদিন কোনকালেও দেখা হইবে কি না। একবার আশুর[২] সহিত ও একবার একাই তোমাদের বাড়িতে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু কি রকম লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল—আর গেলাম না।

'পুঁটু, বড় হতভাগ্য জীবন আমার। এমন অর্থহীন নিষ্ফল নীরস দিন, মাস ও বৎসরের সমষ্টি যে কেন মাথায় বহিয়া বেড়াইতেছি, কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। ভগবান বুদ্ধি যদি দিয়াছিলেন, একটু সুবুদ্ধি দিলেই তো পারিতেন। যদি না দিলেন তো এত ভালবাসিতে শিখাইয়া দিলেন কেন? ভালবাসিবার একটি মাত্র পাত্র আমাকে দিলেই কি এই বিশ্বরাজ্যে তাঁহার লোকের অভাব ঘটিত। জানি না কেমন বিচার।

'বুঝিতে পারি যে, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব সকলেরই আমি ঘৃণার পাত্র। এ বোঝা যে কত মর্মান্তিক তাহা বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না। জানি, বিশ্বাসের কোন রাস্তা আমি রাখি নাই—চির প্রবাসী দুঃখী, কুৎসিত আচারী আমি কাহারো সম্মুখে বাহির হইতে পারিব না, কিন্তু পুঁটু, সমস্তটাই কি আমার নিজের হাতে গড়া? আমার ঘুড়ির নীচে ভার নাই, আমার তীরের মাথায় ফলা নাই, আমার নৌকায় হাল নাই—এখন সোজা চলিতেছি না বলিয়া যে ধিক্কার দিয়া দু'হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছ, তাহার সবটাই কি আমার দোষে? সাধু সাজিতেছি না, ভাই—এত পঙ্কিল জীবনে সাধুত্বের ভান খাটিবে না—কিন্তু তোমরা তো ভাল, তবে তোমরাই বা এত নিষ্ঠুর হইলে কেন?

'সুরেন ও গিরীনকে চিঠি দিয়া জবাব পাইলাম না; তুমিও দিলে না। আমাকে একছত্র লিখিয়া পাঠাইলেই কি তোমরা পতিত হইতে? এতদূরে থাকিয়া তোমাদের কাহারো কোন ক্ষতি করিতে

১ ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮। বিভূতিভূষণ ভট্টকে লেখা।
২ বিভূতিভূষণের এক ভাইপো।

পারিব না। একখানি চিঠি লিখিলেই যদি তোমাদের চরিত্র মলিন হইয়া যায় তো গেলই বা! এমন জিনিস নির্মল থাকিলেই বা কি আর মলিন হইলেই বা কি।

'একদিন তো তোমরা আমাকে ভালবাসিয়াছিলে—আজ আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, এ চিঠির জবাব দিয়ো ভাই! চিরদিনই মনে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, জানি না কেন, তুমি ও বুড়ি কোনদিন আমার প্রতি বিমুখ হইবে না—আমার এ বিশ্বাস ভাঙিয়ো না। মিথ্যা যদিই বা হয় ক্ষতি কি? যে মিথ্যা কাহারো কোন ক্ষতি করিবে না, অথচ একজনকে আশ্রয় দিবে, নৈতিক অবনতি যে তাহাতে কতখানি, মাপিয়া দেখিবার শিক্ষা আমার নাই, কিন্তু দয়া মায়া ও স্নেহের স্বর্ণাঙ্গে একতিল আঁচড়ও লাগিবে না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।'

কিন্তু মনে হয় পরবর্তী চার বছরের মধ্যে এ বিশ্বাসের মর্যাদা শরৎ রাখতে পারেনি। নিজেকে জাহির করার অভ্যেস তার কোনোকালেও ছিল না। যশের কাঙালও সে নয়।

গিরীনমামাকে শরৎ লিখেছিল১, 'যদি আমি যশের কাঙাল হতাম, তাহলে দিনের পর দিন এত সময় আমি নষ্ট করতাম না।'

'মন্দির' গল্পটির জন্য পুরস্কার পেয়েও সে কারো কাছে নিজেকে জাহির করেনি। ঠিক সেই রকমই 'বড়দিদি' ছাপবার পরও সে চুপচাপ থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েও অন্ধকারেই নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। শুধু মনের অতলে কোথাও একটা কিছু ঘটে যাচ্ছিল যার দরুন তার নিজের জীবনটাই যে বদলে গেল তা নয়, বরং ভারতীয় সাহিত্যের ধারাও যেন এক নতুন গতি পেল। সাধারণ মানুষের মনকে অভিভূত করে দেয় এমন এক জীবন্ত সৃজনীশক্তি, মানব অভিজ্ঞতাকে মহীয়সী করে তুলে ধরা এমন এক মহান লোকপ্রিয় কথাশিল্পী কোথায় হারিয়ে যেত, যদি না সৌরীন্দ্রমোহন 'ভারতী'তে 'বড়দিদি' গল্পটি প্রকাশ করত। নইলে নিজেকে সবার আড়ালে লুকিয়ে রাখার প্রবৃত্তির দরুন আত্মগোপনকারী শরতের প্রতিভা রেঙ্গুনের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসের ফাইলের মধ্যে বেঘোরে মারা যেত। হিন্দি সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীইলাচন্দ্র যোশী কলকাতায় বেশ কয়েক বছর শরতের সংস্পর্শে থাকেন। তিনি লিখেছেন, 'মনে হয়, সাহিত্য ও সমাজে অজ্ঞাত ও অপরিচিত থাকার মধ্যে শরৎ এক বিচিত্র ধরনের সুখ পেত। তার অন্তরের কয়েকটি গ্রন্থি এমন ছিল যার দরুন খ্যাতি ও সম্মান নিতে সে কুণ্ঠাবোধ করত। সে যা কিছু লিখত বোধহয় এই ভেবেই লিখত যে তার মৃত্যুর পরই সেগুলি যেন ছাপা হয়। আর স্বর্গীয় লেখক নিজের লেখনীর সাহায্যে সবার মন জয় করে নেবে, এই অনুভূতির জন্য জীবিত অবস্থায় কোন সম্মানই সে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি।'

লেখা সে কোনোদিন ছাড়েনি, ধীর মন্থর গতিতে তা দিনের পর দিন এগিয়ে গেছে। তবুও আশ্চর্য এই যে, বর্মায় তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই জানত না যে, শরৎ সত্যিই একজন বেশ ভালো লেখক। এ রহস্য শেষ পর্যন্ত চাপা থাকেনি, যখন শরৎ একটি প্রবন্ধ 'বেঙ্গল ক্লাবের' সাহিত্যগোষ্ঠীর জন্য লেখে। বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবটি ভেঙে যাবার পর কয়েকজন সদস্য মিলে এই ক্লাবটির স্থাপনা করে। এই সাহিত্যসভায় কবিতা, কাহিনী ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পড়া হত, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদিও হত। বাক্‌পটু হওয়ার দরুন সবার আগে শরৎই আলোচনা শুরু করত। বন্ধুরা বলে যে, এত যখন বলতে পারো তা হলে নিজে লেখ না কেন? শরৎ বলেছিল, 'আমি লিখতে পারি না, বেশি পড়াশোনা করিনি।'

চিরদিনের সেই মিথ্যা ও নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রবৃত্তি। কিন্তু একদিন যখন নারী চরিত্র নিয়ে তুমুল তর্ক চলছে, তখন নানা জ্ঞানীগুণীদের বই থেকে উদাহরণ দিয়ে শরৎ সবাইকে অবাক করে দেয় আর সে ধরাও পড়ে। বন্ধুরা বলল, 'তুমি তো বলতে যে বেশি পড়ালেখা করনি, এত যে

১ ১৮ মার্চ, ১৯১৩

জ্ঞানের কথা আজ বললে সে কি না পড়েই ? এর পরের বার তোমাকেই প্রবন্ধ লিখতে হবে।' সেই সঙ্গে ঘোষণা করে দেওয়া হল যে, আগামী বৈঠকে 'নারীর ইতিহাস' নামক প্রবন্ধ শরৎ পড়বে। প্রবন্ধে নারীর সামাজিক জীবনে যৌনতার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা থাকবে।

সবাই সেই দিনের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে রইল। বিষয়টির নতুনত্বের দরুন সভার দিন প্রচুর ভিড় হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত বক্তার পাত্তা নেই। সময় বয়ে যায়। চেয়ারে বসে সভাপতি ক্লান্তি বোধ করছিলেন, সভামণ্ডলী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দুজন সদস্যকে শরতের খোঁজে পাঠানো হল আর উদ্বোধন সংগীত দিয়ে সভার কাজ শুরু করে দেওয়া হল। সেদিন আবার প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল। যোগেন্দ্রনাথ সরকার ও আর এক জন সদস্য দেড়মাইল হেঁটে শরতের বাড়ি পৌঁছে দেখে যে সে বাড়িতে নেই। অনেক ডাকাডাকির পর একজন বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই ?' সরকার বলল, 'শরৎ বাড়ি নেই ?' লোকটি বলল, 'আপনারা কে ? কোত্থেকে আসছেন ?'

সরকার বলল, 'আমরা বেঙ্গলী ক্লাব থেকে এসেছি। আজ সেখানে শরতের···' পুরো কথাটা শোনার আগেই লোকটি ভিতরে চলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বলল, 'বাবু বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন, সভায় যেতে পারছেন না। আমার কাছে এই কাগজ দিয়ে গেছেন দেবার জন্য।'

কথা শুনে তারা থ! প্রবন্ধটি হাতে নিয়ে আরো অবাক হল, ছোট ছোট অক্ষরে লেখা যেন একটি মহাভারত। সভায় ফিরে পুরো ঘটনা বলল। সবাই মিলে ঠিক করল যে, শরৎবাবু সভায় উপস্থিত না হতে পারলেও তার প্রবন্ধটি সভায় পাঠ করা হবে। কিন্তু পড়বেটা কে ? যদিও পরিষ্কার হরফে লেখা, কিন্তু এত ছোট ছোট আর প্রায় অনেক পাতার প্রবন্ধ। শেষ পর্যন্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকারকেই পড়তে হল। পরে অবশ্য জানা যায় যে, শরৎ এই শর্তেই প্রবন্ধ লেখে যে, সভায় প্রবন্ধটি সে পাঠ করবে না। রাশি রাশি কোটেশনে ভর্তি সেই প্রবন্ধটি পাঠ করতে যোগেন্দ্রর প্রায় পুরো দুটো ঘণ্টা লেগেছিল। সভা স্তব্ধ। তার ভাষা ও গঠন, সাবলীল বিষয়বস্তু, এত নিপুণ, যুক্তিসম্মত ও মৌলিক যে, সবাই মুক্তকণ্ঠে প্রবন্ধটির প্রশংসা করে।

'বড়দিদি' শরতের ছোটবেলার রচনা কিন্তু সেদিন তার সহজ প্রতিভা আর পরিণত-রচনা-কৌশলের পরিচয় সবার সামনে উন্মোচিত হয়।

একদিন ছবি দেখতে দেখতে যোগেন্দ্রনাথ সরকার একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজে পায়। মোটা মলাটের খাতায় মুক্তো অক্ষরে প্রায় আট-নটা অধ্যায় লেখা ছিল। খাতার উপর নাম ছিল 'চরিত্রহীন'। শুরু করলে আর ছাড়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ছাড়া এত ভালো লেখা সে আর পড়েনি। কিছুদিন আগেই 'গোরা' প্রকাশিত হয়।[১]

পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় কয়েকজনের নাম লেখা ছিল। জিজ্ঞেস করাতে শরৎ বলে, 'ভাগলপুরের আমাদের একটি সাহিত্য-সভা ছিল, ওরা তারই সদস্য।' তাদের মধ্যে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের একটি কাহিনী-সংগ্রহ 'শেফালী' নামে বের হয়। যোগেন্দ্রনাথ গল্পগুলির খুব প্রশংসা করেন। শরৎ বলল, 'ওঃ! অমুক তো! ও বেশ লেখে।-কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমাকেই গুরু বলে পরিচয় দেয়।' সরকার বলল, 'তা বটে। কিন্তু দেখছি শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী!'

শরৎ হেসে বলল, 'ওহে, আমিও নেহাৎ মন্দ লিখি নে। লিখলে অনেকের চেয়েই বোধহয় ভালো লিখতে পারি।'

যোগেন্দ্র জানত, মনের আগুন চিরদিন চাপা থাকে না। শরৎকে ক্রমাগত উৎসাহ জুগিয়ে 'নারীর ইতিহাস' বলতে গেলে সে-ই লিখিয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রায় সাতশো কুলত্যাগিনী অভাগিনী নারীর করুণ জীবন কাহিনী এতে লেখা হয়। এতে তাদের নাম ঠিকানা,

১ ১৯০৩

বয়স, জাত, বংশ পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পর্যন্ত দেওয়া হয়। নারীর যৌন জীবনের রহস্য, দৈবী ও মানবীয় অগোচর নারীর বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে গভীর বিবেচনা ও অনুশীলনপূর্বক সত্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছিল। এর জন্য শরৎকে দেশ-বিদেশের ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হয়। এই সংগ্রহখানি সম্বন্ধে অনেক দিন পরে তিনি লিখেছিলেন[২], 'এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম, যারা কুলত্যাগ করে আসে, তাদের শতকরা প্রায় আশিজন সধবা। বিধবা খুব কম। স্বামী বেঁচে থাকলেই বা কি, আর কড়া পাহারা দিয়ে রাখলেই বা কি, আর বিধবা হলেই বা কি! দিদি, অনেক দুঃখে মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম নষ্ট করতে রাজী হয়। পরপুরুষের রূপেরও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভেও নয়। তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজেরা নষ্ট করে, তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যই এ দুঃখ মাথায় তুলে নেয়।'

পাশ্চাত্য দর্শন বিষয়ে শরতের যে এত পড়া ছিল, সে কথা সাধারণ লোকেরা সেদিন মানতে চায়নি। যখনই সে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করেছে, লোকেরা তা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, 'কে বলেছে এ সব কথা, শরৎ চাটুজ্জে? ওর কথা বাদ দাও, কী না বলে ও।'

লোকে যাই বলুক-না কেন, মিল, স্পেন্সর, কান্ট শরতের প্রিয় দার্শনিক ছিলেন। স্পেন্সরের সহজ সরল অভিব্যক্তি তার দারুণ ভালো লাগত। বিশ্বাস করত যে, সত্যের সহজ উপলব্ধি ছাড়া অভিব্যক্তি সহজ হতে পারে না। 'ডিসক্রিপ্টিভ সোসিওলজি' সে খুব ভালোভাবে পড়েছিল।

ঔপন্যাসিক ডিকেন্স শরতের প্রিয় লেখক ছিলেন। টলস্টয় ডিকেন্সকে ভালোবাসতেন তার কারণ, টলস্টয় নিজের ডায়ারিতে লিখেছেন, 'লেখকের জনপ্রিয়তার প্রথম শর্ত হল সেই ভালোবাসা যা নিজের সৃষ্ট চরিত্রে প্রকাশ করেন। হয়তো সেজন্যই ডিকেন্সের চরিত্রগুলি সারা বিশ্বের চোখে সমান প্রিয়।' আমেরিকা ও রাশিয়ার মানুষকে যা এক করে তোলে, শরৎ এমন চরিত্রের খোঁজে ছিল। ডিকেন্স ছাড়া টলস্টয়, জোলা ও হেনরি উড ও তার প্রিয় লেখক ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি আর কাউকে স্বীকার করেনি। বলত, 'অন্য কবিদের মত হওয়ার চেষ্টা হয়তো করা যেতে পারে, কিন্তু রবিবাবু? তাঁর এই কবিতাটির কথা একবার ভাব তো। এমন সুন্দর কবিতা কেউ লিখতে পারে?'—

'জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা;
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।।
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত।
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা।।
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।।'

পড়তে পড়তে শরতের চোখ দুটি জলে ভরে উঠত। বলত, 'কবিতার মূলে কল্পনা মেশালেই তা মহৎ হয়ে ওঠে না। তার জন্য চাই সত্যের উপলব্ধি, তখনই যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।' সরকার বলল, 'অনেকে বলে রবিবাবুর কবিতা নাকি ভারি শক্ত?'

২ ১৪ অগাস্ট, ১৯১৯। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা।

শরৎ বলল, 'সে কথা ঠিক, কিন্তু সহানুভূতির উষ্ণতায় সে জিনিস কঠিন থেকে সরস হয়ে যায়, সে উপলব্ধি তো অন্তরের উপলব্ধি। তা না হলে কবিতা বুঝতে চাওয়া বিড়ম্বনা বই আর কিছু নয়। কবিতা এমন হওয়া চাই যা পড়তে ও শুনতে ভালো লাগে। শোনামাত্র তৃপ্তিতে মন ভরে যায়। এমন গভীর ভাব থাকবে যা সহজ কল্পনার বাইরে, তা যদি না হয় তা হলে 'তুমি মারলে ধাক্কা, আমি মারলাম ঠেলা', একে কি কবিতা বলা যায়? এ যেন সেই শ্রীমান্ বংশীমোহনের 'ওহে তালগাছ তুমি কেন এত লম্বা, ভীত জগদম্বা'-র মতো কবিতা হয়ে যাবে।'

৭

একদিকে অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলত, অপরদিকে সর্বহারা মানুষের জীবনে গভীরে ঢুকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের খেলায় শরৎ বিভোর ছিল। এই সর্বহারা মানুষদের মধ্যে থেকে সে গল্প উপন্যাসের অনেক চরিত্র খুঁজে পেয়েছিল। অসহায় নিরাশ্রিতদের দেখে তার মন বেদনায় ভেঙে পড়ত। তাদের ছোট কাজ করতে দেখলে তার আত্মাভিমান জেগে উঠত। যথাশক্তি তাদের সাহায্য করত। দেশে ফিরে যাবার জন্য টিকিট কেটে অনেককে জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে আসত। কু-পথগামী কত মেয়েকে এভাবে সে রক্ষা করেছিল।

কত রকম বিচিত্র চরিত্রের সান্নিধ্যেই না তাকে আসতে হয়েছে। নিজের তখন খাওয়া-পরার সংগতি নেই, কয়েক কাপ চা খেয়ে দিনের পর দিন কেটে যেত। একদিন বাড়ির কাছেই এক বামুনপুরুতের সঙ্গে দেখা হয়। পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। পুরুতমশাই একদিন বলল, 'দাদা, আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারি অসুবিধে দেখছি, আমার বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হয় না?'

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না-না, এখানে আমার কোনই অসুবিধে হচ্ছে না।'

পুরুত মশাই প্রায়ই অনুরোধ-উপরোধ করেন। শেষপর্যন্ত এই স্নেহপূর্ণ নিমন্ত্রণ স্বীকার না করে পারেনি। অবশ্য আর একটা কারণ ছিল, পুরুত মশাইয়ের সাংসারিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না, শরৎ যদি তার বাসায় খাওয়া-দাওয়া করে তাতে হয়তো তাদের কিছু সুবিধে হতে পারে, এ-সব ভেবে শরৎ রাজী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন হঠাৎ বাড়িতে একটা অসম্ভাব্য কাণ্ড ঘটে গেল। শরৎ জানত না যে, বাড়িতে যে-স্ত্রীলোকটি রান্না করে সে পুরুত মশায়ের স্ত্রী নয়, রক্ষিতা। তার নাম ছিল হরিমতি। শরৎকে সে খুব যত্নআত্তি করত। সেদিন কী জানি কি কারণে পুরুত ঠাকুর ও হরিমতির মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। পুরুত ঠাকুর গলার পইতেখানি কোমরে জড়াতে জড়াতে আসন ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, 'দেখছ দাদা, মাগীর কাণ্ড, এই ছোটজাতের মাথায় ....।'

পুরুত ঠাকুর সম্পূর্ণ বলার আগেই হরিমতি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। তাড়াতাড়ি ভাতের হাঁড়ি উনুনে চড়িয়ে মাথায় কাপড় টেনে দরজার আড়ালে সরে গিয়ে বলল, 'সাবধান! ছোট জাতের কে? আমি নয়, তুই। তুই-ই হচ্ছিস—। খবরদার বলছি জাত তুলে কথা বলবি না। তুই কি ভেবেছিস আমি বাজারের মেয়ে? যা বলবি তাই মেনে চলব? আমি বৈষ্ণবী। তোর মতো ছোট জাতের বামুন আমি ঢের দেখেছি, মুখ সামলে কথা বল্, না দিস খেতে, না পরতে—তার ওপর লম্বা লম্বা বুলি· ··।'

হরিমতির বিরামহীন চোপা শুনে শরৎ সেদিন বুঝতে পেরেছিল এরা অতি দরিদ্র। পুরুত ঠাকুর হরিমতিকে কাছে রেখেছে কিন্তু ভাল ব্যবহার করে না। খেটে খুটে পুরুত ঠাকুরকে খাইয়ে পরিয়ে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বয়সও হয়েছে বেচারীর। তার অবস্থা দেখে শরতের মনে খুব দুঃখ হল। দুজনের ঝগড়া থামাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারল না। ঝগড়ার পর থেকে হরিমতির হাতে খরচ দেওয়া পুরুত ঠাকুর বন্ধ করে দিল।

হরিমতি কেঁদে কেঁদে নিজের কাহিনী শরৎকে বলেছিল। শরৎ তাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিল, 'আমার মনে হয় তুমি কলকাতা ফিরে যাও।'

হরিমতি বলেছিল, 'দাদাঠাকুর, আপনি যদি সে ব্যবস্থা করে দেন আমি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। মাগোদের এই দেশ ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি পারি চলে যেতে চাই।'

কিন্তু একদিন চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরেই প্লেগ হয়ে হরিমতি সব যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। কিন্তু শরৎ ভারি বিপদে পড়ে। প্লেগের নাম শুনে কেউ কাছে আসতে চায় না। মদ খাইয়ে কোনোরকমে চার-পাঁচজন লোক জোগাড় করে হরিমতির দাহ-সংস্কার করা হয়।

মিস্ত্রি পল্লীতে এ ধরনের গল্প বা ঘটনা নতুন ছিল না। শরৎ জানতে পারলেই হোমিওপ্যাথী ওষুধের বাক্সটি সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াত। প্রয়োজনে ওষুধ দিত, ঝগড়ার নিষ্পত্তি করত।

সেদিন পাড়ার এক মিস্ত্রির বউয়ের খুব জ্বর হয়। মিস্ত্রি এসে কেঁদে পড়ল, বলল, 'দাদাঠাকুর, বউয়ের খুব জ্বর, আপনি নিজে গিয়ে একটু দেখবেন আসুন।' শরৎ সঙ্গে সঙ্গে সেই মিস্ত্রির সঙ্গে তার বাড়ি গিয়েছিল। জ্বরে বউ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিল। সৌভাগ্যবশত শরতের ওষুধে সে ঠিক হয়ে যায়। মিস্ত্রিবউ সেই থেকে 'বাবা' বলে ডাকত। একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সে শুনল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নাকি ঝগড়া হয়ে গেছে। শরৎ মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বউকে আমি কোনোদিন জোরে কথা পর্যন্ত বলতে শুনিনি কিন্তু আজ হঠাৎ কী হল?'

মিস্ত্রি খুব রেগে ছিল, কোনোদিন বউয়ের নামে একটা কথাও বলেনি, রাগের মাথায় বলে ফেলল, 'আপনি তো সব খবর জানেন না, বাবাঠাকুর। আমি এই মাগীকে শ্মশান থেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম কি-না জিজ্ঞেস করুন? খাওয়া-পরার কোনো কষ্ট নেই। তবু দিন রাত খচ্-খচ্ করে। এতই যদি তাহলে আমার সঙ্গে কণ্ঠী বদল করতে গিয়েছিল কেন?'

বাবাঠাকুরের সামনে এত বড় দুর্নাম শুনে মিস্ত্রি-বউই বা নীরবে থাকবে কেন? মাথায় কাপড় টেনে দরজার আড়াল থেকে সে-ও চিৎকার করে বলল, 'বাবাঠাকুরের সামনে আমার নামে তুমি অনেক কিছু বলেছ। নিজেকে ভদ্রলোক বলে জাহির করছ। আমার সর্বনাশ করে আবার আমার নামেই দুর্নাম রটাচ্ছ। মাসী ছিল তাই রক্ষে, নইলে কাল রাত্তিরে তো আমায় মেরেই ফেলতে। আমি কী দুঃখে তোমার মার সইব? কথায় কথায় বল বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা, আমি কি কিছুই জানি না, না, বুঝতে পারি না। যাকে বিয়ে করেছিলে সে এখন এখানে নিজের ভাইয়ের কাছে এসে রয়েছে। আমাকে বার করে দিয়ে সে মাগীকে এখানে এনে রাখবে। সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলতে চাইছ না কেন? আমার গয়নাগাঁটি আর কলকাতা যাওয়ার খরচ-পত্তর আমায় দিয়ে দাও, তারপর সে মাগীকে নিয়ে যেখানে খুশি গিয়ে থাকোগে। অনেক সয়েছি আর নয়, আজ এখুনি আমার সব চাই এই কথা বলে রাখলাম। আমার সর্বনাশ তো করেইছ, কিন্তু চন্দ্র সূয্যি এখনও ওঠে, ভগবান করে, রাত পোহাতে-না-পোহাতে তোর সর্বনাশ দেখি।' এরপর মিস্ত্রিবউ কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কোনোরকমে শরৎ তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তখনকার মতো শান্ত করেছিল। মিস্ত্রি সময়মত কারখানায় গেল কিন্তু আর ফিরে এল না। এমনি করে ক'দিন কেটে গেল। শরৎ খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে এল। বউয়ের এ-ব্যাপারে সত্যি কোনো দোষ ছিল না। মিস্ত্রির বিয়ে করা বউ ভায়ের বাড়ি এসে উঠেছিল, বোধহয় সেই বউ নিয়ে সে কোথাও সরে পড়েছিল। শরৎ কণ্ঠী-বদল-করা বউকে বলল, 'তুমি কলকাতা ফিরে যাও।' বউ বলল, 'কলকাতায় ফিরে গিয়ে এখন আর আমি কি করব, দাদাঠাকুর? আমার কাশীবাস করাই ঠিক।'

শরৎ তাকে কাশী পাঠিয়ে দিল। শরতের এক বন্ধু ছিল, তার নাম শ্রীসুরেন্দ্র মাল্লা। দুজনে একই বাড়িতে থাকত। গানবাজনায় ভারি শখ ছিল তার। কীর্তন বেশ ভালো গাইত পারত। শরৎ সুর দিত। সুরেন্দ্র মাল্লার নিজের একটা সংকীর্তনের দল ছিল। একদিন সুরেন্দ্র মাল্লার

চাকরির গেল। সে কি করে? অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারে যে 'নামটু গোল্ড মাইনে' চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শরৎ তাকে বলল, 'তুমি এই মুহূর্তে নামটু চলে যাও।' তার কদিন পরে তাকে দেখে শরৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নামটু যাচ্ছ না কেন? কী ব্যাপার?' প্রথমে সামান্য একটু দ্বিধা করার পর বলল, 'কেমন করে যাই দা'ঠাকুর, হাতে পয়সাকড়ি কিছু নেই। হোটেলে খাওয়ার পয়সা বাকি রয়েছে, বন্ধুদের কাছেও কিছু ধার কর্জ রয়েছে। তাও তো যাবার আগে শোধ করে যাওয়া উচিত।'

শরতের মুখে চট করে কোনো উত্তর জোগাল না। সেও তো একজন সামান্য কেরানী। তার পরদিন সুরেন্দ্রকে সে ডেকে পাঠাল, বলল, 'নামটু যাবার পথঘাট চেন? প্রথমে মান্ডলে যেতে হয়, তারপর লাসিয়োর পথে নামিয়ো পড়বে। সেখান থেকে গোল্ড মাইনের দিকে একটা গাড়ি যায়, সেটা কোনো যাত্রীবাহী গাড়ি নয় তবে তুমি তোমার বন্ধুর লেখা চিঠিখানি দেখালে তোমার গাড়িতে জায়গা পেতে বেগ পেতে হবে না। ভাড়া বাবদ পনেরো টাকা খরচ লাগে, সে টাকা আমি তোমায় দিচ্ছি, তুমি এখুনি রওয়ানা হয়ে পড়।'

সুরেন্দ্র হঠাৎ যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারল না। বলল, 'দা'ঠাকুর, ধারকর্জ শোধ না করে এভাবে যাওয়া কি ভালো হবে?'

শরৎ বলল, 'সে কথা নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। সে-সব আমি শোধ করে দেব। হ্যাঁ, আর একটা কথা, সেখানে ভয়ংকর শীত, কাপড়-চোপড়ের দরকার থাকলে আমায় লিখে জানিয়ো, কেমন?' তারপর হাতে টাকা দিয়ে বলেছিল, 'সকাল বেলা গাড়ি ছাড়বে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও।'

সুরেন্দ্র চলে গেল, জানতেও পারল না যে, তার হাতে টাকা দেবার পর শরতের হাতে সেদিন আর একটি কপর্দকও ছিল না। শুধু এক কাপ চা খেয়ে সেদিন সে অফিসে গিয়েছিল, রাতেও এক গ্লাস দুধ ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। কত লোক তো শরতের বাড়ির দরজার কড়া নেড়ে ভিক্ষে বা সাহায্য চাইতে আসত। একদিন যোগেন্দ্রর সঙ্গে মানুষের অভাব দৈন্য সংক্রান্ত কথাবার্তা হচ্ছিল, হঠাৎ দরজায় খুটখুট শব্দ। উঁকি মেরে দেখা গেল এই চিরপরিচিত নারদমুনি কোনোমতে লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। শরৎ নীচে গিয়ে হাত ধরে বুড়োকে উপরে নিয়ে গিয়ে যোগেন্দ্রকে বলল, 'এ লোকটা সত্যিই ভগবানের দয়ার পাত্র। ভালোবেসে নিজের সব খুইয়ে সত্যি যদি কেউ পথের ভিখিরি হতে পারে তাহলে এর গল্পটিও সত্যি। পুরুত ডেকে শাঁখ বাজিয়ে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিল, সে যেই হোক, বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা ও বুকভরা ভালোবাসা সে পেয়েছিল। সেই বউ প্লেগে মরে যাওয়াতে শোকে পাগল হয়ে পড়ে। প্রায় তিন-চারশো টাকার মতো ডাক্তারের পেছনে খরচ হয়েছিল। বউ বাঁচত তো একটা কথা ছিল। তাই তো আমি বলি বেচারী সত্যিই ভগবানের করুণার পাত্র। তবে যেমন মেরেছেন, রক্ষাও আবার তিনিই করবেন, নইলে সংসার চলবে কেমন করে?' এতটা বলে শরৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কয়েকটা মুহূর্ত শূন্যের দিকে চেয়ে রইল, হয়তো তার নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গিয়ে থাকবে। সে-ও যে প্লেগেই মারা যায়। ভিতরে গিয়ে এক কাপ চা নিয়ে এসে পরম স্নেহের সঙ্গে বুড়োকে বলল, 'দেখ নারদমুনি! তোমার যখন যা দরকার আমায় জানিয়ো। যদি তা না কর আমি কিন্তু কোনোদিন তোমায় ক্ষমা করব না। যদি কোনোদিন জানতে পারি যে তুমি অভুক্ত রয়েছ, তাহলে আর আমার ঘরের দরজা মাড়িয়ো না।'

নারদ মুনি গদ্‌গদ হয়ে জবাব দেয়, 'তাই কি কখনও হয়, দা'ঠাকুর। আপনার মতো দয়ালু ঠাকুর থাকতে অভুক্ত কেমন করে থাকব বলুন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোহালক্কড়ের শক্ত কাজ করতে পারো আর এই সোজা কাজটা করতে পারবে না? খুব পারবে।' এই বলে শরৎ তামাক খাওয়ায় মন দিল। নারদ মুনি কিন্তু তার আসল নাম নয়, আসলে সে একটা সাধারণ মিস্ত্রিশ্রেণীর লোক ছিল। জীবনে এমন কোনোরকম বদ নেশা ও পাপ নেই যা সে করেনি। শনিবার সন্ধ্যায় মদ খেয়ে সোমবার সকাল পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা

তার নিয়মিত অভ্যাস ছিল। তারপর অসুখের ছুতো করে অফিস থেকে ছুটি নিত। তার মাতলামি শরৎ বহুবার দেখেছে। তাই তো 'পথের দাবী'র স্রষ্টা লিখতে পেরেছেন—

'অনাবৃত কাঠের মেঝেতে বসিয়া ছয়–সাতজন পুরুষ ও আট–দশজন স্ত্রীলোকে মিলিয়া মদ খাইতেছিল। একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম ও একটা বাঁয়া মাঝখানে, নানারঙের ও নানা আকারের খালি বোতল চতুর্দিকে গড়াইতেছে, একজন বুড়ো গোছের স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে–তাহাকে বিবস্ত্রা বলিলেই হয়। ষাট হইতে পঁচিশ–ছাব্বিশ পর্যন্ত সকল বয়সের স্ত্রী–পুরুষই বসিয়া গিয়াছে,—আজ রবিবার পুরুষদের ছুটির দিন। পিঁয়াজ রশুনের তরকারির সঙ্গে মিশিয়া সস্তা জারমান মদের অবর্ণনীয় গন্ধ অপূর্বর নাকে লাগিতে তাহার গা বমি- বমি করিয়া আসিল। একজন অল্পবয়সী স্ত্রীলোকের হাতে মদের গেলাস ছিল, সে বোধহয় তখনও পাকা হইয়া উঠে নাই, হয় ত অল্পদিন পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে বাঁ হাতে সজোরে নিজের নাক টিপিয়া ধরিয়া গেলাসটা মুখে ঢালিয়া দিয়া তক্তার ফাঁক দিয়া অপর্যাপ্ত থুথু ফেলিতে লাগিল। একজন পুরুষ তাড়াতাড়ি তাহার মুখে খানিকটা তরকারি গুঁজিয়া দিল। বাঙালী মেয়েমানুষকে চোখের সমুখে মদ খাইতে দেখিয়া অপূর্ব যেন একেবারে শীর্ণ হইয়া গেল।'

কিন্তু শরৎ হতভম্ব হয়নি। কারণ সে জানত এরা তার থেকে আলাদা নয়। শরৎ বিশ্বাস করত অপরের ভালো করা নামক কোন কথা যদি পৃথিবীতে থাকে, তার যদি কোনো প্রয়োজন থাকে তবে সে প্রয়োজন এখানে এদেরই সবচেয়ে বেশি। যখন লোকেরা বাড়াবাড়ি করে নিজের জীবন নষ্ট করে ফেলে তখন তাদের ঘৃণা করতে নেই, ভালোবেসে তাদের বোঝাতে হয়। একদিন যোগেন্দ্রর সামনে একজন অসুস্থ বলে দরখাস্ত লেখাতে এল। শরৎ লিখে দেবার পর সে চলে যেতেই যোগেন্দ্র শরৎকে জিজ্ঞেস করল, 'অসুখের কোনো লক্ষণ তো দেখা গেল না।'

শরৎ হেসে ফেলল, বলল, 'অসুখ থাকলে তো দেখা যাবে। শনিবার সন্ধেতে এদের ঘাড়ে ভূত চাপে। দু–তিন দিন পর্যন্ত সে ভূত থাকে। অনেক বোঝাই, ধমক দিই যদি আসছে শনিবারে আবার ভূত চাপে তো আমি নিজে গিয়ে তোমার বড়সাহেবকে বলে আসব। তোমার চাকরি যাবে। তখন এরা কত রকম দিব্যি দেয়, বলে, "আর কখনও মদ খাব না, যদি খাই তা হলে যেন মা–বাপের রক্ত" .... ।

'কিন্তু মা–বাপের রক্তও শেষ পর্যন্ত তাদের শপথ রক্ষা করাতে পারে না।'

সরকার আশ্চর্য হয়ে বলল, 'এ ধরনের লোকেদের মধ্যে আপনি থাকেন কেন?'

শরৎকে কেউ যেন জোরে ধাক্কা মারল। জলভরা চোখ দুটি তুলে সরকারের দিকে তাকাল, বলল, 'এরা বড়ই অভাগা, সরকার, কিন্তু তবু মানুষ তো! এদের একটু ভালো না করে যদি দূর দূর করে দূরেই সরিয়ে দিই তাহলে এরা যে আরও বিগড়ে যাবে।'

বলতে বলতে যেন সে কোথায় হারিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আত্মবিভোর হয়ে বসে থেকে বলল, 'কোনো অবস্থাতেই মানুষকে ঘৃণা করা উচিত নয়। যে লোক খারাপ তাকে শোধরাবার চেষ্টা করা উচিত। এ সত্যিই খুব বড় কাজ। ভগবানের এই রাজত্বে মানুষ যতখানি শক্তিমান ঠিক ততখানিই সে দুর্বল। কখনও যদি সোমবার দিন সকালে আস দেখবে আমি সত্যি কথাই বলছি। ঘাড়ের ভূত যখন নেমে যায়, সংসারের অস্তিত্ব তখন টের পায়, দরখাস্ত না দিলে চাকরি থাকবে না বুঝতে পারে, তখন লজ্জায় মাথা খেয়ে অসুখের দরখাস্ত লেখাতে আমার কাছে আসে। তখন আমি তাদের বদ্ অভ্যেসের কথা ভুলে যাই, ভাবি, হায়! এই অভাগা মানুষগুলো কত অসহায়!' বলতে বলতে চোখ দুটি আবার জলে ভরে উঠল।

কখনও যে শরৎ রাগ করত না তা নয়। কিন্তু কাউকে ঘৃণা সে কোনোদিন করেনি। কারণ তার মনে হত, যারা মদ খায় তারা হৃদয়, মন ও বুদ্ধির ব্যাপকতায়, মদ যারা খায় না তাদের থেকে অনেক ছোট, একথা কোনমতেই সত্য নয়। তাই তো ছোটজাতের সেই সব নেশাখোরেরা তাকে 'বামুন দা' বলে ডাকত। তাদের নিয়ে সে একটা সংকীর্তন দলও গড়েছিল। যদিও মনে মনে সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল তবু তাদের বদ্ অভ্যাস ছাড়াবার জন্য কীর্তন গাইত, রামকৃষ্ণ মিশনের উৎসবে যোগ দিত।

এ ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার, যে নিজে মদ খায় ও নানান বদ্ অভ্যাসের দাস, সে অন্যের কু-অভ্যাস ও দুর্নাম ঘোচাবার চেষ্টা করছে। বন্ধুদের কানে মাঝে মাঝে তার সেই বিশ্রী গুণপনার কথা বেশ পল্লবিত হয়ে পৌঁছত। ফলে অনেকেই তার সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক ঘটনার সৃষ্টি করে। তার সম্বন্ধে সে সব কথা শুধু যে অতিরঞ্জিত তা নয়, একেবারেই মিথ্যে। সত্যি কথা এই টুকুই যে, শরতের মধ্যে আরো কয়েকটি শরৎ আসন গেড়ে বসেছিল, যারা তার চারপাশে একটা রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করে রাখতে চাইত। নিজেকে লুকিয়ে রাখা, আর অবচেতন মনে সমাজের উপর প্রতিশোধ নেবার নিদারুণ ঘৃণা কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকত। সে যে একটা 'কেউ' একথা সে বলতে চাইত। নইলে মদ খেয়ে মাতাল হতে কেউ কি কোনোদিন তাকে দেখেছে? পঞ্চাশ বছর পর[১] তার এক বন্ধুর ছোট ভাই বলেছিল,'একদিন সে খুব দেরি করে ফেরে। মেসের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বারবার ডাকার পরও যখন কেউ সাড়া দিল না, তখন বাধ্য হয়ে আমি দরজা খুলে দিলাম। তিনি ভিতরে ঢুকে পড়লেন। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির ফলে মনে হয় তাঁর শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়ে থাকবে, বমি করে ফেললেন। খুব মদ খেয়েছিলেন কিন্তু হুঁশ ছিল। ভালোবেসে বললেন,"কনিষ্ঠ, তুমিই শুধু আমায় ভালোবাস"।'

মদ অনেকে খায়। শরতও খেত, তা বলে সে কোনোদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তার সবচেয়ে বড় অপরাধ, সে তথাকথিত ছোট ও চরিত্রহীন লোকেদের সঙ্গে বাস করত। যখনই সুযোগ পেত 'জাভা', 'সুমাত্রা', 'বোর্নিও'র অখ্যাত দ্বীপগুলোতে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ত। তাদেরই একজন হয়ে সে বাঁচতে চাইত। এই অস্বাভাবিক প্রবৃত্তির দরুন অনেক কিছুই সে হারিয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তে পেয়েও ছিল প্রচুর। শরীর অকালে জর্জর হয়ে পড়েছিল, সে কি অভিজ্ঞতার ভারে?

এই অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পাই আমরা 'শ্রীকান্তে', 'চরিত্রহীনে' ও আরও অনেক গল্পে। সে যুগে মানুষের চিত্তজয়ী লেখক কি আজকের মানুষের ভালোবাসার মোহ-পাশ কাটাতে পেরেছেন? সর্বকালের জনচিত্তজয়ী শরৎ নিজেকে কোনোদিন চিনতে পেরেছিল কি-না তা-ই বা কে বলতে পারে!

৮

শান্তির মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা শরৎ আর ভাবেনি। বয়সও হয়ে গিয়েছিল। দুঃখ ঝড়ের আপদে বিপদে যৌবন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। সারাদিন অফিসে খাটাখাটুনির পর বাড়ি ফিরে হয় লিখত, না-হয় ছবি আঁকত। কিন্তু সমাজের সভ্য লোকেদের মধ্যে এ-রটনা কেমন করে ছড়িয়ে পড়ে যে, শরৎ একটি ছোটজাতের স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকে। একজন বলে, 'স্ত্রীলোকটির নাম নাকি বিরাজ বউ।'

অন্যজন বলে, 'না, না, তার নাম নয়নতারা।'

তৃতীয়জন বলে, 'নয়নতারা নয়, শশিতারা।'

এ ছাড়াও আরো অনেক নাম তাদের জানা ছিল। কিন্তু কেউ তার বাড়ি গিয়ে বাস্তবিক খবরাখবর নেবার চেষ্টা করেনি। ভদ্রলোকেরা চরিত্রহীন লোকের বাড়ি যায়ই-বা কেমন করে? কোনো কাজে যদি কেউ যেত, বাইরে বৈঠকখানায় বসে চলে আসত। এটুকু খবরই তাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, বাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক আছে, আর সে শরতের স্ত্রী নয়।

সেবার মাঘোৎসবের দিন কীর্তন গাইবার জন্য মৃদঙ্গের দরকার পড়ল। একজন বলল, 'শরতের কাছে মৃদঙ্গ আছে, নিয়ে আসব?' এর আগে সে শরতের বাড়ি কখনও যায়নি। শরৎ আপ্যায়ন করে বসতে দিয়ে বলল, 'বলুন, আমি আপনার কি কাজে লাগতে পারি?'

১ ১৯৬০ সালে লেখক রেঙ্গুনে তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

বন্ধুটি বলল, 'ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে মৃদঙ্গের দরকার, আপনি কি দিতে পারবেন?'

শরৎ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে টাঙানো রয়েছে সে তো আপনাদের জন্যই।'

বন্ধু আবার বলল, 'এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য কোনো লোক পাওয়া যাবে কি?'

সেদিনটা ছিল আবার রবিবার। রবিবার মিস্ত্রিপাড়ার যা অবস্থা হয়, লোক পাওয়াই মুশকিল। শরৎ কিছু বলবার আগেই ভেতর থেকে নারী-কণ্ঠের ঝংকার শোনা গেল, 'ভক্তের আবার মৃদঙ্গ বইবার লোকের দরকার হয় নাকি?'

তীব্র বিদ্রূপে বন্ধুর মনে আঘাত লাগে, বলল, 'সে তো নিশ্চয়। আমি নিজেই এটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' মৃদঙ্গ নিয়ে যাবার আগে সে আর একটা কথাও জেনে গেল যে, শরতের বাড়িতে একটি ধর্মপ্রাণা স্ত্রীলোক আছে। প্রচলিত অর্থে স্ত্রীলোকটি শরতের স্ত্রী ছিল না। হিন্দু-পদ্ধতিতে বরানুগমন ও অগ্নিসাক্ষী করে সাতপাক ঘুরে শরৎ তাকে বিয়ে করেনি কিন্তু অবশ্যই সে শরতের জীবনসঙ্গিনী।

টাকা রোজগারের জন্য বাংলাদেশ থেকে কৃষ্ণদাস অধিকারী নামে একজন রেঙ্গুনে আসে। সে মেদিনীপুর জেলার লোক। সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল, মেয়েটির নাম মোক্ষদা। তার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে পাওয়া যায়, তবে সে সব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুন্দরী সে ছিল না। দুধের মতো ফর্সা রঙও তার ছিল না, ছিল না পটলচেরা চোখ কিন্তু তার দেহ-সৌষ্ঠব ছিল অপূর্ব। বৃষ্টিতে ভেজা ফুলের মতো লাবণ্যে ভরা বড় স্নেহময়ী মেয়ে ছিল সে। বাপ অধিকারী, বৈষ্ণব। কুলীন ব্রাহ্মণ তারা নয়। অত্যন্ত অভাবের দরুন বরপণ জোগাড়ের সংগতি ছিল না। তাই যাতে দুটো টাকা পয়সা উপার্জন হয় সেই আশায় তারা বর্মায় চলে আসে। এতদূরে বসে অপবাদের কথা কেই বা জানতে পারবে? অধিকারী মশাই রেঙ্গুনে যার বাড়িতে এসে উঠেছিল সে শরতের বন্ধু ছিল। সেই সুবাদে শরতের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়। পরের দুঃখে কাতর হওয়া শরতের স্বভাব। তাই অধিকারী মহাশয়ের মেয়ের বিয়ের জন্য সে-ও উঠে-পড়ে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন কৃষ্ণদাস শরৎকে বলল, 'মেয়ে বড় হয়েছে, একে নিয়ে একা কোথায় ঘুরে বেড়াব? গরিব ব্রাহ্মণ আমি। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক একে গ্রহণ করেন আমার বড় উপকার হয়।'

শরৎ রাজী হয়নি। মেয়েকে সে জানত। তার যাতে একটা হিল্লে হয় সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি, কিন্তু নিজে বিয়ে করার মতো মানসিকতা তার ছিল না। হয়তো শান্তির স্মৃতি তখনও তার মনে জীবন্ত ছিল।

হঠাৎই সে সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্বাধীন, দায়-দায়িত্বহীন দুর্বল শরীর নিয়ে কদিনই বা সে ভালো থাকত। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোনো কালেই ভালো ছিল না। বর্মা ম্যালেরিয়া আর প্লেগের ঘর। জ্বর যখন শরতের খুব বেশি, সে সময় মোক্ষদা বাঙালী মেয়ের আন্তরিক স্নেহ ও মমতা নিয়ে শরতের সেবাযত্ন করে। ক'দিন পর জ্বর যখন একটু কমের দিকে, শরৎ দেখল মোক্ষদা মাথার কাছে বসে তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'এখন শরীর কেমন বোধ হচ্ছে?'

এই স্নেহসিক্ত কথা শুনে তার শান্তির কথা মনে পড়ে। মায়ের মৃত্যুর পর শান্তি তার জীবনে একমাত্র নারী যে তাকে সত্যিকারের স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছিল। বহুদিন পর দুটো মমতামাখানো কথা, তার মনে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল। কৃতজ্ঞ চোখ দুটি মেলে দিয়ে বলল, 'বেশ ভালো বোধ করছি, তুমি আমার অনেক সেবা করেছ, আমার সব কষ্ট যেন তুমিই সহ্য করেছ।'

মোক্ষদার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। শরতের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমার মত অভাগিনীর কপালে অতবড় সৌভাগ্য কি জুটবে?'

ক্ষীণ স্নেহসিক্ত স্বরে শরৎ বলল, 'না, না, তুমি অভাগিনী কেন হতে যাবে? তুমি বাংলার মেয়ে, চির স্নেহময়ী তুমি।' তারপর স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগল, 'রূপের আশীর্বাদ তুমি পাওনি, কিন্তু তোমার অন্তরে যে স্নেহের সমুদ্র লুকিয়ে রয়েছে, তুমি যার কাছেই থাকবে সে ধন্য হয়ে যাবে। আমার মা ঠিক এমনি ছিলেন। তিনি অন্তরের রূপে রূপসী ছিলেন। তুমিও ঠিক তেমনই মহৎ।'

মোক্ষদা সব কথা বোধহয় ঠিক শুনতে পায়নি, শুধু শরতের উজ্জ্বল হয়ে ওঠা শ্যামবর্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে ছিল। মন তার কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। বিলাসীও তো এমনি করে মৃত্যুঞ্জয়কে জয় করতে পেরেছিল।[১] মোক্ষদার স্নেহযত্নে শরৎ ক্রমশ ভালো হয়ে উঠল। কৃষ্ণদাস খুব খুশি। তার ধারণা হল এবার হয়তো তার ভাবনা চিন্তা দূর হবে। শরৎ তবুও রাজী হল না।

কিছুদিন পর কৃষ্ণদাস বলল, 'যদি মোক্ষদাকে আপনি বিয়ে না-ই করেন তাহলে আমায় কিছু টাকাপয়সা দিন যাতে দেশে ফিরে গিয়ে মেয়েটার বিয়ে দিতে পারি।' শরতের কাছে অত টাকা পয়সাই বা কোথায় ? অধিকারী মশায়কে সে অর্থ সাহায্য দিতে পারেনি। তারপর হঠাৎ একদিন দেখে যে, মোক্ষদাকে তার কাছে রেখে কৃষ্ণদাস দেশে ফিরে গেছে। মোক্ষদা বাপের উপর দুঃখে অভিমানে ভেঙে পড়ল। শরৎ নিজেও ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল তবু মোক্ষদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তোমার দুঃখ করবার কোনো দরকার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য ব্যবস্থা হচ্ছে তুমি এখানেই থাকতে পারো।'

মোক্ষদা শরতের কাছে রয়ে গেল। এই নিয়ে আর একবার হৈ চৈ অপবাদের ফুলঝুরি ছড়াল। একদিন শরৎ বলল, 'চলো, আমি তোমায় কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বলা যতটা সহজ মোক্ষদাকে বিদেয় করা ঠিক ততটাই শক্ত ব্যাপার ছিল। ছোটবেলা থেকে যে লোক পরের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেছে, সে কেমন করে একা অসহায় মেয়েটিকে ছেড়ে দেবে ? একদিন বাড়ি ফিরে মোক্ষদাকে বলল, 'জান ! তোমার জন্য আজ একটা বর ঠিক করে ফেলেছি।'

মোক্ষদা শরতের দিকে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, কান্নাভেজা সুরে বলল, 'এভাবে কথা বলতে আপনার ভালো লাগে ?'

শরৎ বলল, 'আমি তোমার সংগে পরিহাস করছি না, তোমার এতে খারাপ কিছু মনে করার নেই। বিয়ে তো তোমায় একদিন করতেই হবে। তোমার জন্য যে লোক ঠিক করেছি সে তোমায় ভালোবাসে, তোমার প্রতি সে ভারি সদয়।'

মোক্ষদা অবাক হয়ে গেল, কোনোরকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'আমি এ সব কিছুই জানি না, সে কোন্ জন ? না জেনে আমি কিছুই বলতে পারব না।'

দুষ্টু হাসি হেসে শরৎ বলল, 'তুমি তাকে দেখেছ।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ, অনেকবারই দেখেছ।'

মোক্ষদা হয়তো বুঝতে পেরেছিল। তবুও না–জানার ভান করে বলল, 'আমি কিছু জানি না।'

শরৎ বলল, 'আমায় জান না ?' মোক্ষদা চোখ তুলে শরতের দিকে তাকাল। বিস্ময় ও অবিশ্বাসে ভরা সে দৃষ্টি শরতের অন্তরকে স্পর্শ করল। ভরা বাদলের মতো মোক্ষদা শরতের পায়ের কাছে ঝুঁকে পড়ল। মাঝপথেই শরৎ তাকে ধরে ফেলল, বলল, 'এ লোকটিকে তোমার পছন্দ তো ?' মোক্ষদা কোনো জবাব দেয়নি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বলার মতো তার কিছু ছিল না। শেষমতে তাদের বিয়ে হয়। হয়তো এ-ঘটনা ঠিক ঠিক এভাবে ঘটেনি, কেমন করে ঘটেছিল সে খবর কেউ জানে না। তবে সে-বিয়ে সমাজ ও আইনের চোখে কোনো অংশে কম ছিল না। যতক্ষণ না গান-বাজনা, আলোর ঝলমলানি ও বিধি-বিধানের সংগে বিয়ে হয়, সমাজ তা মানতে চায় না। না মানুক, সর্বহারাদের শরৎ তো মেনেছিল। মোক্ষদাকে বলেছিল, 'আজ থেকে তুমি হিরণ্ময়ী। খাঁটি সোনার মতো তুমি আসল; তাতে কোনোদিন ময়লা লাগে না। তোমার অন্তরের উজ্জ্বল রূপ আমি দেখেছি, সেটুকুই আমার শক্তি।'

১. 'শরৎ সাহিত্য', পঞ্চম ভাগ, পৃষ্ঠা ১২১ ('বিলাসী' গল্প)।

সুরেন্দ্রও মালতীকে ঠিক একথাই বলেছিল, 'তোমাকে বিবাহ করলাম, এতদিনে তুমি আমার স্ত্রী হলে; আর কোথাও পালাতে পারবে না—যে মালা আজ পরালাম, জন্ম-জন্মান্তরে তা আর খুলতে পারবে না।'

আইনত স্ত্রী না হয়েও স্ত্রীর সব দায়িত্ব হিরণ্ময়ী সেদিন গ্রহণ করেছিল। মনের এই মিলনই যথার্থ বিবাহ। বিবাহের মন্ত্র যে ভাষাতেই পড়া হোক-না কেন, সংস্কৃত হলেও কি এসে যায় তাতে? এ পৃথিবীতে এমন অনেক স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয়েছে যাকে তথাকথিত সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো পবিত্র বলা যেতে পারে না, কিন্তু সে-সব মিলনকেও তো সমাজ মেনে নিয়েছিল, আর বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণে পবিত্র করে তুলেছিল। হিরণ্ময়ী যদি মন্ত্রশুদ্ধা স্ত্রী না-ও হয়, তাতে কী হয়েছে? সমাজ যদি তাকে স্ত্রীর ন্যায্য মর্যাদা না দিয়ে থাকে, তাতে তার কি ক্ষতি হয়েছিল? শরতের প্রতি তার মনে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার শেষ ছিল না। শরৎও যে হিরণ্ময়ীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত।

আর একবার জীবন যেন নতুন করে শরতের কাছে ধরা দিল। মনগড়া প্রেমের গল্প বলে বেড়াবার তার আর প্রয়োজন রইল না। তার উচ্ছৃঙ্খল শিল্পীমন, তার উদাসী বৈরাগী মনকে প্রায়ই পরাজিত করে ফেলত। একটু ভেবে দেখলে দেখা যায়, এই জয়ের আধার ছিল তার অহংকার। তাই না বৈষ্ণবী কমললতা শ্রীকান্তকে বলেছে, 'তোমার ঐ উদাসীন বৈরাগী মন-ওর চেয়ে বড় অহংকারী জগতে আর কিছু আছে নাকি।' ('শ্রীকান্ত'-চতুর্থ পর্ব) কিছুদিন আগে বিভূতিভূষণ ভট্টকে শরৎ লিখেছিল[1], 'মধ্যে এই রেঙ্গুনে দাম্পত্য প্রেমচর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম, পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ বাধিয়া গেল এবং মানভঞ্জনের পূর্বেই দেখিলাম, গৃহিণী আমার অভিমান ভরে আর একজন সুপাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। কাজেই আমি আমার পোঁটলা পুঁটলি ঘাড়ে করিয়া এই ৩৬ নম্বর গলির চারতলার একটা ঘর ভাড়া লইয়া বিছানা পাতিয়া চিৎ হইয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

'এটা যে কি হইয়া গেল, আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধূ আমার ব্রহ্মদেশিনী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী। যখন শুনিলাম, তিনি রজককন্যা, তখন কান মলিয়া, একহাত নাকখত দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিন মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়া প্যাসেজ বুক করিয়া বিরহ জ্বালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম। ফিরতি পথে কলিকাতায় গিয়াছিলাম মাত্র। শুনিয়াছি, চণ্ডীদাস নাকি ঐ রকম কি একটা করিয়া মাথুর লিখিয়াছিলেন, আমিও স্থির করিয়াছি, বহুপূর্বে "চরিত্রহীন" বলিয়া যেটা শুরু করিয়াছিলাম এইবার সেটা শেষ করিব।'

পুরো চিঠিখানি পড়ার পর কি মনে হয় না যে সম্পূর্ণ কাহিনীটিই তার মন-গড়া? গুরুগম্ভীর হয়ে পরিহাস করা তার একটি সহজ স্বভাব ছিল। আঠারো মাসের এই প্রণয় কাহিনী যদি বিন্দুমাত্রও সত্য হত, তাহলে গিরীন্দ্রনাথ সরকার, যিনি অনেক সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য রুচিকর গল্পের অবতারণা করেছেন, এ ঘটনার উল্লেখ নিশ্চয় করতেন। তাই মনে হয়, কিশোর বয়সের সেই নীরদার মতো এ ঘটনাও সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। মহাকবি চণ্ডীদাস রজকিনীর সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করেছিলেন, শরতের মনে চণ্ডীদাসের সেই অনন্যসাধারণ প্রেম মনে হয় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিল, নইলে মনগড়া গল্পের পেছনে তেমন জোরালো কারণ আর কি থাকতে পারে? রজকিনী ছাড়াও তার কল্পনালোকে আরো অনেকগুলি প্রেয়সী ছিল। বহুদিন পর সে যখন কলকাতায় আসে, অক্ষয়কুমার সরকারের সঙ্গে[2] নারীচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলেছিল,-'রেঙ্গুনে একটি বাঙালী মেয়ে কতভাবেই না আমায় প্রেম নিবেদন করেছিল। তার সঙ্গ-লাভের জন্য আমিও কম ব্যাকুল হইনি। কিন্তু কদিন একসঙ্গে থাকার পর হঠাৎ সে

১ ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮
২ এই ঘটনার উল্লেখ অক্ষয়কুমার সরকারের ডায়ারিতে পাওয়া যায়। ২ ২ ১৯৩০

উধাও হয়ে যায়, তার বিরহে আমার পাগলের মতো অবস্থা। বাড়িউলী আমার অবস্থা দেখে বলেছিল,"কার জন্য এমন পাগলামী করছ, বন্ধুর জন্য তার টাকার দরকার পড়েছিল; তোমায় ঠকিয়ে তার সঙ্গে চলে গেছে। তোমার প্রতি তার কোন টান ছিল না"।

এই গল্পগুলি সত্যি মিথ্যা যাই হোক, শরতের মানসিকতার পরিচয় এতে পাওয়া যায়। তার ধারণা ছিল নারীর প্রেম ছাড়া পুরুষ সাহসী হতে পারে না। প্রেমের পরিভাষা তার মতে দেহের ক্ষুধা নয় বরং উপাস্য দেবতার কাছে আত্ম-সমর্পণ যথার্থ প্রেম। কৈশোরের সেই ব্যর্থ প্রেমের পর অবশ্যই সে কাউকে না কাউকে সত্যি ভালোবেসেছিল। সে সময় প্রায়ই অনেক মন্দ লোক মেয়েদের প্ররোচিত করে রেঙ্গুনে নিয়ে পালিয়ে যেত। গায়ত্রী এই রকমই একটি তরুণী। যেমন তার ছিল দেহসৌষ্ঠব, তেমনই ছিল মোহিত করা রূপ। শুধু অকাল-বৈধব্যের জন্য তুষের আগুনের মতো ভিতরে ভিতরে জ্বলছিল। মা-বাপ বোধহয় ভালো ব্যবহার করত না তার সঙ্গে, তাই মেসোর কাছে লক্ষ্ণৌ যেতে চেয়েছিল। পাড়ার ছেলে নন্দদুলালের আশ্বাসে সে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু ছেলেটি লক্ষ্ণৌ না গিয়ে তাকে নিয়ে রেঙ্গুনে পালিয়ে আসে। বেচারী গায়ত্রী পথে ঘাটে কাকেই বা বিশ্বাস করে বলবে এ কথা? জাহাজে বর্মার একটি ছেলে পাঁচকড়ির সঙ্গে তার আলাপ হয়। নন্দদুলাল পাঁচকড়িকে জানায় যে, গায়ত্রী তার স্ত্রী। রেঙ্গুনের বিখ্যাত অ্যাডভোকেট শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে তারা ওঠে। বাড়ির গৃহিণীর স্নেহ-ভালোবাসার ফলে গায়ত্রী নিজের মনের জোর ফিরে পেয়েছিল। তাঁকে নিজের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনিয়েছিল। মুখুজ্জে গিন্নি সমস্ত শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তখুনি গিরীন্দ্রনাথ সরকারকে ডেকে পাঠালেন। গিরীন্দ্রনাথ যার পর নাই নন্দদুলালকে অপমান করলেন, তারপর শরৎ ও অন্য বন্ধুদের সাহায্যে তাকে ভারতগামী জাহাজে তুলে দেওয়া হয়। গায়ত্রীর বাবাকে চিঠি লিখে জানানো হয়, কিন্তু ততদিন গায়ত্রী থাকে কোথায়? মুখুজ্জে গিন্নি গায়ত্রীকে আর থাকতে দিতে রাজী হলেন না। তখন গিরীন্দ্রনাথ শরতের পাড়াতে একটি ঘর ঠিক করে দেন। পাঁচকড়ি তার দেখা-শোনা করত। শরৎ রাতে পাঁচকড়ির বাসায় গিয়ে শুত।

গায়ত্রীর বাবা চিঠির উত্তরে জানালেন, কোন-মতেই কুলটা মেয়েকে ঘরে নিতে রাজী নন। গিরীন হতাশ হয়ে লক্ষ্ণৌ-এ গায়ত্রীর মেসোকে চিঠি লিখে সব কথা জানাল। বার বার আসাযাওয়ার ফলে শরৎ গায়ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ল। বিধবা, সহায় সম্বলহীনার প্রতি শরতের মন সহজাত করুণার ফলে আকৃষ্ট হয়। একদিন সে একথা গায়ত্রীকে জানাল, বলল, 'আজকাল বিধবা বিবাহের রেওয়াজ হয়েছে, তবু যদি সমাজ তা অস্বীকার করে তাহলে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করব।'

গায়ত্রী দুঃখে কাতর হয়ে বলল, 'শরৎ দা, যে ফুল ঝরে গেছে তা দিয়ে দেবতার পুজো হয় না।' শরৎই শুধু গায়ত্রীকে প্রেম নিবেদন করেনি, পাঁচকড়ির ধনী মনিবও তার প্রতি আসক্ত হয়। সেদিন কারবারের বিষয়ে কথা বলার জন্য পাঁচকড়িকে তার বাড়িতে খুঁজতে এসে গায়ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়। এর পর থেকে তাকে নানা প্রলোভন দেখাতে লাগল। কখনও উপহার পাঠিয়ে বা কোনোদিন কোনো মহিলাকে পাঠিয়ে দিত তারপর একদিন স্বয়ং গাড়ি নিয়ে গায়ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য হাজির। তার শক্তি ছিল, আর শরতের সাহসের অভাব ছিল না। গায়ত্রীকে রক্ষা করার জন্য তার সামনে রুখে দাঁড়াল, তখন মনে মনে সে নিশ্চয় রাজুকে স্মরণ করেছিল।

মজা দেখবার লোকের অভাব হল না। রক্তপাত হয় আর কি! গিরীন্দ্রনাথ খবর পেয়ে দৌড়ে এল, তাকে দেখে যে যার পালাল। এ-ঘটনার দু-তিন দিন পর লক্ষ্ণৌ থেকে গায়ত্রীর মেসোর চিঠি এল, 'গায়ত্রীকে লক্ষ্ণৌ পৌছে দাও।'

গায়ত্রী চলে গেল, শরতের প্রণয় আর-একবার ব্যর্থ হল।

এ গল্পটিও যদি পুরোপুরি মিথ্যে হয়, আশ্চর্যের কিছু নয়। তার সম্বন্ধে নানান ধরনের গুজব শুনতে পাওয়া যেত। তা যদি সত্যিও হয়, তাতেও কিছু যায় আসে না। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই গোপনে প্রকাশ্যে অনেক কিছু ঘটে। কুলীন, কৌলিন্যহীন এমন কত মেয়ের সংস্পর্শেই

তো সে এসেছিল। সে তো কোনো সন্ন্যাসী ছিল না। অপরের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে অন্যদের থেকে একটু বেশি পরিমাণেই ছিল। বেশ্যাদের কাছে যেত ঠিকই, কিন্তু তাদের আপদে বিপদে, অসুস্থতায় অক্লেশে প্রাণ দিয়ে সেবা ও সাহায্য করতে পেছ-পা হত না। একবার রেঙ্গুনে বন্ধুদের সঙ্গে নাম করা এক বাঈজীর বাড়ি গিয়ে দেখে যে, তার বসন্ত হয়েছে। বন্ধু ফিরে গেল, শরৎ থেকে গেল। অনেক সেবা-শুশ্রূষা করেও তাকে বাঁচানো গেল না, শেষ পর্যন্ত তার শেষকৃত্য সেরেই বাড়ি ফিরেছিল।

এইজন্যই তো ভদ্রলোকেরা তাকে চরিত্রহীন অস্পৃশ্যের মতো দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাদের সান্নিধ্য পাবার লোভ শরতের কোনোদিন ছিল না। সংসারী হবার পর আবার তার সৌন্দর্য ভাবনা মূর্ত হল, ভালোবাসা তার ঘরে ফুলের মাধুর্যে ভরে গেল। সে বই ভালোবাসত, ফুল ভালোবাসত, পশুপাখি ভালোবাসত; সর্বোপরি হিরণ্ময়ীর আগমনে হিন্দু গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে তুলসীর চারাও দেখা দেয়।

পাখি পোষা শরতের নেশা ছিল। একটা ময়না ছিল, আদর করে তাকে মোনা বলে ডাকত। একদিন হঠাৎ পাখিটি মরে গেল। নিজের সন্তান মরে গেলে যেমন দুঃখ হয়, শরৎ ঠিক ততটাই দুঃখ পেয়েছিল। এরপর একটা সিঙ্গাপুরী নূরী পাখি জোগাড় করে, ভালোবেসে তার নাম দেয় 'বাটু বাবা'। তাকে রাতবিরেতে খাওয়াত। বন্ধুরা বলত, 'পাখি কি রাত্তিরে খায়?'

শরৎ বলত, 'পাখিরা বনে জঙ্গলে থাকে, নিজের ইচ্ছেমত খায়, কিন্তু যখন সংসারে আমাদের মধ্যে তারা থাকে, তখন আমাদের মতোই তাদেরও খাওয়া-দাওয়া করাতে হয়। নিজে হাতে করে যদি না খাওয়াই ওরা দুঃখ পায়। যদি ভালোবাসাই না দিতে পারব, তাহলে খাঁচায় বন্ধ করে লাভ?'

রাত্রিবেলা বাটুবাবা ভারি চমৎকার গান করত। প্রতিবেশীরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করত, 'শরৎবাবু! কাল রাতে আপনার বাড়িতে কেউ গান গাইছিল? "সখীরে কি আর বলিব আমি" ভারি চমৎকার মিষ্টি গলা তো!'

শরৎ হেসে বলত, 'আরে, ওতো বাটুবাবা গাইছিল।'

বাড়িতে কেউ এলে বাটুবাবা তখুনি বলত, 'কে? কে তুমি?'

শরৎ বলত, 'আমি।'

ওমনি বাটুবাবা চিৎকার জুড়ে দিত, 'বাটু। টু-ট্-ট্।'

বাটুবাবার জন্য শরৎ রূপোর একটা দাঁড়, সোনার চেন, পায়ে স্প্রিং দেওয়া রূপোর মল গড়িয়ে ছিল। নিজের বিছানার পাশে তার শোবার ব্যবস্থা ছিল। দামী রেশমের বালিশ, তোষক ও মশারির ব্যবস্থাও ছিল। রাত্তিরে শরৎ বাটুবাবার শেকল খুলে দিত, ওমনি দাঁড় থেকে নেমে টুক্ করে মশারির ভিতর ঢুকে পড়ত।

বাটুবাবা সুন্দর ছিল কিন্তু দুর্দান্ত পাজি ছিল। শরৎ যখন আদর করে চুমু খেত, গদ্‌গদ্ হয়ে তার গালে নিজের ছোট্ট মাথাখানি রগড়াত, কিন্তু আর কেউ আদর করতে গেলে চিল চেঁচাত, কামড়ে দিত। তাই পারতপক্ষে নতুন লোক শরতের বাড়ি যেতে চাইত না। চিরপ্রহরী কুকুরের মতো বাটুবাবা সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখত। একদিন, বাড়িতে যখন কেউ ছিল না, বাড়ির ঝি রান্নাঘর থেকে ঘি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, ভেবেছিল কেউ দেখবার নেই। কিন্তু বাটুবাবা চিৎকার করে পাড়া মাত করে তুলল। প্রতিবেশীরা ভাবল, বাটুবাবা যখন-তখন চেঁচায়, তাই কেউ গা করল না। কিন্তু বাটুবাবা ঠোঁট দিয়ে চেন ছিঁড়ে ফেলে ঝি-এর উপর ঝাপটে পড়ল, আর এমন জোরে কামড়ে ধরল যে, ঝি বেচারী চিৎকার করে কেঁদে ফেলল, 'ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে!'

বাটুবাবা তাকে কিছুতেই পালাতে দেয়নি। সেই সময় শরৎ ফিরে আসাতে ঝি হাতেনাতে ধরা পড়ল।

একদিন সোনার চেন গলায় জড়িয়ে বাটুবাবা মরে গেল। দুঃখে ব্যথায় শরৎ আচ্ছন্ন হয়ে

পড়ে। বিধিমত নদীতীরে গিয়ে তার দাহসংস্কার করে। কদিন বাড়ির বাইরে বেরোয়নি, নায়নি খায়নি, রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল। বন্ধুরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি হয়েছে, শরৎবাবু? মনে হচ্ছে বড় শোক পেয়েছেন?'

শরৎ বলেছিল, 'আমার সন্তান মরে গেছে।'

শরৎ একটা খাঁটি দিশি কুকুর পুষেছিল। যেমন কুৎসিত দেখতে, তেমনই অসভ্য। একজন ফকির হিরন্ময়ী দেবীকে বলেছিলেন, 'এই কুকুরটি পুষলে তোমাদের ভাগ্য উজ্জ্বল হবে।'

কুকুরের জন্যই হোক বা যে কারণেই হোক, সত্যি তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই বড় বউ আদর করে কুকুরের নাম রেখেছিল বংশীবদন। ভালোবাসা সুন্দর নামের পরোয়া করে না। ছোট্ট অদ্ভুত যা হোক একটা নামও ভালোবাসার প্রতীক হতে পারে। তাই শরৎ বংশীবদনের নাম দিল ভেলী। ভেলীর আদরের শেষ ছিল না। এ পৃথিবীতে মানুষ সম্পন্ন ও সুন্দরকেই ভালোবাসে কিন্তু শরৎ বোধহয় মনে মনে শপথ নিয়েছিল, সে তাদের ভালোবাসবে, যারা অসুন্দর-সর্বহারা-বঞ্চিত

৯

'চরিত্রহীন' লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। 'নারীর ইতিহাস' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ লেখা হয়ে গিয়েছিল। এই সর্বপ্রথম শরতের মনে হয় বইগুলি ছাপা হলে কেমন হয়? ভাগলপুরের অন্য বন্ধুদের বই তো বেশ ছাপা হচ্ছে, তাদের থেকে সে খারাপ কিছুই লেখে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে কাকে লেখা যায়? সৌরীন, সুরেন, বিভূতি না প্রমথকে? প্রমথর উপর তার বিশ্বাস ছিল কিন্তু অনেক বছর হয়ে গেছে, এখন সে কলকাতায় আছে কি না; আর, থাকলেও বা তার ঠিকানা কি ?

কোনো একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ এক সন্ধ্যায় তার বাসায় আগুন লেগে যায়। নীচের তলায় একজন ধোপা থাকত। আগুন যখন লাগে, সবাই সে-সময় ঘুমিয়ে ছিল। প্রতিবেশীদের চিৎকারে ঘুম ভেঙে হতভম্ব, তখন আগুন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। সবার আগে হিরন্ময়ী দেবী, কুকুর ভেলী ও পাখিকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেয়। এরপর অত্যন্ত দুর্লভ এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় বই, কাপড়-চোপড় লোহার একটা ট্রাঙ্কে বন্ধ করে দৌড়ে নীচে নামতে গেল কিন্তু ততক্ষণে কাঠের বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, ট্রাঙ্কটি ফেলে দিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে এল। তারপর সড়কের একপাশে দাঁড়িয়ে এই দারুণ অগ্নিকাণ্ড দেখতে লাগল। সামনের ময়দানে তার কয়েকজন বন্ধু হাওয়া খাচ্ছিল, তারা ছুটে এসে দেখে শরৎ একদৃষ্টিতে নিজের জ্বলন্ত বাড়িখানির দিকে চেয়ে রয়েছে। সহানুভূতির সঙ্গে এক বন্ধু বলেছিল, 'সব জিনিসপত্র তো বাড়ির ভেতরেই রয়ে গেল, লাইব্রেরি, অয়েলপেন্টিং পাণ্ডুলিপি, সবই তো নষ্ট হয়ে গেল।'

শরৎ বিরস গলায় বলল, 'তা তো হল, এখন কি আর করা যাবে?'

এক বিদেশী বন্ধুর কাছ থেকে সে সম্পূর্ণ লাইব্রেরিখানা অল্প দামে কিনেছিল। খুব যত্ন করে নিজের বই, অয়েলপেন্টিং দিয়ে সাজিয়েছিল। অভাগিনী নারীদের ইতিহাস, 'চরিত্রহীন' না জানি কত বছর ধরে লিখেছিল, আজ সব কিছুই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

হঠাৎ ধোপার আর্তস্বর শুনতে পেল। নিজের প্রাণের ভয়ে ছাগলের দড়ি খুলতে ভুলে গিয়েছিল। সবার বারণ সত্ত্বেও শরৎ আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে থেকে ছাগল ছানাটিকে বুকে করে বিদ্যুৎগতিতে বাইরে বেরিয়ে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত বাড়িখানা ঝুপ করে ভেঙে পড়ল।

এই অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকমের কথা বলেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে শরৎ

নিজে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে দুটো চিঠি লেখে। এ চিঠির আগে শরৎ তাকে কোনো চিঠি দিয়েছিল কি-না সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। অগ্নিকাণ্ডের প্রায় মাস খানেক পর সে লিখেছিল[১], 'প্রমথকে জানাচ্ছি যে, আমি দেশে মাঝে মাঝে আসি এবং ভবিষ্যতে আশা করি আসব। গতবারে যখন এসেছিলাম দু-বার প্রমথর ঠিকানা জোগাড়ের চেষ্টা করেও পাইনি, তাই দেখাও হয়নি।

'আমার শরীর ভাল নয়। বছর দুই আগে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। আজও সুস্থ হতে পারিনি, তবে কষ্ট একটু কম। ৫ই ফেব্রুয়ারি রাত্রে আমার বাড়ি ঘর সব পুড়ে গেছে। বাড়ি পুড়ে যাবার ফলে একটা ব্যাপারে বড় মুস্কিলে পড়েছি। হাজার-দু-হাজার টাকার জিনিস তো নষ্ট হয়েছে কিন্তু একটি বহুমূল্য লাইব্রেরি ও বইয়ের পাণ্ডুলিপিও সেই সঙ্গে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। মনে মনে ঠিক করেছিলাম এ মাসের শেষে সেটি প্রেসে পাঠাতে পারব। কার উপরে এ ভার দেওয়া যায় ভাবতে গিয়ে প্রমথর কথাই বারবার মনে হয়েছে, কিন্তু এ কথা মনে হয়নি যে, সে এখন কলকাতায় আছে কি না? আশা করি খবরাখবর ভাল। মে মাসে আবার কলকাতা যাচ্ছি।'

বারোদিন পর দ্বিতীয় চিঠি লিখেছিল—

প্রমথ,

তোমার পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি, এমন তো হয় না। যে আমার স্বভাব জানে, তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশি জবাবদিহি করা বাহুল্য।

অনেক সময়েই যে তুমি আমার কথা মনে করিবে, তাহা আমি জানি। কেন না, যাদের মনে করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তারাও যখন করে, তখন তুমি তো করিবেই।

আমার ভাগ্যবিধাতা আমার সমস্ত বড় শাস্তির এই শাস্তিটা জন্মকালেই বোধ হয় আমার কপালে খুদিয়া দিয়াছিলেন। আজ যদি আমি বুঝিতে পারিতাম, আমার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—আমি সুখী হইতাম, শান্তি পাইতাম! তা হইবার নয়। আমাকে ইঁহারা স্মরণ করিবেন, সন্ধান জানিতে চাহিবেন, বিচার করিবেন এবং অনবরত আমার অধোগতির দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মর্মান্তিক দুঃখের বোঝা অক্ষয় করিয়া রাখিবেন। লোকে যে আমার কাছে কি আশা করিয়াছিলেন, কি পান নাই, এবং কি হইলে যে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, এ যদি আমাকে কেহ বলিয়া দিতে পারিত, আমি চিরটা কাল তাহার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিতাম। এত কথা বলিতাম না যদি তুমি গত কথা না স্মরণ করাইয়া দিতে। আমি মরিয়া গিয়াছি—এই কথাটা যদি কোন দিন কাহারো দেখা পাও বলিয়ো।

তাই বলিয়া তুমি যেন দুঃখ পাইয়ো না। তোমাকে আমি ভয় করি না। কেন না, তুমি বোধ হয় আমার বিচার করিবার গুরুভার লইতে চাহিবে না। তাই তোমার কাছে আরো কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকিলেও ক্ষতি হইবে মনে করি না। তুমি আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী। বিচারক হইয়া আমার মর্মান্তিক করিবে না, এই আশাই তোমার কাছে করি।

আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ—তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

১. শহরের বাহিরে একখানা ছোট বাড়িতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

২. চাকরি করি। ৯০ টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টাকা অ্যালাউন্স পাই। একটা ছোট চায়ের দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয়, কোনমতে কুলাইয়া যায়, এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

---

১. ১১ মার্চ, ১৯১২

৩. 'হার্ট ডিজিজ' আছে। যে কোন মুহূর্তেই—

৪. পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর 'ফিজিওলজি', 'বাইওলজি', 'সাইকোলজি' এবং কতক 'হিস্ট্রি' পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

৫. আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই।

লাইব্রেরি এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের 'ম্যানুস্ক্রিপ্ট','নারীর ইতিহাস' প্রায় ৪০০/৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম,তাও গেছে। ইচ্ছা ছিল যা হৌক একটা এ বৎসর 'পাবলিশ' করিব। আমার দ্বারা কিছু হয়, এ বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার শুরু করিব, এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতা প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।

তোমার ক্লাবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। কিরূপ হয় মাঝে মাঝে লিখিয়া জানাইয়ো। নিজেও কিছু করা ভাল—হুজুগের মধ্যে এ কথাটাও ভোলা উচিত নয়। তোমার যেরকম স্বভাব তাহাতে তুমি যে এতগুলি লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া পড়িবে, তাহা মোটেই বিচিত্র নয়।

আমাদের আগেকার 'সাহিত্য সভার' একটি মাত্র সভ্য নিরুপমা দেবীই সাহিত্যের চর্চা রাখিয়াছেন—আর সকলেই ছাড়িয়াছে—এই না? আমার আগেকার কোন লেখা আমার কাছে নাই—কোথায় আছে, আছে কি না আছে, কিছুই জানি না—জানিতে ইচ্ছাও করি না।

আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন 'হার্ট ডিজিজ'-এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন আমি পড়া ছাড়িয়া 'অয়েল পেন্টিং' শুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি 'অয়েল পেন্টিং' সংগ্রহ হইয়াছিল তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও তো তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। নভেল, হিস্ট্রি, পেন্টিং কোন্‌টা? কোন্‌টা আবার শুরু করি বল ত?

তোমার স্নেহের
শরৎ

এর আগেও হয়ত চিঠি সে লিখেছিল কিন্তু মাত্র দুটি চিঠি[১] ছাড়া তার লেখাজোখা কারও কাছে পাওয়া যায় না। এই দুটি চিঠি থেকে তার জীবনে নতুন যুগের সূত্রপাতের আভাস পাওয়া যায়। গত ন' বছরে তার চারপাশে যে রকম রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মেঘ যেন ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল। পাঁচ বছর আগে যখন 'বড়দিদি' গল্প প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তার ভূয়সী প্রশংসা করেন, মনে হয় শরতের হীনমন্যতা কেটে গিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছিল। প্রথম চিঠিখানিতে সে চায়ের দোকানের কথা উল্লেখ করেছিল,কথাটা সত্যি। একদিন অফিসে বন্ধুদেরও বলেছিল, 'আমি একটা চায়ের দোকান খুলেছি।' বন্ধুরা অবাক হয়, কল্পনার রাজ্যে বাস করে এই বখাটে বাউণ্ডুলে লোক আবার দোকান খুলবে কি? অবিশ্বাসের সুরে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিল, 'সত্যি নাকি?'

'দেখতে চাও তো চল।'

অফিসের পর খুব আগ্রহ সহকারে সে দু-চারজন বন্ধুকে নিজের দোকানে নিয়ে যায়। বাড়ির কাছেই একটা কাঠের বাড়িতে সত্যি সত্যিই একটা চায়ের দোকান। এক বন্ধু বলল, 'শরৎ বাবু, এবার আপনি চাকরি ছেড়ে দিন, চায়ের দোকানে নিজে না বসলে দু'দিনে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

শরৎ বলে, 'না রে, বসার দরকার নেই। জান আমি কি বন্দোবস্ত করেছি? একটিন দুধে কতটা চিনি মেশাতে হবে আর তাতে ক'পেয়ালা চা তৈরি হতে পারে সব আমি ঠিকঠাক করে

১. ডিসেম্বর ১৯০২-এর চিঠি গিরীন্দ্রনাথের নামে।
ফেব্রুয়ারি ১৯০৮-এর চিঠি বিভূতিভূষণ ভট্টের নামে।

দিয়েছি। সকালে এক টিন দুধ কিনে দিয়ে যাব। দিন গেলে যতটা দুধ খরচ হবে সেই অনুপাতে পয়সা হিসেব করে নেব।'

এ অঙ্ক বলা যতটা সহজ, কাজের বেলায় ততটাই গোলমেলে মনে হল। শরৎ অচিরেই দোকানপাট তুলে দিল।

১০

বাড়িতে আগুন লাগার পর শরৎ স্ত্রী ও প্রিয় কুকুরকে নিয়ে কলকাতায় আসে।[১] কলকাতার রাস্তায় প্রকাশ্যে কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরুত। ছোট্ট একটুখানি দাড়ি, মাথায় অবিন্যস্ত চুল, মোটা ধুতি, পায়ে চটি, গায়ে চাইনিজ কোট, যে-কেউ দেখে বলে দিতে পারত এ-লোক কখনোই শহুরে নয়।

এবার সে নিজেই খোঁজ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করল। সে সময় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'ভারতী'র সম্পাদনা করছেন। শরৎ তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। কলকাতা ছাড়ার পর এই বোধহয় প্রথম দেখা। দুজনের অনেক কথা হল। শরৎ বলল, 'চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলাম, তোমার অনেক খোঁজ করেছিলাম কিন্তু দেখা হয়নি।'

সৌরীন্দ্রমোহন বলল, 'আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না তুমি লেখা কেন ছেড়ে দিলে? তুমি জান না যে, তুমি লিখলে বাংলা সাহিত্যের কতখানি শ্রীবৃদ্ধি হবে। তোমার ভাগ্যে মহান হওয়া লেখা আছে। "ভারতী"তে যখন "বড়দিদি" ছাপা হয় তখন তো কী হৈ চৈ, যে এ নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের লেখা।'

সৌরীন্দ্রমোহন বিস্তারিত ভাবে সে সব গল্প শোনাল। 'বড়দিদি' পড়ে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন তা-ও বলল। শরৎ যে এ সব কথা জানত না তা নয়, কিন্তু বিশ্বস্ত এক বন্ধুর মুখ থেকে শোনা সে আর এক কথা। সব শুনে শরৎ বলল, 'যেখানে গিয়ে পড়েছি আর রোজগারের ধান্ধায় এমন জড়িয়ে পড়েছি যে, মন একেবারে ভেঙে গেছে।'

সৌরীন্দ্রমোহন শরৎকে নিজের বাড়ি ডেকে নিয়ে গেল। মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, একজন যুবা সাহিত্যিক ফণীন্দ্রনাথ পাল ও আরো অনেকে সেখানে এসে জুটলেন। কালীপুজোর দিন, দুপুর দুটো বেজে গেছে। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাজি-ফুলঝুরি পুড়িয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। শরৎ সৌরীন্দ্রমোহনকে বলে উঠল, 'একবার "বড়দিদি" পড়ে শোনাও তো, ঠিক মনে নেই কি গল্প লিখেছিলাম।' বৈঠকখানায় পাতা তক্তপোষের[২] উপর শুয়ে পড়ে বলল, 'তুমি পড়ো, আমি শুনি!'

সৌরীন্দ্রমোহন গল্প পড়ে শোনাতে লাগল, শুনতে শুনতে শরৎ অভিভূত হয়ে পড়ল, চোখে জল, মাঝে মাঝে বলে উঠছিল, 'থাম, থাম তো, একি আমার লেখা? খুব খারাপ তো লিখিনি। শুনে মনটা কেমন হয়ে যায়। এ গল্প আমি নিজের হাতে লিখেছি, ভারি আশ্চর্য লাগে!'

সৌরীন্দ্রমোহন বলল, 'তাই তো বলছি! যারা এমন লিখতে পারে তারা যদি লেখা ছেড়ে দিয়ে কোলে হাত দিয়ে বসে থাকে, সে অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। তুমি যদি না লেখ তা হলে আমি মনে করব যে, তুমি আত্মহত্যা করেছ। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, যদি তুমি না লেখ তাহলে নিষ্ঠুরতা হবে।'

গল্পের যে জায়গায় রোগশয্যায় শায়িত সুরেন্দ্রনাথ স্ত্রী শান্তিকে দেয়ালে টাঙানো নিজের ছবি দেখিয়ে বলছে, 'এই ছবিটি যদি চারি জন ব্রাহ্মণ দিয়ে নদীর তীরে পোড়াতে পার.... ' শরৎ তন্ময় হয়ে শুনছিল, হঠাৎ পাগলের মতো উঠে বসে সৌরীন্দ্রর হাত ধরে বলল, 'থাম।'

---

১ অক্টোবর, ১৯১২

২. এই তক্তপোষেরই উপর বসে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে লেখক এ সব কথা শুনছিলেন।

তার গলা বুজে এসেছিল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'এবার পড়ো।'

সৌরীন্দ্রমোহন পড়ে চলল, চোখ বন্ধ করে শরৎ পুরো গল্পটা শোনার পর বলল, 'ভালোই তো লিখেছি। সত্যি এবার থেকে আমি আবার লিখব। তোমাদের বিশ্বাস যে আমি ভালো গল্প লিখতে পারি?'

সৌরীন্দ্রমোহন বলল, 'ফণীন্দ্র পাল এ বছর বি.এ.পাস করেছে। সরকারী চাকরি করতে চায় না। "যমুনা" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করতে চায়, তারই পেছনে জীবন কাটাবে ভেবেছে। ওর কাগজে কিন্তু তোমায় লিখতেই হবে।'

শরৎ বলল, 'হ্যাঁ লিখব! কিন্তু তোমরাও যদি সেই সঙ্গে লেখ। তোমরা মানে নিরুপমা, সুরেন, গিরীন, বিভূতি, তুমি, তোমার ছোটবোন, উপেন, তাহলে আমিও নিশ্চিত লিখব। আমি একটা অদ্ভুত রচনা লিখেছিলাম "নারীর ইতিহাস" নামে। ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচশো পাতা লেখা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বাড়িতে আগুন লেগে যাওয়াতে সব পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। কোনো গল্প ছিল না, কিন্তু উপন্যাসের মতো রুচিকর মন-লাগা বিষয় ছিল। অনেক ইতিহাস, পুরাতত্ত্বের বই ও অনেক জীবনী অনুশীলন করে লিখেছিলাম। ওটা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে সত্যি মনে ভারি কষ্ট পেয়েছি।'

সৌরীন্দ্রমোহন বলল, 'কিছুই কি মনে নেই?'

'কিছু কিছু মনে আছে।'

সৌরীন্দ্র উৎসাহ দিয়ে বলল, 'যতটা মনে আছে সেটুকুর উপর ভরসা করে আবার লেখা শুরু করে দাও।'

শরৎ বলল, 'লিখব! আর একটা প্রকাণ্ড উপন্যাস লিখেছি, এক-চতুর্থাংশ লেখা আছে। তোমাকে পড়বার জন্য দেব। গল্পের নাম রেখেছি "চরিত্রহীন"। যদি শেষ করতে পারি তো নতুন জিনিস হবে। দু-তিন মাস পরে আবার কলকাতায় আসব তখন নিয়ে আসব। "নারীর ইতিহাস" যদি লিখে উঠতে পারি সেটিও সঙ্গে আনব। এবার এসে কলকাতায় কিছুদিন থাকব ভাবছি।'

'চরিত্রহীনে'র কয়েকটা পাতা শরৎ সঙ্গে করে এনেছিল। সে সময় 'সাহিত্য' পত্রিকার খুব জয়জয়কার, সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়। উপেন মামার সঙ্গে 'চরিত্রহীনে'র কয়েকটা পাতা নিয়ে সমাজপতি মহাশয়ের সঙ্গে শরৎ দেখা করে। ফণীন্দ্রনাথের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা হয় কিন্তু উপন্যাসটির সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরি না থাকায় শেষ পর্যন্ত কোনোরকম কিছু ধার্য হয়নি। আবার লেখার আশ্বাস দিয়ে শরৎ রেঙ্গুনে ফিরে যায়। যাবার আগে বহরমপুরে গিয়ে বিভূতিভূষণ ভট্ট ও নিরুপমা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে ভোলেনি।

আবার অফিস থেকে ছুটি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সে কলকাতায় আসে। যদিও বন্ধুদের সঙ্গে তার সদ্ভাব হয়ে গিয়েছিল, তবুও এবার সে কারুর কাছেই ওঠেনি। যেখানে ওঠে সেখানে ভদ্রলোকেরা থাকার কথা ভাবতে পারে না। গতবারে সে হাওড়ার একটি বেশ্যালয়ে গিয়ে উঠেছিল। জানতে পেরে খুঁজতে খুঁজতে উপেন মামা সেখানে গিয়ে দেখে পাশের বাড়ির একটি মেয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে। তাকেই উপেন মামা জিজ্ঞেস করে, 'এখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে কি কেউ এসে উঠেছেন? রেঙ্গুন থেকে এসেছেন।'

মেয়েটি বলে,'দাদা ঠাকুরের কথা জিজ্ঞেস করছেন? তিনি তো উপরে, এই যে সিঁড়ি দেখছেন, আপনি সোজা উপরে চলে যান, সামনেই দেখতে পাবেন।'

উপরে গিয়ে উপেন মামা দেখল যে শরৎ 'চরিত্রহীন' লেখায় ব্যস্ত।

অনেক দিন পরে[১] ফণীন্দ্রনাথ পাল লিখেছিলেন, 'সেদিনের কথা মনে পড়ছে, যেদিন শ্রীযুক্ত

১. ১৯২৮

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় খবর দিলেন যে, শরৎ কলকাতায় এসেছে। গতকাল সে আমার বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু কোথায় উঠেছে জানিয়ে যায়নি। কি করে কোথায় তাকে খোঁজা যায়, সে নিয়ে অনেক গবেষণা হল। সে যাই হোক শেষ পর্যন্ত তাকে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম।'

এবার শরৎ চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে এনেছিল। বাদামী রংয়ের ফুলস্কেপ সাইজ কাগজের প্রায় সত্তর আশী পৃষ্ঠা হবে। সৌরীন্দ্রমোহনকে বলল, 'পড়ে দেখো চলবে কি না। প্রকাণ্ড উপন্যাস—তোমাদের রায় জানতে পারলে শেষ করব। এখন পর্যন্ত গল্পে নায়িকার পদার্পণ হয়নি, গল্পের নায়িকা "কিরণময়ী" একটি নতুন জিনিস।'

'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্র পালকেও পড়ে শোনায় উপন্যাসটি। পাল মশায় তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে বারবার অনুরোধ করেন উপন্যাসটি যাতে শরৎ শেষ করে। বললেন, 'যমুনায় এটি আমি ছাপতে চাই।'

'ভারতী' ও 'সাহিত্য' সম্পাদক দুজনের সঙ্গেও এ সম্বন্ধে কথাবার্তা হয় কিন্তু কোনো কারণবশত 'সাহিত্যের' সম্পাদক রাজী হতে পারেননি। 'ভারতী'র দাবি সর্বাগ্রে, কারণ লোক-সমক্ষে সে-ই সর্বপ্রথম 'বড়দিদি' প্রকাশ করেছিল। সৌরীন্দ্রমোহন 'চরিত্রহীন'-এর প্রথম অংশটুকু পড়ে স্বর্ণকুমারীকে দেয়। তিনি পড়ে তো একেবারে বিভোর, বললেন, 'চমৎকার রচনা, কিন্তু সম্পূর্ণ না পড়া পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না। বই লেখা শেষ হলে আমায় জানিয়ো, আমি একশো টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।'

এ প্রস্তাবে শরতের মন ওঠেনি, বলেছিল, 'তাড়াতাড়িতে এ জিনিস লেখা হয়ে উঠবে না। আমি অনেক ভেবেচিন্তে লিখি। কিরণময়ীর কথা যখন লেখা হবে তখন কি সেটি কোনো মহিলা দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকায় ছাপার যোগ্য হবে? আমার মনে হয় না।'

বাকি থাকল 'যমুনা'। ঠিক হল যে, ধারাবাহিকভাবে এটি ছাপা হবে। ফণীন্দ্রনাথ পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়াতে রাজী হলেন। কিন্তু তখনও লেখাই তো শেষ হয়নি। তাই প্রথমে 'যমুনা'য় শরতের একটা পুরোনো গল্প 'বোঝা' ছাপা হয়। 'বড়দিদি'র পর তার নামে কোনো পত্রিকায় ছাপা এটি প্রথম রচনা। এ ব্যাপারেও শরৎকে কেউ কিছুই জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন মনে করেনি। সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে গল্পটি নিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন 'বোঝা' গল্পটি 'যমুনা' পত্রিকায় দিয়ে দেয়। শরৎ জানতে পেরে খুব দুঃখ পেয়েছিল। তখুনি বন্ধুদের লিখে জানায়, 'এবার থেকে আমার অনুমতি ছাড়া আমার কোনো পুরোনো লেখা যেন ছাপা না হয়।'

নিজের পুরোনো লেখাগুলো শরৎ তেমন উঁচুদরের বলে মনে করত না। কিন্তু বন্ধুরা সেগুলো ছাপাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভারি আশ্চর্য লাগে, পাঁচ বছর আগে যখন 'বড়দিদি' বের হয়, তখন এরা কেন চুপ করে ছিল, কেন তারা শরতের খোঁজ করেনি বা তাকে দিয়ে লেখাবার চেষ্টা করেনি! এও কি অবাক হবার কথা নয় যে, 'বড়দিদি'র অভূতপূর্ব সাফল্য ও রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা শুনেও নতুন কিছু লেখবার বা ছাপাবার প্রবৃত্তি কি শরতের হয়নি?

নিশ্চয় তা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। শরতের কাছেও তেমন একটা কোন উঁচু লক্ষ্য অবশ্যই ছিল। 'চরিত্রহীন' লেখার পেছনে যে সাধনার ইতিহাস দেখা যায় তা তার সেই বাসনার সাক্ষ্য বৈ আর কিছু নয়।

এবারে কলকাতায় বসে অজ্ঞাতবাসের আর প্রয়োজন রইল না, অপরিচয়ের অন্ধকার পেরিয়ে সে আলোকিত পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। খ্যাতিমান লেখকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তাই চাকরি ছেড়ে দেবার কথা মনে মনে ভেবেছিল। বলেছিল, 'লিখলে যদি মাসিক একশো টাকা মতো আয় হয় তাহলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি কলকাতায় এসে বাস করব।'

'ভারতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী আর 'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল এ ব্যাপারে রাজী হলেন। এমন-কি পালমশায় শরতের একেবারে ভক্ত হয়ে গেলেন। ফণীন্দ্রের মা শরৎকে স্নেহ করতেন, সামনে বসিয়ে খাওয়াতেন। নিজের মা-র মৃত্যুরপ্রায় ১৫-১৬ বছর পর শরৎ আবার স্নেহের পরশ পেল। ফণীন্দ্রকে বলল, 'তোমার মায়ের স্নেহে যেন আমি নিজের

মায়ের ভালোবাসা আবার ফিরে পেলাম।'

রেঙ্গুন ফিরে যাবার পর তার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ফণীন্দ্রের মা তার কুশল সংবাদের জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। শরৎ ফণিকে লেখে, 'আমার সম্বাদ যে আপনার মাতৃদেবী গ্রহণ করেন, আমার এ বহু সৌভাগ্যের কথা; আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি তাঁহাকে জানাইবেন। আমার সংবাদ লইবার লোক সংসারে প্রায় নাই, সেই জন্য কেহ আমার ভালো মন্দ জানিতে চাহেন শুনিলে, কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। আমার মত হতভাগ্য সংসারে খুবই কম।....'

এর কিছুদিন পর রেঙ্গুন থেকেই বন্ধু প্রমথনাথকে লেখে, 'প্রমথ, একটা অহংকার করব, মাপ করবে? যদি কর ত' বলি। আমার চেয়ে ভাল নভেল কিংবা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জানে সত্য বলে মনে হবে—সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কর—তার পূর্বে নয়—এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে কারও কাছে অসত্য খাতির চাই না—আমি সত্য চাই।' উপেন্দ্রমামাকে সে আরো স্পষ্ট ভাবে লেখে, 'আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। মনে কোর না গর্ব করচি—কিন্তু আমায় আত্মনির্ভরই বল, আর "প্রাউড"ই বল, এই আমার নিজের ধারণা।'[১]

শরতের এ ধারণা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বদলায়নি। বহু বছর পর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমার বয়স হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথেরও বয়স হল, এখন মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়। এর পরে বাংলার উপন্যাস সাহিত্যের স্থানটা হয়'ত একটু নেমে পড়বে।'

সেই সময় বাংলা-সাহিত্য জগতে এক আলোড়নকারী ঘটনার সূত্রপাত হয়। খবরে প্রকাশিত হয় যে, খুব শীঘ্র 'ভারতবর্ষ' নামে একটি পত্রিকা বের হবে। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তার সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য রাখা হয়েছে ৬ টাকা। সে সময়কার কোনো পত্রিকার দামই তিন টাকা ছ আনার বেশি ছিল না। নিজের মূল্যের জন্য 'ভারতবর্ষ' লোকেদের মনে দারুণ বিস্ময় ও কৌতূহল জাগাল।

কয়েক বছর আগে কলকাতায় 'ইভনিং ক্লাব' নামে একটি সান্ধ্য সমিতির স্থাপনা হয়। সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং সম্পাদক ছিলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। বিখ্যাত প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স-এর সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক। অন্যান্য সদস্যরাও যথেষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রমথই প্রস্তাব দেয় যে, সমিতির তরফ থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হোক।

অধ্যক্ষ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বললেন, 'কিন্তু তাতে তো ক্লাবের বেশ ক্ষতি হবে। সদস্য সংখ্যা যখন একশো পর্যন্ত বাঁধা তখন কোন পত্রিকা প্রকাশ করা মূর্খতা।'

অন্যান্য সদস্যরাও তাঁর কথা সমর্থন করল। কিন্তু প্রমথ ছিল দারুণ জেদী মানুষ, ক্লাবের তরফ থেকে না হলেও পত্রিকা বের করা হবেই। রায় মহাশয়ের সম্পাদনায় সে 'ভারতবর্ষ' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বন্ধু ও সহপাঠী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এতে যোগ দেওয়ার জন্য রাজী করায় আর ভরসা দেয় যে, যদি শরৎকে লিখতে বাধ্য করা হয় তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই। অন্য কোনো পত্রিকা এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। শরতের লেখনীর উপর বন্ধুদের এই অগাধ প্রীতি ও বিশ্বাস তাকে নিশ্চয় লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রমথ শরতের বিশিষ্ট বন্ধু, তাদের দল পয়সার দিক দিয়েও বেশ ভারি ছিল। ফণীন্দ্র পাল এসব দেখে তো বেশ চিন্তায় পড়ল; শরৎ যদি 'ভারতবর্ষে' লেখে তাহলে 'যমুনা'র কি হবে? পারিশ্রমিক না নিয়ে 'যমুনা'য় কি শরৎ লিখবে?

শরৎ যখন ফণীন্দ্রের দুর্ভাবনার কথা জানতে পারল, তখন তাকে ডেকে কথা দেয় 'যমুনা'য় সে অবশ্যই লেখা দেবে। টাকার গোলাম সে নয়, আর 'ভারতবর্ষ' তো এখনও বেরই হয়নি।

১. ২২ অগাস্ট, ১৯১৩

রেঙ্গুন ফিরে গিয়ে শরৎ একটা গল্প লেখা আরম্ভ করে। একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ সরকার ছাড়া এ রহস্য আর কেউ জানতেন না। যতটুকু সে লিখত প্রতিদিন অফিসে গিয়ে তাঁকে শোনাত। যোগেন্দ্রনাথ গল্প শুনে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে, শরতের স্বভাব জানা সত্ত্বেও অন্যান্য বন্ধুদের কাছে এ রহস্য উন্মোচন না করে পারেননি, কিন্তু তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। কেমন করেই বা করত? তাদেরই এক কেরানী বন্ধু যে ভালো গল্প লিখিয়ে, বিশ্বাস করা শক্ত ব্যাপার বৈ কি! শুধু পোস্ট অফিসের বিভূতিবাবু সে কথা বিশ্বাস করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ যোগেনদা, শরৎদার মধ্যে অসাধারণ একটা কিছু আছে এ সন্দেহ আমার মনে বহুদিন হয়েছে, বিশেষ করে তার ছবি আঁকা দেখে। এখন ভাবছি তুমি যা বলেছ মিথ্যে হতে পারে না।'

দশদিন কাবার হবার পরও গল্প আর শেষ হল না, অসম্পূর্ণই থেকে গেল। একটি সংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট মনে করে সেই অসম্পূর্ণ লেখাটিই শরৎ ফণীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেয়, নাম দিয়েছিল 'রামের সুমতি'। সব সময়েই শরৎ কিছু-না-কিছু লিখত,কিন্তু 'রামের সুমতি' তার নতুন জীবনের প্রথম লেখা। 'যমুনা'র সম্পাদক 'রামের সুমতি' পড়ে বিস্ময়ে বিভোর হয়ে গেলেন। সারা বাংলাদেশে হৈ চৈ পড়ে গেল। কলকাতায় একদিন 'জাহ্নবী' কার্যালয়ে অনেক সাহিত্যিক একত্রিত হয়েছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এসে বললেন,–'যমুনা'য় "রামের সুমতি"[1] নামে একটা অদ্ভুত গল্প বেরিয়েছে, এমন গল্প আমি এর আগে কখন পড়িনি।'

একথা শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কার লেখা গল্প?'

প্রভাতকুমার বললেন, 'কোন্ এক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

হেমেন্দ্র হঠাৎ কথাটা বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না, তখুনি গল্পটি পড়তে বসে গেলেন। তিনি লিখেছেন, 'পড়তে পড়তে অভাবিত বিস্ময়ে মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বাংলাভাষায় সত্য সত্যই সে শ্রেণীর গল্প আর কখনও প্রকাশিত হয়নি। একেবারে প্রথম শ্রেণীর অসাধারণ লেখনীর দান। মনে মনে মানলুম প্রভাত একটি অদ্ভুত আবিষ্কার করেছেন বটে।'

কিন্তু কে এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়?

এটি কি কোনো বিখ্যাত লেখকের ছদ্মনাম? নূতন কোনো লেখকেরই হাত একেবারে এত বেশি পাকা হতেই পারে না। অমন যে প্রতিভার অবতার রবীন্দ্রনাথ, তাঁরও প্রথম-দিককার রচনায় বয়সোচিত দুর্বলতার অভাব নেই। হাঁসের বাচ্চারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সাঁতার কেটে জলে ভাসতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্যিকরা লেখনী ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই পাকা লেখা লিখতে পারেন না। কত শত চেষ্টা ও পরিশ্রমের এবং দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার পর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পরিপূর্ণতা লাভ করেন।

হেমেন্দ্র রায় চুপ করে রইলেন না। লেখকের খোঁজে উঠে পড়ে লাগলেন। দুদিনের মধ্যেই জানতে পারলেন, শরৎচন্দ্র নতুন লেখক বটে তবে ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যসাধনায় রত। দু'বছর আগে তার লেখা 'বড়দিদি' নামক গল্প 'ভারতী'তে বের হয়েছিল, তখনও সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও 'রামের সুমতি' পড়ে আত্মবিভোর হয়ে ইভনিং ক্লাবে গল্পটির প্রশংসা করেছিলেন। প্রমথনাথকে বলেছিলেন, 'এঁর লেখা তুমি "ভারতবর্ষে"র জন্য পাবার চেষ্টা করো। ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যের নতুন যুগ ইনি সৃষ্টি করবেন।'

সত্যি সত্যিই শরৎচন্দ্রের গল্প সে সময়কার বিখ্যাত গল্পলেখক প্রভাতকুমার

১. ফাল্গুন, ১৩১৯ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)

মুখোপাধ্যায়কে ডিঙিয়ে গিয়েছিল। দুর্দান্ত রামকে ঘরের ভিতর বন্ধ করে নারায়ণী যখন একের পর এক বেত মারছে আর রাম কাঁদতে কাঁদতে পালাচ্ছে, এ দৃশ্য পড়ার পর রায়মশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ভাষা প্রমথ, এ লোকের সঙ্গে বড় দেখা করতে ইচ্ছে করছে।'

তিনি নাট্যকার ছিলেন, তাই গল্পের নাটকীয় রসে এমন অভিভূত হলেন যে মেয়ে মায়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন;"রামের সুমতি" কেমন লাগল?'

মায়া বেচারী তো মেয়েই—বলল, 'খুব ভালো লেগেছে, বাবা।' রায় মহাশয় হেসে বললেন, 'খুব ভালো বলছিস কেন রে? বল্ না, ভারি চমৎকার হয়েছে।'

রায় মহাশয়ের ছেলে দিলীপকুমার রায়ও এ গল্প পড়ে দারুণ প্রভাবিত হয়, কয়েকদিন আগে সে প্রমথনাথের সঙ্গে শরৎ ও প্রভাতকে নিয়ে তর্ক করেছিল। দিলীপ প্রভাতের অনুরাগী আর প্রমথ শরতের। কিন্তু সেই দিলীপ যখন 'রামের সুমতি' পড়ে, তখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে ভুলে গেল। পড়তে পড়তে চোখের জলে লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে যেত, মনে হত এমন গল্প তো আগে কখনও পড়িনি। এ গল্পে না আছে তরুণ-তরুণীর আবেগ উচ্ছ্বাস, আর না আছে পুলিসের দোর্দণ্ড কায়দা-কানুনের রকমারী গল্প।

এতে আছে মাতৃরূপা বৌদির স্নেহ আর দুর্দান্ত এক বালকের কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। প্রমথ দিলীপকে জিজ্ঞেস করে, 'কি? কেমন লাগল শরতের"রামের সুমতি"? প্রভাতবাবুর থেকে কোন্ অংশে কম?'

দিলীপকুমার বলে, 'তিনি বর্মায় কেন থাকেন?'

প্রমথ বলে, 'সে একটা পাগল, নইলে এমন দুর্গতি তার হয়? বর্মা তো ছাগল-ভেড়ার গোয়াল। দুঃখের কথা আর কি বলব, সে রেঙ্গুনে থাকে।'

দিলীপ বলল, 'কী বলছেন আপনি? রেঙ্গুন তো শুনেছি প্রকাণ্ড শহর, কলকাতার চেয়েও বড়।'

'বড় হলে কি গোয়াল হয় না; সুন্দরবনও তো কলকাতার চেয়ে বড় কিন্তু তা বলে কি সেটা ইডেন গার্ডেন হতে পারে?'

'তা না হয় পারে না। কিন্তু রেঙ্গুনের উপর আপনার এত রাগ কেন?'

'ঠিক রাগ নয়। কিন্তু রেঙ্গুন শহরের নাম শুনলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যাই। সেখানের লোকেরা নাপ্পি খায়[১], তার দুর্গন্ধে ভূত পালায়। কিন্তু সে তো ওই কিষ্কিন্ধ্যাতে থেকেই পড়াশোনা করে, আমি তাকে লিখি যে"ওরে ন্যাড়া[২], এত বই পড়ে হবেটা কি? তুই কলম ধর।" কিন্তু কে শোনে কার কথা! আজকাল আবার আর একটা ভূত চেপেছে—সে নাকি আজকাল ছবি আঁকে।'

'ছবি আঁকেন? কী বলছেন আপনি?'

'আমি আর কি বলব। মতিভ্রম হয়েছে, কতবার লিখলাম কলকাতায় চলে আয়, কিন্তু কে শোনে কার কথা, সে জবাবই দেয় না।'

সেদিন সারা বাংলাদেশ একটা কথা জানতে পেরেছিল যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কথাশিল্পীর জন্ম হয়েছে ও অতীতের দীপ নির্বাপিত হয়েছে।[৩]

'যমুনা'র গ্রাহক সংখ্যা রাতারাতি বেড়ে যায়। বহু পত্রিকা শরৎবাবুকে লেখার জন্য আহ্বান জানায়। 'চরিত্রহীন' ছাপতে যিনি অস্বীকার করেছিলেন, সেই সমাজপতি মহাশয় চিঠি লিখলেন। সে সময়কার সাহিত্যিক মহলে সমাজপতি মহাশয়ের দুন্দুভি বাজত, যে লেখকের উপর তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়ত তিনিই কৃতার্থ হয়ে যেতেন। সেই লোক যখন অত্যন্ত বিনীতভাবে শরৎচন্দ্রকে গল্পলেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন, বন্ধুরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে

১. এক রকমের পচা মাছ।
২. শরতের ডাক-নাম।
৩. ওডেন ল্যাটিমোর লিখেছেন, 'দশম শতাব্দীতে ইসলাম জন্মগ্রহণ করে, আর অতীতের দীপ নির্বাপিত হয়ে যায়।'

গেলেন। কিন্তু শরৎ সেই রকমই নীরব হয়ে রইল, অন্তত প্রকাশ্যে কোনোরকম উত্তেজনা সে ব্যক্ত করেনি। এক বন্ধুকে জানিয়েছিল, 'আমার শরীর ত ভাল নয়—তা ছাড়া গল্প-টল্প বড় লিখতেও প্রবৃত্তি হয় না। এ যেন আমার অনেকটা দায়ে পড়ে গল্প লেখা। যা হোক,লিখব—অন্তত আপনার জন্যেও। সত্যই এর মধ্যে গল্প লিখে পাঠাবার অনেকগুলি নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে কিন্তু আমি বোধ করি প্রায় নিরুপায়। অত গল্প লিখতে গেলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশি কিছুতে লিখি না—১০/১২ ঘণ্টা পড়ি।'

কিন্তু এ অহংকার থাকা সত্ত্বেও সে লেখা থেকে নিবৃত্ত হতে পারেনি। অন্তরের সুপ্ত ইচ্ছা আবার জাগ্রত হয়ে উঠল। 'যমুনা'র প্রতি তার একটা বিশেষ টান ছিল, ফণীন্দ্রনাথকে লেখে, 'যদিও আমার ছোট গল্প লেখার অভ্যাস আজকাল কিছু কমেছে,তবে আশা করি দু-এক মাসের মধ্যেই অভ্যাস ঠিক হয়ে যাবে। আমি প্রতিমাসেই ছোট করে গল্প (১০/১২ পাতার মধ্যে) এবং প্রবন্ধ পাঠাব। গল্প নিশ্চয়ই, কেন না আজকাল ঐটার আদর কিছু অধিক।'

এর পর লেখে, 'তিনটে নামে লেখা পাঠাব।

১. সমালোচনা, প্রবন্ধ প্রভৃতি-অনিলা দেবী।
২. ছোট গল্প-শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩. বড় গল্প-অনুপমা।'

এ প্রস্তাব শরৎ এই ভেবেই করেছিল যে, যদি সব লেখা একই নামে ছাপে তাহলে পাঠক ভাববে, ওই একটা লোক ছাড়া ওদের কাছে আর কোনো লেখক নেই। শরতের এই অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তার আর একটা পরিণাম হল যে, ছেলেবেলায় লেখা তার যে-সব রচনা বন্ধুদের কাছে ছিল, সেগুলিও তারা খুঁজে পেতে কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত করতে লাগল। 'বোঝা'র পর 'বাল্যস্মৃতি', 'হরিচরণ', 'কাশীনাথ', 'অনুপমার প্রেম', 'চন্দ্রনাথ', 'আলো ও ছায়া', এক বছরের মধ্যেই 'সাহিত্য' ও 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়। শরতের কিন্তু এ-সব মোটেও ভালো লাগেনি, তার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না যে এ সব গল্প ছাপা হোক। মনে করত, সেগুলো অপরিণত বয়সের রচনা। অতিশয় ভাবপ্রবণতা ও যুবকোচিত অতিরঞ্জন তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। বার বার চিঠি লিখে সে নিজের রাগ ও মনের বেদনা প্রকাশ করেছিল—'তুমি" কাশীনাথ"সমাজপতিকে দিয়ে ভাল করনি। ওটা "বোঝা"র জুড়ি, ছেলেবেলার হাত-পাকানোর গল্প। ছাপানো তো দূরের কথা, লোককে দেখানও উচিত নয়। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোর না, একা"বোঝা"ই যথেষ্ট হয়েছে।'[১]

'এবারের"সাহিত্য"আমার নাম দিয়ে কি একটা ছাইপাঁশ ছাপিয়েছে। ও কি আমার লেখা? আমার ত একটুও মনে পড়ে না। তা ছাড়া যদি তাই হয়, তাহলেই বা ছাপান কেন? মানুষ ছেলেবেলায় অনেক লেখে, সেগুলো কি প্রকাশ করতে আছে? তুমি "বোঝা"ছাপিয়ে আমাকে যেমন লজ্জিত করেছ, সমাজপতিও তেমনি ঐটে ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েছেন।'[২]

' "দেবদাস"ভাল নয়, প্রমথ, ভাল নয়। সুরেনরা আমার সব লেখারই বড় তারিফ করে, তাদের ভাল বলার মূল্য আমার লেখা সম্বন্ধে নাই।ওটা ছাপা হয়, তাও আমার ইচ্ছা নয়।'[৩] ' "দেবদাস" নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও করো না। ঐ বইটা একেবারে মাতাল হইয়া বোতল বোতল খাইয়া লেখা; ওটার জন্য আমি নিজেও লজ্জিত। ওটা"ইমমরাল্"। বেশ্যা চরিত্র ত আছেই, তা ছাড়া আর কি কি আছে ব'লে মনে হয় যেন। আর আগেকার লেখাও প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি,·····আষাঢ়ের"যমুনা"য়"আলো ও ছায়া"বলে একটা অর্ধসমাপ্ত গল্প বেরিয়েছে দেখলাম। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত বা আমারই লেখা। ····· হয়ত আমার ছেলেবেলার লেখার অনুকরণে আর কেউ লিখেছে।'[৪]

---

১. ১০ জানুয়ারি, ১৯১৩
২. জানুয়ারি, (মাঘ), ১৯১৩
৩. ৮ এপ্রিল, ১৯১৩
৪. ২৫ জুন, ১৯১৩

রবীন্দ্রনাথের মতো লিখতে পারবে এ বিশ্বাস তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, তাই তার মনে হয় ছেলেবেলার লেখা গল্পগুলি যদি ছাপা–ই হয় তাহলে ছাপার আগে একবার পরিমার্জনার জন্য দেখা দরকার। 'কাশীনাথ' যখন পুস্তকাকারে ছাপে, যথেষ্ট সংশোধন তাতে করা হয়। পত্রিকায় যখন গল্পটি ছাপা হয়, তখন এটির শেষ বড় মর্মান্তিক ছিল, কাশীনাথ নিহত হয় ও কমলা আত্মহত্যা করে। কিন্তু বই যখন ছাপা হয় তখন গল্পটি মিলনান্তক করা হয়।

'সাহিত্য' পত্রিকায় যখন গল্পটি প্রকাশিত হয়, তখন হরিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামে একটি তরুণ তার সঙ্গে দেখা করে। গল্পটি ছেলেটির খুব ভালো লাগে কিন্তু গল্পের শেষ ভালো লাগেনি। তার আপত্তি শুনে শরৎ বলে, 'শুধু "কাশীনাথ" কেন, "সাহিত্য" পত্রিকাটিতে আমার আরো কয়েকটি গল্প বেরিয়েছে সেগুলির সব-কটিই আমার ছেলেবয়সের লেখা। আমাকে না বলেই একেবারে ছেপে দিয়েছে, যদি প্রুফও দেখতে দিত তাহলে একটু অন্তত রদবদল করা যেতে পারত।'

হরিকৃষ্ণ পরামর্শ দিয়ে বলে, 'এখন কি কোনরকম পরিবর্তন সম্ভব নয়?'

শরৎ বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না বই হিসেবে ছাপবে কি না। যদি ছাপে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন করব।'

'কাশীনাথ' ছাড়া 'চন্দ্রনাথ' গল্পেও বেশ পরিবর্তন করা হয়। 'চন্দ্রনাথ' গল্প প্রকাশ করা নিয়ে ভারি হাঙ্গামা বাধে। উপেন্দ্রর ইচ্ছে ছিল ওটি 'যমুনা'য় ছাপা হোক, 'যমুনা'য় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুরেন্দ্র ও গিরীন্দ্র এতে খুব দুঃখিত হয়ে পড়ে, এ নিয়ে উপেন্দ্রর সঙ্গে তাদের ঝগড়াও হয়, কারণ 'চন্দ্রনাথের' পাণ্ডুলিপি তাদের কাছ থেকেই চেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুরেন্দ্র এ ব্যাপার শরৎকে লিখে জানাতে শরৎ লেখে, যে অংশটুকু ছাপা হয়ে গেছে তা বাদ দিয়ে পাণ্ডুলিপিখানি যেন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সংশোধন করে সে সেটি 'যমুনা'য় পাঠিয়ে দেবে।

সংশোধন করার পর ফণীন্দ্রনাথকে গল্পটি পাঠাবার সময় শরৎ লেখে যে, "চন্দ্রনাথ" গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলায়, অন্তত প্রথম যৌবনে এরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব এরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি, তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত। অন্তত দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব।..... এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, কোনরূপ "ইম্‌মরালিটি"র সংস্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে।'[১]

যে লোকের উপর চিরটা কাল অনৈতিকতার দোষ আরোপিত করা হয়েছে এবং যে নৈতিকতাকে একটা নতুন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে, সে লোকের মন এ প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল ভেবে ভারি অবাক লাগে। মনে হয়, দিশাহীন আরম্ভিক ভাবপ্রবণতা ও আবেগপূর্ণ উগ্রতা সংযত হতে চাইছিল। হয়তো সেজন্যই নতুন কোনো লেখা সে খুব পরিশ্রম সহকারে লিখত। যতক্ষণ না মনোমত কথা মনে পড়ত ততক্ষণ পর্যন্ত লেখা কাটাকুটি করত। মনের সুরের সঙ্গে কথার সুর যতক্ষণ না মিলত, ততক্ষণ কোনো কিছুই তার মনঃপূত হত না। তাই পাণ্ডুলিপি কখনও কখনও এমন কাটাকুটিতে ভরে যেত যে, অপরের পক্ষে বোধগম্য হওয়া মুশকিল হয়ে যেত। একবার একখানি পাণ্ডুলিপি প্রিয়বন্ধু ও সহকর্মী কুমুদিনীকান্ত করকে দিয়ে বলেছিল, 'এই দেখ কত কাটাকুটি করেছি, কোন জায়গা বাকী নেই, শত চেষ্টা করেও তুমি পড়তে পারবে না।'

১. ৩ মে, ১৯১১

'রামের সুমতি'র পর 'পথ নির্দেশ' লেখা শরৎ শুরু করে। আগের মতোই যতটুকু সে লিখত অফিসে গিয়ে যোগেন্দ্রনাথকে পড়ার জন্য দিত। দা' ঠাকুরের চায়ের দোকানে বসে এ সব গল্প আলোচনা হত। টিফিনের পর সবাই সেখানে চা খেতে জুটত, কথা কইতে কইতে কখনো কখনো টিফিনের সময় পার হয়ে যেত। দেরি করে অফিসে ঢুকলে সিংহল দেশ–বাসী–বৃদ্ধ সুপারিন্টেন্ডেন্ট একটু হেসে বলতেন, 'বেশ, বেশ, আপনারা দুজনে আবার দেরি করে ফিরেছেন।'

দুজনেই লজ্জায় মরমে মরে যেত। এর পর দু তিন দিন পর্যন্ত নিতান্ত ভালো মানুষের মতো টিফিনের পর অফিসে আসত, কিন্তু আবার যে-কে সেই। 'রামের সুমতি'র সঙ্গে যেন শরতের সুমতিও ফিরে এসেছিল। তার মতে 'পথ নির্দেশ' 'রামের সুমতি'র চেয়ে ভালো। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ বলে, 'শরৎ দা, আপনি বলেন যে আপনি বৈষ্ণব। ভাবছি বৃন্দাবনের সেই চির কিশোর-কিশোরীদের প্রেমলীলার কথা, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার লেখার যে রকম অসাধারণ ক্ষমতা তাতে মনে হয়, আপনার লেখায় সে ভাবের রস খুব ভাল উৎরোবে।'

শরৎ বলল, 'তোমাদের যেমন রুচি, কিন্তু ওভাবে তো আর গল্প উপন্যাস লেখা যায় না। তুমি তো সব কিছুই ধর্ম,মর্ম ও কর্মের চোখ দিয়ে দেখতে চাও।'

যোগেন্দ্র বলল, 'আপনি লেখক, আমি পাঠক, আমারও তো ভাল লাগা উচিত।'

শরৎ গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ,সে তো লাগাই উচিত কিন্তু লেখকেরও নিজস্ব বিচারের একটা ক্ষমতা আছে। অনেকে অনেক রকমের উল্টো-পাল্টা কথা বলে কিন্তু পাঁচজনের মতামতের উপর নির্ভর করে কি কাজ করা যায়? এভাবে সংসার চলতে পারে না।'

আবহাওয়া গরম হয়ে উঠছিল, যোগেন্দ্র চট করে কোনো জবাব দিল না; একটু পরে বলল, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ শরৎদা; কিন্তু এ কথা তার চেয়েও ঠিক যে,কাউকে জিজ্ঞেস করা হলে সে নিজের পছন্দের কথা নিশ্চয়ই বলবে, যদি না সে নিতান্তই তোষামুদে হয়।'

শরৎ মনে মনে রেগে যায় কিন্তু যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল, 'বেশ, বলো, কী করলে তুমি খুশি হও?'

যোগেন্দ্র বলে, 'সে তো আমি তোমায় বলেইছি, শরৎদা। এরপর তোমার মর্জি, আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

'ঠিক আছে, দেখি কিছু করতে পারি কি না।'

শরৎ এ প্রসঙ্গ সেখানেই থামিয়ে দেয়। যোগেন্দ্র বুঝতে পারে শরৎ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে, কাছে এসে বলল, 'শরৎদা! তুমি যেমন গল্পের শেষটুকু আমায় বলে মনের ভার হাল্কা করে ফেলেছ, তেমনি আমিও নিজের মনের কথা তোমায় বলেছি। যদি অন্যায় হয়ে থাকে আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি, তুমি নিজের বিবেচনায় যা ঠিক মনে কর তাই কেন করো না।'

শরৎ বলল, 'না–হে সরকার, অন্যায় কিছুই হয়নি, ভাবছি তোমার কথাটাও মন্দ নয়, দেখি কি করতে পারি।'

'নিশ্চয় পারবে শরৎদা, নিশ্চয় পারবে।'

'যদি না পারি সে অপরাধ কিন্তু আমার নয়।'

'বেশ! সেই কথাই রইল, অপরাধ তো আমারই, শরৎদা।'

যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন, 'যেদিন সম্পূর্ণ গল্পটি পুনরায় পড়িবার অবকাশ পাইলাম, সেদিন মনে হইল, ঐন্দ্রজালিকের কাঠির স্পর্শে শেষ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া আগাগোড়া গল্পটিকে এমন শ্রী সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে, যাহা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়–অনুপম।'[১]

১ যোগেন্দ্রনাথ সরকার–'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র'।

'পথ নির্দেশ' একটি প্রেমের গল্প। হেমনলিনী ও তার মাকে গুণেন্দ্রর আশ্রয়ে এসে থাকতে হয়। এখানেই হেম ও গুণেন্দ্রর মধ্যে প্রেম হয়। দুজনেই পরস্পরকে ঐকান্তিক ভাবে চায় কিন্তু গুণেন্দ্র ব্রাহ্ম। সেইজন্য হেমের মা গুণেন্দ্রর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হেমের বিয়ে অন্যত্র দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একবছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে আবার সে গুণেন্দ্রর আশ্রয়ে ফিরে আসে। মা বেদনায় ভেঙে পড়ে, এই ব্যথার মধ্যেই মা নিজের ভুল বুঝতে পারে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে গুণেন্দ্রকে তার সঙ্গে হেমের পুনর্বিবাহের ইচ্ছা জানিয়ে যান। মেয়েকে তিনি মুখে কিছু বলে যেতে পারেন নি, তাঁর মৃত্যুর পর গুণেন্দ্রও ততখানি সাহসী হয়ে উঠতে পারেনি। এইভাবে তার প্রেম ও দ্বিধার মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ভালোবাসাকে মহিমান্বিত করার জন্য দুজনেই কাশী চলে যায়।

প্রথমে শরৎ গুণেন্দ্র ও হেমের মিলনে গল্পের শেষ করেছিল, কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ তার জন্য বড় বিরোধ করেন। অনেক অন্তর্মন্থনের পর শরৎ তাঁর পরামর্শ মেনে নেয়। যখন গুণেন্দ্র হেমকে কাশীবাসের প্রস্তাব জানায়, তখন অশ্রুসিক্ত হেম বলছে, 'চলো, কিন্তু এই কি তোমার শেষ আদেশ? এ কি আমি সহ্য করতে পারব?'

গুণেন্দ্র বলল, 'পারবে। যখন বুঝবে সংসারে ভালোবাসাকে মহামহিমান্বিত করবার জন্য বিচ্ছেদ শুধু তোমার মত অতুল ঐশ্বর্যশালিনীর দ্বারে এসেই চিরদিন হাত পেতেছে, সে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রেমের কুটীরে অবজ্ঞায় যায়নি —তখনই সহ্য করতে পারবে। যখন জানবে, অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবেই সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতেই মধুর, তখন সইতে পারবে, হেম। উঠে বস—চলো, আজই আমরা কাশী যাই। যে কটা দিন আরো আছি; সে কটা দিনের শেষ সেবা তোমার ভগবানের আশীর্বাদে অক্ষয় হয়ে তোমাকে সারা জীবন সুপথে শান্তিতে রাখবে।'

গল্পের শেষ যোগেন্দ্রনাথ সরকারেরই যে ভালো লেগেছিল তা নয়, সৌরীন্দ্রমোহনেরও খুব ভালো লাগে।

শরৎকে যোগেন্দ্র বলে, 'দেখলে তো আমি ঠিকই বলেছিলাম।'

শরৎ বলল, 'হ্যাঁ, সরকার, তুমি ঠিকই বলেছিলে। সত্যি,সবসময় নিজের ধারণা ঠিক হয় না।'

একদিন সৌরীন্দ্রর কথায় শরৎ 'বড়দিদি'র শেষের দুলাইন কেটে দিয়েছিল, হরিকৃষ্ণের কথায় 'কাশীনাথে'র শেষটুকু বদলে দিয়েছিল, এবারও যোগেন্দ্রর কথায় 'পথ নির্দেশ'-এর শেষটুকু অন্যভাবে লেখে। অন্যের বিচার ধারা তার অন্তর্মনে প্রেরণা জোগাত, তা মানা বা না-মানা নিজের মর্যাদার বিরুদ্ধে মনে করত না। রাষ্ট্রপতি হিসেবে আব্রাহাম লিংকন নিজের প্রথম ভাষণে বন্ধু সেওয়ার্ড-এর পরামর্শে ভাবনাত্মক আপীলের কয়েকটি কথা যোগ করেছিলেন, সে কথা বহু বছর পরও লোকেরা মনে রেখেছিল।

'পথ নির্দেশ'-এর এই বর্তমান শেষটুকু শরৎ সাহিত্যের মূল ভাবনার সঙ্গে জড়িত। তার প্রেম তো চিরকাল মিলনের অভাবে সম্পূর্ণ ও ব্যথায় মধুর হয়ে উঠেছে সুরদাসের রাধিকার মতো—

'মেরে নয়না বিরহ কি বেলী ভঈ
সিঁচত নীর নয়নকে সজনী
মূল পাতাল গঈ।'

শরতের নিজের বিবেচনায় 'পথ নির্দেশ' গল্পটি 'রামের সুমতি'র চেয়ে ভালো হয়েছিল। এমন লোকও ছিল এবং আজও আছে যারা মনে করে যে, হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধে বিপর্যস্ত ও অসফল প্রেমের গভীর বেদনা সত্ত্বেও চরিত্র-চিত্রণের দৃষ্টিতে 'রামের সুমতি'র চেয়ে 'পথ নির্দেশ'

অনেকাংশে নীরস। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রের বাইরে একজন বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে যে প্রশংসা সে পেয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে উৎসাহজনক মনে করা যেতে পারে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শরৎকে লিখেছিলেন, 'সফলতা কত ক্ষুদ্র, বিফলতা যে কত বড়। আপনার গল্প "পথ নির্দেশ" পড়িতে পড়িতে ভয় হইয়াছিল যে, অত কষ্টের পর সফলতার মোহ ভুলিতে পারিবেন না। কিন্তু দেখিয়া সুখী হইলাম যে, যে-পথটা বড় তাহা নির্দেশ করিতে ভুলিয়া যান নাই।'[১]

'পথ নির্দেশ' তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এ কথা বোধ হয় কেউ জানত না। প্রমথকে লিখেছিল, [২]'পথ নির্দেশ' পড়েছ? কেমন লাগল? কিছু মনে পড়ে ভাই—বহুদিনের একটা গোপন কথা?'

এর পর 'বিন্দুর ছেলে' নামে আর একখানি গল্প সে শুরু করে। এ গল্পের আভাস তার লেখা একটি চিঠিতে পাওয়া যায়;' "রামের সুমতি"র মত প্রেমবর্জিত আমাদের বাঙালীর ঘরের কথা-(যাহাতে মানুষের শিক্ষাও হয়)"সিরিজ অব স্টোরিজ"লিখিব মনে করিয়াছি। বাঙালীর "আইডিয়েল" অন্তঃপুর যে কি, ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।'

' "বিন্দুর ছেলে" বলিয়া আর একটা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি-একবার মনে করিয়াছিলাম একবার তোমাকে দেখাইব, কিন্তু সময় হইল না। অবশ্য তোমাদের "ভারতবর্ষ" কাগজের যোগ্য সেটা মোটেই হয় নাই, তার উপর আবার একটু বড় আয়তনের হইয়া পড়িয়াছে।..... তাই, ও কাগজে ছাপান অসম্ভব বুঝিয়াই"যমুনা"য় পাঠাইয়া দিয়াছি।'

'রামের সুমতি' 'বিন্দুর ছেলে' 'পথ নির্দেশ' ক্রমান্বয়ে এই তিনটি গল্প সম্বন্ধে শরৎ বারবার বন্ধুদের চিঠি লিখেছিল, সেগুলি পড়লে তার মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

' "বিন্দুর ছেলে" আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার পছন্দ হইবে না, হয়ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। তাই পাছে আমার খাতিরে অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছিলাম।..... যদি সত্যই আপনার ভাল লাগিয়া থাকে, ছাপাইয়া ভাল করিয়াছেন।'[৩]

'পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে"পথ নির্দেশের" কাছে"রামের সুমতি"র স্থান নীচে, অনেক নীচে। আমি একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থ চিত্র লিখিব স্থির করিয়া "রামের সুমতি"র মত একটা নমুনা লিখি—এই রকম হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে যতরকমের সম্বন্ধ আছে—সব রকম সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া এক একটা গল্প লিখিয়া এই বইখানি সম্পূর্ণ করিব। এটা শুধু মেয়েদের জন্যই হইবে।'[৪]

' "বিন্দুর ছেলে" পড়ে দেখো।..... একটুও প্রেমের কথা নেই, নিতান্তই বাঙালীর ঘরের কথা।..... বেশী ক্যারেকটার আছে—তাহাদিগকে পরিস্ফুট করবার জন্যই একটু বেড়ে গেছে।..... গল্প শেষ করে যদি না পাঠকের মনে হয়" আহা বেশ" তবে আবার গল্প কি?" রামের সুমতি","পথ নির্দেশ","বিন্দুর ছেলে" সব এই ছাঁচে ঢালা। আচ্ছা"বিন্দুর ছেলে"পড়ে যদি এমন সাহস দাও যে ওটা তোমাদের"ভারতবর্ষে" পাঠালেও নিশ্চয় ছাপা হতো তাহলে নিজের ওজন বুঝে দেখবার চেষ্টা করব—এই কথা দিলাম।'[৫]

'যাহারা নিজে গল্প লেখে তাহারা ঠিক জানে"রামের সুমতি" যদিও বা লেখা যায়"পথ নির্দেশ" লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়ত সবাই পারিবে না।..... আর নিজের সমালোচনা নিজে কি করিয়াই বা করিব? তবে কলিকাতা এবং এ দেশের লোকের মতে দুটো

১ ৪ ডিসেম্বর, ১৯১৩
২. মে, ১৯১৩
৩. ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩। ফণীন্দ্রকে লেখা।
৪. ডাকমোহর, ১২ মে, ১৯১৩
৫. ৮ এপ্রিল, ১৯১৩

গল্পই সুপারলেটিভ ডিগ্রীতে একসেলেন্ট। দ্বিজুবাবু বল্লেন, গল্পের আদর্শ।'[১]

শরতের রচনা-প্রক্রিয়া, মান্যতা, তার দ্বৈত ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরালে নিহিত উদ্দেশ্য সব কিছুই এই সব চিঠিতে পাওয়া যায়। এ গল্পগুলি তৎকালীন বাংলার প্রবুদ্ধ মানসকে আলোড়িত করে তুলেছে একথা শরৎ বুঝতে পেরেছিল, তাই তার অন্তরে সুপ্ত অহং তার হীনমন্যতাকে ডিঙিয়ে যায়। এই চিঠিটি[২] (প্রমথ না জানি আরো কত চিঠিই তাকে লিখেছিল) 'বিন্দুর ছেলে' পড়ে লিখেছিল, 'এর চেয়ে ভাল গল্প বাঙলা ভাষায় বার হয়েছে কিনা সন্দেহ। তুমি লিখেছ—"ওটা ভাল হয়নি"—কি মন্দ হয়েছে তুমি জান, আমি বলতেও পারি না, বুঝতেও পারি না। তুমি ঐ অছিলা করেছ বোধহয় "ভারতবর্ষ"কে এটা প্রকাশ করবার গৌরব থেকে বঞ্চিত করবার জন্য।..... আমার বিশ্বাস "ভারতবর্ষ" কেন, এর চেয়ে ঢের খারাপ গল্প প্রকাশ করতে পেলে অনেক কাগজ ধন্য হয়।·· তুমি তো কখনই ঠিক গৃহী নও, বরাবর উদাসীন। তোমার কি করে এত "কীন অবজারভেশন উইথ মাইনিউটনেস অব ডিটেলস" জন্মাল? অবাক হয়ে গেছি।·· যা লিখেছ সবই জানি—কিন্তু এমন সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে যেন নিজের সংসারের ঘটনা।'

মহান টলস্টয়ের শালী তানিয়া একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমি জানি তুমি জমিদার, পিতা, জেনারেল ও সৈন্যদের চরিত্র-চিত্রণে সমর্থ, কিন্তু ভালোবাসার দুঃখে বিহ্বল যুবতীর মনের ব্যথা ও মায়ের অনুভূতি কি করে ভাষায় ব্যক্ত কর কিছুতেই বুঝতে পারি না।'

বেচারী তানিয়া হয়তো জানত না যে, তার প্রেমের বেদনার তিনি সর্বক্ষণের নীরব সাক্ষী। নিজের স্ত্রীর মধ্যে তিনি নারী ও মাকে যুগপৎ পেয়েছিলেন। শরৎও কত নীরব প্রেমের ব্যথার সাক্ষী, কত সংসারের সুখদুঃখের সে শরিক। প্রথম প্রেমের অসফলতার বেদনা বুকে চেপে শান্তিকে স্ত্রীরূপে পেয়েছিল, আবার তাকে হারিয়েও ছিল। তারপর জীবনসঙ্গিনী হিরণ্ময়ীর প্রেমচ্ছায়ায় সেই উচ্ছৃঙ্খল ব্রাত্য ব্যক্তি জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পায়। কিন্তু নিজেকে গোপন করার বিদ্যায় সে এমনই নিপুণ ছিল, শেষ পর্যন্ত অনেকেই তাকে অবিবাহিত মনে করে। বহু বছর পর হিন্দির সুপ্রসিদ্ধ লেখক জৈনেন্দ্রকুমার যেন তানিয়ার স্বরেই লিখেছেন, 'সেই লোক যে স্ত্রীরূপে কোন নারীকে কোনদিন পান নি, দুর্দান্ত প্রতিভা পেয়েছেন, বাষট্টি বছরের বয়স পেয়েছেন, অসীম মমতায় ভরা আত্মা ও মন পেয়েছেন তবুও নারীকে স্ত্রীরূপে পান নি—সেই মানুষ মানুষের মনকে যতখানি স্পন্দনময় ও সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করেছেন, কোন সংসারী লোক কি তা পেরেছেন? তাই এই বৈরাগী, সংসারী লোকেদের প্রতি চিরদিন উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতা থাকে, কিন্তু তাকে অনুভূতিতে রূপান্তরিত করার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক দৃষ্টি ছাড়া কোনো যথার্থ শিল্পীর জন্ম হতে পারে না। ছোটবেলা থেকেই শরতের সে দৃষ্টি ছিল। এই তিনটি গল্প ছাড়া 'নারীর মূল্য' নামে আর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সে লেখে। 'নারীর ইতিহাস' যেটা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছিল সেই স্মৃতির আধারেই শরৎ এই প্রবন্ধটি লেখে। 'যমুনা'য় ধারাবাহিক ভাবে সেটি প্রকাশ করা হয়।[৩] কিন্তু নিজের নামে সে এটা ছাপতে দেয়নি, বড় বোন অনিলা দেবীর নামে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি ছাপা হয়। দিদির নাম দিয়েই কয়েকটি মহিলা লেখিকার লেখা বইয়ের সমালোচনা 'নারীর লেখা' নামে লিখেছিল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে যোগেন্দ্রকে সে বলে, 'আমার দিদির কথা বোধহয় তোমায় বলা হয় নি। এ লেখাটা[৪] তার নামেই ছাপা হবে। সে খুব ভাল লেখাপড়া জানে, কিন্তু গৃহস্থালীর কাজকর্মে এমনই জড়িয়ে পড়েছে যে চর্চা করবার সময় পায় না।'

১ ১০ মে, ১৯১৩
২ ১৯ জুলাই, ১৯১৩
৩ এপ্রিল থেকে অক্টোবর, ১৯১৩
৪. পুস্তকরূপে এটি ১৮ মার্চ, ১৯১৪-এ প্রকাশিত হয়।

যদিও প্রবন্ধে শরতের নাম ছিল না, তবু অনেক পরিচিত ও অপরিচিত লোক তাকে চিঠি লিখেছিল। প্রবন্ধটির ভাষাশৈলী পাঠকদের খুব ভালো লাগে। শরতের ইচ্ছে ছিল এ-রকমভাবে বারোটি 'মূল্যে'র প্রবন্ধ লিখবার। 'নারীর মূল্য', 'ধর্মের মূল্য', 'ঈশ্বরের মূল্য', 'সাহিত্যের মূল্য', 'সমাজের মূল্য', 'অধর্মের মূল্য', 'বেশ্যার মূল্য' ও 'সত্যের মূল্য'। কিছুদিন পরে 'সাংখ্যের মূল্য' ও 'বেদান্তের মূল্য' এর সঙ্গে যোগ করা হয়।

অনেক রকম পরিকল্পনা করা তার একটা নেশা ছিল কিন্তু পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ছন্নছাড়া স্বভাবের দরুন তা কার্যকর করা হয়ে উঠত না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি পড়ে প্রশংসা করেন, তখন প্রমথ আর চুপ করে থাকতে পারেনি। রহস্য ফাঁস করে দেয় যে, ওটি শরতের লেখা। তাই শরৎ লিখেছে, 'লোকে আমার নাম জানলে কি করে? হয় ফণীর দ্বারা, না হয় তোমার দ্বারা এই অনিষ্ট ঘটেছে। এবার কি শুরু করি বলত? দশটা মূল্যের, বেশ্যার মূল্য আর নেশার মূল্য যা বোধ করি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হত, তাইতেই বন্ধু-বান্ধবের ভীষণ আপত্তি। তারা কিছুতেই রাজী নয় যে, আমি এ দুটো দিদির নাম দিয়ে লিখি। মনে করেছি "ইভলিউশন অব আইডিয়া অব সোল" শুরু করব। অবশ্য ঠিক "নারীর মূল্যে"র ধরনেই।'

আবার লেখে— 'এক-একবার ইচ্ছা করে এইচ স্পেন্সার-এর সমস্ত "সিন্থেটিক ফিলোসফি"র একটা বাংলা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা—এবং ইউরোপের অনান্য ফিলোসফার যাঁরা স্পেন্সার-এর শত্রু-মিত্র তাঁদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া, দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না।'

এ ধরনের চিঠিপত্র দেখলে মনে হয় শরৎ খুব গভীর ভাবে পড়াশোনা করত। কিন্তু কোনো কারণবশত 'সমাজধর্মের মূল্য' ছাড়া আর কোনো মূল্য সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ সে লেখেনি। গল্প কাহিনী লেখে বন্ধুদেরই বিশেষ আগ্রহে, তাছাড়া অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। প্রকাশকদের মতে প্রবন্ধ ইত্যাদির চেয়ে যে কোনো রকম জোড়াতালি দিয়ে গল্প লিখলেও বাজারে হাজার কপি অবশ্যই বিকোবে।

প্রবন্ধ না লেখার আর একটা কারণ ছিল বিভূতিভূষণ ভট্ট। সবাই যখন 'নারীর মূল্যে'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন বিভূতিভূষণ প্রবন্ধটির রীতিমত নিন্দে করে। সৌরীন্দ্রমোহনকে সে লেখে, 'মিসেস পঙ্করস্ট (Pankurust)-এর আদর্শ আমাদের মধ্যে আনিতে যাওয়া বোধহয় একটু দুঃসাহসিকতা। আমি বুড়িকে (নিরুপমা দেবী) এই স্ত্রী-নাম ধারী উদ্ধত মহাপুরুষের অথবা স্ত্রীলোকের স্বত্ব-রক্ষাকারী ডন্ কুইক্সোট-এর কথার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছি।.....'

এ খবর শুনে শরৎ একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। ঠিক করে এ ধরনের প্রবন্ধ সে আর লিখবে না। সৌরীন্দ্রকে শরৎ লেখে, 'পুঁটুকে (বিভূতিভূষণ) লিখিয়া দিলাম, বুড়ি যেন এ সম্বন্ধে কিছু না লেখে। লেখার প্রতিবাদ আমার সহ্য হয় না। সেটা গালাগালির মতো দেখায়। যদি আমার লেখার বিরুদ্ধে তোমাদের কিছু বলিবার থাকে, কথায় বলিও। তাহাতে সুবিধা এই, দু-পক্ষের পরস্পরকে বুঝিতে ভুল হয় না এবং বুঝাপড়ার শেষ হয়।'

এক বন্ধুকে সে বলেছিল, 'আমার কথা-সাহিত্যের সবাই প্রশংসা করে, কিন্তু "নারীর মূল্য" প্রবন্ধটি আমি নিজের গল্পের চেয়ে কম সহানুভূতির সঙ্গে লিখিনি।'

যাই হোক, মূল্য নিয়ে আর কোনো প্রবন্ধ সে লেখেনি। সাহিত্যের বড়ই দুর্ভাগ্য।

১৩

'চরিত্রহীন' প্রকাশন নিয়ে বেশ হৈ-চৈ চলছিল। 'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়লেন যে, 'চরিত্রহীন' শেষ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে' না ছাপা হয়ে যায়। প্রমথনাথ বড় আগ্রহী

ছিল, শরৎকে লেখে,' "যমুনা" সম্পাদক ফণীবাবু কে, আমি তা জানি না, তবে তোমার উপর এতটা জোর খাটায় যে, আমাদের এতদিনকার প্রণয়ের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, দেখিয়া মনে মনে ঈর্ষা হইতেছে। নতুন "যমুনা"র প্রেমে পুরাতনদের একেবারে ভোলা কর্তব্য নহে। তোমার "চরিত্রহীন" চাই-ই চাই।'

এদিকে প্রমথ নাছোড়বান্দা, ওদিকে 'সাহিত্য'র সম্পাদক একের পর এক রেজিস্ট্রি চিঠি দিচ্ছে। 'যমুনা' য় 'চরিত্রহীনে' র বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গেছে, এই রকম বিচিত্র পরিস্থিতিতে শরৎ দারুণ মুশকিলে পড়ল, প্রমথকে লিখল—

'বৈশাখের"যমুনা"য় ইহারা বিজ্ঞাপন দিয়াছে যে,"চরিত্রহীন" শ্রাবণ হইতে তাহারাই বাহির করিবে। এ অবস্থায় আমার আর কি বলিবার আছে জানি না। কেন যে তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া হরিদাসবাবুকে এ প্রস্তাব করিয়াছিলে তাহা নিশ্চয়ই বুঝি। তুমি জানিতে অসাধ্য না হইলে তোমাকে অদেয় আমায় কিছুই থাকিতে পারে না। এখন এই বিভ্রাট যে কিরূপে উত্তীর্ণ হইব, স্থির করা যথার্থই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি যে আমার জন্য লজ্জা পাইবে, "ফল্‌স্ পজিশন"-এ পড়িবে, এইটাই আমায় দ্বিধায় ফেলিয়াছে—না হইলে আমি কোন কথাই মনে করিতাম না।"যমুনা"য় ছাপা উচিত কি না এ কথাই উঠিতে পারিত না। এখন তোমার সম্মান অসম্মানের কথা—এইটাই আসল কথা। "চরিত্রহীনে"র যতটা লিখিয়াছিলাম পাঠাইব মনে করিয়াছি। তুমি যদি সত্যিই মনে কর, এটা তোমাদের কাগজে ছাপার উপযুক্ত, তা হলে হয়তো ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হলে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয়, এই চেষ্টা করিবে, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না। শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়া চরিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন "এথিক্‌স" এর স্টুডেন্ট—সত্য স্টুডেন্ট। যাহা হৌক, পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো, তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য, সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়।'

পাণ্ডুলিপিখানি শরৎ প্রমথকে পাঠিয়ে দেয়। প্রাপ্তি-সংবাদ না পেয়ে অস্থির হয়ে শরৎ অনেকগুলি চিঠি তাকে লেখে।

' "চরিত্রহীন"পেলে কি না সে খবরটাও দিলে না। ওটা পড়লে কি? যদি তোমার নিরপেক্ষ মত এই হয় যে, ওটা ভাল হবে না, তা হলে যাতে ভাল হয়, তার চেষ্টা করব। আমি তোমাকে অনেক আগেই লিখেছিলাম, এটা "চরিত্রহীন", ষট্‌চক্রভেদ নয়। কেবল "এথিক্‌স" আর "সাইকোলজি", ধর্ম নয়।'[2]

এ চিঠির উত্তরে প্রমথনাথ জানায়, গল্প তার খুব একটা রুচিকর মনে হয়নি, কারণ উপন্যাসের শুরুতেই একটা মেসের ঝিকে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উত্তরে শরৎ লিখল, 'যে লোক জানিয়া শুনিয়া "মেসের ঝি"কে আরম্ভতেই টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা ওর শেষটা না জানিয়াই ওকে, অর্থাৎ সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে, ভাই! কাউন্ট টলস্টয়ের "রেসারেকশন" পড়েছ কি? "হিজ বেস্ট বুক" একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে আমাদের দেশে এখনো অতটা আর্ট বুঝিবার সময় হয় নাই। · · আমি উলঙ্গ বলিয়া আর্টকে ঘৃণা করিতে পারিব না, তবে যাতে এটা "ইন স্ট্রিক্টেস্ট সেন্স মরাল" হয় তাই মত উপসংহার করিব। আমাকে যদি কেহ এ বিষয়ে একটু সতর্ক করিত, অর্থাৎ বলিত—ঝি লইয়া শুরু করাটা ঠিক নয়, আমি হয়তো আলাদা পথ দিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম। তা' সে কথা কেহই বলিয়া

১ ১৭ এপ্রিল, ১৯১৩
২ ৩ মে, ১৯১৩

দেয় নাই; এখন টু লেট্।'[১]

প্রমথ পাণ্ডুলিপি ফেরত দিতে দেরি করাতে ফণী পালের মনে ভয় হয় যে, হয়তো শরৎ কোনো প্রলোভনে পড়ে গেছে। কিন্তু শরৎ তাকে ভরসা দেয় যে, 'চরিত্রহীন' 'যমুনা'তেই ছাপা হবে।

শেষ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সেটি পড়ে রায় দেন যে, 'চরিত্রহীন' নিতান্তই অশ্লীল রচনা। কোন ভালো পত্রিকায় ছাপা যেতে পারে না। ভদ্রসমাজে এ উপন্যাস প্রকাশিত করা যায় না। প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ও উপন্যাসটিকে অনৈতিক এবং ছাপার অযোগ্য বলে মত দেন। প্রমথনাথ সব কথা জানিয়ে শরৎকে লেখে যে, 'এ উপন্যাস ছাপা হলে লোকে নিন্দে করবে। এ ধরনের অশ্লীল উপন্যাস তোমার লেখা উচিত হয়নি।'

প্রমথ'র চিঠি পেয়ে শরৎ দারুণ রেগে যায়, তখুনি 'চরিত্রহীন' ফিরিয়ে দেবার জন্য লেখে, আর এও লেখে যে, 'অঙ্গবিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাইতে নাই জানি না। সমাজের যদি কেউ ডাক্তার থাকে, যার কাজ ক্ষত চিকিৎসা করা, সে কি করে শুনি? যাহা পচিয়া উঠে তাহাকে তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে পরের পক্ষে দেখিতে ভাল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত যে লোকটার গায়ে, তার পক্ষে বড় সুবিধার হয় না। শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি ছাড়াও উপন্যাস লেখকের আরো একটা গভীর কাজ আছে। সে কাজটা যদি ক্ষত দেখাই হয়—তাই করিতে হইবে। অস্টিন, ম্যারি কোরেলি প্রভৃতি এবং সারা গ্রেন্ড সমাজের অনেক ক্ষত উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু দেখাইয়া ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়। তুমি যে লিখিয়াছ "চরিত্রহীন" অপরের নামে প্রকাশ করিতে, এইটাতেই আমি সবচেয়ে বেশী ব্যথা পাইয়াছি। আমি কি এতই হীন? ভাল মন্দ যাই হোক, "কনসিকোয়েন্স" আমার ভোগ করা চাই। এত কুরুচিপূর্ণ যখন তখন ত নিশ্চয়ই আমার নিজের নামে প্রকাশ করা চাই। নাম আবার কি? কে এর লোভ করে? সে লোভ থাকিলে ভায়া, এতদিন চুপ করিয়া নষ্ট করিতাম না।'[২]

শরৎ নিজের মন দৃঢ় করে ফেলে। তার মনে হয় ছাপার আগেই যে বই নিয়ে এত মাতামাতি, ছাপার পর অবশ্যই লোকে তা নিয়ে তীব্র আলোচনা করবে। জবাবের জন্য সে 'রেজারেকশান' ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনা থেকে প্রমাণাদি জোগাড় করে রাখে। তা ছাড়া যে বই নিয়ে এত বিচার বিতর্ক হয়, তাতে পাঠক সংখ্যা বাড়ে বৈ কমে না, নিন্দে করলেও পড়ার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে থাকবে। তা না হলে ফিকে উপন্যাস তো দিন-রাতই ছাপছে, কে সে সব পড়ে?

তার ধারণা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। 'যমুনা'য় যখন 'চরিত্রহীনে'র প্রথম অংশটুকু ছাপা হয় তখন এমন ঝড় বয় যে, খুব কম বই নিয়ে এত আলোড়ন হয়ে থাকবে। ফণীন্দ্রনাথ টেলিগ্রামে শরৎকে জানায়; "চরিত্রহীন" ক্রিয়েটিং এলার্মিং সেন্‌সেশান।'

মনে মনে শরৎ দারুণ খুশি হয়ে উঠল। বাংলা উপন্যাসের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো সুতীব্রভাবে নিজের রক্ষা কবচ তৈরি করে প্রমথকে লিখল, 'আমি জিজ্ঞাসা করি, কি আছে ওতে? একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে যে কোন কারণেই হৌক, বাসার ঝি-বৃত্তি করিতেছে, আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ শেষ পর্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না। অথচ রবিবাবুর "চোখের বালি" ভদ্র ঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে, এমনকি আত্মীয়কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই! "কৃষ্ণকান্তের উইলে" রোহিণীকে মনে পড়ে? আর আমার "চরিত্রহীন" যত অপরাধী? .... যাই হৌক আমি এখনও স্বীকার করি না এবং বুঝি না বলিয়াই করি না যে, "চরিত্রহীনে" এক বর্ণও "ইম্‌মরালিটি" আছে। কুরুচি থাকিতে পারে, কিন্তু যা

১ ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, মে-জুন, ১৯১৩
২ ডাক মোহর ১২ মে, ১৯১৩

পাঁচজনে বলিতেছে তা নাই। তবুও নাম দিয়াছি "চরিত্রহীন", এর মধ্যে "কুলকুণ্ডলিনী" জাগাইয়া তুলিব অবশ্য এ আশা করিতেই পারি না। যাহার ইচ্ছা হয় পড়িবে, যাহার নামটা দেখিয়া ভয় হইবে, সে পড়িবে না।'

শরৎ এবার নিজের ভিতরেই আবিষ্কার করল সত্যিকারের সাহিত্যিককে।

১৪

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শরতের প্রশংসক ছিলেন, শরৎও তাঁর মতামতকে শেষ রায় বলে মনে করত। দ্বিজেন্দ্রলাল সে সময় কাব্যে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন, তাই 'চরিত্রহীন' তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। পুরোনোর সঙ্গে নতুনের সংগ্রাম চিরদিনের। তিনি যে যুগের মানুষ ছিলেন সে সময়কার চিরাচরিত স্থাপিত মূল্য ও পরম্পরাকে অস্বীকার করা বা বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু তবু মনে হয় যদি তিনি বেঁচে থাকতেন ও সম্পূর্ণ উপন্যাসটি পড়তেন, হয়তো তাঁর মত বদলে যেত। কারণ সাবিত্রী মেসের ঝি হলেও সতী সাবিত্রী। উচ্চবংশের সুশীলা সুশিক্ষিতা মেয়ে। পরিস্থিতি তাকে মেসের ঝি হতে বাধ্য করেছে। তার সমস্ত ব্যথা-বেদনার মধ্যেও শরৎ তাকে সৎপথ থেকে বিচ্যুত করেনি। কিরণময়ীর দেহজ প্রেমের তুলনায় সাবিত্রীর প্রেম বায়বীয়। সে চির আদর্শবাদিনী,তাই তার পদস্খলন হয়নি। কিন্তু তৎকালীন সমাজ সে কথা বুঝতে রাজী ছিল না। সে সময়কার উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীতিবিচারই সবার চেয়ে প্রিয় ছিল। সংস্কারমুক্ত হয়ে মিথ্যে নৈতিকতার মধ্যে উঁকি মারার সাহস তাদের ছিল না। লোক-দেখানো নৈতিকতার সস্তা মুখোশের অন্তরালের কথা শরতের কাছে গোপন ছিল না, শুধু এইটুকুই, নইলে সে পূর্ণ নৈতিক। এমন-কি কিরণময়ীকে সে নষ্ট হতে দেয়নি, দিবাকরের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েও সে চরিত্রবতী।

প্রায় ছ-মাস পর্যন্ত শরতের কোনো লেখা 'ভারতবর্ষে' ছাপা হয়নি। তার প্রধান কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু। কথা ছিল 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হবেন অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্র। শরৎ প্রমথকে লিখল, 'দ্বিজুবাবুই এ কাজ পারতেন—এ কি সারদাবাবুর দ্বারা হবে? তাঁর সঙ্গে তাঁর অসাধারণ ইনফ্লুয়েন্স পর্যন্ত গেছে। আর আমার সাহস নেই যে কিছু লিখে পাঠাই। অথচ দ্বিজুবাবু থাকলে তাঁর "অ্যাপ্রিসিয়েশন"-এর লোভেও লিখতাম। সারদাবাবুর ভালমন্দ বলার দাম কি? কে গ্রাহ্য করে?'

শেষ অবধি সারদাবাবু 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হননি। এ ভার শেষপর্যন্ত রায়বাহাদুর জলধর সেন নেন। তাঁর সম্পাদনায় যথাসময়ে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চিত্র-সহ 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যা[১] প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সৌষ্ঠব ও শ্রী দেখে সবাই খুব খুশি হয়, কিন্তু শরতের খুব একটা মনে ধরে নি। প্রমথকে লিখল, 'দ্বিজুদা একটা বছর বাঁচলেও "ভারতবর্ষ" অক্ষয় হয়ে যেত। এখন এর "স্ট্যাবিলিটি" সম্বন্ধে সত্যই আশঙ্কা হয়।'

হয়তো এ-সব কারণেই শরৎ বহুদিন পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে' লেখা দেয় নি। ডিসেম্বর মাসে 'বিরাজ বৌ' নামে একটা লেখা সে পাঠায়। ফণীন্দ্র জানতে পেরে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তার সমস্যা শরৎ বুঝত, তাকে অনেকবার বুঝিয়ে ছিল যে 'আপনার কাগজ আমি নিজের কাগজ মনে করি। এর ক্ষতি করে কোন কাজ করব না। শুধু প্রমথকে নিয়েই একটু গোলে পড়েছি। সেও "অ্যাক্যুয়েনটেন্স" নয়, পরম বন্ধু। চিরদিনের অতি স্নেহের পাত্র। তাতেই একটু ভাবিত হই, না হইলে আর কি!'

১ জুন, ১৯১৩। সেন মহাশয়ের সঙ্গে কিছুদিন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই পদে কাজ করেন।

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসটি বর্মায় তার বন্ধুদের খুব ভালো লাগে, কিন্তু বিরাজের অধঃপতন তারা মানতে রাজী নয়। যোগেন্দ্রনাথ সরকার বলল, 'আচ্ছা! বিরাজের আত্মঘাতী হওয়ার চেয়ে যদি তাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হত আর সেই অবস্থায় মাছ শিকার করতে আসা কোনো শখের জমিদার নিজের বজরায় টেনে নিয়ে যেত তা হলেও কি বিরাজের কম পাপ হত? হিন্দু নারী স্বামীর উপর অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে দেবে তারপর আত্মহত্যার চেষ্টা করবে—কী সর্বনাশ! এ দুটির চেয়ে বড় পাপ সংসারে ও শাস্ত্রে আর আছে না কি? স্বামীর উপর রাগ করে কুলত্যাগ করায় ভাবছি "ইস্টালীন"-এর কতখানি প্রভাব। যদিও সেটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

শরৎ উত্তর দেয়, 'পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। সেকসপীয়রের রচনা যে ভালোভাবে পড়েছে এ প্রমাণ তারা খুব ভালোভাবে দিতে পারবে। বলতে পার, সেকসপীয়রের থেকে কোন্ শ্রেষ্ঠ লোক পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, যে নরনারীর চরিত্রকে যথাযথ বুঝতে সক্ষম?'

এ তর্কের কোনো জবাব যোগেন্দ্রনাথ সরকার দিতে পারেনি। কলকাতা থেকে বন্ধুরা আক্ষেপ করে লিখেছিল, তার উত্তরে শরৎ বলে, 'দিনের পর দিন অনাহার ও মানসিক চিন্তায় জর্জর হয়ে যার শরীর ও মন বিকল হয়ে পড়ে, সে ক্ষণিক উত্তেজনার বশে যা খুশি করতে পারে। মানুষের সে অবস্থা আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

নিজের অভিজ্ঞতায় শরৎ বিশ্বাস করত যে, চিরকালের সংসারী গেরস্থ মেয়েমানুষ যদি পতিতা হয়, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই সে লজ্জা-শরম ত্যাগ করে সেই জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, কোনো পুরুষ তা পারে না।

'বিরাজ বৌ' লিখতে শরতের একমাসের কিছু বেশি সময় লাগে, অসীম ধৈর্য সহকারে প্রচুর কাটাকুটি করে যা লিখত, তা সরকারকে পড়ে শোনাত। নিজের লেখা সম্বন্ধে সরকারকে বলে, 'দেখ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একসপ্রেশন সহজ ঝর্নার মত হয় ততক্ষণ তৃপ্তি পাই না। রাত্রের লেখা দিনে ভুল বলে মনে হয়।

'এ ভুল কোন ব্যাকরণের ভুল নয়, ভাবের ভাষার অভাব। গ্রামে ঘরে চলতি বাংলার বেশী প্রয়োগ হয়, সেই ভাষা যদি কাব্যতীর্থ বা বিদ্যাসাগরের মত সংস্কৃতময়ী করে তোলা হয় তাহলে যা অবস্থা হবে ঠিক সেই রকম ভুলের কথা বলছি। অর্থাৎ যেটি যেমন হওয়া উচিত, তাই হওয়া ভাল।'

'বিরাজ বৌ'-এর প্রথম কিস্তি পাঠাবার সময় যোগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা বলত, গল্পের কি নাম দেওয়া যায়?' সরকার বলে,'"বিরাজ মোহিনী" রাখলে ভাল হয়।'

'নারে, তার চেয়ে তো"বিরাজ বৌ"নামটা আমার বেশী পছন্দ। মোহিনী চরিত্র যেন ততটা উল্লেখযোগ্য মনে হয় না, ও নাম দেওয়া ঠিক হবে না।'

সরকার বলল, 'অর্থাৎ প্রথমবার যোগেন্দ্র চ্যাটার্জীর"কনে বৌ"; দ্বিতীয়বার শিবনাথ শাস্ত্রীর"মেজ বৌ"; এবার তৃতীয় বার শরৎবাবুর"বিরাজ বৌ" এই তো?'

'যদি তা হয়, হোক না। তোমার ওই তো দোষ। তাঁর কনে বৌ,মেজ বৌ নিয়ে যার যা খুশি করুক, আমার তাতে কি ক্ষতি?'

বলতে বলতে নীল পেন্সিল দিয়ে পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লিখল, 'বিরাজ বৌ', তার তলায় ছোট ছোট অক্ষরে লিখল—গল্প।

সরকার প্রতিবাদ করে বলল, 'তা হবে না। প্রমথর চিঠির কথা মনে নেই? লেখো, উপন্যাস।'

শরৎ গল্প কথাটা কেটে দিয়ে তার জায়গায় বড় বড় অক্ষরে লিখল—'উপন্যাস'।

লেখকরূপে সম্মান পাবার পর এখন আর পরিচিত লোকেরা ও বন্ধুবান্ধবেরা তেমন উপেক্ষা করতে সাহস পেত না। ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের নেতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন যখন রেঙ্গুনে যান, তখন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য যে সভার আয়োজন করা হয়, সেই সভার সভাপতির আসনে

শরৎকে বসানো হয়। জীবনে সেই প্রথম সে সভাপতির আসনে বসে, খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে, এক সের কি দেড় সের মতো ভারী মালা তার গলায় পরানো হয়,মালার ভারে সোজা হয়ে সে দাঁড়াতে পারছিল না, লেখা ভাষণ—ভারি চমৎকার লেখা—তাও ঠিকমত পড়তে পারে নি।

অনেক কারণে সে নার্ভাস হয়ে পড়ে, শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যে জীবন ক'দিন আগেও তাকে কাটাতে হয়েছে, তাতে স্বাস্থ্য ভালো থাকাই আশ্চর্যের ব্যাপার। জ্বর, নিউরলজিক ব্যথা, আমাশা—এ সব তো তার নিত্যসঙ্গী, তার উপর আফিং খেত, রাতে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত, লেখাপড়ায় ব্যাঘাত হত। তাই বন্ধুরা তাকে লিখল, 'এবার কলকাতায় ফিরে এসো।'

কিন্তু শরৎ কারও কথাই শোনে নি, ফণীন্দ্রনাথকে লিখল, 'চাকরি-বাকরি ছাড়িয়া দিয়া ভবঘুরে হইয়া বেড়াইতে এই অসুস্থ শরীরে মোটেই পছন্দ করি না। আর কাহারো কাছে গিয়ে থাকা—সে ত একেবারেই অসম্ভব। আমি বরং হাসপাতালে মরিব, কিন্তু কিছুতেই কাহারো ঘরে এই পীড়িত দেহ লইয়া গিয়া শেষ রাখা রাখিব না। ওটা আমি ঘৃণা করি।·····যদি যাই, আমার বড় ভগিনীর ওখানে গিয়াই থাকিব, কেন না সেটাই একরকম আমার বাড়িঘরদোর। তাঁর অবস্থাও খুব ভালো—ক্রমাগত যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন, কিন্তু অসুস্থ শরীরে আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমার কেবলি ভয়, পাছে মরিয়া গিয়া তাঁদের বিব্রত করি।'

প্রমথনাথকে সে আগেই জানিয়েছিল, 'একবার যেন দেখা হয় এইটাই মনের শেষ সাধ। গেলে তোমার ওখানেই থাকব। মার ত সদ্‌গতি হবে—বামুনের কাঁধে চড়ে, পরম মিত্রের মুখ দেখে, শেষ সেবা নিয়ে নিমতলায় যাওয়া যাবে।'

শরতের বহু চিঠিপত্রে এ ধরনের অসংগতি দেখা যায়। রেঙ্গুন ছাড়ার জন্য সে মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, হয়ত অফিসের চাকরি ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা, এ' দুয়ের মধ্যে পড়ে সে মনে মনে অস্থির হয়ে পড়ছিল। একটি চিঠিতে সে অফিসের বড় সাহেবের নিন্দে করে লেখে, 'আমাদের অফিস আওয়ারে, নিয়ম এই যে যদি কারও কোনদিন কোন তরফ থেকে "রিমাইন্ডার" আসে—ও মাসের জন্য ১০্ হিসাবে জরিমানা "রিডাক্‌সন"। এই তো সুখের চাকরি।

'দিন ৩-৪ পূর্বের ঘটনা বলি। হঠাৎ আমার একটা রিমাইন্ডার আসে। এত কাজ যে ছোটখাটো কাজ আমি দেখতেই পারি না, এটি আমার "সাব-অডিটার" ভৌমিকবাবু ও পেরিয়া স্বামীর দোষ, অবশ্য আমিই সমস্ত দোষ নিলাম। ইত্যবসরে"রেজিগ্‌নেশন্" লিখে রাখলাম। ঠিক জানি ১০্ টাকা গেছেই। এ অপমান সহ্য করে যে চাকরি করে সে করে, আমি ত কিছুতেই পারব না। যা হোক, কি জানি নিউমার্চ দয়া করে কোন কথাই বললেন না। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, আমার আর "রেজিগ্‌নেশন্" দেওয়া হল না। কিন্তু শরীর আমার আর বয় না। লেখা-টেকাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

'এতদিন চাকরি কচ্ছি ভাই, এমন ভয়ানক দুর্দশায় কখনও পড়িনি। সেদিন ঝোঁকের উপর লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে মিত্তির মশাইকেও চিঠি লিখি যে, যা হোক একটা চাকরি কলকাতায় দাও, আমি "রিজাইন" দিয়ে চলে যাই। তাঁর এখনো জবাব আসবার সময় হয় নি। তবে এও বুঝতে পাচ্ছি, এই সাহেব যদি না যায়, শীঘ্র যাবার বড় আশাও দেখি নে—তা হলে আমাকে অন্তত ছাড়তেই হবে। শালা অন্য অফিসে "অ্যাপ্লিকেশন" পর্যন্ত "ফরওয়ার্ড" করে না। ঢের পাজি লোক দেখেছি কিন্তু এমনটি শোনাও যায় না।'

চাকরি ছাড়া শরতের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, অফিসের উচ্চ কর্মচারীদের প্রতি সে খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে। সাহিত্যে মনোনিবেশ করার ফলে অফিসের কাজে গাফিলতি হওয়াই স্বাভাবিক। কোনো অফিসের কর্তাব্যক্তিরা এটা সহ্য করবেন না। নিউমার্চ সাহেব তেমন মন্দ লোক ছিলেন না, যতটা শরৎ বাড়িয়ে বলেছে। আসলে এতদিন পর্যন্ত উপেক্ষা অবহেলা তুচ্ছতার মধ্যে জীবন কাটিয়ে তা থেকে মুক্তির আনন্দ তাকে কলকাতায় টানছিল। চাকরি সম্বন্ধে তার

মনে কোনোরকম দুর্বলতা ছিল না, তা প্রাইভেট চাকরিই হোক আর সরকারী চাকরিই হোক-না কেন। মনে দুরন্ত বাসনা ছিল যদি কোনো পত্রিকায় কাজ জোটে তার চেয়ে ভালো কাজ আর নেই।

'এত বড় বড় কাগজ বার হচ্ছে, আমাকে কেউ সাব – এডিটর কি কিছু একটা করে না? অনেক কাজ তাদের করে দিতে পারব। একটা বড় গল্প, একটা ধারাবাহিক ভাল উপন্যাস, একটা প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা—এও আমি দিতে পারব। তাছাড়া ছবি "জাজ" করা, গানের স্বরলিপির দোষগুণ ধরা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, সাহিত্যিক আলোচনা, এও আমি ক'রে দেব। ১০টা থেকে ৪/৫ টা পর্যন্ত খাটতে আমি খুব পারি।..... আমার বর্মা আর পোষাচ্ছে না। দেশ দেশ মন কচ্ছে।'

রেঙ্গুনের ভদ্র বাঙালী সমাজে তখনও শরতের কোনো সম্মানই ছিল না। তার কার্যকলাপ সেখানকার প্রতিষ্ঠিত লোকের চোখে অত্যন্ত দূষণীয় ছিল। তারা শরৎকে চরিত্রহীন বখাটে বলেই মনে করত। এবার কলকাতা থেকে একটি ছেলে এসে শরতের কাছাকাছি একটি বাড়িতে ওঠে।[১] ছেলেটি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চুপচাপ রাস্তার দিকে চেয়ে থাকত। আসা-যাওয়ার পথে শরতের চোখ পড়াতে একদিন জিজ্ঞেস করে, 'একলা চুপচাপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে কি দেখেন?'

ছেলেটি বলে, 'এখানে নতুন এসেছি, কারও সঙ্গে পরিচয় হয়নি এখনও।'

'তোমার নাম কি?'

'পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।'

শরৎ বলল, 'আমার নাম শরৎ চাটুজ্জে। এখানে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে কেরানী। কাল তুমি আমার বাড়িতে এসো।'

শরতের স্বতঃপ্রণোদিত আমন্ত্রণ ছেলেটি অস্বীকার করতে পারে নি। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে তার দরজায় কড়া নাড়ে, দরজা খুলে দেয় শরৎ। ছেলেটি ভিতরে এসে দেখে, দেওয়ালের একদিকে বইয়ে ভরা আলমারি, অপরদিকে টেবিল চেয়ার পাতা, টেবিলের উপর একটা কাঠের বাক্স, কলমদানি, তাতে পাঁচ-ছটা ফাউন্টেন পেন পর পর সাজানো রয়েছে। ফুলস্কেপ সাইজের লেমড়ায় বাঁধানো একটা খাতা, প্যাডের উপর গোল করে 'শরৎ' লেখা মনোগ্রাম, আর প্যাডের কাগজে খুব ছোট ছোট মুক্তোর মতো অক্ষরে কিছু লেখা রয়েছে।

অক্ষরগুলির এমন একটা আকর্ষণ ছিল যে, ছেলেটির মন পড়বার জন্য আকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই শরৎ মুখ ফিরিয়ে বলে ওঠে, 'আরে, ও সব পাগলামী, দেখো না। চলো ওদিকে বসে আড্ডা জমানো যাক, আরো কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব এসেছে।'

পাশের কামরায় এসে দেখে, সতরঞ্চিতে তিন-চারজন লোক বসে আছে, তার মধ্যে আবার একজন বর্মী লোকও আছে। শরৎ বলল, 'তুমি বসো। আমি এখুনি আসছি।'

একটু পরে শরৎ হাতে একখানা বই নিয়ে ফিরে জিজ্ঞেস করল, ' 'সাহিত্য" মাসিক পত্রিকায় যে পবিত্র গাঙ্গুলির একটা কবিতা বেরিয়েছে, সে কি তোমার লেখা?'

ছেলেটি কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে থাকে। শরৎ খুশি হয়ে বলল, 'এবার তো বাড়িতে একজন কবিরও উদয় হল।'

ঠিক সেই সময় ছেলেটি যে বাড়িতে এসে উঠেছিল, সে বাড়ির চাকর এসে জানায়, 'বাবু আপনাকে এখুনি ডাকছেন।' ছেলেটি বাড়ি যেতে বন্ধু চূড়ান্ত তিরস্কার করে বলল, 'এই তাহলে তোমার কাজ, তার আড্ডায় গিয়ে বসেছ! আমার কথা মেনে যদি সেখানে না যাও ভাল কথা, একে তো বিদেশ তায় রেঙ্গুন, জায়গা মোটেই ভাল নয়।'

১. ১৯১৩

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শরতের বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ছিল। শরৎ তাকে ভালোবাসলেও 'চরিত্রহীন' বইটির দরুন তার মন চাইছিল না যে, তার কাছে সে যায়। কখনও কখনও কবিতা ছাড়া বাদবাকি 'যমুনা'র সবকটি পাতা সে একাই ভরিয়ে তুলত। প্রমথকে যে-সব চিঠিপত্র লিখত, তাতেও 'যমুনা'র প্রতি তার ভালোবাসা গোপন থাকত না।

'তোমাকে আমার একটা নিবেদন, আমার "যমুনা"কে একটু স্নেহ কোরো। "ভারতবর্ষ" যেমন তোমার, "যমুনা" তেমনি আমার। যাতে ওর ক্ষতি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়, সে দিকে একটু নজর রেখো ভাই। তুমি ফণীর উপরে রাগ কোর না। লোকটা ভালই। কিন্তু সে কি করে জানবে, তুমি আমার কি এবং ২০ বছরের কি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। লোকে মনে করে বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্ব যে কাহাদের মধ্যে, কিরূপ বন্ধুত্ব তা সে বেচারা কি করে জানবে ? তোমার আমার কথা তুমি আমি ছাড়া আর ত কেউ জানে না, প্রমথ।'

'যমুনা' পত্রিকাটির জন্য শরতের চিন্তা-ভাবনার অবধি ছিল না। নতুন বন্ধু-বান্ধবদেরও বার বার 'যমুনা'য় লেখা দেবার জন্য অনুরোধ করত। সেইসঙ্গে সে সময় গল্প ইত্যাদি 'যমুনা'য় ছাপা হচ্ছিল সে বিষয়ে আলোচনা সংক্রান্ত একটি চিঠি সে সৌরীন্দ্রমোহনকে লেখে, 'আজকাল মাসিকপত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয়, তাহার পনেরো আনা সম্বন্ধে সমালোচনাই হয় না। এবার কার্তিক-এর এতগুলো গল্প বাহির হইয়াছে, অথচ একটাও ভাল নয়। অধিকাংশই অপাঠ্য। কোনটার মধ্যে বস্তু নাই, ভাব নাই—আছে শুধু কথার আড়ম্বর, ঘটনার সৃষ্টি আর জোরজবরদস্তির "প্যাথস"; বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করাইয়া যুবতী সাজাইয়া লোক ভুলাবার চেষ্টা করা দেখিলে, মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা, লজ্জা অথবা করুণা জাগে, এই সব লেখকদের এই সব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে সত্যাই আমার মনে এমনিধারা একটি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর যাই হোক, মোটেই "হেল্‌দি" নয়। ছোটগল্পের কি দুরবস্থা আজকাল।'

এ দুর্দশা থেকে সাহিত্য মুক্ত হোক ও সকল দিক দিয়ে 'যমুনা'র শ্রীবৃদ্ধি হোক, এটুকুই ছিল শরতের মনের ঐকান্তিক কামনা।

১৫

পরের বছর[১] যখন দু-মাসের ছুটি নিয়ে শরৎ কলকাতায় এল, সে আসা যেন কোনো বিজয়ী রাজকুমারের নিজের রাজত্বে ফিরে আসা। সে এবারেও কোনো বন্ধুর কাছে গিয়ে ওঠে নি। নিজের পরিচয় ও সম্মান সম্বন্ধে চিরদিনের মতোই উদাসীন হয়ে রইল। বেশভূষা চাল-চলনেও তাকে গ্রাম্য বলে মনে হত, কিন্তু বন্ধুদের দেখা করা ও আড্ডা জমানোর নেশা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'যমুনা'র কার্যালয়ে অনেক সাহিত্যিক এসে জড়ো হতেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কবি ও কথাশিল্পী সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শরৎকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন, শরতের চলা-বলা, হাসি, ঠাট্টাতামাশা, সবেতেই তিনি আনন্দ পেতেন।

এই বৈঠকে শুধু সাহিত্যিক আলোচনাই হত না, হাস্য পরিহাস অবাধে চলত। শরৎ মুহূর্তের মধ্যে বানিয়ে গল্প করত, সব গল্পের শেষেই বলত, 'এ আমার জীবনের সত্যি ঘটনা।'

সুধীন্দ্র হেসে বলতেন, 'তা কখনই নয় শরৎ, এ সবই তোমার মনগড়া গল্প।'

শরৎ বলত, 'দেখছেন তো ? যখন গল্প লিখি তখন আপনারা বলেন মনন চিন্তন করে লিখি, আর যখন গল্প বলি তখন বলছেন মনগড়া গল্প শোনাচ্ছি। না-মশাই, একেবারে সত্যি ঘটনা, যদি আপনার বিশ্বাস না হয় সাক্ষী সাবুদ দিতে পারি।'

সাক্ষী প্রমাণের প্রয়োজন হয়নি, তবে সে সব গল্পের পেছনে নিশ্চয়ই তার কোন অভিজ্ঞতা

১ জুন, ১৯১৪

থাকত। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সহজ স্রোত শরতের জীবনের মূলধন।

সেদিন সন্ধ্যায় সৌরীন্দ্রের পথ চেয়ে শরৎ পায়চারি করছে, সবাই যে যার বাড়ি চলে গেছে, কিন্তু কম্পাউন্ডের ভিতরে জেলের গাড়ি কয়েদী নিয়ে যাওয়ার জন্য তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। কোন দাগী চোরের মামলা ছিল সেদিন, দু বছরের শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহন তার উকিল ছিল। যেই সে বাইরে এসেছে, অমনি মক্কেলের রক্ষিতা এসে পায়ের উপর কেঁদে পড়ল, বলল, 'আজ রাত্তিরে আপনার কাছে টাকা নিয়ে আসব, আপনি হাইকোর্টে আপীল করার ব্যবস্থা করুন, সবচেয়ে বড় উকিল ওর জন্য ঠিক করুন।'

সৌরীন্দ্রমোহন তাকে বুঝিয়ে বলে, 'আপীল করে কোন লাভ নেই, অনর্থক পয়সা নষ্ট।' মহিলাটি বলল, 'লাভ হোক আর না হোক আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। টাকার চিন্তা করবেন না, আমি সব গয়নাগাঁটি বেচে দেব।'

সৌরীন্দ্রের কোনো যুক্তিই সে মানতে রাজী নয়। ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিসেরা আসামীকে গাড়ির কাছে নিয়ে এল। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে সেখানে গিয়ে দু-চার টাকা পুলিসগুলোর হাতে গুঁজে দিল। মেয়েটির প্রণয়ী তাকে বোঝাল, 'দেখ, হাইকোর্টে যেয়ো না। বাবার কথা শোনো। টাকা যদি এভাবে সব খরচ হয়ে যায়, দু-বছর তোমার কাটবে কি করে?'

গাড়ি আসামীকে নিয়ে চলে যেতেই মেয়েটি সৌরীন্দ্রমোহনের দিকে ফিরে বলল, 'রাতে টাকা নিয়ে আমি আপনার কাছে যাব। মানা করা ওর কর্তব্য ছিল, তা সে করেছে। আমার কর্তব্য আমি করব।'

শরৎ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা সবই শুনে সৌরীন্দ্রমোহনকে বলল, 'মেয়েটি জোরাল। এ ঘটনা থেকে ওর মনের পরিচয় আমি পেয়েছি, সমাজের চোখে এরা ঘৃণিত, বহিস্কৃত, কিন্তু এদের মনের ভেতর যে মনুষ্যত্ব আছে তা মরে নি, বড়ই মহৎ। অনেক সতী-সাধ্বী রমণীরাও স্বামীর বিপদে আপদে বিচলিত হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে না, আর এ তো একজন পতিতা রমণী, এই পতিতাদের কথা আমাদের সাহিত্যে কবে স্থান পাবে?'

শরৎ নিজের সাহিত্যে এই পতিতা মেয়েদের মর্যাদা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বর্মা থাকাকালীন এ-রকম অনেক চরিত্রের সান্নিধ্যে তাকে আসতে হয়েছিল, যাদের ছোটলোক বলা হয়, তাদের কাছে শরৎ অনেক রূপে পরিচিত ছিল। ডাক্তার হিসেবেই কামিনী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়। কামিনী বাংলাদেশে ভালো ঘরের বউ ছিল, কিন্তু একদিন স্বামীর সংসার ছেড়ে একজন কামারের সঙ্গে পালিয়ে যায়। কামারের নাম ছিল শীতলচন্দ্র, কাঁচড়াপাড়ার রেলের কারখানায় কাজ করত। হঠাৎ রেঙ্গুনে ভালো চাকরি পেয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসে, কামিনীও তার সঙ্গে আসে। তার বয়স চব্বিশ পেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু যৌবনের ভরা জোয়ারে তখনও ভাটা পড়েনি। তারা শরতের বাড়ির কাছাকাছি থাকত। অফিস যাবার সময় শরৎ তাদের রোজ দেখতে পেত। তারা খুব আনন্দেই ছিল, কামিনীর জন্য শীতলচন্দ্র মদ খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে শরৎ দেখে, কামিনী দরজা ধরে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শরৎ কাছে আসতেই কামিনী বলে, 'দাদা, আমার কপাল পুড়লো। আজ চারদিন হল ওর মায়ের দয়া হয়েছে, ভেবেছিলাম ঠিক হয়ে যাবে, এই ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে আপনাকে আর জড়াব না, কিন্তু কাল রাত থেকে ভীষণ জ্বর, সারা গায়ে এত বসন্তের গুটি বেরিয়েছে যে, মানুষটাকে এখন চেনা যাচ্ছে না। ব্যথায় কাতরাচ্ছে, আমি তো আর তাকাতে পারছি না, আপনি দয়া করে কোন ওষুধ দিন, দাদা।'

একথা বলে কামিনী পায়ে হাত দেবার জন্য যেমনি এগিয়েছে অমনি শরৎ পিছিয়ে এসে বলে, 'তুমি চিন্তা কোর না, আমি আসছি।'

বাড়ি ঢুকে হোমিওপ্যাথী ওষুধের বাক্সটি নিয়ে তাদের বাসায় পৌঁছল, সেখানে গিয়ে রুগীকে যে অবস্থায় সে দেখল তা বর্ণনা করা যায় না। মাত্র ক'দিনের অসুখে মানুষ এমন বীভৎস কদাকার হয়ে উঠতে পারে ধারণা করা যায় না। চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি তাকে চেনা

যাচ্ছিল না। কামিনী কোনোরকমে তার বিকৃত মুখখানির কাছে মুখ রেখে বলল, 'শুনছ। দেখ দাদা এসেছেন। আর কোন ভয় নেই, তাঁর হাতের এক ফোঁটা ওষুধ খেলেই সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।'

রুগীর মনে উৎসাহ দেবার জন্য শরতের ওষুধের সে তারিফ করতে লাগল। রুগীর অবস্থা দেখে এবং যতটুকু শরতের জানা ছিল ওষুধ দিল, তারপর কয়েকদিন পর্যন্ত সকাল সন্ধ্যায় দু-বেলা তাকে দেখতে যেত, কিন্তু রোগের উপশম হয়নি, যন্ত্রণাও ক্রমশ বেড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল কিন্তু শীতলচন্দ্রকে কেউ বাঁচাতে পারে নি। কামিনী শোকে-দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়ল, অসুখের সময় আহার নিদ্রা ভুলে কি ভাবে সে তার সেবা করেছিল, কোন সতী-সাধ্বী স্ত্রীও হয়তো এভাবে স্বামী-সেবা করতে পারে না।

শরতের মনও দুঃখে কাতর হয়ে পড়ে, কোনরকমে মনের দুঃখ সামলে তার শেষকৃত্য করে। পরদিন অফিস যাবার সময় দেখে কামিনীর বাড়িতে তালা ঝুলছে। আশ্চর্য হয়ে আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে গতকালই সে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

এই সব বস্তিতে এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে, শরৎ ক্রমশ সে ঘটনার কথা ভুলে গেল। দু-বছর এমনি ভাবে কেটে যায়, এর মধ্যে শরৎও ঠিকানা বদল করে, নতুন মেসে উঠে অভ্যেসমত বেড়াতে বেরিয়েছে। পথে নেমে দেখে পকেটে চুরুট রয়েছে কিন্তু দেশলাই নেই। সড়কের উপর একটি মনিহারী দোকানে যেতে আশ্চর্য হয়ে গেল শরৎ, যে মহিলাটি গ্রাহকদের সওদা ওজন করে বিক্রি করছিল সে আর কেউ নয়—কামিনী।

কামিনী এই রূপে? এই ভাবে? সারা অঙ্গে গয়না, স্বাস্থ্যের বাঁধুনী, তেমনই মুখে মিষ্টি হাসি। এ কি শীতলচন্দ্রের সেই কামিনী? যে শোকে বিহ্বল হয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল?

শরৎ ভাবছিল অনেক কথাই। ততক্ষণে কিন্তু কামিনী শরৎকে দেখতে পেয়েছে। মাথায় কাপড় দিয়ে পা ছুঁয়ে শরৎকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, ভালো আছেন তো?' শরৎ বলল, 'হ্যাঁ আমি ভালো আছি, তুমি বল, তুমি কেমন আছ? কি খবর? দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ আনন্দেই আছ। কি বল?'

কামিনী বলল, 'আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি, দাদা।' তারপর যেন সব পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল, সজল দুটি চোখ মেলে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'যম টানলে মানুষ কি করতে পারে বলুন, দাদা? নইলে তাঁকে বাঁচাবার জন্য আপনি কত চেষ্টাই না করেছিলেন।'

তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'এ তাঁরই মামাতো ভাই। বহু দিন থেকে রেঙ্গুনেই আছেন, বিপদে-আপদে খোঁজ-খবর নিত। আপনি একে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন দাদা, তাঁর অসুখের সময় প্রায়ই আসত। এখন এর দয়াতেই দু-মুঠো খেতে পাচ্ছি, এর দুটি ছোট ছোট ছেলে, মা মরে গেছে। আহা! সেই শিশু দুটির মুখের দিকে চেয়েই আবার সংসারী হতে হল, তা না হলে একটা পেট, সে একটা যে কোন কাজ করেও ভরাতে পারতাম। কিন্তু লোক খুব ভালো দাদা, একেবারে ঠিক তাঁরই মত—খুব ভালোবাসে—আদর যত্ন করে।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কামিনী আরও না জানি কত কি বলেছিল, শরৎ কেবল একটা কথাই বুঝেছিল যে, এই নতুন সংসারে কামিনী বেশ সুখেই আছে। নতুন প্রেমিককেও খুব ভালোবাসে। তার মনে পড়ে গেল শীতলচন্দ্রের অসুখের সময় একটা লোক সেখানে যেত বটে; জিজ্ঞেস করল, 'নিবারণ নাকি? তার নাম নিবারণ ছিল না?' কামিনী হেসে ফেলল। মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে নিয়ে বলল, 'দাদার তো সব কথা মনে আছে দেখছি।'

একটুক্ষণের জন্য শরৎ যেন কোথায় হারিয়ে গেল। শীতলচন্দ্রের ঘরকন্নার মাঝে কামিনীকে সে দেখেছে, সেখানেও তো সুখেই ছিল। তারপর যখন সে অসুখে পড়ে, সেই রুগ্ন মানুষের একান্ত পাশটিতে কামিনীকে দেখেছে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে চিন্তায় আকুলপ্রাণা কামিনী শুকিয়ে যেন পোড়া-কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সেই কামিনীকেই সে আবার নিবারণের সংসারের মধ্যে

তাকিয়ে দেখছে। সারা অঙ্গে যেন বসন্তের ছোঁওয়া, রূপ-লাবণ্য ফেটে পড়ছে। শীতলচন্দ্রকে কামিনী ভালোবেসেছিল, নিবারণকেও সে ভালোবাসে আর কাঁচড়াপাড়ার সেই স্বামী যাকে সে ছেড়ে চলে এসেছে, তাকেও নিশ্চয়ই সে ভালোবাসত।

শরতের মন খেই হারিয়ে ফেলল। আর একটা গল্প তার মনে পড়ে গেল, নৈহাটির একটি তরুণ বাঙালী ছেলে, নাম তার যাই হোক, তাকে দুলালচাঁদ বলে ডাকলেই হল, কলকাতার কোনো অফিসে চাকরি করত, রেসের প্রচন্ড নেশা ছিল তার, তাছাড়া মদের নেশা তো ছিলই। ফলে, ধারে কর্জে জড়িয়ে পড়ে। তাগাদা ও কাবুলীর লাঠির ভয়ে একদিন সব দেনা মাথায় করে সে বর্মা পালিয়ে আসে। সে সময় বহু বাঙালীই ধার-কর্জ করে, অফিসের টাকা ভেঙে, জাল জুয়াচুরি করে সাধু সেজে বর্মায় পালিয়ে যেত। কারণ সেখানে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করার উপায় ছিল না। দুলালচাঁদ সোজা পালিয়ে গিয়ে মান্দালয়ে গিয়ে পৌছল, সেখানে কাঠের কারখানায় কেরানীর কাজে লাগল। কারখানা একজন বর্মী ভদ্রলোকের ছিল, সে বেচারী ইংরেজিতে হিসেবপত্র করতে পারত না। দুলালচাঁদ ইংরেজি ভালো জানত, মন লাগিয়ে কাজ-কর্ম করত, বর্মী মনিব তাকে খুব পছন্দ করত। মালিকের পৃথিবী বড়ই সীমাবদ্ধ ছিল। নিজে, মেয়ে ও জামাই-এর বাইরে সে আর কিছু জানত না। জামাইও ভারি অদ্ভুত মানুষ, কোনো কাজই সে করত না, খালি শখ-সৌখিনতা নিয়ে মেতে থাকত। ক্রমশ দুলালচাঁদ মনিবের পরামর্শদাতা হয়ে উঠল।

ছুটি-ছাটার দিন দুলালচাঁদ মালিকের বাড়িতে অতিথি হত, সেখানে কাজের কথা হত, মনিবের মেয়ের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টাও হত। বর্মী মেয়েরা ভারতবর্ষের মেয়েদের মতো তেমন লাজুক নয়।

এর কয়েক বছর পর হঠাৎ জামাই মারা গেল। কেউই তার উপর প্রসন্ন ছিল না, মরণে পর সবাই যেন মুক্তির নিশ্বাস ছাড়ল। তার এক বছর পর মালিকও মারা গেল, মেয়েই তখন সব কিছুর মালিক, কিন্তু আসল মালিক দুলালচাঁদ। কারণ যাবতীয় কাজকর্ম সে-ই দেখাশোনা করত। দু-তিন মাস পর মেয়েটি দুলালচাঁদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে।

দুলালচাঁদ হাতে স্বর্গ পেল। তখুনি রাজী হয়ে গেল, তারপর বর্মী নারীর প্রেমে দুলালচাঁদ হাবুডুবু খেতে লাগল। সে এখন বলতে গেলে রাজা, সত্যিকারের রাজা। মেয়েটিও যেন দুলালচাঁদ বলতে অজ্ঞান। সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে বেশ কটা বছর যখন কেটে গেল, তখন একদিন দুলালচাঁদ স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'এখানেই যখন চিরটা কাল থাকতে হবে, তখন দেশের বাড়িতে যা কিছু আছে বেচে বুচে নিয়ে আসি কি বল? সেখানে বিধবা বোন ও বুড়ো মা রয়েছেন, তাদেরও একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি।'

বর্মী স্ত্রী খুশিমনে স্বামীকে যাবার অনুমতি দেয়, সে বেচারী জানত না যে, দুলালচাঁদ বিবাহিত, তার স্ত্রী জীবিত, সন্তানও আছে। দুলালচাঁদ কিছুই তাকে জানায় নি! যাবার সময় স্বামীর হাতে দু-তিন হাজার টাকা আরও তুলে দেয়। কারখানার সব টাকাকড়ি দুলালচাঁদের কাছেই থাকত। দশ হাজার টাকা তা থেকে বের করে নিয়ে প্রায় বার-তেরো হাজার টাকা সঙ্গে করে সে কলকাতায় রওয়ানা হল। তার বর্মী স্ত্রী স্টিমার ঘাট পর্যন্ত ছাড়তে আসে, যাবার সময় যত এগিয়ে আসছিল, সে ততই কাতর হয়ে পড়ছিল, একসময় কান্নায় ভেঙে পড়ল। দুলালচাঁদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আমি সত্যি বলছি, একমাসের ভেতর ফিরে আসব, সেখানে আমারও তো মন লাগবে না।'

স্ত্রী বলল, 'তোমায় যেতে দিতে আমার মন চাইছে না, কিন্তু কি করি? তোমার নিজের কাজ আছে। তাড়াতাড়ি কাজকর্ম মিটিয়ে ফিরে এস, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

জাহাজ ছেড়ে গেল, ক্রমশঃ চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুলালচাঁদ আর কোনোদিনই বর্মায় ফিরে যায় নি। দুলালচাঁদ তার আসল নামও ছিল না। স্ত্রীকেও সে নিজের ভুল ঠিকানা দিয়েছিল। মাস গেল, বছর গেল, তিন-চার বছর পর্যন্ত তার সেই বর্মী স্ত্রী তার আশায় পথ চেয়ে

থাকত। খোঁজ নেবার সে বহুরকম চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মনের ব্যথায় শেষ পর্যন্ত সে বেচারী আর বাঁচেনি।

এ ধরনের চরিত্র শরৎ অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছে, এরা তার গল্পের আধার। দুলালচাঁদের এই গল্প শরতের লেখনীর ছোঁয়ায় 'শ্রীকান্তে' (দ্বিতীয় পর্ব) কী দারুণ মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। বর্মী নারী শরৎ সাহিত্যে কম দেখা যায় কিন্তু তাদের প্রতি শরতের মনে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বর্মী নারীর সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ নয়, কিন্তু তাদের স্বাধীনতাকে সে মনে মনে ঈর্ষা না করে পারত না। 'ঘোমটার বালাই নাই, পুরুষ দেখিয়া ছুটিয়া পলাইবার আগ্রহাতিশয্যে হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া পড়া নাই, দ্বিধাসঙ্কোচলেশহীন—যেন ঝরনার মুক্ত প্রবাহের মতই স্বচ্ছন্দে অবাধে বহিয়া চলিয়াছে। . . রমণীদের ততখানি স্বাধীনতা দিয়া এদেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে, আর আমরাই বা তাহাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি! আমাদের মেয়েরাও যদি এমনি একদিন …।'

১৯০৩ থেকে ১৯১২-র গোড়ার দিকে পর্যন্ত শরৎ যেন অন্ধকারে চাপা ছিল। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যে নিজের জীবনকে এমন ভাবে তৈরি করে নিয়েছিল, যা তাকে প্রসিদ্ধির চূড়ায় তুলে ধরতে পারে। একজন স্রষ্টার পক্ষে মানব-জীবনকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখা অত্যন্ত আবশ্যক। সর্বহারাদের মধ্যে একান্ত তাদেরই হয়ে শরৎ তো তাই করেছিল। তাদের অন্তর্মনকে সে চিনতে পেরেছিল। সেইসঙ্গে নিজের জীবনের মূল উদ্দেশ্যও সে খুঁজে পেয়েছিল।

১৬

'যমুনা' কার্যালয়ে যে সাহিত্যিক বৈঠক হত, তাতে সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার পরিচয়। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি 'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে সাহায্য করতেন। একদিন সন্ধ্যায় যখন তিনি গল্প নির্বাচন করছিলেন, শরৎ সেখানে গিয়ে হাজির। কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁদের দু-জনের মধ্যে ছিল না। হেমেন্দ্র চোখ তুলে চেয়ে একবার দেখলেন, নিতান্ত সাধারণ চেহারা, রোগা পাতলা রুগ্ন শরীর। কালোরঙের একটি লোক চটি পরে, একটি কুৎসিত দিশি কুকুর ছানা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল, ছোট পাতলা দাড়ি, পরনে আধ ময়লা কাপড়। অবহেলা ভরে হেমেন্দ্রকুমার রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে চাও?'

'ফণীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তিনি এখনও আসেন নি।'

'আমি কি খানিকক্ষণ বসতে পারি?'

হেমেন্দ্র ভাবলেন কোন দপ্তরী গোছের লোক হবে বোধহয়। তাই কিছু না বলে বেঞ্চির দিকে ইশারা করে বসতে বলে নিজের কাজে মন দিলেন। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। শরৎ কুকুর ছানাটির সঙ্গে খেলা করতে লাগল। কুকুরটি মাঝে মাঝে হেমেন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে তার ধুতি ধরে টানাটানি আরম্ভ করাতে, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'ছিঃ ছিঃ! অফিসের মধ্যে নেড়ি কুকুর,……'

ঠিক সেই মুহূর্তে ফণীবাবু এসে পড়লেন। শরৎকে দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'একি শরৎবাবু? ওখানে ওই বেঞ্চের উপর কেন বসে রয়েছেন?'

শরৎ আঙুল তুলে হেমেন্দ্রকে দেখিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'উনি আমাকে এখানেই বসতে হুকুম করেছেন।'

ফণীবাবু বললেন, 'না, না, ওই চেয়ারে এসে বসুন! এ কি করেছেন, হেমেন্দ্রবাবু? আপনি শরৎবাবুকে চেনেন না?'

হেমেন্দ্র লজ্জিত হয়ে বললেন, 'ক্ষমা করবেন, কি করেই বা চিনব? আমি তো আগে এঁকে কখনও দেখিনি, ভেবেছিলাম কোন দপ্তরী হবে হয়ত।'

একথা শুনে শরৎ খুব একচোট হাসল, পরে হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। গল্প করতে করতে শরৎ যখন ইয়া বড় একটা আফিং-এর গুলি মুখে পুরত, ভয় পেয়ে হেমেন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করতেন, 'এ কি করছেন আপনি?'

শরৎ বলত, 'আফিং খাচ্ছি! যদি ভাল লিখতে চাও তাহলে আমার মতো আফিং খাও।'

হেমেন্দ্র বললেন, 'মাফ করবেন মশাই, ওই রকম একটা আফিং-এর গোলা যদি খাই তাহলে আর সুন্দর লেখার অবসরই পাব না! খবর পেয়ে যমদূত ছুটে আসবে।'

কিন্তু শরতের মনে এ সব ব্যাপারে কোন ভয়ডর ছিল না। কখনও কখনও দশ বারো ঘণ্টা অক্লান্তভাবে সে গল্প শোনাতে পারত। রাত দুটো তিনটের সময় ফিরত, একটা কুখ্যাত গলিতে বাস করত, হেমেন্দ্র প্রায়ই তার সঙ্গে আসতেন। রাস্তা চলতে চলতে শরৎ নিজের জীবনের বিচিত্র সব কাহিনী শোনাত। হেমেন্দ্র অবাক হয়ে ভাবতেন, কি সরল এই মানুষটা, কোন কিছুই লুকোতে জানে না।

শরৎ বলল, 'হেমেন্দ্র, এমন কোন নেশা নেই যা আমি করি নি, এমন কোন নোংরা জায়গা নেই যেখানে আমি যাইনি। আজ সে সব কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই যে এরপরও আমি নিজের কাছে হেরে যাইনি। আমার মনের ভেতরের মানুষটা চিরদিন নির্বিকার রয়ে গেল।'

কিন্তু সাধারণ মানুষ কি অত গভীর মনের সন্ধান পেতে পারে? রেঙ্গুনের মতো কলকাতাতেও তাকে নিয়ে অখ্যাতি-অপপ্রচারের শেষ ছিল না। লোকে তাকে বেশ্যাসক্ত, লম্পট, চরিত্রহীন, মদ্যপ কিছু বলতেই বাকি রাখে নি।

একদিন দারুণ বৃষ্টিতে কলকাতার পথঘাট জলে জলময় হয়ে উঠল, সেদিন আর বৈঠক বসেনি। ন'টা বাজতে-না-বাজতেই পথ জনশূন্য হয়ে ওঠে। শরৎ ও হেমেন্দ্র যখন বাড়ি ফিরছিল রাস্তায় তখন হাঁটু জল। তাদের আগে আগে একটি স্ত্রীলোক যাচ্ছিল। জলের তোড়ে ভালোভাবে চলাই দায়, এরা স্ত্রীলোকটির দিকে ভালোভাবে চেয়ে দেখে নি। কিন্তু পরদিন অফিসে পৌঁছে দেখা গেল, রটনা সবার কানে কানে উঠেছে যে, গতকাল রাতে শরৎ ও হেমেন্দ্র একজন বেশ্যার পিছু পিছু যাচ্ছিল।

হেমেন্দ্র শুনে হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু শরৎ হঠাৎ দারুণ ক্ষেপে গেল। বলল, 'ছিঃ ছিঃ এমন হতভাগা লোকও সব আছে। আমার নামে মিথ্যে এতবড় অপবাদ দেওয়া! আমি বুড়ো মানুষ আর হেমেন্দ্র এখনও ছেলেমানুষ, বয়সের কথাটাও তো একবার ভাবতে হয়।'

শরতের মুখচোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল রটনাকারী ব্যক্তিকে যদি সে সামনে পেত, মেরে হাড় গোড় গুঁড়িয়ে দিত। যেলোক বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে সত্যি সত্যিই থাকে, এই অপবাদে তাঁর এমন ক্ষেপে ওঠা কি একটু আশ্চর্য লাগে না? এ-ঘটনার বর্ণনায় অতিশয়োক্তি থাকতে পারে কিন্তু মনের অজান্তে সদাচারী হওয়ার কামনা তার বৈরাগী মনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। শরৎ দুঃসাহসী কিন্তু বিদ্রোহী নয়। হয়তো সেজন্যই এই রকম বিরোধাভাস দেখতে পাওয়া যায়।

হেমেন্দ্র ছাড়া দ্বিতীয় স্বনামধন্য লোক যাঁর সঙ্গে শরতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তিনি হলেন 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেন। তিনি নিজেই এক বন্ধুর সঙ্গে 'যমুনা'র কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। ফণীন্দ্র শরতের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য কিছু বলতে যেতেই শরৎ বলল, 'দাদার সঙ্গে আমার পরিচয় বহু পুরোনো।'

জলধর সেন অবাক হয়ে বলেন, 'আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না।'

শরৎ বলল, 'আপনার হয়তো মনে আছে যে, কয়েক বছর আগে "কুন্তলীন" পুরস্কার প্রতিযোগিতায় আপনি ছিলেন বিচারক এবং তাতে "মন্দির" নামে একটা গল্প প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল।'

জলধর সেন বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে প্রায় দেড়শো গল্প এসেছিল, তার মধ্যে "মন্দির" গল্পটি আমার সব থেকে ভালো লাগে। আমি গল্পের উপর লিখে দিয়েছিলাম যে, এ-যদি লেখা

না ছাড়ে ভবিষ্যতে যশস্বী লেখক হবে। কিন্তু সে গল্পটি তো ভাগলপুরের শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিল।'

শরৎ হেসে বলল, 'গল্পটা আমি লিখেছিলাম, নিজের নাম দিতে বড় লজ্জা হল তাই সুরেন্দ্র আমার নামে পাঠিয়েছিলাম। দেখলেন তো আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কত পুরোনো।' জলধর সেন বললেন, 'এ আমার বড় গৌরবের কথা, এত বড় রত্ন সেদিন চিনতে ভুল করিনি।'

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জলধর সেন ও শরতের মধ্যে অত্যন্ত স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। শরতের সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে যদি কারুর কোন অবদান থাকে তা হলে তা জলধর সেনের। অনেক বছর পর শরৎ লিখেছিল:

'দাদা যদি লেখার জন্য এত মারামারি না করতেন, গুরুর মত তাগাদার উপর তাগাদা না দিতেন তাহলে আমার মত কুঁড়ে লোকের পক্ষে অর্ধেক কেন, যা লিখেছি তার এক-চতুর্থাংশও লিখে উঠতে পারতাম না, বা প্রকাশও হত না।'

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয়। শরৎ রবীন্দ্রনাথের পরমভক্ত, রবীন্দ্রনাথও শরতের প্রতিভা চিনতে পেরেছিলেন। কিছুদিন হল তিনি শরতের নতুন লেখা 'পণ্ডিতমশাই' বইখানি পড়েছিলেন।'[২]

অসিতকুমার হালদার লিখেছেন, 'আমার মনে আছে "পণ্ডিতমশাই" পড়ে তিনি বলেছিলেন, "বহুদিন হল আমি এধার ওধারের কিছু পড়ি না, কিন্তু 'পণ্ডিতমশাই' বইখানি পড়ে মনে হচ্ছে মরুভূমিতে বাদল দেখতে পেয়েছি"।

'পরে শরতের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

'কলকাতায় ফিরে আসলে সলজ্জ শরৎকে ধরে যখন আমরা রবীন্দ্রনাথের সামনে উপস্থিত করলাম, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।'

কেউ জানত না সেদিন সেই প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণে গুরু শিষ্যে কি কথা হয়েছিল। কবিগুরুর গৌরবময় দীপ্তি ও রূপ, ফরসা ধপধপে রঙ, লম্বা দাড়ি, ঢিলেঢালা পোশাক, সুমিষ্ট কথাবার্তা শুনে নিশ্চয় শরৎ তাঁকে অন্য জগতের মানুষ ভেবে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের রূপ শরতের কাছে চিরদিনের একটা বিস্ময়।

শরতের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না,তাই 'রামের সুমতি', 'পথ নির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে' ও 'বিরাজ বৌ' বই কটির সর্বস্বত্বাধিকার সে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে মাত্র তিনশো টাকায় বিক্রি করে দেয়। সে সময় এ সওদা অবশ্য খুব একটা খারাপ ছিল না।

সেই সময়েই ফণীন্দ্রনাথের মাধ্যমে শরৎ 'পরিণীতা', 'পণ্ডিতমশাই', 'চন্দ্রনাথ', 'কাশীনাথ', 'নারীর মূল্য', 'চরিত্রহীন' প্রকাশনের অধিকার 'এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স'-কে দেয়, শুধু প্রথম সংস্করণের জন্য।

ফণীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল শরতের সমস্ত রচনা নিজে প্রকাশ করেন, কিন্তু সে সামর্থ্য তখন তাঁর ছিল না আর শরতেরও টাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ফণীন্দ্রনাথের অনুরোধেই সুধীরচন্দ্র সরকার শরৎকে দুশো টাকা অগ্রিম দেন। আসলে ফণীন্দ্রনাথ চাইতেন না যে, শরৎ 'যমুনা' থেকে পৃথক হয়ে যায়।

'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা' ও 'পণ্ডিতমশাই'[৩] এর প্রকাশন শরতের কলকাতা থাকাকালীন হয়েছিল। 'বিরাজ বৌ'[৪] কলকাতা আসার আগেই প্রকাশিত হয়। 'নিষ্কৃতি'[৫], 'আলো-আঁধারে', 'মেজদিদি' ও 'দর্পচূর্ণ' ইত্যাদি নতুন ও পুরোনো লেখাগুলিও এই সময়ে ছাপা হয়।

---

১ ১৯৩৩

২ অক্টোবর, ১৯১৪ সালে প্রয়াগ যাত্রার সময় রবীন্দ্রনাথ বইখানি পড়েছিলেন। ১৫ সেপ্টেম্বর,১৯১৪ সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

৩ 'বিন্দুর ছেলে' জুলাই ১৯১৪, 'পরিণীতা' ১০ অগাস্ট ১৯১৪, 'পণ্ডিতমশাই' ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪

৪ 'বিরাজ বৌ', মে ১৯১৪

৫ এই তিনটি গল্পই 'যমুনা'-য় ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়।

'যমুনা' শরৎকে অর্থ দিতে অপারগ ছিল। সেদিক দিয়ে 'ভারতবর্ষ' ছিল প্রচন্ড সক্ষম। তাছাড়া 'ভারতবর্ষে' শরতের আবাল্যের সুহৃদ প্রমথনাথ ভট্ট ছিল। সম্পাদক জলধর সেন শরৎকে স্নেহ করতেন,তাছাড়া'ভারতবর্ষে'র সবাই শরতের গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। ফণীন্দ্রনাথ সবই বুঝতেন, মনে মনে ভয়ও হত, তাই একদিন তিনি 'যমুনা'র সম্পাদক পদে শরৎকে প্রতিষ্ঠিত করে বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে দিলেনঃ

' "যমুনা"র পাঠকগণ বোধহয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান মাস হইতে "যমুনা"-র সম্পাদন-কার্যে যোগদান করিলেন। "যমুনা"র পাঠকগণের নিকটে শরৎবাবু যথেষ্ট পরিচিত—অতএব পরিচিতের নতুন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।'

শরতের নিষেধ সত্ত্বেও 'বড়দিদি' তিনি পুস্তকরূপে প্রকাশিত করেন।[১] শরৎ বইটি পেয়ে লেখে,[২] 'তোমার প্রেরিত "বড়দিদি" পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলেও বোধ করি ভাল হইত।'

বইটির আশানুরূপ বিক্রি হয়নি। মাত্র আট আনা দাম রেখেও সারা বছরে চারশো কপি বইও বিক্রি হয়নি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতেন। কিন্তু মনে হয় সে সময়কার পাঠকদের চোখে বইটি 'চরিত্রহীনে'র মতই অশ্লীল ছিল।

এইরকম পরিস্থিতিতে, অপরদিকে শরতের সেই সব বন্ধুরা যারা মনে প্রাণে চাইত যে, 'যমুনা'র সঙ্গে শরতের বিচ্ছেদ ঘটুক, তারা শরৎকে খবর দিল যে 'বড়দিদি' বইটির দরুন ফণীন্দ্রনাথ প্রচুর পয়সা উপার্জন করেছে। কি জানি কেন, শরৎ এ কথা বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসের একটা কারণ এও হতে পারে যে, গুরুদাসের দোকানে তার অন্য বইগুলির বেশ ভালো বিক্রি চলছিল।

একদিন শরৎ 'যমুনা'র কার্যালয়ে গিয়ে দেখে ফণীন্দ্রনাথ সেখানে নেই, তার কোন আত্মীয় বসে আছে। শরৎ তাকে বলে, 'বড়দিদি'র সবকটি কপি আমায় দিয়ে দিন, ওগুলো আমার।'

আত্মীয় ভদ্রলোক বলে, 'বই আলমারিতে বন্ধ এবং আমার কাছে চাবি নেই। তিনি এলে তাঁর কাছ থেকে বই নিয়ে যাবেন।'

শরৎ দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে বলল, 'আমি অপেক্ষা করতে পারব না। চাবি না থাকে আমি পেরেক দিয়ে তালা খুলে বই নিয়ে যাব।'

সত্যি সত্যিই পেরেকের সাহায্যে শরৎ আলমারির তালা খুলে ফেলে এবং সবকটি বই মুটের মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে ফণীন্দ্রনাথ দারুণ দুঃখ পেয়েছিল। সেইদিনই বিকেলে সৌরীন্দ্রমোহনকে সে এ কথা জানায়, সেও ভারি বিব্রত হয়ে পড়ে। সৌরীন্দ্রমোহন শরৎকে বলে, 'জান, তুমি যা করেছ তা অপরাধ, এক ধরনের চুরি। বই ফণীন্দ্রনাথ নিজের খরচে ছেপেছে, ও জিনিস তারই সম্পত্তি। সে যদি কাছারি যায়, তোমার হাজত বাস অবধারিত। তুমি ফণীকে বলনি কেন? তুমি যদি চাইতে সে তোমায় অবশ্যই টাকা দিত, সে কখনও গররাজী নয়। তুমি তো তার বাড়ির লোকের মতই। তোমার জন্য সে কি না করেছে।'

শরৎ এবার বুঝতে পারে সত্যিই সে ভুল কাজ করেছে, ভারি লজ্জিত হয়, কিন্তু 'যমুনা'র সঙ্গে আর তার বনিবনা হয়নি। এবার সে শুধু 'ভারতবর্ষে'র জন্যই লিখতে আরম্ভ করে।

কিন্তু সত্যি সত্যিই কি এ-ধরনের অপ্রিয় ঘটনা কোনোদিন ঘটেছিল? তার জীবনের অনেক প্রবাদ ও অপবাদের মতো এ ঘটনাও কি একটা প্রবাদ হতে পারে না? ফণীন্দ্রনাথের কাছে সে এক পয়সাও নেয়নি, তাছাড়া তার লেখার দরুনই 'যমুনা'র গ্রাহক সংখ্যা দুশো থেকে দু-হাজার

১ ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩
২. ১০ অক্টোবর, ১৯১৩

পরিণত হয়। গরিব দুঃখীকে দেখামাত্র যে মানুষের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, টাকার লালসা যার কোনোদিন ছিল না, সে এ ভাবে চুরি করে বই নিয়ে পালাবে সহসা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। পয়সা দিয়ে শরৎকে কেনা যায় না। প্রমথকে একদিন সে স্পষ্টই বলেছিল, 'আমাকে কিনতে পারে, এত টাকা তোমাদের কলকাতাতেও নেই, তো তোমাদের পাড়াটি তো ছোট।'

এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে শরৎকে প্রকাশ্য পথে আনার সবটুকু বৈশিষ্ট্য একা ফণীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। বড় গর্বের সঙ্গে ফণীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন, 'শরৎকে চিনেছিলেন অনেকেই, কিন্তু তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাহস কেউ করেনি। "সাহিত্য"র সম্পাদক সমাজপতি "চরিত্রহীন" বইটির প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু নিজের পত্রিকায় ছাপার সাহস করেন নি। "নারীর মূল্য" নারীর নামে কেউ ছাপতে রাজী হয়নি। কিন্তু আমি ছেপেছি। কত গাল মন্দই না শুনতে হয়েছে সেজন্য, কিন্তু আমি ভয় পাই নি।'

'যমুনা'র সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের সব দোষ কি একা শরতের? বন্ধুদের ভালোবাসা ও পয়সার লোভেই কি 'ভারতবর্ষে'র প্রতি সে আকৃষ্ট হয়? সেটাও হয়তো যুক্তিসংগত একটা কারণ হতে পারে। বর্মায় থাকতে আর তাব ভালো লাগছিল না, দেশে ফেরার জন্য টাকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, এ-অবস্থায় শরৎকে দোষ দেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু এ ছাড়াও আরো কারণ ছিল, ফণীন্দ্র স্বভাবতই একটু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক ছিল। বারংবার ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও তার কেবলই ভয় হত 'ভাবতবর্ষে'র মতো বড় পত্রিকা থাকতে, শরৎ হয়তো ছোট পত্রিকায় লিখবে না। চিন্তা করাটা হয়তো তেমন অস্বাভাবিক নয় কিন্তু সব-কিছুরই একটা সীমা আছে। রেঙ্গুন থেকে লেখা শরতের একটি চিঠি দেখলে[১] বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সম্পর্কে চিড় ধরেছে। 'আচ্ছা "যমুনা" আজকাল কি চলে? ফণী নাকি বই ছাপিয়েছে? সে বলত, আপনার এক একটা গল্প আমি ৩০/৪০ বার পড়ে মুখস্থ করে ফেলি। আপনার লেখাই আমার আদর্শ। অথচ এমনি গুরুভক্তি যে, একখানা বইও পাঠালে না। আমি তার সব লেখাই পড়েচি এবং সে সব লেখা যে কি, সে তো আমাব চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না। অবশ্য নানা কারণে আমিও তার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখি নাই।' ফণীন্দ্রনাথও একবাব বলেছিল, 'প্রত্যেক মিলনের একটা উদ্দেশ্য থাকে। শরৎ যমুনা মিলনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। এখন যদি মথুরার রাজসিংহাসনের আহ্বান পেয়ে ব্রজধাম ছেড়ে সে যেতে চায় তাহলে মর্মান্তিক বেদনা পেলেও ব্রজবাসী অভিযোগ করবে না।'

এ রূপক সত্যি না হলেও উদ্দেশ্যর কথা নিশ্চিতরূপে সত্য না হয়ে যায় না।

১৭

হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটি শেষ হবার আগেই শরৎকে একা রেঙ্গুনে ফিরে যেতে হয়। এসেই বিখ্যাত রচনা 'পল্লীসমাজ' বইখানি লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী সঙ্গে না থাকায় খুব অসুবিধে হচ্ছিল। তাই কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমথকে সে লেখে, 'এঁকে তো এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না—তাঁর ত প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। এরা না এলে লিখতেই পারি না। মেসে হয় না—সব লোকেই দেখতে চায়, উঁকি মারে—এই সব উৎপাত। আমি যে অবস্থায় অনেক লিখেছিলাম—ঠিক সেই অবস্থায় না পড়লে আর কিছুই হয়ে উঠছে না দেখছি।'

'পল্লীসমাজ' শরতের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। বইটিতে শবদাহ ও প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি

১ ৫ নভেম্বর, ১৯১৫

ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়, সে সময় বাংলাদেশে হাঁপানী ইত্যাদি কতকগুলো রোগের রুগীদের প্রায়শ্চিত্ত করার নিয়ম ছিল। সেই সম্বন্ধেই উপন্যাসের একটি চরিত্র গোপাল সরকার রমেশকে বলছেঃ

"এই ছেলেটির বাপ দ্বারিক চক্রবর্তী ছয়মাস হইতে কাসরোগে শয্যাগত থাকিয়া আজ ভোরবেলায় মরিয়াছে; প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া কেহ শব স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না—এখন সেইটা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কামিনীর মা গত ছয় মাস কাল তাহার সর্বস্ব এই নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-পরিবারের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে, আর তাহারও কিছু নাই। সেই জন্য ছেলেটিকে লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছে।"

'রমেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"বেলা তো প্রায় দুটো বাজে। যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয় মড়া পড়েই থাকবে?"

'সরকার হাসিয়া কহিল,"উপায় কি বাবু? অশাস্তর কাজ তো আর হতে পারে না! আর এতে পাড়ার লোককেই বা দোষ দেবে কে বলুন—যা হোক, মড়া পড়ে থাকবে না; যেমন করে হোক, কাজটা ওদের করতেই হবে! তাই ত ভিক্ষে হ্যাঁ কামিনীর মা, আর কোথাও গিয়েছিলে?"

'ছেলেটি মুঠা খুলিয়া একটি সিকি ও চারিটি পয়সা দেখাইল। কামিনীর মা কহিল,"সিকিটি মুখুয্যেরা দিয়েচে, আর পয়সা চারিটি হালদার মশাই দিয়েচেন। কিন্তু যেমন করে হোক ন' সিকের কমে তো হবে না! তাই বাবু যদি—"

'রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, 'তোমরা বাড়ি যাও বাপু, আর কোথাও যেতে হবে না। আমি এখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে লোক পাঠিয়ে দিচ্চি"।'

এ ঘটনা লেখার সময় শরতের নিশ্চয় দাদামশায় মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে থাকবে। অনেক বছর আগে জগদ্ধাত্রী পুজোয় ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় ব্রাহ্মণদের আপত্তিতে এই দাদামশায় শরৎকে পরিবেশনে বাধা দিয়েছিলেন। সেই দাদামশায় মারা যাওয়াতে ব্রাহ্মণেরা আবার হাঙ্গামা বাধিয়েছিলেন।

'মহেন্দ্রনাথ পীড়িত। সামান্য জ্বর, সেই সঙ্গে রক্ত ওঠে। কবিরাজ বললেন—রক্ত পিত্ত।

'গোঁড়াদলের দলপতিরা ঘন ঘন আনাগোনা করছেন। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে। দলপতিদের ভেতর একজন কেউ এলেন না, তাঁদের চেলা-চামুণ্ডাদের মারফৎ খবর এল—অচিরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ফেল, নইলে দহন-বহনের সময় গোল হতে পারে।

'—কিসের গোল?

'—রোগীর রক্ত উঠছে যে! লোকে স্পর্শ করবে না। বাড়ির চারিদিকে মৃত্যুর ছায়া ঘনাচ্ছে; অতীব দুঃখের সময়। সে কথায় বড় কেউ কর্ণপাত করলে না; তবু কানাঘুষো চলতে লাগল। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু সামলে উঠতে পারলেন না। অষ্টমী না ওই রকম কোন এক তিথিতে তাঁর মৃত্যু হল। আর যাবি কোথা! বিপক্ষ দল এমনই একটা কিছু কামনা করেছিলেন—তাঁদের খুশী ধরে না আর। অষ্টমীতে দেহ প্রায়শ্চিত্তের কোন ব্যবস্থা নেই শাস্ত্রে—অতএব মড়া বাসি হতেই দলপতি মশাই নিজে বাড়ি গিয়ে এই ফতোয়া জারি করে ঘোঁট পাকিয়ে তুললেন। ফলে, শবদাহ করার লোক পাওয়া দায় হল।

'শবদাহের জন্য তখন যেতে হত বারাব্রির মণ্ট ঘাটে। বাঙগালীটোলা থেকে তা তিন-সাড়ে-তিন মাইল পথ; পথও সুগম নয়, জায়গায় জায়গায় খোয়া উঠে তা এক রকম দুর্গম। ফাঁপরে পড়ে গেলেন গাঙ্গুলীরা।

'শরতের ছোটদাদামশাই অঘোরনাথ সাহসী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বললেন,"হিঁদু শাস্তর কামধেনু, যা চাইবে তাই পাওয়া যাবে তাতে। নানা মুনির নানা মত! তোমরা ভয় পেও না, ব্যবস্থা হবেই হবে।"

'অবশেষে ব্যবস্থা হল।

'তর্করত্ন মশাই বললেন,"ও শালা কাব্যতীর্থ, ও ন্যায়ের জানে কি? হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই। অষ্টমী, চতুর্দশী, শনি মঙ্গলবারে জীবিতের দেহ প্রায়শ্চিত্ত হয় না। মড়া পচাবার ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রের বিধি এবং ন্যায়বিরুদ্ধ। এ অসম্ভব কথা। যুক্তি হল সবার বড়–

যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্মহানি প্রজায়তে"

'তর্করত্ন ব্যবস্থা লিখে দিলেন এবং তাঁর এক শিষ্য এসে করালেন প্রায়শ্চিত্ত। শব উঠল বাড়ি থেকে।''[1]

'পল্লীসমাজ' লেখার সময় এক বন্ধুর কাছে শরৎ বলেছিল[2]; "পল্লীসমাজে"র এই রূপ শেষ করিয়া পাঠাইলাম। সেদিন যেমন করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইতে ছিলাম, সেটা ভালো বোধ না হওয়ায় "কনক্লুশান"টা অন্যরূপ হইল।·· অবশ্য আমি নিজেই জানি "সরস" বলিতে যা বুঝায়, এ গল্প তার ধার দিয়াও যায় না—নিতান্তই কট্‌মটে পদার্থ খাড়া হয়েছে—তাহোক্, দুই একটা ইন্টারেস্টিং গল্পও ভাল। প্রবন্ধও ত অনেকে পড়ে।'

আর একটি চিঠিতে লেখে, 'আমার ইচ্ছা, লোকে পাড়াগাঁয়ের কথা জানে যেন। এই বইখানিতে একটা মূল কথাই, বিবাহের কথাটাই বলা হয় নি। ইচ্ছা করি এই কথাটি আর একখানা বই -এ বলি।· কলিকাতায় লোকে এ বইখানিকে কি ভাবে নিলে সেটা জানি না। বিরুদ্ধ মত কেউ বলে কি?'

'পল্লীসমাজে' দুঃখ দৈন্য নিপীড়িত সংকীর্ণ কুসংস্কারের আবর্তে আবদ্ধ আজন্ম প্রচলিত গোঁড়ামিতে অন্ধ বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্তের পল্লীজীবনের একান্ত সাধাসিধে কিন্তু যথার্থ চিত্রণ তুলে ধরা হয়েছে। শরতের ছেলেবেলা এবং যৌবনের অনেকটা সময় গ্রামেই কাটে। গ্রাম সে ভালোবাসত, সেই ভালোবাসার দাবিতেই সে বইখানি লেখে।

শরৎ একথা স্বীকার করে গেছে, 'পাড়াগাঁয়ের লোকে যদি নিজের মনের সহিত মিলাইয়া লইয়া সত্য কথাগুলাই বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কথাগুলো চলনসই প্রায়ই হয়। অন্ততঃ ভুলচুক তত হয় না, যত কলিকাতা বা সহরের বড়লোক কল্পনা করিয়া বলিতে গেলে হয়। প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে। যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া,–বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভালমন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া—তবে।'[3]

বর্মায় পল্লীসমাজের বেশ ভালো রকম অভ্যর্থনা হয় কিন্তু কলকাতা তীব্র আলোচনায় ফেটে পড়ে। বিধবা রমা রমেশকে কেন ভালোবাসবে—তা নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের আক্ষেপ করতে লাগলেন। 'সাহিত্য'র একজন প্রবীণ সমালোচক সাহিত্যের 'স্বাস্থ্য রক্ষা' নামক গ্রন্থে রমাকে এমন তিরস্কার করেছিলেন,——

'ঠাকরুণ, তুমি বড় বুদ্ধিমতী, তাই না? নিজের বুদ্ধিবলে বাপের জমিদারী সামলাচ্ছ, সেই তুমিই বাল্যবন্ধু পরপুরুষকে ভালবাসলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছিঃ···?'

এই তীব্র আক্রমণের আর একটা কারণ এই ছিল যে–রমা ও রমেশ যখন পরস্পরকে এত ভালোবাসত, তখন লেখক কেন তাদের বিয়ে দিতে পারেন নি। এ অভিযোগের উত্তরে শরৎ লেখে; "পল্লীসমাজ" বলে আমার একখানাই বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এতবড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিকও তো আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু সমাজ স্বর্গে যায়, কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের

১ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭

২ ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫

৩. ১০ মার্চ, ১৯১৬ সালে লেখা একটি চিঠি।

মত পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু সমাজে এ-সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নরনারী এ-জীবনে বিফল ব্যথ পঙগু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষের এতবড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না এ-কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সেদিন বন্ধ হয়ে যেত।'[১]

'পল্লীসমাজ' ছাড়া সে আরও দুটি উপন্যাস লেখায় ব্যস্ত ছিল, 'গৃহদাহ' ও 'শ্রীকান্ত'। 'গৃহদাহ' সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত হয়ে পড়ে। তার একটা কারণ শরৎ নিজে, কখন কোথায় কি বলে বসত, আবার অন্য জায়গায় সে কথার প্রতিবাদ করে অন্য কথা পাড়ত। হয়তো এ-সব সে জেনে বুঝে ইচ্ছে করেই করত, মজা পেত। একটা চিঠিতে সে লেখে, 'এ গল্পটা "গোরা"র পরেশবাবুর ভাব নেওয়া। তবে ধরবার জো নেই। সামাজিক-পারিবারিক গল্প। আমার ত মনে বড় উৎসাহ হয়েছে যে চমৎকার হবে। তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার জো নেই।'

তবে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি সে অত্যন্ত অনুরক্ত ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। যে কোনো লেখাই লেখবার সময় তার অবচেতন মনে একটা কথাই ঘুরে ফিরে অনুরণিত হত, রবীন্দ্রনাথের অমুক রচনার তুলনায় ভাল হবে তো! কিংবা অন্তত তাঁর মতো যেন হয়। বন্ধুদের সে লিখেছিল, 'আমার চেয়ে ভাল নভেল কিংবা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জানে সত্য বলে মনে হবে সেই দিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো।'

শরতের মনের এই বিচিত্র মনোভাব তাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিত।

বর্মার অফিসে কাজকরাকালীনই 'শ্রীকান্ত' লেখা আরম্ভ করে; 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে তা বের হচ্ছিল। তার প্রথম লেখার সঙ্গে যেমন যোগেন্দ্রনাথ সরকারের নাম জড়িয়ে আছে তেমনই 'শ্রীকান্তের' সঙ্গে কুমুদিনীকান্ত করের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। অনেকের বিশ্বাস 'শ্রীকান্তের' শ্রীকান্ত স্বয়ং শরৎ আর রাজলক্ষ্মী তার প্রেয়সী। এই রাজলক্ষ্মীর খোঁজ করার জন্য না জানি কত লোকই ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু কেউই তার খোঁজ পায় নি। কি করেই বা পাবে? রাজলক্ষ্মী লেখকের কল্পনার অতৃপ্ত কামনার সঙ্গী। ছেলেবেলার খেলার সাথী ধীরুকে নিয়ে সে 'দেবদাসে'র পারু ও 'শ্রীকান্তের' রাজলক্ষ্মীকে গড়েছিল। শোনা যায়, ধীরুর আসল নাম নাকি রাজলক্ষ্মী ছিল। যৌবনে একবার যে প্রেম ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, সেও তো রাজলক্ষ্মী হতে পারে? এবং মজঃফরপুরের রাজবালাই বা রাজলক্ষ্মী নয় কেন?

অনেকে অনেক রকম কথা বলেছেন, শরতের মুখ দিয়েও তাঁরা অনেক কথা বলিয়েছেন। অনেকে আবার হিরণ্ময়ী দেবীকেই রাজলক্ষ্মী মনে করেন। ভালোবেসে হয়তো কখনও তাঁকে সে লক্ষ্মী বলে ডেকে থাকবে, ব্যস্ অমনি তাঁকে রাজলক্ষ্মী ভেবে নেওয়া হল? এক বন্ধু একবার শরৎকে বলেছিল—বিয়ে করে আপনি মহৎ প্রেমের অমর্যাদা করেছেন। যা একদিন ভাগীরথীর পুণ্য স্বচ্ছ নির্মল জল ছিল, তাতে বাঁধ বেঁধে আপনি পুকুর ও গর্তে পরিণত করেছেন।

একটু চুপ থেকে শরৎ শুধু এটুকুই বলেছিল, 'এ ছাড়া আর তো কোনো পথ ছিল না। কিন্তু তাকে আমি ছাড়ি নি।'

এ সব কথাগুলিকে কি সত্য বলে মনে করা যেতে পারে? আদৌ নয়।

১ 'সাহিত্য আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধ থেকে।

এ যদি সত্যি হয় তাহলে একটি চিঠিতে শরৎ একথা কেমন করে লিখত,[১] 'রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাবে? ও সব বানানো মিছে গল্প। "শ্রীকান্ত" একটা উপন্যাস বই তো নয়। ও মিছে জনরবে কান দিতে নেই।'

কিন্তু অনুসন্ধানকারীরা এ নিষেধ শুনে তা বলে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তারা হিরণ্ময়ী দেবীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই কি রাজলক্ষ্মী?'

এ প্রশ্ন শুনে হিরণ্ময়ী দেবী এত দুঃখ পেয়েছিলেন যে, লোকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাই ছেড়ে দিলেন। সে বেচারী রাজলক্ষ্মীর মতো সুন্দরও ছিল না, ঐশ্বর্যময়ীও নয়। নাচ গান তো দূরের কথা, কথাবার্তাতেও তেমন দক্ষ ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত সাধারণ সরল অশিক্ষিতা, কিন্তু ধর্মশীলা পতিব্রতা সেবাপরায়ণা নারী ছিলেন। শরৎকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন ও ভালোবাসতেন। দিশাহারা নিরাশ্রিত একটা মানুষের জীবন যাতে সুখী হয় তিনি আপ্রাণ সেই চেষ্টাই করতেন। যথার্থ অর্থে তিনি সমর্পিতা নারী ছিলেন। ভাবপ্রবণ অর্পিতা তপস্যাময়ী এই নারীর জন্যই শরৎ যৌবনে মানুষের উপেক্ষা অপমানে দিশাহারা হয়েও ব্যর্থ হয়ে যান নি। শান্তি দেবী ও হিরণ্ময়ীর স্নেহছায়ায় শরৎ প্রাণবন্ত সাহিত্যের স্রষ্টা হতে পেরেছিল। সে ছিল তেজরশ্মিপুঞ্জ এবং তাতে নারীর স্পর্শ চাই-ই। তা না হলে সেই তেজে নিজেই শুধু ভস্ম হয়ে যায় না, আশেপাশের অনেক কিছুই সে নষ্ট ও দিক্‌ভ্রষ্ট করে তোলে।

যদিও শ্রীকান্ত শরতের মতোই ভবঘুরে বখাটে উচ্ছৃঙ্খল ছিল এবং উপন্যাসের অনেক ঘটনাই ছিল সত্যের উপর আধারিত। এক বন্ধুকে সে লিখেছিল, 'আমার লেখা উপন্যাস পড়বার সময় দয়া করে ঘটনা ও পরিবেশের উপর জোর দেবেন না। ঘটনাকে আমি উপন্যাসের আসল বস্তু বলে মনে করি না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হল চরিত্র সৃষ্টি করা। ঘটনা সে সঙ্গে আপনা-আপনি এসে পড়ে, চেষ্টা করার দরকার পড়ে না। আমার সৃষ্ট চরিত্রের অন্তরালে কোন কোন জায়গার ঘটনা যথার্থ, সেগুলিকে গল্পের পটভূমি হিসেবেই দেখান হয়েছে, তার বেশী নয়।'

আর একজন বন্ধুকে সে লেখে,' "শ্রীকান্তে" নিজের কথা তো কিছু আছেই। জীবনের কোন ঘটনাকে সাহিত্যের স্তরে নিয়ে আসবার সময় কখনও ভাঙগাভাঙগা ঘটনাগুলিকে যোগ করে গল্প লেখার জন্য কল্পনার সাহায্য নিতেই হয়। তুমি তো শিক্ষক। মনে কর তুমি তোমার ছাত্রকে "আপন গ্রাম" সম্বন্ধে একটা রচনা লিখতে বলেছ , সে –গ্রামে না আছে কোন নদী, না আছে মন্দির। কিন্তু সে ভালো নম্বর পেতে চায়, এবার ভাব সে কি করবে? আশে-পাশের গাঁয়ে যে সব নদী ও মন্দির সে দেখেছে সেগুলিকে সে নিজের গাঁয়ের সঙ্গে যোগ করে রচনাটি লিখবে। সাহিত্যেও সেই একই জিনিস খাটে।'

এখানে 'শ্রীকান্ত' বর্ণিত কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। ইন্দ্রনাথ একটি চরিত্র, শ্রীকান্তের ছেলেবেলার সঙ্গী। একদল বলেন, শরৎ ভাগলপুরের ছোটবেলার বন্ধু রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার অর্থাৎ রাজুকেই ইন্দ্রনাথ রূপে চিহ্নিত করেছে। রাজু ও ইন্দ্রনাথ দুজনের স্বভাব প্রায় একই রকম, সে কথা শরৎ নিজেই স্বীকার করেছে।

অন্যদল বলেন, ইন্দ্রনাথ শরতের জন্মস্থান দেবানন্দপুরের সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। গ্রামে থাকতেই দু-জনের বন্ধুত্ব হয়। বহুমত যদিও রাজেন্দ্রনাথের পক্ষেই, তবুও একথা মানতে দোষ কি যে, শরৎ 'ইন্দ্রনাথ' চরিত্র সেই দুটি বাস্তব চরিত্রকে অবলম্বন করেই গড়েছিল।

ঠিক এই রকমই অন্নদা দিদির বাস্তবিকতাকে শরৎ অস্বীকার করেনি। দেবানন্দপুরের সম্পর্কে শরতের বোন অথবা ভাগলপুরের কোনো মেয়ে, এ প্রশ্ন এখানে অসংগত। শুধু নাম

১. ১৪ অগাস্ট, ১৯১৯। লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা।

বদল করে অনেক ঘটনাই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে হুবহু একই রকম বর্ণিত হয়েছে। শরতের লেখনীর চমৎকারিত্বে তা এমনই মনোরম হয়ে উঠেছে যে, আসল সত্য খুঁজে পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। নিজের স্বভাবের ছবি আঁকা একটা দারুণ শক্ত কাজ। কোনো জিনিসকেই ভালোভাবে দেখতে হলে, ভালোভাবে বুঝতে হলে দূরত্ব ও ব্যবধানের প্রয়োজন। অত্যন্ত কাছ থেকে কোনো জিনিসই ভালোভাবে দেখা যায় না। কোনো শিল্পীর পক্ষে নিজের ছবি আঁকা যেমন ভয়ংকর শক্ত কাজ, তেমনই কোনো লেখকের পক্ষেও নিজের চরিত্র চিত্রণ করা ভারি শক্ত ব্যাপার।

'শ্রীকান্ত' চরিত্রে শরৎ নিজেকে চিত্রিত করেছে কিনা তার সোজা উত্তর দিতে হলে এটুকুই বলা যেতে পারে যে, চিনিকে সন্দেশ বলে ভ্রম করা হবে। অন্যথায় মাঝে মাঝে তার নিজস্ব চরিত্রের একটা ঝলক ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। সব লেখকই নিজের অভিজ্ঞতার জোরেই লিখে থাকেন, সে হিসেবে প্রতিটি লেখকের লেখাই তাদের স্বরচিত জীবনী বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু উপন্যাসের মাধ্যমে ছদ্মরূপে আত্মচরিত্র লেখা শরৎ ঘৃণা করত। বহু বছর পর হিন্দির বিখ্যাত লেখক ইলাচন্দ্র যোশীকে সে বলেছিল–

'যাদের জীবনকে গভীর ও ব্যাপকরূপে দেখার চোখ নেই, অহংকারে উঁচু প্রাচীরের ওপার দেখার সাহস যাদের নেই, সাহিত্য শিল্পে যারা নিরপেক্ষ ভাব বজায় রাখতে অক্ষম, তারাই জীবনের গোপন কথা উপন্যাসে লিখে জানান।'

শরৎ স্পষ্ট বলেছে, "শ্রীকান্তে" জীবনের সেই সকল ঘটনা ও দৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জড়িত। যে চরিত্র আমি সৃষ্টি করেছি তাদের অতি নিকট থেকে চেনা ও জানার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, "শ্রীকান্ত" আমার আত্মচরিত। তবুও লোকেদের ধারণা জানতে পেরে ভালোই লাগছে কারণ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমার সৃষ্ট চরিত্র পাঠকদের চোখে প্রাণবন্ত ও সজীব। আমার সাহিত্য যথার্থ জীবনের বড় কাছাকাছি।'

সুরেন্দ্র মামা লিখেছেন, 'অনেকে বলেন, শরৎচন্দ্র সাহিত্যে নিজেকে যতখানি তুলে ধরেছেন, জীবনী হিসেবে সেটুকু যথেষ্ট। আলাদা জীবন চরিতের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্র আসলে সাহিত্যে নিজেকে দারুণভাবে লুকিয়েছেন, যারা এ কথা জানে না, তাদের ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।'

অন্যান্য লেখার বেলাতে যা হয়েছে 'শ্রীকান্ত'র বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শরৎ দোনা–মোনা অবস্থায় প্রকাশককে লেখে, "শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী" যে সত্যই "ভারতবর্ষে" ছাপিবার যোগ্য, আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল সে সকল যে, কোনমতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত' জানা কথা। তবে অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতে পারে, এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফতে পাঠানো।

'যদি বলেন ত আরো লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রুপ ঐ পর্যন্তই।[১] তবে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে। আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়।.... অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তাছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে।'[২]

এর কিছুদিন পর লেখে, 'এ সম্বন্ধে একটা কথা যদি নির্ভয় দেন ত বলি। এই কাহিনীটাকে সম্পাদক মহাশয়রা দয়া করিয়া যেন নেহাৎ তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য না করেন। আমার বড় আশা আছে — ইহা অন্ততঃ যে সকল ছাপা হয় এবং হইয়াছে,তাহাদের নিতান্ত নীচের আসনের যোগ্যও নয়। অনেক সামাজিক ইতিহাস ইহার ভবিষ্যৎ জঠরে প্রচ্ছন্ন আছে। আমার অনেক

১ পুস্তকে এ অংশটুকু প্রকাশিত হয়নি।
২. ১৫ নভেম্বর, ১৯১৫ সালে লেখা।

চেষ্টা ও যত্নের জিনিস, অন্ততঃ বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও একটু খাতির পাইবার মত হইবেই। প্রথমটা অবশ্য খুবই খারাপ—তা অনেক সত্যকার ভাল জিনিসেরও প্রথমটা মন্দ—এমন দেখাও যায় তো। এই আমার কৈফিয়ৎ। এবার ছাপা হবে কি? হাতের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখার আশাতেই ওটা দেওয়া, সে তো ভূমিকাতেই লেখা আছে।'[১]

এ চিঠিগুলিতে শরৎ এ ইঙ্গিত দিয়েছে যে, গল্পের সঙ্গে শ্রীকান্তের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আসলে শরতের নিজের জীবন যে-রকম বৈচিত্র্য ও রোমাঞ্চে ভরা, তাই 'শ্রীকান্ত' পড়ে ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শ্রীকান্ত শরৎ নয়, কিন্তু তবু দু-জনের স্বভাবের কী দারুণ মিল! সহজভাবে দেখতে হলে 'শ্রীকান্ত'কে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হিসেবে দেখা যেতে পারে।

একবার শরৎ বলেছিল, 'লোকে আমার লেখায় আমায় খুঁজতে চায়। কেউ বলে আমি গোঁড়া হিন্দু, কেউ বলে দারুণ নাস্তিক, কেউ বা আবার বলে "চরিত্রহীন" নাকি আমারই গল্প, কেউ বিশ্বাস করে "শ্রীকান্ত" আমার আত্মচরিত। আমায় নিয়ে যখন এত জল্পনা-কল্পনা, আমি দূরে দাঁড়িয়ে হাসি।'

প্রত্যেক মহৎ প্রাণ ব্যক্তির নিয়তি হয়তো তাই। যে-গান্ধীকে লোকে সন্ত-সাধু বলে গ্রহণ করেছে, তাঁকেই কেউ কেউ দাম্ভিক-ঠগ বলে মনে করেছে। বাস্তবিকই গান্ধী একমাত্র মানুষ যে সব-কিছুই হতে পারে। সব-কিছু হওয়ার জন্য অনেক বড় হৃদয়ের দরকার, সে হৃদয় শরতের ছিল। জীবনে সে বড় দুঃখ সয়েছিল, পাপ করেছিল অনেক, কিন্তু সবার উপরে সব-কিছুকে অভিজ্ঞতার রসে সিঞ্চিত করে প্রাণবন্ত করে তোলার মতো প্রাণশক্তি শরৎ ছাড়া আর কার মধ্যে দেখা যায়?

সে শুধু ভোক্তা নয়, দ্রষ্টা। সাহিত্যের মূল লক্ষ্য সে খুঁজে পেয়েছিল। চিরাচরিত সংস্কারের বিরুদ্ধে যে মাথা তুলে দাঁড়ায়, সে নিজের অন্তরের অজ্ঞাত শক্তির বলেই। কেউ বলতে পারে না তার পরিণাম কী দাঁড়াবে। স্বাধীনতা, শক্তিশালীর জন্যই, যোগ্য লোকের পক্ষেই তা লাভপ্রদ। শরতের মধ্যে সেই অসীম ক্ষমতা ছিল, তাই সে স্রষ্টা হতে পেরেছিল।

১৮

এখনও পর্যন্ত সে রেঙ্গুনের চাকরি ছাড়েনি। কিন্তু মন কিছুতেই টিকছিল না, অফিসের বাঁধাধরা নিয়মের গণ্ডিতে তার স্বাধীন মনোবৃত্তি হাঁপিয়ে ওঠে। কলকাতা থেকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়ে তাকে চিঠি লেখেন, ভরসা দেন যে মাসিক একশো টাকার ব্যবস্থা তার জন্য তিনি করতে পারবেন। নানান রকম ঝামেলা ও অস্থিরতার মধ্যে তার ভগ্ন স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়ল। শারীরিক অক্ষমতা যখন মনের দোসর পায়, তার ভালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আকাশ-কুসুম হয়ে ওঠে। বন্ধুদের সে বারবার লিখেছিল, 'আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি। .... ভয় হয়, হয়ত বা চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব।· এই মানসিক চঞ্চলতাবশতঃ কিছুই কাজ করিতে ইচ্ছা নাই। .... আমার কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সম্ভব হইতে পারিবে তাহাও মনে করি নাই।'

তারপর লেখে, 'এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন তাই ভাল। মাঝে মাঝে মনে করি, বোধ করি আমার চলিয়া বেড়ানো শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি পা দুটো বন্ধ করিয়া এবার শুধু হাত দিয়া কাজ করিতেই বলেন।'

শরতের পা ফোলার রোগ কিছুতেই আর সারছিল না। ডাক্তারের মত, বর্মা ছাড়লে হয়ত এ

---
১ ৭ ডিসেম্বর, ১৯১৫ সালে লেখা।

রোগ সেরে যেতেও পারে।

প্রচন্ড আফিং খাওয়া শরৎ কমায়নি, এও স্বাস্থ্য খারাপের একটা কারণ। কারুর পরামর্শে একবার সে আফিং খাওয়া ছাড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে শরীর আরও খারাপ হয়ে যায়, আফিং খেয়েই সে যাত্রা সে রক্ষা পেয়েছিল। আফিং-এ অভ্যস্ত মানুষ হঠাৎ নেশা ছাড়লে উল্টো বিপত্তি ঘটে, এ ঘটনার উল্লেখ করে একটি পত্রে[১] সে লেখে, 'আফিং ছাড়িবার চেষ্টা করিয়াই এত দুঃখ বোধ করি পাইলাম। আর ছাড়িবার নামটিও কখনো মুখে আনিব না, বেশ করিয়া পুনরায় ধরিয়া তবে পা ভাল হইল। এইবার আর একটু ভাল করিয়া ধরিলে হাতটাও ভাল হইবে আশা হয়। আফিং কম করিয়া মাথাটা একেবারে খালি হইবার মত হইয়াছিল। আবার ধীরে ধীরে বেশ ভরিয়া আসিতেছে। কি জিনিস! আপনাদেরও ধরা বোধ হয় ভাল। আমি ত মনে করি সমস্ত ভদ্রলোকেরই এটা সেবন করা কর্তব্য।'

কিন্তু আফিং-এর কথা থাক, তামাশা করা শরতের স্বভাব। সে যাই হোক বর্মা ছাড়ার সংকল্প মনে মনে সে নিশ্চিত করে ফেলে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখে,[২] 'আপনি আমাকে যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন, সেই আমার যথেষ্ট। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি মরিয়া না যাই তাহা হইলে হয়ত বা টাকাকড়ির দেনাটা শোধ হইতেও পাবে—অবশ্য কৃতজ্ঞতার দেনা ত শোধ হইবার নয়। আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। এই হতভাগা স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া—আপনার আমার জন্য এই সমস্ত অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতির যদি কতকটা কমাইয়া আনিতে পারি—এই একটা বৎসর সেই চেষ্টাই করিব।'

কখনও কখনও শরতের অভিমানী মন বেদনা ও করুণায় অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠত। পঙ্গু হওয়া ও টাকা পাঠাবার কথা সে বারবার লেখে। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত টাকা পাঠিয়ে দেন। শরৎ তাঁকে খবর দেয় এগারোই এপ্রিল সে রওনা হচ্ছে। মন এত বিষণ্ণ যে কোনো কাজেই হাত দিতে ইচ্ছা হয় না। দিলেও তা ভালো হয় না। ভাবে, কলকাতা যাবার পরই আবার লিখবে।

এই সময়েই রেঙ্গুনে এমন একটা কান্ড ঘটে যে, শরতের সে স্থান ত্যাগ করা ছাড়া আর পথ ছিল না। অফিসের কাজে কোনো কালেই তার মন লাগত না, কাজ জমে থাকত, নালিশ বড় সাহেবের কানে উঠত। কয়েকবার তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। একদিন অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট বার্নাড-এর সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া বেধে যায়, তিনি কোনো ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, শরৎ জানায়—সে সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। তার কাছে কোনো ফাইল নেই।

কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা যায় তার দেরাজের মধ্যেই ফাইল রাখা রয়েছে। বার্নাড দারুণ রেগে যান। সবই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়েছিল, দ্বন্দ্ব হয় আর কি! শরৎ যেমন রোগা পাতলা, অপরদিকে বার্নাডের তেমনই সুস্থ সবল শক্তিমান চেহারা। হাতাহাতি মারামারিতে শরৎ বেশি চোট পেয়েছিল। কাপড়-চোপড় রক্তে ভেসে যায়। রিপোর্ট বড় সাহেবের কানে যেতে তিনি ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, দোষ বার্নাডেরই বেশি। তৎক্ষণাৎ বার্নাডকে বরখাস্ত করা হয়। পরে শোনা যায়, নব্বুই টাকা জরিমানাও করা হয় তাকে, এবং সে টাকা যেন শরৎকে দেওয়া হয়, এ নির্দেশও জারী হয়।

এ কথাও শোনা যায় যে, এ রিপোর্ট যখন অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেলের কাছে যায়, তিনি শরৎকে বলেছিলেন, 'তুমি বার্নাডের বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছ, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে স্টেপ নেব। কিন্তু মনুষ্যত্বের স্তর থেকে তুমি নেমে গিয়েছ। আঘাতের পরিবর্তে যদি তুমিও আঘাত করতে এবং তারপর আমার কাছে আসতে তাহলে বুঝতাম।'

১ ৫ অক্টোবর, ১৯১৫
২ ১৫ জানুয়ারি, ১৯১৬

এ সব কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু ঘটনাটি সত্যি।

সে যাই হোক, রেঙ্গুন পরিত্যাগের কল্পনা তার সুনিশ্চিত ছিলই। বন্ধুরাও বলত, 'তুমি এত ভালো গল্প লেখ, তোমার এত নাম, কেন অনর্থক অফিসে পড়ে রয়েছ? চাকরি ছেড়ে লেখায় মন দাও, তোমার পক্ষে সেই ভালো।'

সাহিত্যে মজা ছিল, অর্থও ছিল। শরৎ পরিশ্রমী কোনোদিনই ছিল না। অফিসের কাজে গাফিলতি হওয়া এ ক্ষেত্রে অনিবার্য, শরৎ সে-সব কথা ভেবে চাকরিতে পদত্যাগ পত্র দেয়। এক বছরের ছুটি বাকি ছিল, তা নিয়ে কলকাতার পথে রওনা হয়ে পড়ল। বর্মা আর সে ফিরে যায়নি, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা কেমন করে এ কথা ভুলে যাবেন যে, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পুনর্জন্ম বর্মাতেই হয়েছিল? 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'ছবি', 'পথের দাবী' এই বইগুলিতে তার বর্মা প্রবাসের ছাপ রয়েছে। বর্মা প্রবাসে সে বহু উচ্চস্তরের ধীমান লোকের সংস্পর্শে এসেছিল, কিন্তু তার বেশির ভাগ বন্ধু-বান্ধব অনুল্লেখ্য অত্যন্ত সাধারণ অজানা-অচেনা মানুষ ছিল। তাদের প্রেরণাতেইএই দরিদ্র অর্ধ-শিক্ষিত ভবঘুরে তরুণ সাহিত্যের সেই স্থানটিতে প্রবেশ করতে পেরেছিল, যেখানে বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব দুহাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য অপেক্ষা করে ছিল।

বর্মা ছাড়ার চার মাসের ভিতর তার লেখা আরও তিনখানি বই প্রকাশিত হয়। 'মেজদিদি'[১], 'পল্লীসমাজ'[২], ও 'চন্দ্রনাথ'।[৩]

দিশাহারা মানুষের দিশান্বেষণের পালা শেষ হল, দিক্ সে খুঁজে পেল।

১ ডিসেম্বর, ১৯১৫
২ ১৫ জানুয়ারি, ১৯১৬
৩. ১২ মার্চ, ১৯১৬

তৃতীয় পর্ব

দিশান্ত

প্রথম যেবার শরৎ কলকাতা ছেড়ে রেঙ্গুনের পথে পাড়ি দিল, সে ছিল এক উপেক্ষিত অসহায় শরৎ। কিন্তু তেরো বছর পর যখন আবার সে কলকাতায় ফিরে এল, তখন সে খ্যাতনামা অদ্বিতীয় কথাশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তখন আর শরৎ 'সে' নয়, 'তিনি'।

বাংলার প্রতিটি মানুষ সেদিন যেভাবে, যতখানি আগ্রহ সহকারে শরৎকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, যে-কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে তা অনিবার্য ভাবেই ঈর্ষার কারণ হতে পারত। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্র দিলীপকুমার রায়ের, (যিনি সংগীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিমান) শরতের প্রতি অনুরাগ পিতার চেয়েও অনেক বেশি ছিল। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি লেখার জন্য শরতের কপালে যে অখ্যাতি জুটেছিল, সেই অখ্যাতির দৌলতে তিনি দিলীপকুমার রায়ের চোখে অতিমাত্রায় হিরো হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রায়ই মনে হত শরৎ কলকাতায় কেন ফিরে আসছে না? কী করতে এমন বিভূঁয়ে পড়ে আছে, যেখানে লোকেরা নাপ্পি খায়? তাই কলকাতায় শরতের ফিরে আসার খবরে দিলীপ কুমারের আনন্দের সীমা ছিল না। রাতে ভালো ভাবে ঘুমুতে পারতেন না, ভাবতেন, সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে কখন আসবেন অপরূপ সেই গল্পের রাজা!

শরতের সঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় গুরুদাস লাইব্রেরির ওপর তলার ছোট্ট একটি ঘরে। চারিদিকে এলোমেলো ভাবে বইপত্র ছড়ানো, তারই মধ্যিখানে শরৎচন্দ্র বসে ছিলেন। শ্যামবর্ণ, ছাগল দাড়ি, এক অতি শীর্ণকায় পুরুষ, শুধু চোখ দুটি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ, নাকও তেমনি লম্বা, কিন্তু শরীরে তেমন তেজস্বিতা কোথায়, নিতান্ত গদ্যময় এ কেমন চেহারা....!

দিলীপকুমার রায়ের মনের আনন্দ এক নিমেষে নিভে যায়, তবুও পায়ের ধুলো নিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'আপনি....!'

শরৎ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ! আমিই শরৎচন্দ্র! আমায় দেখে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে, তাই না? ভেবেছিলে না-জানি কেমন রাজপুত্রের মতো চেহারা, এ কথাই ভেবেছিলে তো?' দিলীপ সত্যিই সেদিন ভারি লজ্জা পেয়েছিলেন। বললেন, 'না, না, তা নয়, তবুও....'

কিন্তু ভালোবাসার গভীরতা তো রূপের কাঙাল নয়। শরতের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা সহজেই অপরকে কাছে টানত। আর সত্যি বলতে কি দিলীপ ছিলেন শরৎ-সাহিত্যের উপাসক। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শরতের আন্তরিক সরলতা নিষ্কলুষ স্নেহ ও সাদাসিধে স্বভাবের জন্য দিলীপ তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়েন। এই শ্রদ্ধার আর-একটা কারণ ছিল শরতের মিষ্টি গলা। যদিও দিলীপকুমার রায় নিজেও একজন সংগীতজ্ঞ এবং তাঁর পিতা শুধু কীর্তন গানই নয়, হিন্দুস্থানী রাগসংগীতেও সমানভাবেই দক্ষ ছিলেন। বাবার এই গানখানি যখন দিলীপ গাইতেন, 'ও যে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়' শরৎ বারবার শুনেও তৃপ্তি পেতেন না। বলতেন, 'গাও তো মন্টু, আর একবার ওই লাইনটা....''সে যে দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে দেখে যা রে

তোরা দেখে যা "। গান শুনে বলতেন 'তোমার বাবা শুধু কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ভক্ত। তাই না এমন গান লিখতে পেরেছেন।' তাঁর আর একটি প্রিয় কীর্তন ছিল চন্দ্রগুপ্ত নাটকের সেই গানটা–

'আর কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা,
মিছে কেন তাব ভাবনা।
সে যে সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ,
আমি তো তাহাবে পাব না।'

কলকাতায় ফিরে এসে শরৎবাবু সর্বপ্রথম ছ নম্বব শিবপুর ফার্স্ট বাই লেন (নীল কুন্ডু লেন) এ কিছুদিন ছিলেন, পরে শিবপুরে চার নম্বর ফার্স্ট বাই লেনে, স্থায়িভাবেই থাকতেন। বাড়িটা খুবই ছোট ছিল এবং পয়সাকড়িও হাতে তেমন থাকত না। তবুও সেই ছোট্ট অপরিসর জায়গাটুকুতেও তাঁর শৌখিনতাব শেষ ছিল না। বৈঠকখানায় মাঝারি ধরনের একটা টেবিল ও টেবিলের তিন দিকে তিনটে চেয়ার, একপাশে একটা বেঞ্চি। টেবিলের উপর সুন্দর বাঁধানো দুটি খাতা, সুন্দর একটা কলমদানি, লাল ও কালো কালির দোয়াত, চাব-চারটে কলম, দুটো দামী ফাউন্‌টেন পেন আব বিজ্ঞান বিষয়ক এবং অথনীতির কয়েকটি বই সুন্দরভাবে সাজানো থাকত।

পাশেই একটা বড় হুঁকো। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে হুঁকোটি ধরাবার জন্য চাকরকে হাঁক দিতে তিনি ভুলতেন না।

বমামুলুকে যাবার সময়ে যে ছোট-ছোট ভাইবোনগুলিকে তিনি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বন্ধুদের কাছে অনাথের মতো ফেলে চলে গিয়েছিলেন, কলকাতায় ফিরে এসে আবার তাদের নিজের কাছে টেনে নিলেন। ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র সে সময় অগ্রদ্বীপে থাকতেন, তাঁকেও নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন। মেজভাই প্রভাসচন্দ্র চাকরি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন এবং বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পরিচালনা করছিলেন। যখনই তিনি কলকাতায় আসতেন পূর্বাশ্রমের এই ভায়ের কাছেই এসে উঠতেন। শরতেব বড় বোন অনিলা দেবী পাশের গাঁ সামতাবেড়েতে থাকতেন। স্বামী ও ভাসুরপো, দেওরপোদের নিয়ে তিনি ভায়ের কাছে আসতেন। এই বোনেব পরিবারবগেব সাহায্যেই তাঁরও থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি হয়েছিল। সবার চেয়ে ছোট বোন সুশীলাকে শরৎ বাড়িউলির কাছেই রেখে গিয়েছিলেন। ছোটমামা বিপ্রদাসের চোখে এটা ভালো ঠেকেনি। তিনি সুশীলাকে নিজের কাছে এনে রাখেন, এবং যথাসময়ে তার বিয়েও তিনি দেন। এই বিয়েটি আসানসোলের এক কয়লা ব্যবসায়ীর ঘরে হয়। শরৎচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলে প্রকাশচন্দ্র দেখা করতে যান কিন্তু কোনো কারণে সুশীলার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়, সুশীলা দুঃখে অভিমানে কিছু কটূক্তি করেও থাকতে পারে। প্রকাশচন্দ্র বাধ্য হয়েই ফিরে আসেন। কারণ যাই হোক, সুশীলা তাঁর কাছে কোন কালেই যায়নি।

এই একটি অপবাদ ছাড়া শরৎচন্দ্র নিজের বিশৃঙ্খল পরিবার বা সংসারটিকে আবার গুছিয়ে তুলেছিলেন। এর কিছুদিন পরেই তাঁর ভাগ্নীর বিয়ে হয়। বিয়েতে অনেক কিছুই দেবার নিয়ম কিন্তু সে সময় তাঁর হাতে একেবারেই টাকাপয়সা ছিল না। একজন প্রকাশককে লিখলেন,

' আমার ভাগ্নীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার। আমারই সমস্ত দায়। এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি "একঘরে", আমার কাজকর্মের বাড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। যাক, সেজন্যও ভাবিনা কিন্তু টাকা দেওয়া চাই, অথচ আমি না যাই, এই তাঁদের গোপন ইচ্ছা। আমার চারশ টাকার অকুলান। এটা আমার চাই।'[১]

১ ২৯ জুন, ১৯১৬

নিজের দিদিকে যে শরৎচন্দ্র কতখানি ভালোবাসতেন এই চিঠিতে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। জাতিচ্যুত হওয়ার দরুন তিনি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে মিলিত হতে পারতেন না। (আর সারা জীবনটাই তিনি জাতি-বহির্ভূত হয়েই কাটিয়ে দিলেন।) তিনি ইচ্ছা করলে ভাগ্নীর বিয়ের তত্ত্বের খরচ অনায়াসেই এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু মনে হয়, তাঁর মনের যাযাবর বৃত্তি বা উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিত্ব যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি এই সব থেকে মুক্তি চাইছিলেন এবং তাঁর মন সংসারের সকলের মধ্যে একজন হয়ে থাকতে চাইছিল। বোধহয় সেইজন্যই এত বড় অপমান সহ্য করেও ভাগ্নীর বিয়েতে টাকা পাঠাতে তিনি ভোলেননি। অপরদিকে, সমাজ তাঁকে নিজের দলে টেনে নিক এ চেষ্টা তিনি কখনও করেননি। যারা চাইত যে, শরতের উপর থেকে একঘরে করে রাখার শাস্তি উঠিয়ে নেওয়া হোক, তাদেরও তিনি কোনোদিন উৎসাহ দেননি। নানান ধরনের লোকেরা নানান প্রস্তাব নিয়ে আসত, কেউ ইংরেজি স্কুল খোলার জন্য পাঁচশো টাকা দিতে বলত, আবার কেউ বলত যে, পুকুরের চারটি ঘাট যদি বাঁধিয়ে দাও তাহলে তোমায় আবার জাতিতে সম্মিলিত করা হবে। কোনো শর্তই তিনি শেষ পর্যন্ত মেনে নেননি। তাঁর অহংকারী মন এইরকম ঘুষ দেওয়ার পক্ষে একেবারেই বিরূপ ছিল।

আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আশেপাশের লোকজনের সঙ্গেও তিনি আলাপ-পরিচয় করতেন। একবার কী একটা জিনিস কেনবার সময় বণিক শরৎ শেঠের সঙ্গে তাঁর ভাব হয়ে যায়। শরৎ শেঠের সঙ্গে তিনি প্রায়ই তাস খেলতেন, শেঠজীকে তিনি উঠতেই দিতেন না। দুজনেই খেলতে খেলতে তামাক খেতেন আর তিন প্রহর রাত অবধি বসে বসে তাস খেলতেন। শেঠজীকে বলতেন, 'নতুন এসেছি, কারুর সঙ্গে পরিচয় নেই, কোথায়ই বা বসব বল? তোমার এই দোকানই ভাল।'

পরিচয়ের এই পরিধি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, লোকেরা শরতের বাড়িতে আসা যাওয়া আরম্ভ করে। তাদের মধ্যে ক'জন তো বেশির ভাগ সময়ই তাঁর বাড়িতেই পড়ে থাকত। বেঞ্চির উপর আধশোওয়া হয়ে তামাক খেতে খেতে তাদের তিনি গল্প শোনাতেন। একতারা বাজিয়ে যে বৈষ্ণব ভিখারীরা গান গেয়ে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াত, তাদের শরৎ সম্মানের চোখে দেখতেন। বৈষ্ণব সংগীত শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে পড়তেন। বৈষ্ণব ভিখারী ছাড়া অন্য ভিখারীদের তিনি দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। গুলি বা ডাংগুলি খেলার বয়স তো কবেই পেরিয়ে এসেছিলেন কিন্তু সক্রিয় দর্শকের ভূমিকা তিনি কখনই ছাড়েননি।

এই সময়েই মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার সরকারের সঙ্গে শরতের পরিচয় হয়। খুব অল্পদিনের মধ্যেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। মনোরঞ্জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন, 'অরক্ষণীয়া'র ভূমিকাটি তিনিই লিখেছিলেন। ইতিহাসের অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকার প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ডায়ারি লিখতেন। এই ডায়ারিতে শরতের সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছুই লিখেছিলেন। 'শেষপ্রশ্ন' লেখার সময় আদর্শবাদী অধ্যাপক অক্ষয়বাবুর চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে এই আদর্শবাদী বন্ধুটিকে নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্র স্মরণে রেখেছিলেন।

অস্থির স্বভাবের জন্য বেশিক্ষণ একভাবে শরৎ লিখতে পারতেন না। তাঁর লেখার অনুরাগী প্রকাশক ও পাঠকের তো শেষ ছিল না, কিন্তু সবার আবদার মেনে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাঁরা তাঁকে বিশেষভাবে জানতো এবং তাঁর লেখার পরম ভক্ত, তাঁরাই শুধু জোর করে লেখা আদায় করে নিতেন। এদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন-'ভারতবর্ষে'র খ্যাতিমান সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন। 'বৈকুণ্ঠের উইল',[১] 'অরক্ষণীয়া',[২] 'শ্রীকান্ত', 'নিস্কৃতি', এবং 'সমাজ ধর্মের মূল্য' ইত্যাদি অনেকগুলি রচনা তিনি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করেন। 'নিস্কৃতি'র অংশবিশেষ 'ঘরভাঙা' নামে 'যমুনা' পত্রিকাটিতেও ছাপা হয়েছিল।

১. পুস্তকরূপে প্রকাশিত-৫জুন, ১৯১৬
২. ২০ নভেম্বর, ১৯১৬

'অরক্ষণীয়া' একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী। শরৎচন্দ্র প্রথমে গল্প নায়িকার আত্মহত্যায় শেষ করেছিলেন। অত্যন্ত কুৎসিত নায়িকার মর্মান্তিক ব্যথা ও গ্লানি থেকে শুধু জলে ডুবে আত্মহত্যা করেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব, লেখক হয়তো এটাই উচিত মনে করেছিলেন। মনে হয়, গল্পের এই রকম পরিণতি পাঠকদের মন নিতে চায়নি, পরে লেখকের নিজেরও ভালো লাগেনি। বিশেষ করে প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের তো মোটেই ভালো লাগেনি। তাই পুস্তকাকারে যখন 'অরক্ষণীয়া' বইটি প্রকাশিত হয়, তখন দেখা যায় 'অরক্ষণীয়া' আর সেদিন অরক্ষণীয়া ছিল না, সে এক 'রক্ষক' পেয়েছিল। এ সেই অতুল, যাকে কুরূপা কল্যাণময়ী জ্ঞানদা অন্তর দিয়ে চেয়েছিল। গল্পের এই পরিবর্তনের কৈফিয়ৎ হিসেবে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'মেয়েদের এই রোগ (আত্মহত্যা) আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।' কিন্তু লেখক এবারও স্পষ্ট করে বলেননি যে অতুল জ্ঞানদাকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছে কি না? পাঠকের মনে বারবার এ প্রশ্ন উঠেছে, 'শেষ পর্যন্ত তাদের কী হল। অতুল কি জ্ঞানদাকে বিয়ে করেছিল?'

একদিন এই কথা নিয়ে দুটি দলে বাজি ধরা হল। শরৎচন্দ্রের কানে কথাটি পৌঁছল। তিনি নিজেও মুশকিলে পড়লেন। হরিদাসকে বললেন, 'তোমার জন্যই এটা হল। নইলে জ্ঞানদা তো জলে ডুবে মরেই গিয়েছিল। আর তা ভালোই হয়েছিল, বেচারী অতুল তো কালো মেয়ের হাত থেকে বেঁচে যেত। লেখক-প্রকাশকও বাঁচতে পারত, এখন আর কি জবাব দিই বলো? রোজ এমন সব চিঠি আসে বলার নয়। এক কাজ করো, পত্রিকায় লিখে দাও, তারপর আর শরৎবাবুর তাদের দু-জনের সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি। সেইজন্য তারপর যে তাদের কি হয়েছিল সে কথা লেখক জানতে পারেননি।' যদিও অরক্ষণীয়াকে বাঁচিয়ে তুলে শরৎচন্দ্র মূলীভূত সিদ্ধান্তকে হয়তো রক্ষা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু গল্পের আর্টটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসটি দুঃখের মধ্যেই সার্থক হতে পারত। তৎকালীন সমাজ এবং সংসারের অভ্যন্তরে যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন হামেশাই চলত, তারই নিদারুণ মর্মান্তিক কাহিনী 'অরক্ষণীয়া'য় ফুটে উঠেছিল। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসমাজে বিবাহ ইত্যাদির যে বিধি-বিধান তা আজকের যুগে কতখানি ক্ষতিকর, জীবনকে তা কী ভাবে অশান্ত নিষ্ঠুর এবং অনৈতিক করে তোলে, এগুলোই তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তা ও সংযমের সঙ্গে 'অরক্ষণীয়া'য় ফোটাতে চেয়েছিলেন। রূপহীনা, পিতৃহীনা, দরিদ্র জ্ঞানদা আপন চরিত্রবলে ও অপরিসীম সহ্যশক্তির দরুন প্রত্যেকটি সহৃদয় পাঠকের মনে আলোড়ন তুলতে পেরেছিল।

আর-একটি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু উপন্যাসটি শেষ হবার আগেই তাঁর আদরের কুকুর ভেলু সেটি কুচিয়ে নষ্ট করে ফেলে। একদিন লিখতে লিখতে কোথাও কোনো জরুরী কাজে তাঁকে যেতে হয়েছিল, তাড়াতাড়িতে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে দেখেন উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি টুকরো-টুকরো হয়ে সারা ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে। দুঃখে চোখে জল এসে গিয়েছিল, তাঁর মতে এটিই তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টি হত। ছ-মাস ধরে নিরলস পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে উপন্যাসটি লিখেছিলেন। উপন্যাসটির নাম রেখেছিলেন 'মালিনী'। দ্বিতীয়বার আর এ উপন্যাসটি তাঁর লেখা হয়ে ওঠেনি।

সে সময় জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়িতে 'বিচিত্রা'র আসর বসত। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও অনেক সুপরিচিত সাহিত্যিক এবং শিল্পী সে আসরে যোগ দিতে আসতেন। মাঝে-মধ্যে শরৎচন্দ্রও এ বৈঠকে আসতেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হঠাৎ একদিন একটা রটনা ছড়িয়ে পড়ে যে, 'বিচিত্রা'র আসরে প্রতিবারই কারও কারও জুতো খোওয়া যায়। সবাই তাই বেশ সতর্ক হয়েই থাকতেন। একথা শরৎচন্দ্রও শুনেছিলেন, সেদিন আবার তিনি একেবারে নতুন জুতো পরে এসেছিলেন। তাই জুতো চুরি যাবার ভয়ে খবরের কাগজে জুতোটি মুড়ে নিয়ে আসরে গিয়ে বসেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কিন্তু কিছুই নজর এড়ায়নি। তিনি চুপিচুপি রবীন্দ্রনাথের কানে কথাটি তুলে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই রবীন্দ্রনাথ শরৎকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শরৎ, তোমার হাতে ওটা কিসের প্যাকেট?'

'আজ্ঞে, তেমন কিছুই নয়, সামান্য জিনিস।'
'তবুও শুনিই না কি জিনিস? কোন বই নাকি?'
'হ্যাঁ!'
'কোন্ বই? বোধহয় "পাদুকা-পুরাণ" তাই না?'
শরৎচন্দ্র একেবারে অবাক, এদিকে আসরে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

২

শরৎচন্দ্রের জীবনে সেটা স্বর্ণময় যুগ। সারা বাংলায় তাঁর সাহিত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষের হৃদয়-মনে ছেয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রতিটি রচনা। একের পর এক 'শ্রীকান্ত'[১] (প্রথম পর্ব) 'দেবদাস',[২] 'নিষ্কৃতি',[৩] 'চরিত্রহীন',[৪] এবং 'কাশীনাথ'[৫] পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়। 'একাদশী বৈরাগী', 'শ্রীকান্ত' (দ্বিতীয় পর্ব), 'গৃহদাহ', 'স্বামী', 'দত্তা', ও 'আমার আশায়' এই লেখাগুলি নানান পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। তাঁর প্রতিটি রচনাই পাঠকরা নিজস্ব রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়ে আনন্দ পেয়েছে, প্রশংসাও করেছে।

লেখার সময় শরৎচন্দ্র খুব চিন্তা করতেন, তাঁর পাণ্ডুলিপিই একথার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি মাঝে মাঝে নিজের লেখাই যে সংশোধন করতেন তাই নয়, অন্য ভাষাতেও কিছু-কিছু লিখে রাখতেন। 'শ্রীকান্ত'র পাণ্ডুলিপিতে দু-এক জায়গায় ফরাসী ও হিন্দিতেও লিখে রেখেছিলেন। 'দেবদাস' সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন: "দেবদাস" সৃষ্টির মূলে আমার হৃদয় কাজ করেছে, কিন্তু "শ্রীকান্ত" আমার মস্তিষ্কের সৃজন।'

যৌবনে শরতের স্বভাব স্বাধীন ও বেপরোয়া ছিল, প্রৌঢ় বয়সে তিনি কিন্তু বেশ আচার-বিচার মেনে চলতেন। বোধহয় ভেবে থাকবেন, দেবদাসের আত্মঘাতী ভাবপ্রবণতাকে ভালোবাসার মহৎ আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়তো ঠিক হয়নি, তাই নিজেরই সৃষ্টি 'দেবদাস' পরে তাঁর আর তত ভালো লাগেনি। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহই নেই যে, যখন তিনি 'দেবদাস' উপন্যাসটি লেখেন সে সময় প্রেমের অপরিসীম ব্যথায় তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন। যদিও সেই বেদনা ছিল অপরিপক্ব কিশোর হৃদয়ের ব্যথা। মনে হয় তাঁর প্রেমিকাও রক্ত-মাংসের কোনো নারী ছিল না। আর থাকলেও, তার কাছে পৌঁছনোর রাস্তা তাঁর জানা ছিল না। যৌবনে অন্য আর পাঁচ জনের মতো তিনিও হয়তো প্রেমে পড়েছিলেন, তাঁর সেই ব্যর্থ প্রেম নানা সামাজিক আঘাতের মধ্যে দিয়ে 'দেবদাসে' প্রতিফলিত হয়। এইজন্যই বোধহয় 'দেবদাস' উপন্যাসটির উচ্ছ্বাস ও তীব্র বেদনাবোধ মনকে আলোড়িত করে তোলে। বিদ্বান সুধীজনেরা এই বিরহকে সার্থকতার কষ্টিপাথরে বিচার করবার চেষ্টাও করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ গান্ধীবাদী চিন্তক জৈনেন্দ্রকুমার 'দেবদাস'কে অসীম সংযমী পুরুষ প্রমাণ করতে চেয়ে লিখেছেন, ...'মনের সেই কঠোর ব্রহ্মচর্য যা শরীরকে বিদ্রূপ করে, বিদ্রোহ করেও বিশুদ্ধ ছিল, তা কি স্বীকৃত বিরহের শক্তিটুকুকে অবলম্বন করেই রাখতে পেরেছিল? আমি বলতে চাই, বিরহের সম্পূর্ণ বেদনাকে যদি "দেবদাস" আরও গভীর ভাবে স্বীকার করে সহ্য করতে পারত তো দেবদাসের মত যোগী পুরুষ উপন্যাস বা সাহিত্যে দ্বিতীয় কারও হবার সম্ভাবনাই ছিল না। সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি বলেই কি আমরা নিজের চোখ বন্ধ করে রাখব? যে অংশে দেবদাস চরম বিয়োগ

১. ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭
২. ৩০ জুন, ১৯১৭
৩. ১ জুলাই, ১৯১৭
৪. ১১ নভেম্বর, ১৯১৭
৫. ১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ (এতে আরও ছটি গল্প ছিলঃ 'আলো ও ছায়া', 'মন্দির', 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম', 'ছেলেবেলার স্মৃতি', ও 'হরিচরণ'।)

ব্যথাকে চূড়ান্ত ভাবে মেনে নিয়েছে, সেই অংশটুকুতে বিরহ যেন ঈশ্বরের দেওয়া প্রসাদ, এখানেই দেবদাস অনেক বড়। দেবদাস পার্বতীকে কোনদিনই ভুলতে পারেনি, কিন্তু যেদিন বিবাহিতা পার্বতী রাত্রির নিবিড় একান্তে দেবদাসের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে বসে রইল, তখন যথেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল দেবদাস কী করেছিল? সে কি পার্বতীকে গ্রহণ করেছিল? না, করেনি! দেবতার মূর্তির মতোই নিজের থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সে মূর্তির ভক্তিটুকু তার চাই কিন্তু সে মূর্তি পাবার স্পর্ধা সে করেনি।'

প্রেমের এই অসাধারণ গভীরতা মনকে স্পর্শ না করে পারে না। সফলতা বা অসফলতার প্রশ্ন নয়, বোধহয় সত্যিকারের প্রেম মিলন ছাড়া কখনও কখনও বিচ্ছেদও টেনে আনে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'নিষ্কৃতি'র প্রশংসা করেছেন। কিন্তু 'চরিত্রহীন'কে কেন্দ্র করে যে ঝড় উঠেছিল তা সত্যিই অভূতপূর্ব। উপন্যাসটি 'যমুনা'য় সম্পূর্ণ প্রকাশিতও হতে পারেনি। পুস্তকরূপে প্রকাশিত হতেও যথেষ্ট সময় লাগে। কারণ শরৎচন্দ্র লেখা বড় দেরি করে পাঠাতেন। সুধীরচন্দ্র সরকার উপন্যাসটির পুরো পাণ্ডুলিপি পাওয়ার আগেই মুদ্রণ কার্য আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'চরিত্রহীন' যে দারুণ আলোড়ন তুলেছে, তা বই বিক্রির পক্ষে সহায়ক। কিন্তু মাসের পর মাস চলে যায়, শরৎচন্দ্র লেখা পাঠান না। সরকার মশাই বার বার চিঠি লেখেন—তার উত্তরে শরৎ জানান যে-

'বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না? তবে, প্রায় অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি দু-এক মাস দেরী হয় বরং সে ভাল। তবে, আর ছাপা বন্ধ হইবে না, পরের মেলেই এতটা যাইবে। হয়ত বেশী হইবে। আর একটা কথা, রি-রাইট্ করার জন্য অনেক সময় ভয় হয়, পাছে যাহা একবার পূর্বে বলিয়াছি, হয়ত আবার তাহা বলিতে পারি! যতটা ছাপা হইয়াছে, তাহার অনেক কপি আমি পাই নাই। যদি রেজিস্ট্রি করিয়া সমস্ত ছাপাটা পাঠাও বোধ করি সিকি পরিশ্রম আমার কমিয়া যায়। অত অবশ্য সবটুকু গোড়া হইতে পাঠাইয়া দিবে। তাড়াতাড়ি করি ত সবটুকু ১৫ দিনে হয়; কিন্তু সে কি ভাল? তবে আর যত বিলম্বই হোক, মাঘ মাসের শেষে বেশী ছাপা শেষ হয়ে যেতে পারবেই।'[1]

এর পর শরৎচন্দ্র আবার লিখলেন, 'মন এত বিমর্ষ যে,কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছে করে না—করিলেও তাহা ভাল হয় না। শুধু যেগুলা আগে লেখা ছিল—অর্থাৎ অর্দ্ধেক, বারো আনা, চার আনা, এমন অনেক লেখাই আছে—সেগুলাই কোন মতে জোড়া-তাড়া দিয়া দিই।"চরিত্রহীন" সম্বন্ধে ওটা করিতে চাই নাই বলিয়াই এতদিন ২ অধ্যায় করিয়া পাঠাইতে ছিলাম। এবার তুমি আমার কাছে বসিয়া না হয় সবটা ঠিক করিয়া লইও। আমি কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১১ই এপ্রিল রওনা হইব।'[2]

কিন্তু এত কথার পরও 'চরিত্রহীন' এক বছর পর প্রকাশিত হয়। বর্মা যাবার অনেক আগেই বইটি লেখা তিনি শুরু করেন, প্রায় পনেরো বছর ধরে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে বইটি লেখেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন বাড়িতে আগুন লেগে যাওয়ায় পুরো পাণ্ডুলিপিখানাই আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তার পর শুধুমাত্র স্মৃতির সাহায্যে আবার তিনি লিখতে আরম্ভ করেন এবং দ্বিতীয়বার পাঁচ-ছ বছরে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি লেখা সম্পূর্ণ হয়।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা বাংলা হৈ হৈ করে উঠল। 'উপাসনা' পত্রিকাটি তো বইটির সমালোচনা করে এমন তীব্র আঘাত করল যেন এই বইটি লিখে ধর্ম ও সমাজকে নষ্ট ও ভ্রষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। 'চরিত্রহীনে' যে নারী চরিত্রকে সৃষ্টি করা হয়েছে সমাজে এরকম স্ত্রীলোকের কোন অভাব ছিল না এবং শরৎচন্দ্র চরিত্রহীনদের চরিত্রকে রক্ষা করেছিলেন বলে সমাজের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা তাঁর বিপক্ষে মারমুখী হয়ে উঠলেন।

১. ডিসেম্বর, ১৯১৫
২. ১৪ মার্চ, ১৯১৬

একদিন বাড়ির বারান্দায় বসে তিনি ধূমপান করছিলেন, তিন-চারটি যুবক 'চরিত্রহীনে'র একখানি কপি নিয়ে এসে উপস্থিত। শরৎবাবু গড়গড়া থেকে মুখ সরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন, কি জন্য আসা হয়েছে?'

একটি যুবক অত্যন্ত রাগতভাবে বলল, 'এই "চরিত্রহীন" বইটি আপনার লেখা?'

'হ্যাঁ।'

'এই ধরনের বই লিখলে পরে আপনার এ পাড়ায় আর থাকা চলবে না, এটা ভদ্রলোকেদের পাড়া।'

দ্বিতীয় যুবকটি আরও রেগে গিয়ে বলল, 'সাবিত্রী আর কিরণময়ী ছাড়া সমাজের অন্য কোন ভাল চরিত্র চোখে পড়েনি আপনার?'

শরৎচন্দ্র মনে মনে হাসলেন। বললেন, 'একটু বসুন না!'

এবার তৃতীয় যুবকটি বলল, 'আপনার এই বইটির কি পরিণাম হওয়া উচিত আমরা শুধু সেটুকুই দেখাতে এসেছি।'

আর সত্যি সত্যিই তারা তিনজন শরৎচন্দ্রের সামনেই 'চরিত্রহীনে'র কপিটি ছিঁড়ে ফেলে পুড়িয়ে দিল। অত্যন্ত দুঃখিত মনে তিনি শুধু চেয়ে রইলেন। ক্রোধে উন্মাদ সেই যুবক তিনটিকে তিনি বোঝাবার চেষ্টাও করেছিলেন। বলেছিলেন, 'সাবিত্রী মেসের দাসী নয়। সে মেসের সব কিছুই, সবাইকেই স্নেহ দিয়ে আপন করে নিয়েছিল। সতীশও তারই হয়ে গিয়েছিল। কতবার কত রকম ভাবেই না সতীশ তাকে পেতে চেয়েছে, নিজের করতে চেয়েছে কিন্তু সাবিত্রী তাকে দূরেই সরিয়ে রেখেছে। সাবিত্রী ত সতীশকে ভালোবাসত,তবুও সতীশকে পাবার চেষ্টা সে কোনদিন করেনি,বরং সরোজিনীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে তুলেছিল।'

হঠাৎ একটি যুবক জিজ্ঞেস করল, 'কিরণময়ীর সম্বন্ধে কী বলতে চান?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'দেখ! কিরণময়ীর মাধ্যমে আমি নারী চরিত্রের ব্যর্থতা দেখাতে চেয়েছি। কিরণময়ীর আর হারানবাবুর সংসার বড়ই দুঃখের, বড়ই করুণ। স্বামীর ভালোবাসা সে পায়নি। সংসারে স্বামী, শাশুড়ী সবাই ছিলেন। দার্শনিক স্বামী, স্ত্রীকে পড়িয়ে ও দর্শন তত্ত্ব বুঝিয়েই তৃপ্ত। এদিকে শাশুড়ী অত্যন্ত স্বার্থপর, বউকে সারাদিন খাটিয়ে মারতেন। কিরণময়ী দুটি পরস্পরবিরোধী স্বভাবের স্ত্রী-পুরুষের প্রেমহীন মিলনকে হিন্দু সমাজের বিধি বা নিয়ম বলে মেনে নিতে পারেনি, আর সেখান থেকেই কিরণময়ীর দুঃখের শুরু।'

কিন্তু সেই যুবক তিনটি এ সব তত্ত্ব কথা বোঝার জন্য যায়নি। তাদের ধারণায় বইটি সমাজের চোখে বর্জনীয়। সাহিত্যিক শরৎকে বোঝার মতো মানসিকতা তাদের ছিল না, তাই তারা শুধু ঘৃণা করেই চলে গেল। তাদের চলে যাবার পর শরৎচন্দ্র পোড়া ছাইয়ের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন, মনে মনে বললেন, 'বেচারি ছেলেগুলি! ওরা বুঝলও না যে ওরা কী করে গেল। "চরিত্রহীনের" এই ভস্মই বইটিকে এমন পর্যায়ে পৌছে দেবে, যা এই ঘটনার আগে হয়তো সম্ভবপর হত না।'

অবশ্য এই ঘটনার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। যদি উক্ত ঘটনাটি সত্যি নাও হয়, তবুও সেই সাহিত্যিকের সাহসী ব্যক্তিত্বকে তো অস্বীকার করা যায় না, যার বিরুদ্ধে এমন সব রটনা শোনা যায়। সেই-সব পরিবেশের বিপক্ষেও তো মনে সন্দেহ জাগে, যে পরিবেশের মধ্যে এরূপ রটনার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি রটনাই এক মুখ থেকে দশমুখ ফেরতা হয়ে কল্পনার রঙে রসে বিচিত্র হয়ে শোনা যেত।

কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রতিটি বাড়িতে আসরে সামাজিক সভায় 'চরিত্রহীন'-কে নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়, গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়। একজন ব্যঙ্গ করে লিখেও ছিলেন যে, 'সাবিত্রীর মত মেসের ঝি থাকলে আমরা মেসেই পড়ে থাকতাম।' এর জবাবে শরৎ বলেছিলেন, 'সতীশ হওয়া চাই, নইলে সাবিত্রীর হৃদয় জয় করা যায় না।'... সেই ভদ্রলোকটি সাবিত্রীকে শুধু মাত্র দাসীজাতীয় স্ত্রীলোক যাতে না ভেবে বসেন তাই জানিয়ে ছিলেন, 'পুরাণে

প্রমাণ পাওয়া যায় প্রয়োজনে লক্ষ্মীও কোন ব্রাহ্মণের বাড়িতে দাসী হয়ে ছিলেন। যে সময় অর্জুন, উত্তরাকে নাচ-গান শেখাতেন, সে সময়ের কথা শুনলে এ কথা নিশ্চিত ভাবে নিশ্চয় বলা যেতে পারে না যে, অর্জুনের মত শিখণ্ডী পেলে সমস্ত নারীকুল নাচ-গান শেখার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠত। অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের মত বেশ্যাজাতিরও শ্রেণীভেদ আছে বৈ কি · ।'

যারা শরতের বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে 'চরিত্রহীন' লেখার জন্য প্রসন্ন ছিলেন না। কুমুদিনীকান্ত কর রাগ করে বলেন, 'আপনি এ ধরনের দৃশ্য সাহিত্যে কেন টেনে আনলেন?'

শরৎ বললেন, 'নতুন কিছু লিখিনি। এসব বহুকাল থেকেই আছে।'

—'দুনিয়ায় এ ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা বা চর্চা চলে কি? না এভাবে তাকে চিত্রিত করা হয়? এ কি মানুষের হাতে উপহার স্বরূপ তুলে দেওয়া যায়? আপনি এ সর্বনাশ কেন করলেন? ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারীরা এ বই থেকে কি শিখবে?'

এই রকম আক্রমণ ও বিরূপতার কোনো শেষ ছিল না। কিন্তু বিপক্ষ যত বড় বড় আস্ফালন ও অভিযোগ করেছে, শরৎ তার খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন, 'আমি "চরিত্রহীন" লিখেছি। চরিত্রবানের গল্প তো বলতে চাইনি।'

শরৎচন্দ্রের উপর ব্যক্তিগতভাবেও যথেষ্ট অভিযোগ-আক্রমণ করা হয়। একবার টাকা চুরির ব্যাপারে কোনো এক শরৎ চ্যাটার্জীর নাম কাগজে বেরোয়। শরতের প্রতিপক্ষের লোকেরা অমনি প্রচারে মেতে উঠলেন যে, টাকা-চোর শরৎ চ্যাটার্জী ও গল্প-লেখক শরৎ চ্যাটার্জী উভয়ে একই ব্যক্তি।

একদিকে যেমন শরতের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলছিল, অপরদিকে অনেকেই শরতের আত্মা ও মনকে বুঝতে চাইছিল। বেশ কিছুদিন পরে কোন একটি আসরে ধর্মপ্রাণ কোন ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন,[১] 'আপনি মুখে যাই কিছু বলুন না কেন, আপনার লেখা পড়লে মনে হয়, সনাতন ধর্মের মর্যাদা আপনি ক্ষুণ্ণ করতে চান না। যখন দেখি যে "চরিত্রহীন" উপন্যাসের সেই মেয়েটি স্টীমারে একটি ছেলের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটিয়েও নিজের শ্লীলতা ভঙ্গ করেনি, এর পরেও কি আমরা বলতে পারি যে আপনি ধর্ম মানেন না?'

উত্তরে শরৎ বলেন, 'আপনি আমার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারেননি। যা বললেন, তা ভেবে কিন্তু আমি কিছু লিখিনি। যদি কিরণময়ী নিজের মর্যাদা নষ্ট করত তাতেও আমার কিছু ক্ষতি ছিল না, কিন্তু গল্পের চরিত্র একেবারেই অসত্য হয়ে যেত। কারণ লেখাপড়া জানা অতি সুশিক্ষিতা কোনো নারী একটি ছেলেমানুষ ছেলের সঙ্গে শুধু জিদবশতই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ছেলেটিকে নাবালক ছেলেও বলা যেতে পারে, যাকে মেয়েটি কোনমতেই নিজের সমকক্ষ মনে করতে পারেনি। আর সেই ছেলেটিকে দিয়ে যদি সে নিজের শ্লীলতা নষ্ট করত তো তার সম্পূর্ণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বটাই নষ্ট হয়ে যেত।'

কিরণময়ীর চরিত্রের ব্যাখ্যা মানবমনের রহস্য-অভিজ্ঞ কোনো শিল্পীর ব্যাখ্যা, সমাজ-সংস্কারক বা ধর্মভীরু কোনো ব্যক্তির ব্যাখ্যা নয়। কিরণময়ীর এই রকম বিচিত্র চরিত্র-চিত্রণের জন্য প্রমথ চৌধুরী মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, 'এ ধরনের চরিত্র কোন সাধারণ লেখক সৃষ্টি করতে পারেন না।'

'চরিত্রহীন' বইটি নিয়ে লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অভিভাবকেরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের বারবার মানা করতেন যে, ওই চরিত্রহীনের লেখাগুলো পড়ো না। কিন্তু যে বই-এর উপর যত নিষেধ, সেটাই পড়বার জন্য মানুষের ঝোঁকও তেমনি প্রবল হয়ে পড়ে। একদিন পড়ার ক্লাসে একটি ছাত্রের হাতে 'চরিত্রহীন' বইখানি দেখে অধ্যাপক অত্যন্ত রেগে গিয়ে বলেন,

১ নভেম্বর, ১৯৩০ চন্দননগর।

'আহা! এটি বুঝি"চরিত্রহীন"? তোমার এটা পড়া উচিত নয়।'

ছাত্রটি বলে, 'কিন্তু স্যার ! বইটির লেখক তো খুব বিখ্যাত।'

অধ্যাপক বলেন, 'হতে পারেন! তবে এই বইটা বাজে।'

ছাত্রটি তবু অধ্যাপককে প্রশ্ন করে বলে,'স্যার, আপনি কেমন করে বলছেন যে বইটি খারাপ, আপনি কি পড়েছেন?'

অধ্যাপক বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ; পড়েছি বলেই তো বলছি। আমার ছেলে বালিশের তলায় লুকিয়ে রেখে বইটা পড়ত। কাল যখন আমি দেখতে পেলাম তো একেবারে পুরো বইটা পড়া শেষ করেই তবে উঠলাম। আমার বড় ইচ্ছে ছিল যে, দেখি বইটাতে কি আছে?'

ছাত্রটি বলল, 'তবে তো স্যার, আমিও পড়ে দেখি! যদি খারাপই হয় তাহলে আর কখনও পড়ব না।'

কিন্তু হঠাৎই একবার এমন একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে শরৎবাবুর দেখা হয়, সেই ভদ্রমহিলা 'চরিত্রহীন' পড়েই শরৎচন্দ্রকে নিজের গুরু এবং ত্রাণকর্তা বলে মনে করে। শরৎচন্দ্র সেবার কাশী গিয়েছিলেন। সেখানকার প্রবাসী বাঙালীরা তাঁর সম্মানার্থে একটি সভার আয়োজন করে। মালা, চন্দন, ধূপধুনো কিছুরই অভাব ছিল না। আন্তরিক অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। সভা শেষে ফেরার সময় অনেকে তাঁকে ঘিরে ধরেন, তাঁদের মধ্যে দু-জন মহিলাও ছিলেন। দু-জনেই বিধবা,একটি তরুণী, অপরটি বৃদ্ধা। শরৎচন্দ্রর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে একটু একা পেয়ে তরুণীটি এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন কতকালের চেনা। একটু পরে অতি মিষ্টি সুরে বলল, 'আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন, আপনি আমার গুরু, আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।'

শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তোমায় বাঁচিয়েছি? কবে? কোথায়? আমি তো এর আগে কখনও তোমায় দেখিওনি।'

মেয়েটি যেমন ফর্সা তেমনই সুন্দর মুখশ্রী। নিজের জীবনের পুরো কাহিনীটি সে শরৎচন্দ্রকে বলে। 'আমার বাবা বাংলার বাইরে কোনো কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। মা ছেলেবেলায় মারা যান, বাবাই কোলে-পিঠে করে আদরে, যত্নে মানুষ করেছিলেন। আমার বিয়ে সতেরো বছর বয়সে হয়, কিন্তু এই কাশীতেই মাত্র তিন দিনের জ্বরে আমার স্বামী মারা যান। আমি আবার বাবার কাছেই ফিরে যাই। জীবনের ব্যথা বেদনা যাতে ভুলে থাকতে পারি, সেজন্য তিনি আবার আমার পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেন। বাবারই এক ছাত্র আমাদের বাড়িতে থাকত। বাবা তাকে খুবই স্নেহ করতেন। ক্লাসে কোন্ দিন কোন্ লেকচারটি দেওয়া হবে, তার হিসেবও ছেলেটির কাছেই থাকত। যাবতীয় প্রয়োজনীয় বই এবং নোট্স খাতাপত্র ইত্যাদি সে-ই ঠিকমত সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখত। আমি তার কাছে সাহিত্য পড়তাম।

'এই রকম ভাবে দেড় বছর কাটে। খুব স্বাভাবিকভাবে মেলামেশার দরুন আমাদের মধ্যে বেশ একটা পরিবর্তন এসে পড়ে। ছেলেটি বুঝতে পেরে একদিন বাবাকে বলেওছিল, "আমি আর পড়াতে পারব না।"

'বাবা সবই বুঝতে পারলেন। আমার উপর তাঁর যথেষ্ট রাগও হয়। সেই কারণে তিনি আমায় কলকাতার বরানগরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু আমার মন সর্বক্ষণ সেখানেই পড়ে থাকত। এর কিছুদিন পর থেকেই কি জানি কেমনভাবে আমাদের দু-জনের মধ্যে চিঠি লেখালেখি শুরু হয়। তারপর একদিন সে সশরীরে কলকাতায় এসে হাজির। আমরা নিয়মিতভাবে দু-জনে দেখা-সাক্ষাৎ করতাম। শেষে আমরা মনস্থির করে ফেললাম যে, যাই হোক না কেন আমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে বিয়ে থা করে চিরদিনের জন্য মিলিত হব।

'দিন স্থির করা হল। কথা ছিল সে-রাত আমি জেগে থাকব। রাত দুটোর সময় গাড়ি নিয়ে ছেলেটি আসবে। নীচের যে ঘরটিতে আমি শুতাম, তার জানলায় যেই সে টোকা মারবে ওমনি আমিও চিরদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাব।'……

অল্পক্ষণের জন্য মেয়েটি থামল। তারপর বলল, 'সে দিনের সেই রাত আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। সমস্তক্ষণ বিচিত্র ধরনের চিন্তা ও উত্তেজনায় মনটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। সারারাত জাগার প্রশ্ন তখনও সামনে পড়ে রয়েছে। আমি আমার মামাতো ভাইকে বললাম যে, লাইব্রেরি থেকে আমায় একটা ভালো দেখে কোন উপন্যাস এনে দাও।

'ভেবেছিলাম, বই পড়াও হবে আর রাত জাগার কাজও হবে। সেইজন্য বেশ মোটা দেখে উপন্যাস আনতে বলে দিয়েছিলাম। মামাতো ভাইটি একটি বেশ মোটা উপন্যাস এনে আমার হাতে দিল, বইটির নাম "চরিত্রহীন"। নামটা পড়েই বুকটা কেমন করে উঠল, ভাবলাম, প্রকৃতির কী বিচিত্র পরিহাস! চরিত্রহীন হবার জন্যই কি আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি?

'খাওয়া-দাওয়ার পর যে-যার ঘরে শুতে চলে গেলেন, আমি বইটি হাতে নিয়ে কপাট বন্ধ করে পড়তে বসলাম। যখন পড়া শেষ হল, তখন বোধহয় রাত দুটো। কিন্তু ততক্ষণে আমি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি। "চরিত্রহীনে"র কিরণময়ী আমায় বাঁচিয়ে দিল। নির্ধারিত সময়ে জানলায় টোকা পড়ল, বুঝলাম, সে এসেছে। জানলার কাছে এসে তাকে মিনতি করে বললাম,- তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমি যেতে পারব না।

'সে সময়কার তার সেই হতাশ মুখখানি আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। মনে হচ্ছিল, তার পায়ের তলার মাটিটুকু আমি সরিয়ে নিয়েছি, এখন সে কোথায় দাঁড়ায়? কোন রকমে শুধু বলল, সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। রেলের টিকিট পর্যন্ত কাটা হয়ে গেছে।

'আমি দুটো হাত জোড় করে বললাম, আমার অন্যায় হয়েছে, তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমি যেতে পারব না।

'অসহায় বিবর্ণ অবস্থায় কিছুক্ষণ সে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর গভীর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল। তারপর তার কী হল, আমি জানি না। আমি আমার এই দিদিমার সঙ্গে কাশী চলে এসেছিলাম। এখানেও এক বছর কেটে গেল। আজ ভাবি, আপনার সেই কিরণময়ীই সেদিন আমায় রক্ষা করেছিল। আপনার "চরিত্রহীন" পড়ে আপনাকে দেখার বড় সাধ হয়, কিন্তু বাবা বিশ্বনাথ যে এত তাড়াতাড়ি আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ করবেন তা ভাবিনি। সেদিন যদি আপনার "চরিত্রহীন" না পড়তাম তাহলে আজ আমি কোথায় যেতাম? কী দশা হত আমার ভাবতেও ভয় লাগে। আপনি আমায় রক্ষা করেছেন। আপনার কাছে আমি চির-ঋণী হয়ে রইলাম।'

সত্যিই সেদিন শরৎচন্দ্র আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। বইটি লিখে পর্যন্ত কতই না গালমন্দ খেতে হয়েছে, নিন্দা, গ্লানি ও অবমাননার একটা ঝড়ই বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে। কিন্তু সেই মেয়েটির নিজের মুখে তার জীবনের গল্প শুনে তিনি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, অন্তত একটি মেয়েকেও তো তিনি পদস্খলন থেকে বাঁচাতে পেরেছেন।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি সম্পর্কে নানান স্রোতে নানান মন্দ কথা ভেসে আসত। হয়তো তার সবটুকুই সত্যি নয় তবুও এটা তো সত্যি যে, বইটির জন্য সমাজে এবং সাহিত্যে প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল। সেটাই কি কিছু কম নাকি?

'চরিত্রহীন' লেখার কল্পনা যখন শরতের মাথায় আসে, তখন তিনি দেবানন্দপুরে থাকতেন। সে সময় সুরবালা নামে একটি মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এ নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয় এবং তিনি পুরী পালিয়ে যান। পুরী যাবার পথে আর একটি মহিলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, এই মহিলাকে কেন্দ্র করেই তিনি 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রীকে গড়েন। চরিত্রটি একটি বাস্তব জীবন্ত চরিত্র। লেখকের কল্পনাশক্তির জোরে শুধু তাকে মেসের দাসী ও সতীশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

সুরবালার সম্বন্ধে শরতের মামা সুরেন্দ্রনাথ শরতের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন, 'ঐ সুরবালাই, আমার প্রবৃত্তির দিকটা জাগিয়ে দেওয়ার গুরু ছিলেন। ও চরিত্রটির বাইরের দিক আঁকতে আমার প্রায় কিছুই পরিশ্রম করতে হয়নি। সতী সাধ্বী, স্বামীর উপর যেমনি ভক্তি, তেমনি ভালবাসা তেমনি আকর্ষণ। আর শেষও হল তেমনি, চারিদিকে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল, অমন আর

হয় না। স্বামীর পায়ে মাথা রেখে সুরবালাও চলে গেল! কিন্তু কিরণময়ীকে আমি তারই, মানে-সুরবালার, শিক্ষায় যে জ্ঞান লাভ করলাম, সেই উপকরণ দিয়েই গড়ে তুলেছি। ওতে যদি কোন ভুল থেকে থাকে তো সে নিছক আমারই। সুরবালার আগাগোড়া কন্‌ট্রাস্ট্‌ করতে গিয়ে ঐ রকম করতে বাধ্য হয়েছি·· ·· মোট কথা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার যে সজাগ্রতা দেখতে পাও,-সে ঐ সুরবালার জন্যে। তাঁকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধা করে এসেছি····গুরু-দক্ষিণা আমার ঐ চরিত্র চিত্রণ।'[১]

এই সুরবালার জন্যই দেবানন্দপুরকে তিনি এত ভালোবাসতেন। 'চরিত্রহীনে' তাকে অমর করে যেন তিনি মাতৃঋণ পরিশোধ করেছেন।

শরতের মামার বাড়িতেও সুরবালা নামে কেউ একজন ছিলেন, তাঁকে মনে রেখেই চরিত্রটির নাম তিনি দেন। কিরণময়ী নামেও মামার বাড়িতে কেউ ছিলেন মনে হয়। এই উপন্যাসটি লেখার সময় এই নামগুলি থেকে তিনি কিছু প্রেরণা পেয়েছিলেন। যদিও এখনও পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যার জোরে বলা যেতে পারে যে, তাঁদের স্বভাব ওই ধরনের ছিল কিনা, তাই মনে হয় পরিচিত নামের প্রয়োগ করা হয়তো শরতের নিজস্ব একটা স্বভাব।

তবে সতীশ অবশ্যই ছেলেবেলাকার বন্ধু সেই রাজু ছাড়া আর কেউ নয়। যেখানেই গান বাজনা হয়, থিয়েটার কনসার্ট-এর রিহার্সাল ইত্যাদি হয়, ক্রিকেট ফুটবলের ম্যাচ হয়, সেখানেই সতীশ এতদিন পর্যন্ত কাটিয়ে এসেছে। কোথায় মারপিট হবে বা কার বাড়িতে শোক হয়েছে, কাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক নেই, কে বিপদে পড়েছে,তাদের জন্য পয়সার ব্যবস্থা করা বা যে ভাবে হোক কায়িক সাহায্য করাও সতীশের কাজের তালিকায় পড়ত। সতীশ যখন বাঁশি বাজাত, তখন পৃথিবীর মাটিতে ছড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্না রাতেরও ঘুম ভেঙে যেত।

এই-সব প্রমাণিত এবং অপ্রমাণিত কিংবদন্তী ইত্যাদির শুধু মাত্র একটাই অর্থ হয় যে, শরতের প্রতিটি রচনার মূল ধারা তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। কিশোর বয়সে যে সময় তিনি কলম ধরতে শিখেছিলেন, সে সময় মাস্টারমশাই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন, 'যাই লেখ না কেন, আমার আনন্দ হবে। কিন্তু তোমায় তিনটি কথা বলতে চাই, যা লিখবে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে লিখবে। দ্বিতীয়তঃ নিজের লেখা কাউকে বিশেষ দেখিও না, আর তৃতীয় হল যে, নিজে কলম দিয়ে কখনও কারও ব্যক্তিগত নিন্দা করো না।'

এ উপদেশ শরতের না পেলেও চলত, কারণ এর সব-কটি উপাদান তাঁর মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল। তবে গুরুর আদেশ পেয়ে তাঁর ধারণা বা বিচারশক্তি আরও দৃঢ় হয়। কোনো সমালোচক লিখেছেন, 'আমাদের দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখকের লেখায় এই সব সমাজ-বহির্ভূতা নারীদের জীবন বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শোনা যায়, এগুলি লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পরিচায়ক।'

এই রকম আক্রমণের দংশন যতই তীব্র হোক-না কেন, মানবীয় অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এটা একটা বিশেষ প্রমাণপত্র। 'কাশীনাথ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরৎবাবুর একটি উদাত্তরূপের গল্প যোগ হয়ে গেছে। এই বইটির স্বত্ত্বাধিকার তিনি প্রিয়বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে দিয়ে দিয়েছিলেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুন স্বাস্থ্যলাভের আশায় প্রমথনাথ ছত্রপুরে যান; প্রথম দিকে তাঁর স্বাস্থ্য একটু ভালোই যাচ্ছিল, কিন্তু পরে আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভাওয়ালী স্যানিটোরিয়ামে যেতে হয়, সেখানেও তাঁর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয়নি, বরং দিনের পর দিন আরো খারাপের দিকেই এগোচ্ছিল। আর্থিক সংগতিও তাঁর ভালো ছিল না। এই খবর পেয়ে 'কাশীনাথ' উপন্যাসটির স্বত্ত্বাধিকার তিনি বন্ধুকে দিয়ে দেন। যখন এই দানের খবর প্রমথবাবু পেলেন, তিনি হরিদাসকে লিখলেন, 'কাল সন্ধ্যায় তোমার পত্র

১. সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-'শরৎ পরিচয়', পৃঃ ৯৫

পাইয়া অবধি আমি কী পর্যন্ত যে আত্মহারা হইয়া আছি, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে।... জীবনে এরূপ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতে কখনও অভ্যস্ত নহি, আর আমাকে কিসের জন্য, কিসের যোগ্যতার জন্যই বা লোকে দিবে? এখন দেখিতেছি অযোগ্যতাও একটা বিশেষ গুণ। শরতের সব কার্যই বিচিত্র—যেদিন হইতে তাহার সহিত আলাপ হইয়াছে, সেইদিন হইতে ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তাহার কার্য তাহাকেই সাজে, তাহার তুলনা নাই। এ অপ্রত্যাশিত অনুভূত সহানুভূতি পাইবার আমি ত ভাই কোন হিসেবেই যোগ্য নই। শরতের কাণ্ড! পৃথিবীটা আমার কাছে নূতন করিয়া তুলিয়াছে। শরৎকে আর কি বলিব, সে দেবতা।... আমি আজন্ম পরিশ্রম করিয়া আমার পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের জন্য যাহা করিতে পারি নাই, আজ তোমরা তাহা করিলে।... তোমাদের কোটি কোটি নমস্কার, তোমরা এখন আমার অনেক উচ্চে, তোমরা দাতা—আমি গ্রহীতা।'

ভালোবাসার ক্ষমতা শরৎচন্দ্রের অসাধারণ ও অদ্ভুত ছিল, বন্ধুদের জন্য সর্বদাই তিনি কিছু করার জন্য আকুল হয়ে থাকতেন। কয়েক বছর আগে[১] ছেলেবেলাকার বন্ধু বিভূতিভূষণকে সোনার কলম পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে বিভূতি লিখেছিল, 'সোনার কলম দিয়ে কেমন করে লিখব?'

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,'তোকে এটা দিয়েই লিখতে হবে।'

বিভূতি জবাবে আবার লেখে, 'এ তো গয়না, এ দিয়ে কিছুতেই লিখতে পারব না, যেমন দিয়ে তুমি লেখ, সেই রকমই একটা পাঠিয়ে দাও।' শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে সেই রকম একটি কলম আবার পাঠিয়ে দিলেন, আর শুধু বিভূতির জন্যই নয়, সুরেন্দ্র মামা, গিরীন্দ্র মামা, যোগেশ মজুমদার, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ছেলেবেলার সব বন্ধুদের জন্যই তিনি কলম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন দিতে হলে এর থেকে ভালো জিনিস আর দেওয়ার মতো কিছুই নেই তাঁর।

৩

'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হওয়ার পরের বছরেই শরৎচন্দ্রের আরো তিনটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস পাঠকদের হাতে পৌঁছে যায়। 'স্বামী' (গল্প সংগ্রহ—'একাদশী বৈরাগী'র সহিত)[২] আর 'দত্তা'।[৩] এ ছাড়া 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্ব।[৪] শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি শুধু পাঠকের মনকেই আলোড়িত করেনি। এই লেখার জন্যই সে সময়কার খ্যাতনামা মনীষী ও বিদ্বানদের সংস্পর্শেও তিনি আসেন। কোনো বড় মানুষের কাছে যেতে হলেই তিনি সর্বদাই মুশকিলে পড়তেন, ইতস্ততঃ করতেন। বলতেন, 'কী একটা আমার স্বভাব, বড়লোকের বাড়ি যাব মনে হলেই কেমন সমস্ত মনটা দ্বিধায় সংকোচে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, তাই যাই-যাই করে যাওয়া হয় না।'[৫]

তবুও সম্পর্ক সবার সঙ্গে বেড়েই চলেছিল। একদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ন্যায় সাহিত্যিক সুধীজনেরা, অপরদিকে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অমল হোম ও দিলীপকুমার রায়ের মতো বন্ধুর দল। আধুনিক দলের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ও মাঝে

১. ১৯১৩
২ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
৩ ১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮
৪ ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮
৫ ১ অক্টোবর, ১৯১৬ প্রমথ চৌধুরীর নামে।

মাঝে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদি করতেন। সাহিত্যক্ষেত্র ছাড়াও তাঁর সম্পর্ক বহু-বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে বর্মায় তাঁর প্রিয়বন্ধু কুমুদিনীকান্ত কর একবার বিপদে পড়েন, তখন শরৎ লেখেন, 'আমি চিঠি ত অনেককেই লিখিতে বলিতে পারি, যেমন, বলরাম আইয়ার, মণি মিত্তির, উপেন মজুমদার, তা ছাড়া আরও অনেক অফিসার ত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ঠিক কি লিখিতে এবং কাহাকে লিখিতে বলিব ?'[১]

নিজের পাড়ায় সাহিত্যসভার ব্যবস্থা শরৎ এখানেও করেন। সভার সভাপতিত্ব করার জন্য তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের তিনি আমন্ত্রণ জানাতেন। সভাপতির এই নিমন্ত্রণকে উপলক্ষ্য করে শরৎ কবিগুরুকে প্রথম চিঠি লেখেন, 'কয়েকদিন হইতে আমরা ক্রমাগত তর্কাতর্কি করিয়াও মীমাংসা করিতে পারিতেছি না, এ সভায় আপনার পায়ের ধূলা পড়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি না। এবার যখন বাড়ি আসিবেন, যদি অনুমতি দেন, আমরা গিয়া আপনার কাছে আবেদন করি।'[২]

আড্ডা দিতে শরৎ সর্বদাই ওস্তাদ ছিলেন, এই আড্ডায় তাঁর ছেলেবেলার বন্ধুরাও আসতেন। তাদের তিনি ঠিক তেমনই ভালোবাসা ও স্নেহ দিতেন, তাদের কাছে শরৎচন্দ্র চিরকালের গেঁয়ো শরতই হয়ে থাকতেন। সেইরকম হাসি, চঞ্চলতা ও মহাব্যস্ততায় বিভোর হয়ে যেতেন। বয়সের কোনো বাধা সেখানে ছিল না। সেদিন বিভূতিভূষণ নিজের এক বন্ধু অতুলচন্দ্র দত্তকে নিয়ে শরতের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

দরজা খুলতেই কুৎসিত ভেলু তাঁদের অভ্যর্থনা করল। সেই বিচিত্র ক্ষণটিতে বিভূতিবাবুর মনে হয়েছিল, নিজের একাকিত্ব ও নির্জনতাকে রক্ষা করবার জন্যই এই যমদূতটিকে শরৎ মোতায়েন করে রেখেছে। ভেলুর চিৎকার শুনে তাকে জোরে জোরে ডাকতে ডাকতে শরৎচন্দ্র বাইরে বেরিয়ে এলেন। আর যেই বিভূতির দিকে চোখে পড়ল, ব্যস, আর কোনো কথাই নয়। অল্পক্ষণের জন্য তাঁরা দেখা করতে এসেছিলেন কিন্তু এ বাড়ির দরজার বাইরে যখন তাঁরা পা দিলেন, ততদিনে তিন দিন তিন রাত কেটে গিয়েছিল। কথা বলতে বলতে এতখানি দীর্ঘ সময় কোথা দিয়ে যে কেটে গিয়েছিল, বোঝার উপায় ছিল না। গল্পের উপর গল্প, প্রতি ঘণ্টায় তামাক, তার ফাঁকে ফাঁকে অপর্যাপ্ত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, বন্ধুরা শরতের এ ধরনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কিন্তু শরতের ভালোবাসায় ক্লান্তি বোধ ছিল না। হয় ঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হত, নইলে সেটাকে উল্টে রাখা হত। বিভূতিভূষণ বললেন, 'শরৎদা, এই জঘন্য কুকুরটির প্রথম অভ্যর্থনায় ভেবেছিলাম আপনি বুঝি কালভৈরবের সাধনায় ডুবে রয়েছেন। কিন্তু এখন দেখছি আগেকার সেই নটরাজ মূর্তিই রয়ে গেছেন।'

জবাবে শরৎচন্দ্র কুকুর ভেলুর মুখে মুখ ঠেকিয়ে আদর করতে লাগলেন, চুমো খেতে লাগলেন। বিভূতিভূষণের একি জবাব ? পরিচিত-অপরিচিত না জানি কত লোকই এই রকম বৈঠকে তাঁর মুখের কত গল্পই শুনেছেন। সত্য মিথ্যা সেই-সব বৈঠকী গল্প, তাঁর সাহিত্যিক রচনাগুলির চেয়ে কম উপাদেয় ছিল না।

সে সময় বাংলায় অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হত। পত্রিকাগুলির মধ্যে সর্বাধুনিক নতুন সুরের প্রতিনিধি ছিল 'ভারতী'। 'সবুজপত্র' চলতি ভাষার পত্রিকা ছিল। যদিও শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণই ছিল সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রয়োগ।

'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগদান সর্বোপরি ছিল। 'ভারতবর্ষে'র প্রধান লেখক ছিলেন শরৎচন্দ্র আর 'নারায়ণে' বিপিন পাল ইত্যাদি লেখকেরাই বেশির ভাগ লিখতেন। 'নারায়ণে'র সম্পাদক ছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত অরবিন্দ ঘোষকে বাঁচাবার দরুন ব্যারিস্টার হিসেবে তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে

১. ২৫ অক্টোবর, ১৯১৭
২. ৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭ (২৯ পৌষ, ১৩২৪)

পড়েছিল। তিনি কবিও ছিলেন, যদি না তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তেন তাহলে অবশ্যই মরমী কবি হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করতেন। 'নারায়ণে'র প্রকাশন তিনিই আরম্ভ করেন। 'নারায়ণ'কে 'সবুজপত্রে'র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হত। তার প্রধান কারণ চিত্তরঞ্জন দাশ রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রীতিকে ভালো মনে করতেন না। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিলেন, তবু এটা নিশ্চিত যে, তাঁর জন্য বাংলা সাহিত্যে অনেক বৈচিত্র্য আসে, এবং সাহিত্য সমৃদ্ধ ও ধনী হয়। কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণেই বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশ হতে পারে না। যে-কোনো পরিস্থিতিতেই আমাদের পক্ষে পাশ্চাত্য দেশের গ্ল্যামারে প্রভাবিত হয়ে পড়া নিশ্চয় শোভন নয়।

এই উক্তিটির দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় যে, চিত্তরঞ্জন দাশের সাহিত্যিক প্রেরণা ছিল তাঁর বিশুদ্ধ দেশপ্রেম। পুরোনো রীতি-নীতি ও পদ্ধতির প্রতি তাঁর ছিল অসীম সম্মান-বোধ। এই কারণেই শরৎচন্দ্রের প্রতি তিনি আকর্ষিত হন। একদিন শরৎচন্দ্রকে লেখা পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠিও লেখেন।

তাঁর অনুরোধে শরৎচন্দ্র বিশেষ করে তাঁরই জন্য একটি গল্প লেখেন এবং গল্পটির সঙ্গে এই মর্মে একটি চিঠিও দেন যে, গল্পটির নামকরণের ভার তিনি দাশ মহাশয়ের উপরেই দিচ্ছেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ গল্পটির নাম রাখেন 'স্বামী'।[১] এই গল্পের নায়ক বৈষ্ণব আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর পারিশ্রমিক হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশ একটি 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' শরৎচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেন এবং লেখেন যে, 'টাকা-পয়সার হিসেব দিয়ে আপনার মতো শিল্পীর মান নির্ণয় করা যায় না। আপনার পারিশ্রমিক হিসেবে এই সাদা চেক্ পাঠালাম। দয়া করে এটি গ্রহণ করবেন এবং আপনার ইচ্ছানুযায়ী টাকার অঙ্ক এতে লিখে নেবেন, দ্বিধা করবেন না।'

শরৎচন্দ্রের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। একজন লেখকের প্রতি এত অপরিসীম ভক্তি ও বিশ্বাস তাঁর নরম মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। নিজের ইচ্ছা মত টাকার অঙ্ক চেকটাতে বসাতে পারতেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই তো ছিলেন শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর জনপ্রিয়তাও তখন তুঙ্গে। অনেকে তাঁর নামও জানত না, কিন্তু তাঁর সাহিত্য তাদের অপরিচিত ছিল না।

সেবার উত্তর প্রদেশের কোন এক প্রবাসী বাঙালী আড়তদার কার্যবশত কলকাতায় এসে আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠেন। সেই আত্মীয় পরিবারবর্গের সবাই খুব সুশিক্ষিত ছিলেন। সেই বাড়ির একটি মেয়ে একদিন তাকে বলল, 'মামা, একটা কাজ করবে? আমাদের বাড়িতে আসার সময় মোড়ের কাছে যে লাল বাড়িটা আছে, সেখানে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন। একবার সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসো।' মামা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কোন্ শরৎ?'-'শরৎবাবু! সেই যে আমাদের শরৎচন্দ্র।' আড়তদার ভদ্রলোক তবুও বুঝতে পারলেন না যে, 'আমাদের শরৎচন্দ্র' লোকটি আসলে কে? মেয়েটির বাবা অনেক রকমে তাকে শরৎবাবুর পরিচয় দিলেন, কিন্তু সবই ভস্মে ঘি ঢালা হল। শেষে তিনি বললেন, 'আরে বাবা, সেই শরৎ যে "শ্রীকান্ত" লিখেছে।'

এই কথা শোনামাত্র আড়তদার ভদ্রলোক বললেন, 'ও, সেই বখাটে ছেলেটি? বুঝেছি, এবার নিজের নাম বদলে শ্রীকান্ত নাম রেখেছে।'

নাম বদলে ছিল কি না একথা থাক্। তবে এ ঘটনার দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর রচনাগুলি কত জনপ্রিয় ছিল। লেখককে অনেকেই দেখেননি, কিন্তু তাঁর লেখা ছাত্র, কেরানী, বাড়ির বউ, মেয়েরা, দোকানদার, ব্যাপারী সবাই সমান আগ্রহ নিয়ে পড়ত। ছাত্রদের পড়ার বইয়ের তলায় 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' ও 'দেবদাস' লুকোন থাকত। লক্ষ্মী বউয়ের বালিশের

১. ১ অগাস্ট, ১৯১৭

তলা থেকে সিঁদুরে মাখামাখি অবস্থায় 'পল্লী সমাজ', 'বিরাজ বৌ' ও 'বিন্দুর ছেলে' খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। এমন-কি বেনের দোকানে যেখানে প্রাত্যদিন রামায়ণ পাঠ হত, সেখানেও 'বড়দিদি', 'পণ্ডিত মশায়', বা 'শ্রীকান্ত' বইগুলি পৌঁছে গিয়েছিল। এই জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ তাঁর রচনার প্রতিটি পাত্রই জীবন্ত ও সজীব, কোনো নিয়ম ও নীতির বিধান মেনে তাদের গড়া হয়নি। গল্পের প্রতিটি পাত্রের সঙ্গে শরতের আন্তরিক ভালোবাসা ছিল, সে ভালোবাসা মমতায় ঘেরা, অভিমানে ভরা, স্নেহে সিক্ত। সূক্ষ্ম বৌদ্ধিক ভালোবাসা তা নয়, তাই তো তিনি সবার। চিন্তাভাবনার দুঃখের মাঝখানে টেনে এনে কাউকে তিনি কাতর করতেন না। প্রেমের এই যে অনন্যতা, সেই-ই যথার্থ শিল্পীর পরিচয়।

এইজন্য পাঠকরা তাঁর রচিত চরিত্রগুলির সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম হয়ে পড়ত যে, তাদের মনেও পড়ত না যে, এই চরিত্রগুলোর কোনো একজন স্রষ্টাও আছেন। ছাত্রেরা দল বেঁধে শরৎচন্দ্রের রচনা পাঠ করত, কিন্তু আসল মানুষটি যে কোথায় থাকেন, বা কী করেন তা খুব কম লোকই জানত। অনেকেই তাঁকে অত্যন্ত বখাটে ভাবতেন। কারণ তিনি ভবঘুরে ছন্নছাড়ার মতো কখনও বিহারে, কখনও কাশীতে আবার কখনও বা বর্মায় ঘুরে ঘুরে দিন কাটাতেন।

জনপ্রিয়তা তুঙ্গে থাকা অবস্থাতেও কিন্তু শরৎচন্দ্র চিত্তরঞ্জন দাশের ব্ল্যাঙ্ক চেকে মাত্র একশো টাকার অঙ্কই লেখেন, তার বেশি নেবার মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। টাকার প্রশ্ন তো নিতান্ত সাময়িক, আসল মূল্য তো দেশবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হওয়াতেই উসুল হয়ে গিয়েছিল। একটি প্রতিভা মুক্ত মনে হাত বাড়িয়ে আর একটি প্রতিভাকে বরণ করে নিল।

শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, দেশের বাইরেও শরৎচন্দ্রের প্রতিভা ক্রমশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। লন্ডনের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'দি টাইম্‌স লিটরারী সাপ্লিমেন্ট'-এ[১] তাঁর দুটি গল্প 'বিন্দুর ছেলে' এবং 'মেজদিদি'র প্রশংসামূলক সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। সমীক্ষক মহাশয় মোপাসাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা করেন। নারী-চরিত্র ও শিশুমন-অভিজ্ঞ হিসেবে তিনি শবৎচন্দ্রের বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। যদিও এই সমালোচনায় তেমন গভীরতা ছিল না তবুও শরতের প্রতিভাকে বরণ করে সমালোচক মহাশয় ভালো কাজই করেছিলেন।

একসঙ্গে অনেকগুলি ভালো গল্প ছাড়াও এ সময়ে 'দত্তা' এবং 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্ব, পুস্তক রূপে প্রকাশিত হয়। 'দত্তা' উপন্যাসটি লেখার দরুন তাঁকে কম অপমান সহ্য করতে হয়নি। এই উপন্যাসটিতে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষে সমালোচনা করেছিলেন। ফলে, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা একেবারে খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। সেই সময়কারই কথা, একটি শিক্ষিত ব্রাহ্মবাড়িতে শরৎচন্দ্র নিমন্ত্রিত হয়ে বড়ই মুশকিলে পড়লেন, ভাবলেন, 'গেলে যদি কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে? কিন্তু না গেলে যদি তারা তাঁকে ভীতু মনে করে?'

শেষ পর্যন্ত যাওয়াই তিনি স্থির করলেন। সেখানে তাঁরা তাঁকে খুব সমাদর করে বসালেন। সংসারে সাজ-সজ্জার কোনো অভাব ছিল না। বাড়ির মহিলারা যথেষ্ট আদরযত্ন ও সম্মান দেখিয়ে বহুমূল্য চেয়ারে বসতে দিলেন। তারপর সুন্দর সুন্দর বিশেষণ যুক্ত করে শরৎচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়লেন। এবার খাবার পালা। এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর চোখে পড়েনি যে, বাঁদিকে রুপোর থালায় 'দত্তা' বইখানি রাখা রয়েছে এবং বইটির সেই পৃষ্ঠাটি খোলা অবস্থায় রাখা যেখানে রাসবিহারী সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়াতে ছেলেকে তিরস্কার করছেন। সেই লাইনগুলিতে বিশেষভাবে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া রয়েছে।

শরৎচন্দ্র সবই বুঝলেন। কিন্তু এমন ভাব দেখালেন যেন কিছুই নজরে পড়েনি। খুব খেলেন, খোলা মনে বেশ গল্প করে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সেই ব্রাহ্ম মহিলারা ভাবলেন যে, তাঁরা বুঝি শরৎচন্দ্রকে বেশ উচিত শিক্ষা দিতে

১ জুলাই, ১৯১৮

পেরেছেন। কিন্তু যিনি সমস্ত তর্ক-বিতর্কের উপরে, দৃষ্টি যাঁর তাত্ত্বিক না হয়ে কল্যাণময়ী, যিনি স্রষ্টা, তিনি কি এই ধরনের তিরস্কারকে পরোয়া করেন!

শরৎচন্দ্রের প্রতিটি সাহিত্যিক রচনার সঙ্গে কোনো-না-কোনো ইতিহাস জড়িয়ে আছে যা রুচিকর নয়। 'সাহিত্য'র সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ বহুদিনের। অত্যন্ত কঠিন সমালোচনার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। শরৎচন্দ্রের প্রতিও মাঝে মাঝে এ ধরনের দয়া তিনি করতেন। 'সাহিত্য'র কোনো একটি সংখ্যায় তিনি শরৎচন্দ্রের বিষয়ে বড় তীব্র ব্যঙ্গ করেছিলেন, যদিও ব্যঙ্গ তাঁর কুকুরটিকে নিয়ে করা হয়। তিনি লিখেছিলেন, 'শরৎচন্দ্র নামে একজন নতুন লেখকের উদয় হয়েছে, তাঁর মনে অসীম দয়া-মায়া। সেদিন কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীটে তিনি একটি নেড়ীকুকুরকে কাটলেট কিনে খাওয়াচ্ছিলেন, ঠিক তার পাশেই একজন ভিখারী একটি পয়সার জন্য কাকুতি-মিনতি করছিল, কিন্তু দয়ালু শরৎচন্দ্রের সেদিকে নজর পড়েনি।'

শরৎচন্দ্র বুঝলেন যে, 'সাহিত্য'র জন্য বহুদিন তিনি কিছু লেখেন নি, সেই জন্যই এই ধরনের অপ্রিয় সমালোচনা শুরু হয়েছে। সে সময়ে বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত পূজাসংখ্যা 'আগমনী'র সম্পাদনার ভার তাঁর উপরেই ছিল, তাঁর ইচ্ছেও ছিল যে, শরৎচন্দ্র যেন পূজাসংখ্যার জন্য একটি লেখা দেন। এই তো সুযোগ, সমাজপতি মহাশয়কে খুশি করার জন্য শরৎচন্দ্র 'ছবি'[১] নামক গল্পটি লেখেন। এই গল্পটি একজন বর্মী শিল্পী এবং তার ধনী প্রেমিকার কাহিনী। রেঙ্গুনে থাকাকালীন একজন বর্মী শিল্পীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। 'ছবি' গল্পটি লেখার সময় অবশ্যই তাঁর সেই শিল্পী বর্মী বন্ধুটিকে মনে পড়েছে। কিন্তু মূলত এই গল্পটি তাঁর ছেলেবেলার লেখা 'কোরেল গ্রাম'[২] গল্পটি অবলম্বনে লেখা হয়। শরৎচন্দ্র নিজের ছেলেবেলাকার লেখাগুলিকে তেমন পছন্দ করতেন না। এইজন্য সম্ভবত তিনি অল্প বয়সের লেখাগুলিকে আবার নতুন করে লিখেছিলেন। এই 'কোরেল গ্রাম' গল্পটিই নতুনরূপে 'ছবি' নামে প্রকাশিত হয়। কোরেল গ্রামের পটভূমিও বিদেশ, লন্ডনের কাছেই ছোট্ট একটি গ্রাম্য পরিবেশের উপর গল্পটি লিখেছিলেন। গল্পের পাত্রপাত্রী সবই ইংরেজ। কিন্তু 'ছবি' গল্পটিতে পরিবেশটি বর্মার এবং গল্পের পাত্রও বর্মারই এক তরুণ শিল্পী। শরৎচন্দ্র লন্ডনে যাননি, কিন্তু বর্মায় তিনি তেরো বছর ছিলেন, তাই গল্পটি তিনি বর্মী জীবনকে কেন্দ্র করেই নতুনভাবে লেখেন।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ও তাঁর কাছ থেকে লেখা চেয়েছিলেন, কিন্তু এ চাওয়া শ্রী সমাজপতির মতো চাওয়া নয়। সৌরীন্দ্রমোহন শরৎকে বলেন, 'তোমার লেখা সর্বপ্রথম গল্প "বড়দিদি" "ভারতী"তে প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশের লোকেরা ওই গল্পটি থেকেই তোমায় জানতে পারে। তোমার উপর "ভারতী"র দাবি তো পুরোনো, সেই দাবির জোরেই তোমার কাছ থেকে একটা গল্প চাইছি, টাকা যা চাইবে তাই দেব।'

শরৎ হেসে বলেন, 'তোমার কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেব? কখনোই নয়, তবে গল্প তোমায় আমি দেব।' আর তিনি 'ভারতী'র জন্য 'বিলাসী'[৩] গল্পটি লেখেন। এই গল্পটিতে তিনি নিজের জীবনকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। পুরোপুরি সত্য না হলেও গল্পটিতে ঘটনাগুলি নিশ্চিতরূপে সত্য। গল্পটি ডায়ারি ধরনের লেখা, ডায়ারিটিও গ্রামের একটি ছেলের। ছেলেটির নাম 'ন্যাড়া'। এই ন্যাড়া নামটি আবার শরৎচন্দ্রের নিজেরই ডাক নাম ছিল। মনে হয়, গল্পে নিজের নাম দিয়ে তিনি গল্পের প্রামাণিকতা বা সত্যাসত্য এবং নিজের সম্পর্কও স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। তিনি একথা ভুলতে পারেন নি যে, মৃত্যুঞ্জয় বলে সত্যিই কেউ একজন ছিল, যাকে ছেলেবেলা থেকে

১ পূজাবার্ষিকী, 'আগমনী' ১৩২৬ (অক্টোবর, ১৯১৯)
২ ২৯ জুলাই, ১৮৯৩, ৩ অগাস্ট, ১৯০০
৩ 'ভারতী' বৈশাখ, ১৩২৫ (এপ্রিল, ১৯১৮)

তিনি জানতেন। তখনকার দিনের মায়া-মমতাহীন সমাজের নিষ্ঠুরতার কথাও তাঁর মনে ছিল। 'বিলাসী' গল্পটিতে কায়স্থের সন্তান মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে অস্পৃশ্য মুসলমান কন্যা বিলাসীর বিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র নিজের শক্তিশালী মনের যে পরিচয় দিয়েছিলেন, তা কখনোই সম্ভবপর হত না, যদি না তাঁর জীবনবোধ ও মননশক্তি এত স্পষ্ট হত। তাঁর ধারণায়, যখন কোনো সাহিত্যিক তদ্‌গত চিত্তে সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে মগ্ন থাকেন, তখন সে হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। তখন সে সব অহংকারের ঊর্ধ্বে, নইলে সাহিত্যিকের সব সাহিত্য-সাধনাই ব্যর্থ।

শুধু সম্পাদক বা প্রকাশকই তাঁর লেখা গল্প বা উপন্যাস চাইতেন তা নয়। বাজারে তাঁর বইয়ের চাহিদা খুবই বেড়ে চলেছিল।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের ব্যবস্থাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের নিকট একটি প্রস্তাব করেন যে, তাঁর সব-কটি রচনা অল্প মূল্যে গ্রন্থাবলী হিসেবে প্রকাশ করলে কেমন হয়? দরিদ্র দেশে ইচ্ছা থাকলেও প্রত্যেকের পক্ষে বই কেনা সম্ভব নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র তখুনি মনস্থির করতে পারেননি, হয়তো তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে, গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর আলাদাভাবে বইগুলির বিক্রি কমে যাবে। কিন্তু প্রকাশক এ ধরনের তর্ক মানতে চাননি। এছাড়া তিনি শরৎচন্দ্রকে বলেন যে, গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হলে তিন বছরে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। শরৎচন্দ্রের সে সময় টাকার প্রয়োজনও ছিল। শুধু পেটের জন্য ক্রমাগত লিখতেও তাঁর ভালো লাগছিল না। একসঙ্গে এতগুলি টাকা পেলে লেখার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। একবার তিনি পিছিয়ে যেতে চাইছিলেন, আবার তাঁর স্থায়ী প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কোনো ক্ষতি হয় তাও তিনি চাইছিলেন না।

এই রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে কয়েকমাস কেটে যায়। গ্রন্থাবলী প্রকাশ করার সংকল্প বা সাধ হয়তো নিজেরও ছিল বা অন্য কোনো প্রকাশককে দিয়ে করাবার ইচ্ছে ছিল, শেষ পর্যন্ত বসুমতী সাহিত্য মন্দিরকেই তিনি অনুমতি দেন। তিনি মনে করেন যে, সতীশবাবুকে নিরাশ করে কোনো প্রকাশককে দিয়ে গ্রন্থাবলী প্রকাশ করলে তাঁর প্রতি নিতান্তই অশোভন ব্যবহার করা হবে। অতএব শরৎ গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত[১] হল। এই খণ্ডে 'দত্তা', 'পরিণীতা', 'শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব', 'অরক্ষণীয়া', 'একাদশী বৈরাগী', 'মেজদিদি', এবং 'মামলার ফল' ইত্যাদি গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থাবলী থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। পাঠকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলে এবং পুরোনো পুস্তকগুলির বিক্রিরও কোনো ক্ষতি হয়নি। তারপর আরও খণ্ড[২] প্রকাশিত হয়ে বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। এক-একটি খণ্ডের পাঁচ হাজার কপি ছাপানো হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তা বিক্রি হয়ে যায়। সে সময় দেশে টাকাপয়সার খুব একটা অভাব ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পাটের দাম বেড়ে গিয়েছিল, বাংলাদেশ পাটের জন্য বিখ্যাত। অপর্যাপ্ত অর্থের দৌলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনও উচ্চমানের হয়ে পড়ে। কাঁচের তেলের কুপির বদলে ঘরে ঘরে হ্যারিকেন-লণ্ঠন জ্বলতে লাগল। খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরে টিনের ছাত পাতা হল, কাজে-কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই বইপত্র কেনার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে যায়। তাছাড়া পড়ার নেশা বাংলাদেশে একটু বেশি রকম ভাবেই প্রবল।

শরৎ গ্রন্থাবলীর এইরকম অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে'র কর্তাব্যক্তি আলাদাভাবে বই ছাপার আগ্রহও প্রকাশ করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র এবার আর কিছুতেই রাজী হলেন না, বললেন, 'আমার জীবনের শুরু থেকেই হরিদাস আমায় অনেক সাহায্য করেছে। আমি তার কাছ থেকে কোনো বইই ফেরৎ নিতে পারব না।"বসুমতী"শুধু গ্রন্থাবলীই ছাপতে পারে। পৃথক ভাবে বই হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছাপবেন।'

১ প্রথম খণ্ড-২০ অক্টোবর, ১৯১৯
২ দ্বিতীয় খণ্ড-২০ জানুয়ারি, ১৯২০
তৃতীয় খণ্ড-১৮ জুন, ১৯২০
চতুর্থ খণ্ড -২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২০

নতুন প্রকাশকের কাছে থেকে প্রতি বছর তিনি আট হাজার টাকা পাচ্ছিলেন। তাঁর পুরোনো প্রকাশকও তাঁকে প্রতি বছর ছ'হাজার টাকা দিচ্ছিলেন। যে শরৎবাবু কৈশোরে সামান্য পরীক্ষার ফিস জোগাড় করতে পারেননি, যিনি যৌবন শুধু জীবিকা অন্বেষণেই ব্যয় করেছিলেন, তিনি এখন একজন ধনী ব্যক্তি। তিন বছর আগেও তিনি মাসিক একশো টাকার একটা চাকরির জন্য কাতর হয়ে পড়েছিলেন, আর আজ তাঁর মাসিক উপার্জন হাজার টাকারও বেশি। কিন্তু এত অর্থ পেয়েও তাঁর মন দারিদ্র্যকে ভুলতে পারেনি। দারিদ্র্যের কশাঘাতে প্রত্যক্ষভাবে জর্জরিত হয়েছিলেন বলেই হয়তো, হাতে অনেক টাকা এলেও সঞ্চয়ের সামান্যতম প্রবৃত্তিও তাঁকে স্পর্শ করেনি।

বন্ধুদের সাহায্য করবার জন্য তিনি সর্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকতেন। এবার আশেপাশের দুঃখবেদনা অভাবের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি পড়ল। সেদিন, যেমন বরাবর হয়ে এসেছে— 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক জলধর সেন গল্পের জন্য তাগাদা দিতে এসেছিলেন, দেখলেন, ঘরে চারিদিকে অনেক ধুতি আর শাড়ী ছড়িয়ে রয়েছে। চাকর সেগুলি বাঁধবার চেষ্টা করছে আর তারই মাঝখানে চেয়ারে বসে শরৎচন্দ্র এক-আনি, দু-আনি, সিকি গুনে গুনে টেবিলে সাজিয়ে রাখছেন। সেন মহাশয় আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী হচ্ছে, শরৎ?'

শরৎ বললেন, 'দাদা! দশটার গাড়িতে দিদির বাড়ি যাচ্ছি।'

সেনমশায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মনে হচ্ছে সেখানে কোনো ব্রত-প্রতিষ্ঠার উৎসব ইত্যাদি হবে? সেইজন্য এই এত কাপড়-চোপর আর এত খুচরো পয়সা নিয়ে চলেছ?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'না দাদা! দিদির বাড়িতে আপাতত কোনো ব্রত প্রতিষ্ঠার ব্যাপার নেই।'

সেনমশায় আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো বারব্রত উৎসব যদি না-ই হবে তাহলে এত জিনিসপত্র কিসের জন্য নিয়ে যাচ্ছ?'

অন্যমনস্কভাবে বেদনাভরা মন নিয়ে শরৎ বললেন, 'দাদা, দিদির গাঁয়ে চারিদিকে গরিব লোকেদের যে কী দুর্দশা, পেটে ভাত নেই, লজ্জা ঢাকবার বস্ত্র নেই। এই যে এগুলি ...' বেদনায় তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে এল, আর কিছুই বললেন না, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

এই পরদুঃখকাতরতা তাঁর সাহিত্যে মুখর হয়ে উঠেছে, আর সেজন্যই তাঁর লেখা এত জনপ্রিয়। পাঠক বুঝতে পেরেছিল যে, শ্রীকান্তর বখাটে বাউণ্ডুলেপনা সত্ত্বেও বড় দুঃখের মধ্যে দিয়ে তাঁকে নিজের পথ খুঁজে নিতে হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

নিজের প্রতিও তিনি কৃপণ ছিলেন না। জীবনস্তর উঁচুমানের ছিল, কারণ এখন আর তাঁর অর্থের অভাব ছিল না। তাই সমৃদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের তৃষ্ণাও বেড়ে গিয়েছিল। বাড়ি তৈরির জন্য দিদির গাঁয়ের পাশেই পাণিত্রাস গ্রামে এগারোশো টাকা দিয়ে জমি কেনেন। আর সে সময়কার সবচেয়ে ভালো দামী জুতো 'র‍্যাক শু'[১] কেনেন। সেইদিনই উপেন্দ্র মামা দেখা করতে আসেন। চা খাওয়া গল্প-সল্প হওয়ার পর হঠাৎই শরৎচন্দ্র বললেন, 'চলো উপীন, আজ একটা জিনিস কিনতে হবে।' উপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী জিনিস?' শরৎ বললেন, 'হোয়াইট ওয়ের দোকান থেকে এক জোড়া র‍্যাক শু কিনব, যেমন মজবুত তেমনিই দামী।'

তখনকার দিনে 'র‍্যাক শু'র দাম ছিল সাড়ে বত্রিশ টাকা, কাজে কাজেই জুতোটির সৌন্দর্য এবং উপকারিতার বিষয়ে সন্দেহের প্রশ্ন ওঠে না। এই জুতো কেনবার জন্য উপীন মামাকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্র স্টিমারে করে কলকাতার পথে রওনা হলেন। পায়ে একটা ছেঁড়া চটি পরে ছিলেন, নতুন অবস্থায় এই চটিটার যে কী রঙ ছিল তা আর আজ কল্পনাও করা যেতে পারে না। কালো আর বাদামী রঙের ছোপ লেগে সে এক অদ্ভুত রঙের হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোকদের

১ ১৯২০ সালের শুরুতে।

বাড়িতে এই রকম চটি লোকে শৌচালয়ের জন্যই সাধারণত ব্যবহার করে থাকে। চলতে চলতে শুধু চটি জোড়াতেই ধুলো লাগেনি, মনে হচ্ছিল শরতের পা দু-খানিতেও যেন কেউ ধুলোর মোজা পরিয়ে দিয়েছে। গঙ্গা পার করে গল্প করতে করতে যখন তাঁরা দোকানের কাছে পৌঁছলেন, তখন উপীন মামা বললেন, 'শরৎ, তোমার এই পা-দুখানি দেখার পর দোকানদার কি দামী ব্ল্যাক শু দেখাবে?'

শরৎ চিন্তায় পড়ে গেলেন। বার বার পা ঠুকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু বিশেষ তফাত বোঝা গেল না। শেষে বললেন, 'চলো ভেতরে যাই, পকেটে পয়সা তো আছে। চারটে নোট মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলব, 'এই নাও টাকা, পায়ের দিকে তাকাবার কী দরকার?'

কিন্তু দোকানের ভিতর ঢুকে পড়ার পর কোনো রকম অসুবিধেয় পড়েননি। বিদেশীদের দোকান, দিশি দোকান হলে হয়তো বলত—'আজ নয় আর একদিন আসবেন।' চীনা দোকানগুলিতেও ভালো ব্যবহার পাওয়া যেত না। বাঙালীরা নিজের ভাষায় গাল দিয়ে রাগ ঠান্ডা করত। কিন্তু এই বিদেশী দোকানটি শরৎচন্দ্রকে সেই রকমই অভ্যর্থনা করল যেমন 'ব্ল্যাক শু'পরা কোনো লোক এলেও করে থাকে। ইংরেজ ব্যবসাদার জাত। পায়ের ধুলো আর ছেঁড়া চটি দোকানের সাদা চামড়া কর্মচারীকে বিব্রত করতে পারে নি। আট-দশটি জুতোর বাক্স বগলে করে তৎক্ষণাৎ কর্মচারীটি হাজির হল। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে একজোড়া জুতো শরৎচন্দ্রের পায়ে পরিয়ে মাপ পরীক্ষা করতে লাগল। শরৎবাবুর আর কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না। কর্মচারীটি আরও চার-পাঁচ জোড়া জুতো নিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত একটা জুতো পরে তিনি সন্তুষ্ট হলেন, কর্মচারীটি ভালো করে জুতোর ফিতে বেঁধে দিয়ে বলল, 'একটু চলে ফিরে দেখুন, আমার মনে হয় এই জুতো জোড়া আপনার পায়ে ঠিক বসেছে।'

শরৎবাবু তার কথা-মতো একটু চলা-ফেরা করে তারপর বললেন, 'চমৎকার! জুতো পরে আছি মনেই হচ্ছে না।'

ব্যাগ থেকে চারটে দশ টাকার নোট বার করে কর্মচারীটির হাতে দিলেন। ক্যাশ মেমো ও বাকি সাড়ে-সাত টাকা শরৎচন্দ্র নিয়ে বললেন, 'চলো মামা, এবার ওঠা যাক।'

কর্মচারীটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনার চটি জোড়া বাক্সে ভরে দিয়ে দিই?'

'না, দরকার নেই।' এই বলে তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। পুরোনো চটি জোড়া আর নতুন জুতোর বাক্স দুটোই প্রভুহীন হয়ে দোকানে পড়ে পরস্পরের দিকে অসহায় ভাবে চেয়ে রইল। জুতোর বাক্স বয়ে বেড়াবার ভয়ে তিনিই পুরোনো চটিটা দোকানে ফেলে এলেন।

শুধু জুতোর ব্যাপারেই তিনি সৌখিন ছিলেন তা নয়, সব ব্যাপারেই তাঁর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল। সাজ-সজ্জায় এখন আর তিনি গেঁয়ো শরৎ ছিলেন না। আগে জামা-কাপড় সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ছিলেন, রুক্ষ চুল, বোতামহীন জামা, কাঁধের উপর ময়লা চাদর, বাঁশের ডাঁটি দেওয়া ছাতা, পায়ে ছেঁড়া জুতো। এখন সেই রুক্ষতার বদলে চেহারায় একটি স্নিগ্ধ কোমলতার ভাব এসেছে। সেই শরৎ এখন ডবল ব্রেস্টএর চটকদার কামিজ, দামী সার্জের কোট, ধোওয়া শান্তিপুরী ধুতি, পায়ে লাল মোজা, ফিতে দেওয়া জুতো পরতেন, হাতে থাকত রুপো-বাঁধানো ছড়ি, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, মুখে দাড়ি, হঠাৎ দেখলে চেনাই মুশকিল।

কিন্তু এই যে রূপলাবণ্য, সাজ-সজ্জা তা কি তাঁর বাউণ্ডুলে স্বভাব ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকে বেঁধে রাখতে পেরেছিল? একটু অনিয়ম করলেই শরীর খারাপ হয়ে যেত, জ্বর হত। এছাড়াও নানা উটকো রোগেও তাঁকে ভুগতে হত। একদিন ডান পায়ের হাঁটুর নীচে খুব চুলকুনি ও জ্বালা করতে থাকে, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন। একবার ভাবলেন, একজিমা কিংবা বেরিবেরি হয়েছে। কী অসুখ না জেনেই টিনচার আয়োডিন লাগান। কয়েকবার লাগাবার ফলে যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। শেষে ডাক্তার এসে বেশ করে ধমক দেন, বললেন, 'আপনার আর তর সয় না? কস্টিক বা অ্যাসিড-ফ্যাসিড যা খুশি লাগান তো আমি চললাম।'

পরে রাগ একটু কমলে ডাক্তার ওষুধপত্র, মালিশ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিলেন। শরৎবাবু পা দুটো বালিশের উপর চড়িয়ে চুপ-চাপ শুয়ে রইলেন। এই ঘটনাটিকে নিয়ে নিজের এক গুণগ্রাহীকে তিনি দীর্ঘ একটি পত্র লেখেন, চিঠিতে শুধু স্বাস্থ্য সম্পর্কেই লেখেননি, অনেক ধরনের সামাজিক বিষয়ে এবং নিজের দাম্পত্য জীবনের বিষয়েও অনেক কিছু লেখেন—

'কোন কালে আমি অম্বলের রুগী নই। এতই কম খাই যে, অম্বল পর্যন্ত আমার কাছে ঘেঁষে না, পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কী যে সেদিন জোর করে ছাই-পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে, আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠছে। আমি এদেশের একটি বিখ্যাত কুঁড়ে। চিবোবার ভয়ে কোনো জিনিস সহজে মুখে দিতে চাইনে—আমার ধাতেও অত্যাচার সইবে কেন? সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মত হাতি হয়ে উঠব।

'স্বর্গীয় গিরীশবাবু তাঁর আবু হোসেনে লাখ কথার এক কথা বলে গিয়েছেন যে, অবলার গোলা, তারা মলেও খায়। মেয়েমানুষ জাতটাকে তিনি চিনেছিলেন। আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আসছি। ঐ খেলে না, খেলে না, রোগা হয়ে গেলে—ঘর সংসার রান্নাবান্না কিসের জন্যে? যেখানে দু-চোখ যায় বিবাগী হয়ে চলে যাব ইত্যাদি কত কি! আমি বলি, ওরে বাপু, বিবাগী হবে তো শীগগীর হও—এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে কাঁটা করে তুললে। বাস্তবিক আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না, আমি প্রায়ই ভাবি সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সেখানে বোধহয় এমন করে একজন আর একজনকে খাবার জন্য জবরদস্তি করে না। আর তা যদি হয় তো আমি যেন বরঞ্চ নরকে যাই।

'দিন কুড়ি আগে কুকুরের ঝগড়া থামাতে গিয়ে কোথাকার একটা ঘেয়ো কুকুর আমার হাতের তেলোতে আচ্ছা করে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে পালাল। হতভাগা কুকুরটা কী অকৃতজ্ঞ! তাকে আমি আমার "ভেলু"র কবল থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম। ভয়ে কাউকে এ কথা বলিনি, শুকিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু কাল থেকে আবার যেন মনে হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে।

'তবে একটা দুঃখ এই যে, বুড়ো হয়েছি। কত রকম-বেরকমের দুঃখ-দৈন্য আপদ-বিপদের মাঝখান দিয়ে তো আজ চল্লিশের কোঠা পার হলাম। শুনি, আমাদের বংশে আজও কেউ চল্লিশ পৌঁছন নি। সে হিসেবে তো অন্তত পিতৃ-পিতামহদের হারিয়েছি। আর কি চাই?'[১]

শরৎ গ্রন্থাবলীর চার খণ্ড ছাড়াও আর একটি গল্পসংগ্রহ 'ছবি'[২] নামে প্রকাশিত হয়। 'গৃহদাহ'[৩] ও 'বামুনের মেয়ে'[৪] এই দুটি উপন্যাসও ওই সময়েই প্রকাশিত হয়। 'দেনা-পাওনা' ও 'শ্রীকান্ত' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হচ্ছিল। 'ছবি' গল্প-সংকলনটিতে 'ছবি' এবং 'বিলাসী' গল্প দুটি ছাড়াও 'মামলার ফল' গল্পটি ছাপা হয়। 'মামলার ফল' গল্পটিতে নিচু শ্রেণীর কৈবর্ত সংসারের বিবরণ লেখক ফোটাতে চেয়েছেন। এ ধরনের গল্প উনি খুব কমই লিখেছেন।

'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসটির প্রকাশন 'শিশির পাবলিশিং হাউস' থেকে প্রকাশিত উপন্যাস-মালার মধ্যে হয়। এটি পূর্বে কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি। উপন্যাসটি লেখার আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎবাবুর কথাবার্তা হয়। শরৎবাবু গুরুদেবকে বলেন, 'আমি "বামুনের মেয়ে" নামে একটা উপন্যাস লিখছি, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা লিখছি কৌলীন্য বা কুলীনতা আমাদের সমাজকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেটাই আমি লিখতে চাই।' রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এখন তো আর কুলীন-প্রথা নেই। একজন লোক একশোটা বিয়েও আর করতে পারে না। তখন আর এর পুনরাবৃত্তি করে কী লাভ? তবুও যদি সাহস হয় তো লেখো, কিন্তু কোনো মিথ্যা কল্পনার সাহায্য নিয়ো না।'

১. ১৪ অগাস্ট, ১৯১৯
২ ১৬ জানুয়ারি, ১৯২০
৩ ২০ মার্চ, ১৯২০
৪. সেপ্টেম্বর, ১৯২০

মিথ্যা কল্পনাকে শরৎ কোনোদিনই বিশ্বাস করেন নি। কবর খুঁড়ে মরা লাশ টেনে বার করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কুলীন-প্রথা তাঁর মনে বড়ই বিঁধত। কোনো-না-কোনো অছিলায় আজও এর অস্তিত্ব আছে, এই ধারণা তাঁর যায় নি। যারা ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করার জন্য নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে, আর ভাবে যে ব্রাহ্মণের ধমনীতে শুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তাদের ধারণা বড়ই ভুল। তিনি নিজের জীবনে যা দেখেছেন, বা যে কষ্ট ভোগ করেছেন তাই লিখেছেন। মনগড়া জিনিস লেখার স্পৃহা কোনোদিনই তাঁর ছিল না। কৌলীন্য ভালো কিংবা মন্দ এ সম্বন্ধে তিনি কোনো রায় দেন নি। এ কথাও বলেন নি, বৈদ্যের সঙ্গে কায়স্থের বিয়ে দিয়ে দাও। কিন্তু যদি কেউ দিতে চায় তাতে বাধা দিয়ো না। তিনি ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন এ কথা যাক, তবে এটা সত্যি যে তাঁর মধ্যে কোনোরকম কপটতা ছিল না। অনেকে মুখে বলেন যে, বিধবাদের আবার বিয়ে হওয়া উচিত, কিন্তু নিজের মেয়ে যেই বিধবা হয়ে যায়, ওমনি তারা বলতে শুরু করেন, 'দেখুন, এ কাজ আমি কেমন করে করি বলুন? আমার আর চারটি মেয়ের বিয়ে এখনও বাকি' ইত্যাদি।

এই ধরনের মিথ্যাচারকে শরৎ ভালো মনে করতেন না, তাই মিথ্যার ভিত্তিতে তিনি নিজের কোনো উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীকে দাঁড় করান নি।

এই উপন্যাসটির প্রেরণা তিনি কেমন করে পান এ সম্বন্ধে কয়েকজন বন্ধুকে আলাদা-আলাদা গল্প শোনান। একজনকে বলেন, 'হঠাৎ গ্রামে বেড়াবার শখ হল। স্টিমারে করে যখন পৌঁছলাম বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। খিদে আর তেষ্টায় ক্লান্ত, গাঁয়ের ভেতর একটি বেনের দোকানে বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে কিছু খাবার খেলাম। তারপর কিছুদূর এগিয়ে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি গিয়ে উঠলাম। বাড়ির গিন্নি বয়স্কা বিধবা ভদ্রমহিলা, হঠাৎ দুপুরবেলা একজন অভুক্ত অতিথি পেয়ে স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র পুকুরে স্নান করে এসে দেখেন যে, ইতিমধ্যে রান্নাবান্নার সব যোগাড় হয়ে গেছে। উনুন ধরানোটাই যা বাকি। বিধবা মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি নিজেই কি রাঁধবেন?'

কুলীন ব্রাহ্মণের বাড়িতে নিজে রেঁধে খাওয়ার প্রশ্ন কেমন করে ওঠে তা তিনি ভেবে পেলেন না। কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা সংশয় নিয়ে তিনি খাওয়া-দাওয়া করে বিদায় নিলেন। ফেরবার পথে সেই দোকানদারটি চেঁচিয়ে বলল, 'কী ঠাকুর, জাত খুইয়ে এলেন?'

বেনে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে শরৎচন্দ্র জানতে পারলেন, যে, কুলীন ব্রাহ্মণ ঘরের সেই মেয়েটি নীচ শূদ্রজাতির একটি ছেলেকে বিয়ে করে। এই ঘটনাটিই 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাস লেখার প্রেরণা জোগায়।

এই সম্বন্ধেই অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে তিনি বলেন, 'যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমি বামুনের মেয়ে"উপন্যাসটি লিখেছি তা শোনাতে আমার আপত্তি নেই। মনে হয় অনেকের নাম নিয়ে যে প্রশ্ন তুমি আমায় করেছ তার জবাব তুমি খুঁজে পাবে। কোলাঘাট স্টেশনে একটি মহিলা পান বেচত। যেমন অন্য স্ত্রীলোকেরা পান বিক্রি করে তাকে সে রকমটা ঠিক মনে হত না। আমার মনে খুব কৌতূহল হয়, আমি তার সঙ্গে কথা কই, সেও আমায় বিশ্বাস করত।"বামুনের মেয়ে তে প্রিয় মুখার্জির মায়ের চরিত্র কলঙ্কে মলিন। তা আমি সেই পানওয়ালী স্ত্রীলোকটিকে মনে করেই লিখেছি। তার ছেলে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজনরা এ কথাই শুনেছে যে, সে পাগল হয়ে কোথাও চলে গেছে বা মরে গেছে। এবার তুমি আমায় বোঝাও যে, একথা বলে বেড়ালেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? এই যে উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক তিনি বংশ-মর্যাদার অহমিকায় যথার্থ ভদ্রলোক বলে কি সমাজে গণ্য হবে না? কেনই বা হবে না? সে তো জানে না কিসের ব্যথায় তার মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, আর কোনদিন ফিরতে পারবে না।'

হতে পারে এ ধরনের সমস্যা-বিজড়িত ঘটনা শরৎ অনেকে দেখেছিলেন, তারই ফলে তিনি 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসটি লেখেন। কোনো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৎক্ষণাৎ কিছু লিখতেন না। বছরের পর বছর ধরে সেই ঘটনাগুলি তাঁর মাথায় অবিরাম ঘুরে মরত। 'গৃহদাহ'

লিখতে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি বছর লাগে। ছ-বছর আগে[১] রেঙ্গুন থেকে বাল্যসখা প্রমথবাবুকে লিখেছিলেন, 'একটা বড় উপন্যাস "গৃহদাহ" নাম দিয়ে খানিকটা লিখেছি।' একবার তিনি একথাও বলেন, 'এই উপন্যাসখানি রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" উপন্যাসটির চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'উপন্যাসটি লেখা কি আপনার হয়ে গিয়েছে?'

'না, এখনও তা লেখা শুরুই করিনি।'

'যা লেখাই হয়নি, তার তুলনা "ঘরে-বাইরে"র সঙ্গে কেমন করে করা চলে?'

এ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রকুমার রায় 'যাঁদের-দেখেছি' বইয়ে লিখেছেন, 'উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করে শরৎচন্দ্র নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তিনি "ঘরে বাইরে"র সমকক্ষ কোন কিছু রচনা করছেন না। আর সত্য কথা বলতে কি, "গৃহদাহ" কেবল "ঘরে বাইরে"র সঙ্গে তুলনীয় তো নয়ই, এ উপন্যাসখানি শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের মধ্যেও উচ্চস্থান অধিকার করে নেই।'

নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্র অগ্রণী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি বীতরাগ হয়, তাহলে সেই স্ত্রীলোকের পথভ্রষ্ট হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস দুটিতে একথাই দেখতে পাওয়া যায়। 'গৃহদাহ'তে মহিম ও অচলার মাধ্যমে এ কথারই প্রতিপাদন শরৎচন্দ্র করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা ও রচনাকৌশল নিতান্ত মৌলিক ধরনের। 'গৃহদাহে'র শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অনেক রকম মতভেদ আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা ডঃ সুকুমার সেন, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সঙ্গে একমত। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ইত্যাদি অনেকে মনে করেন যে, 'গৃহদাহ' উপন্যাসটিতে শরৎবাবুর গভীর চিন্তাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায় এবং শরৎ সাহিত্যেও এর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এটি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এর অনেক দিন পর[২] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার শরৎবাবুকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি আপনার লেখা কোন্ উপন্যাসটিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?' শরৎবাবু তৎক্ষণাৎ বলেন, 'আর্টের দিকে দিয়ে "গৃহদাহ" ত্রুটিহীন।'

ডঃ মজুমদার তাঁর এ-কথার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। যাই হোক, 'গৃহদাহ' শ্রেষ্ঠ রচনা হোক আর নাই হোক, উপন্যাসটির আধার 'ঘরে বাইরে' বা 'গোরা'র পরেশবাবুই হোন-না কেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি তৎকালীন সমাজ এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা তাঁদের লাইব্রেরিতে এ ধরনের বইও রাখতেন না।

একবার কোনো ভদ্রলোক ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরিতে গিয়ে লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা দাদা, আপনি কি শরৎচন্দ্রের "গৃহদাহ" বইটি পড়েছেন?'

একথা শুনেই বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোকটি কানে আঙুল দিলেন। বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, ওটা কি একটা বই নাকি? ভদ্রলোকদের পড়বার মতো?' ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ' "গৃহদাহ"র কথা বাদ দিন। আপনার লাইব্রেরি ঘরে শরৎচন্দ্রের আর কোন্ কোন্ বই আছে?'

বৃদ্ধ বললেন, 'শরৎচন্দ্রের কোনো বই-ই লাইব্রেরিতে নেই। ওই সব পড়ে ছেলেমেয়েদের মানসিক অধঃপতনই হয়। সেজন্য ওঁর লেখা কোনো বই আমরা রাখি না।'

একবার কয়েকজন ব্রাহ্ম মহিলা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁরা সত্যিই শরৎবাবুকে ভক্তি করতেন। কিন্তু অচলার চরিত্রের দরুন তাঁরা মনে বড় ব্যথা পান। তাঁদের ধারণা হয়, সাম্প্রদায়িকতার চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তিনি অচলার চরিত্র গড়েছেন। এতে ব্রাহ্মসমাজকে অপমান করা হয়েছে। কিন্তু শরৎবাবু কোনো কালেই কোনো সম্প্রদায়ের

১ ১৩ মার্চ, ১৯১৪
২ ১৯২৫

অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি বললেন, 'এর পরের সংস্করণে আমি সব ঠিক করে দেব।' মহিলারা সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু শরৎবাবুর এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, 'এর আর কি সংশোধন করবেন আপনি?'

শরৎ বললেন, 'অচলার সম্বন্ধে যেখানে "আজীবন তৃষ্ণা" লিখেছি তার বদলে "আজীবন পিপাসা" লিখে দেব।'

এখনও পর্যন্ত সমাজে শরৎ বিদ্রোহী অনীশ্বরবাদী এবং আচারহীন ব্যক্তি হিসেবেই বিখ্যাত। কিন্তু আসলে তিনি একেবারেই ধর্মভীরু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন, 'কেউ কেউ বলে থাকেন যে, আমি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন, যথার্থ হিন্দু নই। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি আমি কোনোদিন কোনো কটাক্ষ পর্যন্ত করিনি। তবে ধর্মের নিষ্ঠুরতার প্রতি আক্রমণ অবশ্যই করেছি। অনেকেই আলোচনার ভয় দেখিয়েছিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই কিছু করেননি। এক বন্ধু আমায় লিখেছিল, মনের দিক দিয়ে আমি নাকি ব্রাহ্ম, নামেই শুধু হিন্দু। যদিও আমার গলায় কণ্ঠীর মালা, প্রতিদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে জল পর্যন্ত খাইও না, তবুও তিনি আমায় অনেক গালমন্দ করেছেন। আমি নাকি উপর উপর অনেক রকমের ঢং দেখিয়ে থাকি।'

সন্ধ্যা আহ্নিক করা এবং যার-তার হাতের জল খাওয়া সম্বন্ধে কিছু অতিশয়োক্তি করা হয়েছে। তাঁর গলায় অবশ্য একটি কণ্ঠী ছিল। মনে হয়, তাঁর থাকা-খাওয়া ও জীবনযাপনের রকম-সকম দেখে ও সময়ে সময়ে তাঁর লেখার দরুন সমাজে কটু আলোচনা হয়, এজন্য তাঁর সম্বন্ধে নানান ধরনের প্রবাদ ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম লোকেরা তাঁকে ব্রাহ্ম মনে করত, আবার যখন 'গৃহদাহ'তে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ভণ্ডামির উপর আক্রমণ করলেন তখন তো ব্রাহ্মরাও তাঁর উপর ক্ষেপে উঠলেন।

অত্যন্ত জনপ্রিয়তার দরুন জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্ররা তাঁর প্রতিটি গতিবিধির উপর নজর রাখত, এবং অর্থ বোঝবার চেষ্টা করত। যখন তিনি বেনারসে[১] যান, অনেক ছাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায়। তাদের সঙ্গে শরৎবাবুর নানা ধরনের কথাবার্তা হয়। একদিন সবাইকে সঙ্গে করে বিশ্বনাথ মন্দিরেও যান। মন্দিরে সে সময় আরতি হচ্ছিল। এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আরতি শেষ হবার পর বিশ্বনাথ দর্শন না করেই তিনি চুপচাপ মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। একটি ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার উপন্যাস পড়ে মনে হয় আপনি কনজারভেটিভ বা অর্থোডক্স কোনোটাই নন, তাহলে মন্দিরে আপনি গেলেন কেন?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'ভগবানের প্রতি আমার মনে ঠিক সেই রকম শ্রদ্ধা নেই, তবে ভক্তদের আমি ভালোবাসি। একজন অশিক্ষিত গেঁয়ো লোকের ভেতর সত্যিকারের দেবত্ব থাকে, সেই দেবত্বই আমি দেখতে গিয়েছিলাম। দেখে এসে বড় ভালো লাগছে, ধন্য মনে হচ্ছে নিজেকে।'

শরৎচন্দ্রের স্ত্রী পরম ধার্মিকা এবং নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন। তিনি খুব ব্রত উপবাস করতেন। শরৎবাবু কোনোদিন স্ত্রীর কাজে বাধা দেননি বা কোনো মন্তব্য করেন নি। বেনারসের দারুণ গরমে শুধু স্ত্রীর বিশ্বাস ও ভক্তির মর্যাদা দেওয়ার জন্যই কয়েকদিন থেকে গিয়েছিলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়েও তাঁর সম্বন্ধে একটি কথা খাটে। বিশ্বাস থাক্ বা না-থাক্ জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি তাঁর ভারি ঝোঁক ছিল। বেনারসের এক পণ্ডিত কোষ্ঠী দেখে তাঁর অতীত জীবনের অনেক ঘটনাই সবিস্তারে বলেছিলেন, এ কথাও তিনি বলেছিলেন, 'এই কোষ্ঠী কোনো যোগী পুরুষ কিংবা কোনো রাজতুল্য ব্যক্তির। ধর্মস্থানে বৃহস্পতির এমন পূর্ণ অবস্থান আমি এর আগে কখনও দেখিনি। আয়ু আটচল্লিশ বছর বা খুব বেশি হলে পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত। যদি

১ ১৯২০ (মার্চ বা এপ্রিল)।

আটচল্লিশ বছরে মোক্ষলাভ না হয়, তাহলে পঞ্চান্ন বছর বয়সে সংসার ত্যাগ এবং শরীর ত্যাগ দুই-ই হবে।'

আর একজন জ্যোতিষী জবরদস্তি করে তাঁকে একজন ধার্মিক-ব্যক্তি বলে ঘোষণা করেন। আর সত্যিই তিনি তাই ছিলেন। একটি মুহূর্তের জন্যেও সাহিত্যে তিনি সনাতন ধর্মের মর্যাদার অবমাননা করেন নি।

উপনয়ন সংস্কারের সমর্থক, শরৎ আসলে গোঁড়ামি, কু-প্রথা এবং অন্ধবিশ্বাস, গতানুগতিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। ধর্মের মূল স্থাপনার বিপক্ষে ছিলেন না। সমাজের নিষেধের জন্যই সতী না হলেও অসতী নারী যে নারী নয়, এ তিনি মানতেন না। এই সংকীর্ণতাকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন, কারণ তাঁর মতে এতে মনুষ্যধর্মের অপমান করা হয়। তিনি বুঝতেন পরিস্থিতি বা যে-কোনো কারণবশত মানুষ যদি এমন কিছু করে ফেলে থাকেই যা তৎকালীন সমাজ ও ধর্মের চোখে দোষযুক্ত, তা বলে একটা ভুলের জন্য গোটা মানুষটাই মন্দ হয়ে যেতে পারে না। তার যেটা মনুষ্যধর্ম, চরিত্রের উজ্জ্বল দিক কোনো মতেই সেটা নষ্ট হয়ে যায় না। নষ্ট তখনই হয় যখন সাময়িক কোনো ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য তাকে নিদারুণ অপমানিত করা হয়, লাঞ্ছিত করা হয়, বা তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। মানুষের বাইরের রূপটা বাদ দিয়ে তার অন্তরের দিকে তাকালে হয়তো তার আর একটা ভিন্ন পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তাই লোকসমাজে যে পতিতা, পতন তো তার সত্যই, কিন্তু বাইরের এই পতনের অভ্যন্তরেও তার নারীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, এটাও তো তেমনই অব্যর্থ সত্য না হয়ে পারে না। এ দুটোই মানুষের স্বরূপ এবং এ দুটিব সমান রূপকে যা স্পষ্ট করে তোলে, তাকেই যথার্থবাদ বলা হয়।

৪

শরৎচন্দ্রের নাম তখন জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে, ঠিক সেই সময়ে তাঁর জীবনে আর একটি আলোড়ন ওঠে। গোটা দেশই তখন একটি নতুন মোড় নিচ্ছিল। রাজনৈতিক আকাশে নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ব্রিটিশ মুকুটের প্রতি শপথ গ্রহণকারী কংগ্রেস শপথ প্রত্যাহার করে। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতার বদলে ভারতীয়দের দাবিয়ে রাখার জন্য সেই ব্রিটিশ সরকারই এদেশে রাওলাট আইন চালু করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে মহাত্মা গান্ধী বলেন, 'রাওলাট কমিশনের সুপারিশকে বিল হিসাবে স্বীকার করে নিলে আমি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করব।'

গান্ধীজী সারা দেশ পরিভ্রমণ করেন। সে সময় তিনি যে-রকম অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা লাভ করেন, তার আগে আর কেউ সেরকম অভ্যর্থনা পাননি। সবাই সেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। এপ্রিল, ১৯১৯-এ পাঞ্জাবে যে অমানুষিক ঘটনা ঘটে, তাতে সমগ্র দেশের হৃদয় কেঁপে ওঠে। ১৩ এপ্রিল 'বৈশাখী'র দিনটিতে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি সভার আয়োজন করা হয়। প্রায় কুড়ি হাজার নারী-পুরুষ যখন দেশের নেতার ভাষণ শুনতে তন্ময়, তখন জেনারেল ডায়ার নিজের সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাদের ঘিরে ফেলেন। গুলি চালাবার আগে লোকেদের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ার জন্য মাত্র দু-মিনিটের সময় তিনি দিয়েছিলেন। যে স্থানটিতে সভার আয়োজন করা হয়েছিল তার দরজাটি ছিল অত্যন্ত ছোট। লোকেরা গুলির আওয়াজ শুনে পালাতে চাইলেও পালাতে পারত না। হাজার হাজার লোক সেই মুহূর্তে মারা যায়, অনেকে আহত হয়।

এই নিদারুণ ঘটনা দেশের আত্মাভিমানে ভীষণভাবে আঘাত হানে। বিষধর সাপের মতো লোকেরা ক্রোধে, যন্ত্রণায় ব্যথায় ক্ষেপে ওঠে। বড় বড় সরকারী ব্যক্তিও সেদিন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ঘটনায় এত বিচলিত হয়ে পড়েন যে, তিনি 'স্যার' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। শরৎবাবু এ কথা শুনে খুশি হন। পাঞ্জাবের ইংরেজি দৈনিক 'ট্রিবিউন'-এর

সম্পাদক অমল হোমকে এক চিঠিতে লেখেন,-

'"ভারতী"র আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়েছে। ইংরেজের মারমূর্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভালো করে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হতে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল। আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

' "নারায়ণে"র সময় সি. আর. দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কি না বলুন।'

এই আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মন-প্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎবাবুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা এবং স্নেহের সম্পর্ক ছিল। কাজে কাজেই শরৎবাবুর মনও এই দিকে ঝুঁকে পড়ে। জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হাওড়ায় যে বিশাল সভা হয়, তাতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন এবং দেশবন্ধুর সঙ্গে এবার থেকে আর শুধুমাত্র সাহিত্যিক বন্ধুত্বের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখেননি নিজেকে।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক আকর্ষণ ছিল উগ্রপন্থীদের প্রতি। লোকমান্য তিলকের প্রতি তাঁর সত্যিকারের শ্রদ্ধা ছিল। 'হরিলক্ষ্মী'তে মেজবৌ লজ্জা পেয়ে হেসে বলেছিল, "ওটি তিলক মহারাজের ছবি দেখে বোনবার চেষ্টা করেছিলাম দিদি, কিন্তু কিছুই হয়নি।" এই কথা বলিয়া সম্মুখের দেয়ালে টাঙানো ভারতের কৌস্তুভ মহাবীর তিলকের ছবি আঙুল দিয়ে দেখাইয়া দিল।'

৩১ জুলাই মধ্য-রাত্রিতে যখন তিলকের দেহাবসান হয়, শরৎ ব্যাকুল নয়নে কেঁদে লিখেছিলেন, 'তিলক শুধু আমার ভাই ও বন্ধুই ছিলেন না, শুধু নেতাই ছিলেন না, তিনি আমাদের মতন বাইশ কোটি মলিন ললাটের শুভ্র তিলক ছিলেন। সেই তিলক আজ মুছে গেল, আমরা অনাথ হয়ে গেলাম।'

প্রথমদিকে বাংলাদেশ গান্ধীজীর সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারেনি। দেশবন্ধু অসহযোগ ইত্যাদি কর্মপন্থার একেবারে বিরুদ্ধে ছিলেন। তবুও কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় সভাপতিত্ব করেন এবং গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১]

সে সময়কার পরিবেশই এমন হয়ে উঠেছিল যে, ভারত সরকার 'হান্টার কমিশনে'র রিপোর্ট অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষের কথাই সমীচীন মনে করে গ্রহণ করেছিল। অধিকারীবর্গের অন্যায়কে পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা ছাড়া এর আর কী অর্থ হতে পারে?

কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে সরকারী উপাধি, স্কুল-কলেজ, আদালত, আইনসভা, সরকারী দরবার ও বিদেশী বস্তু পরিত্যাগ করে তার বদলে স্বদেশী বস্ত্র ও চরকাকে স্বীকার করে নেওয়ার কথা বলা হয়।

এই প্রস্তাবের ঠিক বিরুদ্ধে না হলেও শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল একটি সংশোধনী পেশ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তা সমর্থনও করেন। এই সংশোধনীতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের এক প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়। কিন্তু সেই সংশোধনী প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। অসহযোগ প্রস্তাব অনুসারে পরবর্তী নির্বাচনে সবাই ভোট দিতে অস্বীকার করে। সরকার একথা ভাবতে বাধ্য হলেন যে, আগামী বহু বছরের ঘটনাবলীতে কাউন্সিল পরিহারের

১ ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২০

ঐ প্রস্তাবের ঘোরতর প্রভাব পড়বে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের শেষ বিচারের ভার তখনও বাকি ছিল।

এর তিন মাস পরে ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। দেশবন্ধুর একেবারে ইচ্ছা ছিল না যে, অসহযোগ প্রস্তাব পাস হোক। নাগপুর অধিবেশনে তিনি নিজের খরচে দুশো পঞ্চাশ জনের একটি প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে যোগ দেন। কিন্তু এখানেও গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বই জয়ী হয়। এমন-কি যিনি এতকাল নিজেই গান্ধীজীর বিপক্ষে ছিলেন, সেই দেশবন্ধুই স্বয়ং এই প্রস্তাবটি পেশ করেন ও লালা লাজপত রায় এর সমর্থন করে। এই প্রস্তাবটিতে দেশবন্ধুকে অনুরোধ করা হয় যে, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে সবাই সাধ্যমত ত্যাগ স্বীকার করবে ও সার্বজনীন সংস্থাগুলি পুরোপুরিভাবে সরকারের কাজে অসহযোগিতা করবে এবং জনতা পরস্পরের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা স্থাপিত করবে।

দেশবন্ধু ঘোষণা করেন যে, তিনি ওকালতি করা ছেড়ে দেবেন, তিনি খুবই উঁচুদরের ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁর আয়ের কোনো হিসাব ছিল না, অগাধ বিত্তশালী লোক ছিলেন তিনি। দেশবন্ধুর এই ঘোষণায় সারা দেশে তীব্র আলোড়ন শুরু হয়। চোখের পলকে তাঁর বাড়িটি একটি রাজনৈতিক সংস্থার প্রচার ও সংগঠনের কেন্দ্র বিশেষে পরিণত হয়। শরৎচন্দ্র সে সময়ে বাজে শিবপুরে থাকতেন। তিনিও আন্তরিকভাবে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন। তিনি হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন, এবং বাংলার প্রাদেশিক ও অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই রকম ভাবে এই আন্দোলনটির পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপরে এসে পড়ে। প্রতিদিন তিনি শিবপুর থেকে কলকাতা যেতেন এবং অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে আন্দোলন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা ও পরামর্শ করতেন। এই কর্মীদের মধ্যে ডঃ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, হেমন্তকুমার সরকার এবং নির্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন। নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে শরৎবাবুর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। দুজনেই সমান বাক্‌পটু, সরলপ্রাণ, তামাকের আসক্ত এবং রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ছিলেন।

শরৎচন্দ্র অপরকে পরামর্শ দিতেও খুব ওস্তাদ ছিলেন। কোনো জটিল সমস্যা নিয়ে যখন সবাই বিব্রত, তখন নির্বিকারচিত্তে চা ও চুরুট খাওয়ায় মগ্ন থাকতেন। সবাই যখন ভাবনাচিন্তায় রীতিমত অস্থির, তখন খুব সহজভাবে সমস্যার সমাধান তিনি বাতলে দিতেন। সবাই অবাক হয়ে যেতেন। বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। যাঁরা শরতের বিরোধী পক্ষের লোক, তাঁরা এ-সুযোগ ছাড়তেন না। বলতেন, 'আরে আরে দেখো, শরৎবাবু নেশায় বুঁদ হয়ে ফিরছেন।'

সামান্য এই চার-পাঁচটি বছরের মধ্যেই যেমন অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগী শরৎকে ভালোবেসেছিল, তেমন তাঁর শত্রুপক্ষের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। সময়ে-অসময়ে তাঁকে ব্যঙ্গ করতে তারা কোনোমতেই পিছ-পা হত না। শরতের চরিত্রের উপরেই তাঁদের বিদ্রূপ সবচেয়ে তীব্র ছিল। বিশেষভাবে তাঁকে নেশাখোর, মদখোর বলে চিহ্নিত করার প্রতি তাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। একবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শরৎচন্দ্রকে একটি রাধাকৃষ্ণের মূর্তি উপহার দেন।[১] জনশ্রুতি, দেশবন্ধুর বাড়িতে শ্বেত পাথরের একটি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি দেখে তিনি খুব প্রশংসা করেছিলেন। পরে দেশবন্ধু সেই মূর্তিটি শরৎচন্দ্রকে দিয়ে দেন।[২] মূর্তিটি বেশ ভারী ছিল। সেটাকে নিয়ে গভীর রাতে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরতে চিরদিনই তাঁর দেরি হয়ে যেত, সেদিন তাঁর সঙ্গে শৈলেশ বিশী ছিলেন। তাঁর সাহায্যেই মূর্তিটিকে ট্যাক্সিতে চাপানো হয় এবং বাড়িতে এসে ভালো করে সেটা নামানোও হয়। মূর্তিটি অত্যন্ত ভারী হওয়ার জন্য তাঁর পা কাঁপছিল। পথচলতি কোনো ভদ্রলোক এ দৃশ্য দেখে

১ ২২ অগাস্ট, ১৯২৪ (রাত বারোটা)।
২ 'বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন'।

থাকবেন, তবে মূর্তিটি নিশ্চয় তিনি দেখতে পাননি, কাজে কাজেই সকালে উঠে অনায়াসে তিনি প্রচার করে দিলেন, 'গতকাল রাতে শরৎ নেশায় বুঁদ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। তাকে ট্যাক্সি থেকে ধরে-ধরে নামানো হয়, ঠিকমত চলতেও পারছিল না।'

শিল্পীর জীবন তার নিজস্ব ধন। তাকে কটাক্ষ করে কী লাভ? শিল্পীর মূল্যায়ন তার শিল্পের দ্বারাই করা উচিত। কিন্তু মানুষ স্বভাবতই ছিদ্রান্বেষী। দোষ খুঁজে না পেলেও দোষ গড়ে নিতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না। এই ধরনের লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র কখনও কিছু বলেন নি। নীরব থেকে অখ্যাতিকে বাড়তে দেবার সুযোগ দিতেন। তাঁর সম্বন্ধে কত রকম গল্পই না প্রচলিত ছিল। যাঁরা তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাঁরাও বলতেন যে, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পূর্বে তিনি খুব নেশা করতেন। গেলাসে ঢেলে, কখনও বা বোতলে মুখ রেখে মদ খেতেন। দুধভাত খাওয়ার মত শ্যাম্পেন মেখে তিনি ভাত খেতেন। মার্বেলের গুলির মত আফিংএর গুলি বানিয়ে মদে ফেলে কাঁচ বা পাথরের বাসনে রেখে ঠোঁটে নল লাগিয়ে খেতেন।

যে ব্যক্তিটিকে এত রকম ভাবে কল্পনা করা যায়, তিনি নিশ্চিতরূপে অসাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কেউ তাঁকে এসব করতে নিজের চোখে দেখেনি, শোনা কথাই নতুন করে লোককে শুনিয়েছে। তিনি যে মদ খেতেন, এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিশোর জীবনেও তিনি নেশা করতেন, কিন্তু যে ভাবে তাঁর সম্বন্ধে বলা হত, সে রকম নেশাখোর তিনি কখনোই ছিলেন না। কলকাতা ফেরার আগে থেকেই মদ খাওয়া তিনি ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। হিন্দীর প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীইলাচন্দ্র যোশী একবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান।[১] কথায় কথায় শরৎবাবুকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি কখনও নেশা করেছেন?'

—'অনেকবার।'

—'নেশায় কি কখনও আপনার তেমন অবস্থা হয়েছে, যেমন আপনার দেবদাস মদে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকত?'

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, 'ছোট-বড়, জীবনে আমি অনেক ভুলই করেছি, কিন্তু নিজের মূর্খামিকে আমি এতদূর যেতে দিইনি। মদ আমি খেয়েছি তবে নেশা হিসেবে মদকে গ্রহণ করিনি, ওষুধের মতোই ব্যবহার করেছি। শারীরিক কোনো রোগের উপশমের জন্য নয়, তবে আমার স্বভাবের মধ্যে একটা অভাব আছে, সেই অভাবটিকে পূরণ করার জন্যই খাই। আমার মন অন্তর্মুখী, সামাজিক জীবনকে মেনে নিয়েও ব্যবহারিক জগতে সমাজ ও ভীড় থেকে আমি পালাতে চাইছি। সমাজের মধ্যে বড় কষ্ট হয়, হাঁপিয়ে উঠি। তাই ওষুধ ভেবে মনের এই কষ্ট তাড়াবার জন্য মদ আমি খাই। মদ খাবার পর সমাজের আর পাঁচজন সামাজিক প্রাণীর মতো আমিও তাদের একজন হয়ে বেশ থাকতে পারি, তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো গল্পসল্পও করতে পারি।[২] কিন্তু ইদানীং প্রায় মাস দুই তিন একবিন্দু মদও আমার খাওয়া হয়নি।'

—'মনে করুন কোন গল্প বা উপন্যাস আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করতে চান কিন্তু প্রেরণা পাচ্ছেন না, এ অবস্থায় মদ খেয়ে কৃত্রিম প্রেরণার সাহায্যে লিখতে বসেছেন?'

—'কখনও নয়! নেশা করার পর লেখার প্রেরণা আমি হারিয়ে ফেলি। ওই অবস্থায় আমি শুধু ভাবি, আর যদি গুরুত্বপূর্ণ ভাব বা বিষয় মাথায় আসে তবে তখুনি তা অবশ্যই নোট করে নিই।'

তবুও নিন্দা আর অপবাদের শেষ ছিল না। লোকমুখে শোনা যেত, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামনে বসেও তিনি নাকি মদ খেতেন আর বেশ্যাদের সঙ্গে গান গাইতেন, বাজনা বাজাতেন। একটা অদ্ভুত ধরনের রটনা শোনা যেত, যে, তাঁর কাছে নাকি 'পঞ্চরত্ন' আছে,

১ ১৯২২
২ এই কথাই লেখককে শ্রীঅমল হোমও বলেছিলেন।

অর্থাৎ রূপোর একটি গড়গড়া তার উপর রূপোর একটি ছিলিম চারভাগে ভাগ করা ছিল, একটিতে গাঁজা, দ্বিতীয়টিতে ভাঙ, তৃতীয়টিতে আফিং, চতুর্থটিতে তামাক আর গড়গড়ায় মদ ভরা থাকত।

এ ধরনের রটনার স্রোত তাঁর কাছ থেকেই বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি অনেকবার অনেক লোকের কাছে মদ খাওয়ার গল্প করেছেন। বন্ধুদের দিয়েও অনেক বিচিত্র কাহিনী বলিয়েছেন। এ সবে কী মজা যে তিনি পেতেন, তা তিনিই জানেন। অনেকদিন আগে রেঙ্গুন থেকে এক বন্ধুকে লিখেছিলেন;[১] "দেবদাস" একেবারে মাতাল হইয়া বোতল বোতল খাইয়া লেখা।'

কিন্তু তারও আগে আর একটি পত্রে[২] তিনি লিখেছিলেন, 'মাস ছয়েক মদ খাই নাই—শরীরটা যেন একটু সুস্থবোধ করি—আর যদি না খাই ত বোধ হয় বেশ সারিয়া যাইব।'

রেঙ্গুনে থাকাকালীন তিনি কী ভাবে মদ খাওয়া ছেড়েছিলেন, সে-বিষয়ে তিনি একদিন হরিদাস শাস্ত্রীকে বলেন,'শ্রীরামপুর থেকে যে মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, মেয়েটি কেমন অদ্ভুত ধরনের জানো?'

হরিদাস বললেন, 'কই না তো।'

শরৎ বললেন, 'মেয়েটি আমাব কাছে এসে বলল, "অনেকদিন থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজনেরা বলেন যে, তুমি ভাল ঘরের মেয়ে হয়ে শরতের সঙ্গে দেখা করবে? বড্ড সাহস তোমাব?" এই কথা বলে সে আমায় সোজা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি সত্যিই এমনি লোক যে, কোন যুবতী মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারে না?"

'আমি হেসে বললাম, যদি দশ বছর আগেব শরৎকে একথা কেউ বলত, হয়ত আমি কিছুই বলতাম না কারণ তখন আমি খুব নেশা করতাম। দিনরাত নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতাম, তবুও একথা হলপ করে বলতে পারি যে, কোনো নারীব অপমান আমি কখনও করিনি। আর এখন তো আমি তোমার বড় ভাই, নির্ভয়ে তুমি আমার কাছে আসতে পারো।'

শাস্ত্রী মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন, 'খুব মদ খেতেন?'

শরৎ বললেন, 'হ্যাঁ ভাই খেতাম, কিন্তু একদিন ছেড়ে দিলাম।'

—'কেমন করে ছাড়লেন?'

—'বলছি দাঁড়াও! একটি চ্যাটার্জী বলে ছেলে আর একজন বর্মী বন্ধু[illegible]। আমরা তিনজনে মিলে খুব মদ খেতাম। হঠাৎ আমার সেই বর্মী বন্ধুটি অসুখে পড়ে। ডাক্তার তাকে মদ খেতে বারণ করে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সে রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করে। হঠাৎ একদিন রাত প্রায় এগারোটার সময় আমার চ্যাটার্জী বন্ধু আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল। ডাকার কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে বলল,"সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, একটুখানি মদ চাই।"

'আমার কাছে যেটুকু মদ ছিল তাতে তার তেষ্টা মেটেনি। বলল,"চলো, বর্মী বন্ধুর কাছে যাওয়া যাক।"

'আমি রাজী হইনি কিন্তু সে তখন আমার কথা শুনবে কেন? তার সঙ্গে আমায় শেষ পর্যন্ত যেতেই হল। রাত একটা বেজে গিয়েছিল। অনেক ডাকাডাকির পর বন্ধুর স্ত্রী জানলায় উঁকি দিয়ে বলল,"আমার স্বামী খুব অসুস্থ। দয়া করে আপনারা চলে যান।"

'কিন্তু ততক্ষণে আমাদের ডাকাডাকিতে বন্ধুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে নিজের স্ত্রীকে আমাদের দরজা খুলে দেবার জন্য অনুরোধ করে। আর বলে,"আমার বাড়িতে একটা মদের বোতল পড়ে রয়েছে, আমার তো আর প্রয়োজন নেই, মদ আর খাইও না। দরজা খুলে দাও।"

১ ১৯১৩
২ ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮

'আমার তো হুঁশ ছিল। চ্যাটার্জীকে ফিরে আসার জন্য অনেক করে বোঝালাম কিন্তু আমার কোনো কথাই সে কানে নিলে না। বর্মী বন্ধুর বাড়ির মধ্যে একটা ছোট টেবিলের পাশে গিয়ে বসলাম। বন্ধুটির স্ত্রী পাহারা দেবার জন্য সেখানে বসে রইল। কিন্তু সারাদিনের ক্লান্তিবশত অল্পক্ষণ পরেই সে ঝিমুতে লাগল। সুযোগ বুঝে চ্যাটার্জী বর্মী বন্ধুটিকে মদ খাবার জন্য ইশারা করল, কিন্তু বন্ধুটি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মদ খেতে রাজী হলো না। বন্ধু পত্নী ঘুমিয়ে পড়লে চ্যাটার্জী আবার অনুরোধ করল। এবার আর সে না বলতে পারল না, একবার দুবার তৃতীয়বার খাবার সময় মদের পাত্রটি তার হাত থেকে পড়ে গেল। শব্দ শুনে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা জেগে উঠল, বন্ধুর বুকের উপর আছড়ে পড়ে তারা যে রকম হাহাকার করে কাঁদতে লাগল তা দেখে আমার নেশা গেল কেটে। সারারাত সকাল পর্যন্ত থানা-পুলিশের হ্যাংগামা চলল। পরের দিন দাহ সংস্কার ইত্যাদি করলাম, আর সে দিনই শ্মশান থেকে ফিরে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আর কখনও মদ খাব না। চ্যাটার্জীও প্রতিজ্ঞা করেছিল, তবে সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি। বুঝলে হরিদাস, একজন ভদ্রলোক নিজের বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র সহ সুখে ঘুমোচ্ছিল। রাত একটার সময় দু-জন লোক ঢুকে তাকে নেশার ঘোরে মেরে ফেলল। এতবড় ভয়ংকব ব্যাপারের পরও যদি মাতালের জ্ঞান না হয়, তবে আর কবে হবে বলো?'

শরৎ ইলাচন্দ্র যোশীকে যে কথা বলেন, তার সংগে এই ঘটনার একবিন্দুও মিল না থাকলেও বক্তব্যের মধ্যে কতকটা সত্য নিশ্চয় ছিল। সারা জীবনটাই তাঁর পরস্পরবিরোধী তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত। তার ভিতর থেকে আসল সত্যকে খুঁজে পাওয়া বড়ই দুরূহ কাজ। তবে তাঁর তথাকথিত এই বক্তব্য সত্যি হোক আর নাই হোক, একথা সত্যি যে মদ ছাড়ার চেষ্টা তিনি কয়েকবারই করেন এবং ভারতে ফিরে আসার পর নেশার জন্য তিনি কখনও মদ খাননি। স্নায়ুমন্ডলীকে উত্তেজিত করার জন্য ওষুধ হিসেবে এক-আধ পেগ মাঝে মাঝে নিতেন, হয়তো হীনমন্যতাকে পরাজিত করে সুস্থ স্বাভাবিক সবল সামাজিক জীবনযাপন করার জন্যই খেতেন।

সাহিত্যিক নিজের সাহিত্যে কোনো-না-কোনোভাবে নিজেকে এবং নিজের চিন্তাধারাকে ব্যক্ত করে থাকেন। শরৎ সাহিত্যের অনেক পাত্রই নেশাখোর এবং মাতাল। তবে তাদের মধ্যে শুধু দেবদাসই মদকে যথার্থভাবে ভালোবাসতে পেরেছিল। ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে দেবদাস মদ খেয়ে সে বেদনা ভুলতে চেয়েছিল। হয়তো শরৎবাবুও এই রকম কোনো অবস্থায় পড়ে মদ খাওয়া আরম্ভ করেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি 'দেবদাস' লেখেন। প্রেমে পড়বার মতো উপযুক্ত বয়সই বটে সেটা, ওই বয়সেই হয়তো চতুর্দিকে অবহেলা ও উপেক্ষায় জর্জরিত হয়ে মদ খেতে খুব ভালো লাগে। দেবদাস তো সে পথই বেছে নিয়েছিল। তবে শরৎচন্দ্রের পরবর্তী কালের রচনায় এ ধরনের ঘটনা বিরল। 'চরিত্রহীনে'র সতীশও নেশা করত তবে ছেড়ে দেবার চেষ্টাই সে বরাবর করে গিয়েছে। একদিন সাবিত্রীর কাছে মদ না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে এ ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিল। 'দেনা-পাওনা'র মাতাল জীবানন্দও একদিন ভরা মদের গেলাস ফিরিয়ে দিয়ে চা খেয়েছিল। 'পথের দাবী'র কবি শশী ও নবতারাও ডাক্তারের কথামত মদ না খাবার প্রতিজ্ঞা করে।

মদকে মন্দ মনে করলেও কবি বা গুণী ব্যক্তির মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন না। 'পথের দাবী'র ডাক্তার যেন শরতের সুরেই বলেছেন, 'তাছাড়া ও কবি ও গুণী, ওদের জাত আলাদা। ওদের ভালোমন্দ ঠিক আমাদের সংগে মেলে না। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার ভালো মন্দ আইন ওকে মাপ করে চলে না। ওর গুণের ফল তারা সবাই মিলে ভোগ করে কিন্তু দোষের শাস্তিটুকু সহ্য করে ও নিজে।'

শরৎবাবু নিজেও ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি আন্তরিক ভাবেই যোগ দিয়েছিলেন। সাহিত্যিক হয়ে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। সাহিত্যিকরা প্রায়ই রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসেন। কিন্তু

শরতের বিশ্বাস ছিল যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজী যে আন্দোলন আরম্ভ করেছেন তা শুধুই শুকনো রাজনীতি নয়, বরং তা দেশের মুক্তির ব্রত। দেশের দাসত্ব যে সহ্য করতে পারে, সে কোনোমতেই সাহিত্যিক হতে পারে না। শরৎ-সাহিত্যে দেশ ও মানবের এই প্রেমই পরিমার্জিত হয়ে ফুটে উঠেছে। শরতের সাহিত্যিক বন্ধুরা বলেছিলেন, 'আপনি তো সাহিত্যিক, আপনার কাজ সাহিত্যচর্চা, রাজনীতি করা নয়।' একথার উত্তরে শরৎ বলেছিলেন, 'আপনাদের এ ধারণা একেবারেই ভুল। রাজনীতিতে যোগদান করা প্রতিটি দেশকর্মীর কর্তব্য। আমাদের দেশের আজকের এই রাজনৈতিক আন্দোলন দেশের মুক্তি সংগ্রাম ছাড়া আর-কিছু নয়, সবার আগে সাহিত্যিকদের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত। জনমত জাগ্রত করার গুরুভার পৃথিবীর সব দেশে সাহিত্যিকদের উপরে। যুগে-যুগে তারাই তো মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছে। যদি আপনাদের কথা মেনেও নিই, তা হলে উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ছাত্র সবাই তো এ প্রশ্নই তুলবে। তাই যদি হয় তাহলে রাজনীতি কারা সামলাবে?' শরৎ দেশের মুক্তি আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। তবে তাদের সব কর্মপন্থাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি, শ্রদ্ধা করতেও পারেন নি। চরকার প্রতি তাঁর একেবারেই কোনো বিশ্বাস বা সম্মান বোধ ছিল না। তবুও প্রতিদিন নিয়ম করে তিনি চরকা কাটতেন, ও খদ্দরের কাপড় পরতেন। জায়গায় জায়গায় নিজের পয়সায় তিনি চরকা বসান। মনে করতেন যে, তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস থাক্ বা না-থাক্, কংগ্রেস যখন খদ্দর পরবার নিয়ম করেছে তখন পরাই উচিত। নইলে অনুশাসন কেমন করে বজায় থাকবে? তিনি খুব সুন্দর চরকা চালাতে পারতেন। এত সুন্দর ও নিখুঁত সুতো কাটতেন যে, একবার বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় শরৎচন্দ্রের হাতে তোলা সুতোর কাপড় মাথায় নিয়ে নেচে উঠেছিলেন। বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন। শরৎবাবুও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। এই দুটি মহাপ্রাণ ব্যক্তির প্রথম মিলন একটি অসাধারণ ঘটনা হিসেবে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। একবার কোনো একটা প্রসঙ্গে রায়মহাশয় ছাত্রদের কাছে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখুনি একটি ছাত্র শরৎবাবুর কাছে গিয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের ইচ্ছার কথা জানিয়ে বলল, 'আপনি কি রায়মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য যেতে পারবেন?' শরৎবাবুরও অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল রায়মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করার, তাই শোনামাত্র তৎক্ষণাৎ ছাত্রটির সঙ্গে তিনি রওনা দেন। সায়ান্স কলেজের উপরতলার একটি ঘরে রায়মশায় থাকতেন। ছাত্রটি শরৎচন্দ্রকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। রায়মশায় ছোট্ট একটি খাটের উপর বসে কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শরৎবাবু দেখলেন, খাটের পাশে দুটো চেয়ার রয়েছে তবে কাগজপত্রে বোঝাই। বসবার জন্য ইঞ্চিখানেক জায়গাও কোথাও নেই। খাটের উপর বসবার জন্য যেই তিনি এগিয়েছেন, হঠাৎ রায়মশায় উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'করো কি? করো কি? খাটের উপর বোসো না।' শরৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। ছাত্রটি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এনে দিল। শরৎবাবু বসলেন। রায়মশায় তাঁর দিকে চেয়ে সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করচ আজকাল?' শরৎচন্দ্র বললেন, 'একটু আধটু লেখার চেষ্টা করছি।' উত্তেজিত হয়ে প্রফুল্লবাবু বললেন, 'খুব ভালো কথা! লেখো, খুব লেখো, তবে একটা কথা—ছাপাবার জন্য তাড়াহুড়ো কোরো না।' কথাবার্তায় এ-কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, রায়মশাই শরৎকে তাঁর কোনো পুরোনো ছাত্র ভেবে বসে আছেন। খুব বিনীত ভাবে শরৎ বললেন, 'ছাপাবার মতো কিছুই নয়, একটু-আধটু লেখার চেষ্টা করি শুধু।'

যে ছাত্রটির সঙ্গে শরৎচন্দ্র এসেছিলেন, সে আর চুপ করে থাকতে না পেরে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'স্যার, ইনিই শরৎচন্দ্র।'

শোনামাত্র প্রফুল্লচন্দ্র রায় চশমার ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে শরৎকে দেখে নিলেন। তার পর উঠে দরজার কাছে গিয়ে নিজের প্রিয় ছাত্রদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে ছোটখাটো একটা ভিড় জমা হয়ে গেল। তাদের নিয়ে সেনাপতির মতোই তিনি প্রথমে ঘরের মধ্যে ঢুকে শরৎবাবুর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'দেখছ! ওখানে কে বসে

আছেন! ইনিই হচ্ছেন শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর ওই দিকে চেয়ে দেখ, ওনার সব-কটি বই ওখানে আছে, আর আজ তো উনি স্বয়ং এখানে এসেছেন। ভালো করে দেখে নাও, পায়ের ধুলো নাও।'

তারপর শরৎচন্দ্রের কাছে এসে বসলেন ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো কথাবার্তা শুরু করলেন। বললেন, 'আপনার বই পড়ে কতবার কথা বলার ইচ্ছে হয়েছে, আজ কতদিনে সে ইচ্ছে পূর্ণ হল।'

কথাবার্তার মধ্যে প্রথমে পরিচয় না থাকার দরুন যে ভুল হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য ক্ষমা চাওয়ার কথাও তিনি ভুলে গেলেন। সত্যিকারের স্নেহে ক্ষমার প্রশ্ন নিতান্তই অর্থহীন।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ বোধ হয় এতখানিই রোমাঞ্চে ভরা হয়েছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো সঠিক বিবরণ কারো লেখায় পাওয়া যায় না। রেঙ্গুনে প্রথম তিনি গান্ধীজীকে দেখেন। তাঁর অভ্যর্থনা সমারোহের রিপোর্ট তিনিই লেখেন। সেই রিপোর্টটি রেঙ্গুন গেজেটে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এসে চরকা সংক্রান্ত ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথম দেখা হয়। প্রমাণ বা সাক্ষ্য একথাই বলে। মহাত্মাজীও শরতের চরকায় সুতো বোনা দেখে খুব প্রশংসা করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে যখন তিনি কলকাতায় আসেন, তখন একদিন 'সার্ভেন্ট' কার্যালয়টি দেখতে যান। দেশবন্ধুর বাড়ির আরও কয়েকজন ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সে সময় বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। কার্যালয়ে পৌঁছে মহাত্মা গান্ধী সবার সঙ্গে বসে চরকা কাটার ইচ্ছার কথা বলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি চরকা আনা হল। সবাই চরকা কাটতে বসে গেলেন। মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি বড়ই তীক্ষ্ণ ছিল, শরতের সুতোই যে সবচেয়ে মিহি এবং সুন্দর তা তাঁর নজর এড়ায় নি। শ্যামবাবু খুবই মোটা সুতো কাটছিলেন। পরিহাস করে তিনি বলেন, 'আরে দেখো তো, বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান ব্যক্তি কেমন দড়ির মতো সুতো বুনছেন।' একথা শুনে সবাই হেসে উঠল। শরৎচন্দ্র বললেন, 'মন্দিরের যে যত কাছে থাকে, ঈশ্বর থেকে সে ততখানিই দূরে থাকে।'

গান্ধীজী বললেন, 'শরৎবাবু, চরকার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা নেই?'

—'না! একেবারেই নেই।'

গান্ধীজী বললেন, 'আপনি তো চরকা-ভক্তদের চেয়ে অনেক ভালো সুতো কাটতে পারেন।'

শরৎ বললেন, 'আমি চরকাকে নয়, আপনাকে ভালোবাসি। সেই ভালোবাসার দাবিতেই চরকা চালানো শিখেছি।'

মহাত্মা হেসে বললেন, 'চরকার সুতো বুনলে স্বরাজ লাভে বিন্দুমাত্রও সাহায্য হবে, একথা আপনি বিশ্বাস করেন না?'

শরৎচন্দ্র হেসেই জবাব দিলেন. 'আজ্ঞে না, আমি একথা বিশ্বাস করি না। আমার বিবেচনায় স্বরাজ লাভের পথে সৈনিক সহায়ক হতে পারে, চরকা কখনোই নয়।' একথা শোনার পর গান্ধীজী খুব হেসেছিলেন।

একবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেন, 'চরকার প্রতি আপনার বিশ্বাস কি রকম?'

শরৎবাবু বললেন, 'যে বিশ্বাসের কথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন সেরকম কোনো বিশ্বাস আমার নেই।' দেশবন্ধু আবার জিজ্ঞেস করেন, 'কেন বিশ্বাস করেন না?'

শরৎবাবু বললেন, 'মনে হয় বহুদিন পর্যন্ত অনেক চরকা কাটার জন্যই।'

একটু চুপ থেকে দেশবন্ধু বললেন, 'দেশের তিরিশ কোটি লোকের মধ্যে যদি পাঁচ কোটি লোকও সুতো তৈরি করতে পারে, তাহলে সাত কোটি টাকার সুতো উৎপাদন দেশের মধ্যেই হতে পারে।'

শরৎবাবু বললেন, 'তা হয়তো হতে পারে। দশ লাখ লোক মিলে যদি একটি ঘর তৈরির কাজে হাত লাগায়, তাহলে দেড় সেকেন্ডে ঘরও তৈরি হয়ে যেতে পারে। আপনার কি বিশ্বাস, হতে পারে?'

দেশবন্ধু বললেন, 'এ দুটো জিনিস কিন্তু এক নয়। আমি আপনার কথার মানে বুঝতে পেরেছি। রাধাও নেচেছে আর ন' মণ তেলও পুড়েছে। তবুও আমি বিশ্বাস করি এবং বড় ইচ্ছা হয় চরকা চালানোটা শিখে ফেলি। কিন্তু মুশকিল এই যে, হাতের কোনোরকম কাজই আমার দ্বারা তাড়াতাড়ি হয় না।' শরৎবাবু বললেন, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

বিশ্বাস থাক্ বা না-থাক্, চরকার প্রচারের জন্য তিনি অনেক করেছেন। এমন কি শখের সিল্কের পোশাক ছেড়ে খদ্দর পরা শুরু করেন। তেলেভাজা বা শুকনো ছোলা ভাজা খেয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে তিনি চরকার প্রচার করেছিলেন। নিজে সুতো বুনতেন, বাড়ির অন্যান্য ব্যক্তিদের দিয়েও বোনাতেন। চাকরকে দিয়েও সুতো বোনাতেন। মাঝে মাঝে অবশ্য সে যেই ফাঁকি দিত, অমনি শরৎ জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন রে, অমুক কাজ কেন করিসনি রে?'

চাকর জবাব দিত, 'চরকা কাটছিলাম যে।'

চাকর পর্যন্ত দেশোদ্ধারের কাজে মেতেছে, কী আর বলবেন তিনি! সুরেন্দ্রমামাও এই আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন। অধ্যাপকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে এসে থাকতে লাগলেন। চরকা নিয়ে মামা ভাগ্নেতে দারুণ তর্ক হত। একদিন শরৎচন্দ্র বললেন, 'মামা, সমাজের যে কাজে তুমি নিযুক্ত ছিলে, চরকা আন্দোলনের চেয়ে তা অনেক বড়। আমি সাহিত্য রচনা করি, একাজও চরকার থেকে অবশ্যই বড় কাজ। সব কাজ ছেড়ে ছুড়ে বসে যদি ঘরে বসে চরকা চালাই, তাতেই কি দেশের খুব লাভ হবে বলে মনে কর?'

সুরেন্দ্রমামা বললেন, 'তা কি করে হতে পারে, খুবই ক্ষতি হবে।'

–'তাহলে?'

সুরেন্দ্রমামা বললেন, 'কিন্তু আমি যদি ছুটির দিনে চরকা চালাই তাতে কি অন্যায় থাকতে পারে? যদি সরকার বলে যে, চরকা চালানো অন্যায় এবং যে চরকা চালাবে তাকে জেলে পাঠানো হবে, তাহলে প্রতি অবশ্যই আমি চরকা চালাব এবং জেলেও যাব। আমাদের দেশে ঠাকুমা দিদিমারা চিরদিনই চরকা চালিয়ে এসেছেন, এতে তো কোন দোষ নেই।'

শরৎ বললেন, 'যদি ভারতবাসীরা বস্ত্রের প্রয়োজন নিজেরাই হাতে সুতো বুনে মেটাতে পারে, তাতে আমাদের অনেক লাভ এবং সরকারের ক্ষতি তারা, সেইজন্য চরকা চালানো তারা অন্যায় মনে করে।'

মামা বললেন, 'আমি এ সিদ্ধান্তকে অন্যায় মনে করি। যদি স্কুলে চরকা কাটবার সুযোগ না দেওয়া হয়, তা হলে আমি অধ্যাপকের কাজ করতে রাজী নই। সেইজন্যই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।' শরৎচন্দ্র বললেন, 'তুমি কোনো অন্যায় করনি।'

কিন্তু সুরেন্দ্রমামাও বোধহয় আর চরকার উপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। তাই একদিন বললেন, 'শরৎ, শুধু চরকা নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না, তাঁত ঘর বসাতে হবে।'

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। ভাগলপুরে পাঁচ-সাতটি তাঁত ঘর বসানো হল। বকশিশ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভালো ভালো তাঁতীকে ডেকে পাঠানো হল। কিন্তু কিছুদিন না পেরোতেই, বকশিশের টাকা ফুরোবার আগেই তাঁতীদের বাড়ি থেকে চিঠি আসতে আরম্ভ করল। কারো ছেলে বউ অসুস্থ, কারো বাড়িতে টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না, সেজন্য আরো টাকা চাই.... ইত্যাদি।

টাকা তাদের দেওয়া হল। কিন্তু চিঠি আসার আর বিরাম ছিল না। এবার খবর এল যে, লোকের অভাবে পাকা ধান খেতে ঝরে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, পত্রপাঠ চলো এসো। কেউ বা আবার লিখত, অমুকে কাছারিতে মামলা করেছে, অনুরোধ উপরোধ করা দরকার। নইলে সব দিক নষ্ট হয়ে যাবার ভয় আছে। এই চিঠিগুলি নিয়ে তাঁতীরা তাঁর কাছে হাজির হত। শেষে বাধ্য হয়ে ছুটি

এবং রাহাখরচ দিয়ে তাদের তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু কেউ আর ফিরে আসত না। যে ঘরে তাঁতীরা কাপড় বুনত, সে ঘরে উইপোকা বাসা বাঁধল। শেষে সুরেন্দ্রমামা বললেন, 'ছাড়ো। পরের ভরসায় কি আর এ-সব কাজ হয়? এর চেয়ে দেশলাইয়ের কারখানা খোলা ঢের ভালো ছিল। দেশের কাজও হত, কিছু আমদানীও হত। কাজের জন্য বাইরে থেকে আর লোক আনাব না। নিজে শিখেই সব করব। ভালো ছেলেদের কাজ শেখাব।' শরৎচন্দ্র বললেন, 'চরকা তো ঝগড়ু মিস্ত্রিও তৈরি করতে পারে; কিন্তু দেশলাইয়ের মেশিন কিনতে কত টাকা খরচ পড়বে?'

সুরেন্দ্রমামা বললেন, 'সাতশো টাকা।' শরৎ জিজ্ঞেসা করলেন, 'কুমিল্লা থেকে স্টিমারে করে ওই মেশিনটা আনাতে কি রকম আন্দাজ টাকা লাগবে?' সুরেন্দ্র বললেন, 'তা তো বলতে পারব না, তবে মনে হয় খুব বেশি খরচ পড়বে না। আশি টাকায় কেমিক্যাল কেনা যায়।'

শরৎচন্দ্র আবার বললেন, 'আচ্ছা, আমি তোমায় হাজার টাকা দেব, তুমি কারখানা খোলার ব্যবস্থা ইত্যাদিতে লেগে পড়ো।'

দেশলাইয়ের কারখানা খোলা হল, কিন্তু হিন্দু ঘরের কোনো ছেলেই কাজ শেখবার জন্য এগিয়ে এল না। কিছু মুসলমান ছেলে পাওয়া গেল। তারা বলল, 'আমরা কাজ শিখতে রাজী কিন্তু মজুরী দিতে হবে।'

অনেক বলা-কওয়ার পর চার আনা দিনমজুরী বরাদ্দ করা হল। কাজ খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। কিন্তু হঠাৎ একদিন বারুদে আগুন ধরে যাওয়াতে কারো হাত পুড়ল, কারো মুখ পুড়ে গেল। সেইসঙ্গে দেশলাইয়ের কারখানারও ইতি। শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন ভাগলপুর থেকে।

৫

চরকার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। দেশবন্ধুর বাড়িতে একদিন মহাত্মা গান্ধীকে তিনি বলেন, 'মহাত্মাজী, আপনি অসহযোগরূপী একটি অভেদ্য অস্ত্রের আবিষ্কার করেছেন। যদি সরকারের সঙ্গে জনতা অসহযোগিতা করে, তাহলে একদিনেই সরকার শেষ হয়ে যাবে। তখন আর এক বছর নয়, চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর আমরা স্বরাজ পেয়ে যাব।'

বিলিতি কাপড়, বিলিতি বস্তু এমন কী তিনি বিলিতি বইয়েরও বহিষ্কারের পক্ষে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেন তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের আহ্বানে যখন স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তা করলেন না, তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন, 'চাঁদেও কলঙ্ক থাকে। প্রফুল্লচন্দ্রের "স্যার" উপাধি ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত। তাঁর মত এত বড় দেশভক্ত উপাধি পরিত্যাগ করতে পারলেন না, এ দুঃখ আমার মন থেকে কিছুতেই যাবে না।'

আচার্য রায়কে ভালোবাসতেন বলেই হয়তো শরৎ এতখানি ব্যথা পেয়েছিলেন। বিলিতি বস্ত্রের বহিষ্কারের সঙ্গে যদি বিলিতি উপাধিগুলিকেও বর্জন করা হয়, তা হলে হয়তো স্বাধীনতার দিনটি আর একটু নিকট হবে। যাঁরা বিদেশী উপাধি পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেন, তাঁরা নিতান্ত ছোট মনের। যারা তাঁদের সম্মান দেয়, তারাও দেশের শত্রু।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন দেশবন্ধু একটা সমস্যায় পড়েন। পুরুষের দেখাদেখি স্ত্রীলোকেরাও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। দেশবন্ধু এ বিষয় বড়ই চিন্তিত ছিলেন। কী ভাবে মেয়েদের কাজে লাগানো যায়, এ নিয়ে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। শেষে তিনি শরৎচন্দ্রকে বলেন, 'এ ভার আমি আপনার উপর চাপাচ্ছি, এদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে।'

স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। শরৎচন্দ্র তাদের জন্য ভবানীপুরে 'নারী কর্ম মন্দিরে'র স্থাপনা করেন। সেটি পরিচালনার ভার দেশবন্ধুর ভগিনী উর্মিলা দেবীর উপর দেন।

পরে মেয়েদের সংখ্যা আর একটু বাড়ে তবে শরৎচন্দ্র সংখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না, বলতেন, 'যুগ-যুগান্তর ধরে যারা ঘরের বাইরে পা দেয়নি, রান্নাঘর এবং প্রসূতিঘর পর্যন্ত যাদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত ছিল, তাদের মধ্যে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সহস্র সৈনিক কোথা থেকে আসবে? কিন্তু পদ্ম তো কাদায় ফোটে। একদিন দেশের অন্তঃপুর থেকে তা নিশ্চয় ফুটে বেরুবে।'

গান্ধীজীর আহ্বানে সেই প্রথম ভারতবর্ষের মেয়েরা সামগ্রিক রূপে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে রণভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্ত্রী ও পুরুষেরা মিলেমিশে কাজ করলে অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে, এ চিন্তায় অনেকে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেসময় স্পষ্ট বলেছিলেন, 'মশালের উজ্জ্বল আলোয় অন্ধকার ঘুচে যায়, এ কথা সবাই জানে, কিন্তু তার ধোঁয়া থেকে যে কিঞ্চিৎ দুর্গন্ধ বেরোয় সেদিকে কি কারও নজর পড়ে? জলের প্লাবনে ধরিত্রী উর্বর হয়, তবে সেই জলের সঙ্গে যদি কিছু ময়লা আবর্জনা এসেই পড়ে তা নিয়ে এত দুশ্চিন্তার কি আছে?'

শিবপুর ইনস্টিটিউটে ভাষণ দেবার সময় তিনি বলেন, 'যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোনো জ্ঞান, কোনো শিক্ষা, কোনো সাহস আজ পর্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে, শুধমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। মেয়েমানুষকে আমরা কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হতে দিইনি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশেব হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ আজ অবধি কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখেছে, তার মনুষ্যত্বের কোনো খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে।' সে সময় মুষ্টিমেয় মহিলা স্কুলে পিকেটিং করার সময় গ্রেফতাব হয়। এই খবর চারিদিকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ ভলান্টিয়ার হয়ে গ্রেফতার হওয়ার জন্য ক্ষেপে ওঠে।

এই আন্দোলনের একটি প্রধান কাজ ছিল সরকারী স্কুল এবং কলেজ বয়কট। ছাত্রদের অভিভাবকগণের কাছে কংগ্রেস অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন আপন ছেলেদের সরকারী স্কুল কলেজ থেকে অবিলম্বে সরিয়ে নেন। এই অনুরোধ ব্যর্থ হয়নি। দেখতে দেখতে অসংখ্য ছাত্র স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এল। দেশবন্ধু ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফরবিজ ম্যানসনের বিশাল অট্টালিকায় 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা করেন, এর পরিচালনার জন্য সেখানেই একটি জাতীয় বিদ্যালয় 'কলিকাতা বিদ্যামন্দিরে'র স্থাপনা করেন।[২] মহাত্মা গান্ধী বিদ্যামন্দিরটির উদ্ঘাটন করেন। সুভাষচন্দ্র বসু এর প্রিন্সিপাল হলেন আর শরৎচন্দ্র হলেন বাংলার প্রধান অধ্যাপক। শরৎচন্দ্র খুব উৎসাহ নিয়ে স্কুল কলেজের বহিস্কার আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠলেন ও নতুন পাঠশালা 'কলিকাতা বিদ্যামন্দির' নিয়ে মেতে রইলেন। অপরদিকে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বকবি এরকম আন্দোলনের ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন। দেশবন্ধু স্যার আশুতোষের যুক্তির বিরুদ্ধে বলেন, 'শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ নয়।'

শরৎচন্দ্রও চুপ করে থাকেন নি। ইওরোপ থেকে ফিরে কবিগুরু যখন 'শিক্ষার মিলন'[৩] নামে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রথমে শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের পড়ে শোনান ও পরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ,ইউনিভার্সিটিতে সেটি পড়েন,তখন শরৎচন্দ্রের মনে বড় ব্যথা লাগে। জীবনে প্রথমবার কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম বাধে। যদিও এই প্রবন্ধটিতে কবিগুরু স্পষ্ট ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা করেন নি, তবে একথাও অস্পষ্ট থাকেনি, গান্ধীজী যেভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-

---

১ পৌষ, ১৩২৮ (ডিসেম্বর, ১৯২১-জানুয়ারি, ১৯২২)

২ ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯

৩ ১০ অগাস্ট, ১৯২৯

বিজ্ঞানের নিন্দে করে বেড়াচ্ছেন, আধুনিক ভারতের পক্ষে তা কল্যাণকর কোনো সদুপদেশ নয়। রবীন্দ্রনাথের মতবাদের খণ্ডনে শরৎচন্দ্র 'শিক্ষার বিরোধ'[১] নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে' পাঠ করেন।

'পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূল মন্ত্র হচ্ছে Standard of living বড় করা। ···· ওদের সমাজ নীতির যেমন interpretation ই দেওয়া যাক, তার আসল কথা হচ্ছে ধনী হওয়ার। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞানের সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি ধনহীন করে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে শুধু ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না। সুতরাং কোন এক মহাদেশ যদি কেবল ধনী হতেই চায় তো অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না। ···· এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর পরেই তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। তারই জন্য তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত। আজ আমার কথায়, আমাদের ঋষিবাক্যে সে কি তার সমস্ত Civilisation-এর কেন্দ্র নড়িয়ে দেবে? আমাদের সংসর্গে তার বহু যুগ কেটে গেল, কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগতে দেয়নি। ···· কিন্তু আজ খামকা যদি সে ভারতের আধিভৌতিক সত্যবস্তুর বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পদার্থের inquiry করে থাকে তো আনন্দ করব কি হুঁশিয়ার হব—চিন্তার কথা।

'ইওরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে, এই মূলে। আমাদের ঋষিবাক্য যত ভালই হোক, তারা নেবে না। ···· সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা আমাদের দেবে না। ···· আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সেটুকু না নেওয়াই ভাল। বাকিটুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, আবর্জনা। তাদের মত পরকে যদি মারতে না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি ত মারণ-মন্ত্র যত সত্যই হোক, তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভাল।

'আর একটা কথা বলেই আমি এবার এ প্রবন্ধ শেষ করব। ···· বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়, শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়। এমন হতে পারে, বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে মেশে না, এ দুটো পদার্থও একেবারে উল্টো, তবু তেলের সেজ জ্বালাতে যে মানুষ জল ঢালে, সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে পুড়িয়ে নিতে চায়। যারা এ তত্ত্ব জানে না, তাদের একটু ধৈর্য থাকা ভাল।'

এই প্রবন্ধটিতে কবিগুরুর বিরুদ্ধে বেশ মুখরোচকভাবে একচোট নিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। লিখেছিলেন; "গোরা" বলে বাংলা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে, কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন ত দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশ ভক্ত গোরার মুখ দিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন, 'নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে"।'[২]

মহাত্মা গান্ধীও কবিগুরুকে বলেছিলেন, 'আজ লোকে ব্যবসায়িক সাফল্য ও রাজনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে। আমাদের দেশের ছাত্রদের বিশ্বাস যে ইংরেজি জ্ঞান না থাকলে সরকারী চাকরি পাওয়া অসম্ভব। মেয়েদের এই ভেবে ইংরেজি শেখানো হয় যাতে তাদের যোগ্য বরে বিয়ে হয়। এই ধরনের কয়েকটি ঘটনা আমার জানা আছে, স্ত্রীলোকেরা এইজন্যই ইংরেজি পড়ার প্রতি আগ্রহশীল যাতে ইংরেজদের সঙ্গে ইংরেজি কথা বলতে পারে। আমি এ রকম অনেক স্বামী দেখেছি যাঁদের স্ত্রীরা তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ইংরেজিতে

---

১. এই প্রবন্ধটি 'স্বদেশ ও সাহিত্য' থেকে সংগৃহীত। প্রথমে এটি 'বাংলার কথা' ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয়।

২. ১৯২৯

কথা না বলতে পারার জন্য দুঃখ পান। আমি এমন আত্মীয় কুটুম্বজনকে জানি যাঁরা বাড়িতে ইংরেজিতেই কথা বলেন।

'হাজার হাজার যুবকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে ইংরেজি না জানলে ভারতবর্ষের স্বরাজ প্রাপ্তির কল্পনা একটি অসার কল্পনা মাত্র। এই ধারণা সমাজে এমন ভাবে শেকড় গেড়ে বসেছে যে মনে হয় শিক্ষার অর্থ শুধু ইংরেজি ভাষাব জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়। আমার বুদ্ধি ও বিবেচনায় এটা আমাদের দাসত্ব ও অধঃপতনের নজির। আজ যেভাবে আঞ্চলিক ভাষাগুলি উপেক্ষিত এবং আঞ্চলিক ভাষার বিদ্বান লেখক সাহিত্যিকদের শুধু ক্ষিদের তাড়নায় মুখ দিয়ে লালা ঝরে পড়ছে এ দৃশ্য অসহনীয়। মা-বাপেরা নিজের ছেলেমেয়েদের, স্বামী-স্ত্রীকে নিজের মাতৃভাষা বাদ দিয়ে ইংরেজিতে চিঠি লিখবে এ আমি কেমন করে বরদাস্ত করি।

'বিশ্বকবির মতো আমিও বিহঙ্গের স্বাধীনতায় মুগ্ধ। খোলা হাওয়া আমিও খুব পছন্দ করি। আমি চাই না যে আমার ঘরের আবহাওয়া চারিদিক দেয়াল ঘেরা গুমোট হয়, সব জানলা দরজা বন্ধ করে এক দম বন্ধ কবা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আমিও চাই যে আমার বাড়ির আশেপাশে দেশ বিদেশের সংস্কৃতিব হাওয়া বয়। তবে আমি চাই না যে সে হাওয়া ঝড়ের বেগে মাটি থেকেই না আমায় উপড়ে ফেলে। পরের বাড়িতে অতিথি, ভিখিরি বা গোলাম হয়ে থাকতেও আমি রাজী নই। মিথ্যা অহংকারের জোবে তথাকথিত সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবার লোভে পড়ে নিজের দেশের বোনেদেব উপব অনর্থক ইংরেজি শিক্ষার বোঝা চাপানো আমি অস্বীকার করি। তবে আমাদেব দেশের যুবক যুবতীরা যদি সাহিত্যের প্রতি প্রীতিবশত অন্যান্য ভাষাব মতো ইংরেজি ভাষাও গভীর অনুরাগ নিয়ে পড়ে তাতে আমার কোনো অনিচ্ছা নেই। এবং তাদের কাছ থেকে আমি মনে মনে এ আশা করব যে, ডঃ বোস, ডঃ রায় ও স্বয়ং কবি সম্রাটের মতো তারাও ভারতবর্ষ ও বিশ্বকে কিছু যেন দিতে পারে। তবে ভারতবর্ষের একটি লোকও যদি নিজের মাতৃভাষা ভুলে যায়, মাতৃভাষাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে বা কোনো আদর্শ বা সিদ্ধান্তকে নিজের ভাষায় বোঝাতে না পারে, তবে সে দুঃখও আমি সইতে পারব না। কবি যদি ধৈর্য রাখেন তাহলে তিনি দেখবেন যে, ভারতবর্ষ এমন কোনো কাজ করছে না যার ফলে তাকে বিদেশে বসে নিজের দেশভাইদের জন্য আফসোস করতে হবে, বা অপমানিত হতে হবে। অত্যন্ত নম্রভাবে তাঁকে আমি সচেতন করতে চাই যে, এই আন্দোলনের দরুন যেটুকু আফসোস করার মতো ঘটনা ঘটে গেছে, সেটাকেই যেন তিনি আন্দোলনের যথার্থ স্বরূপ বলে মনে না করেন। ডায়ার এবং ও ডায়ারদের নিয়ে যেমন ইংরেজদের মূল্যায়ন করা যায় না, তেমনই লন্ডনের ছাত্রদের বোকামির দ্বারা প্রচারিত ম্যালে গ্রামে যে দুর্দশার বর্ণনা করা হয়েছে, তা দিয়ে অসহযোগের মূল্যায়ন করা ততখানিই ভুল হবে।'[১]

তবুও রবীন্দ্রনাথ নীরব হয়ে রইলেন না। 'সত্যের আহ্বান'[২] নামক আর একটি প্রবন্ধ তিনি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পড়েন। এই প্রবন্ধটিতে স্পষ্টভাবে তিনি অসহযোগ এবং চরকা নীতিকে অস্বীকার করেন। শরৎ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার পার্থক্য কোথায়, তা এবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শরৎ মনে করতেন স্বাধীনতা পেলেই সব পাওয়া যাবে। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী তাই তো বলেছে, 'ভারতী, আমি চাই না দেশের সমৃদ্ধি, দেশের কল্যাণ, আমি চাই দেশের স্বাধীনতা।'

কিন্তু কবির মত ছিল একেবারেই ভিন্ন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের মন মুক্ত হলে স্বাধীনতা আপনা হতেই আসবে।

প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোর দ্বারা দাসত্বের পরিধান ভস্মীভূত হচ্ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনকারীদের মধ্যে উকিল ব্যারিস্টাররা রমরমা প্র্যাকটিস

---

১ ইংরেজি বিদ্যা এবং রবিবাবু 'হিন্দী নবজীবন', ১৩ জুন, ১৯২১

২ ২৯ অগাস্ট, ১৯২১

ছেড়ে দিলেন। জাতীয় পঞ্চায়েতের স্থাপনা করা হচ্ছিল। শরৎবাবুও নিজের সাহিত্য সাধনা মুলতবী রেখে দেশবন্ধুর কাছে চলে যেতেন। দেশবন্ধুর লেখা চিঠিপত্রের বিষয়বস্তুর মনোনয়ন ও সম্পাদনায় সাহায্য করতেন। কখনও বা নিজেও লিখতেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর একটি চিঠি,[১] যেটি তিনি শরৎবাবুর প্রতিবেশী শ্রীভোলানাথ রায়কে লিখেছিলেন, তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ভাষণ দেওয়া শরৎবাবুর পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, ' আমি অনেককে আশা দিয়েছি যে, শরৎবাবু আবার ভাষণ দেবেন। যদি আর একদিন সভা না করা হয়, তাহলে কথার খেলাপ তো হবেই উপরন্তু মানও বজায় থাকবে না।'

এইভাবে অনেকগুলি দিন, সপ্তাহ, মাস কেটে গেল। সারা দেশ একটি নতুন চেতনায় মুখর হয়ে ওঠে। হিন্দু মুসলমানরাও এক প্রাণ দুই দেহ হয়ে যায়। 'বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লাহ আকবরে'র সম্মিলিত স্বর নিনাদ ভারতের ভাগ্যাকাশে অনুরণিত হচ্ছিল। মানুষের সেই উদ্দাম কর্মশক্তি, উল্লাস, উৎসাহ ও মৃত্যুঞ্জয়ী আশাবাদ, সেই স্নেহ ও দীপ্তি আর কখনও দেখা যায় নি। গান্ধীজীর স্বরাজের শ্লোগান এক বছরের মধ্যেই যেন সঞ্জীবনী মন্ত্রের কাজ করেছিল। 'তিলক স্বরাজ ফন্ডের' জন্য এক কোটি টাকার আবেদনে লোকেরা অর্থের বন্যা বইয়ে দিল। স্ত্রীলোকেরা গায়ের গয়না পর্যন্ত দান করে দিলেন।

ওদিকে সরকারের দুশ্চিন্তার আর সীমা পরিসীমা ছিল না। বছরের শেষে যুবরাজের ভারতবর্ষে আসার কথা ছিল। অখিল ভারতীয় কংগ্রেসের কার্যসমিতি যুবরাজের আগমনের জন্য কোনোরকম অভ্যর্থনা করার পক্ষে ছিল না। ক্রিশ্চান এবং পার্শিরা ছাড়া দেশের সমস্ত জনগণ কংগ্রেস সমিতির আদেশকে মেনে নেন। এই নিয়ে বোম্বাইয়ে ভয়ংকর মারামারি-কাটাকাটি হয়। এই ঘটনায় মহাত্মা গান্ধী খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। কংগ্রেস কার্যসমিতি এই শর্তে বাংলা দেশকে সবিনয় অবজ্ঞা আন্দোলনের অনুমতি দেন যে, ব্যবহার ও কথাবার্তা দুটি বিষয়েই সে অহিংস থাকবে।

বাংলায় এই আন্দোলনের সঞ্চালক ছিলেন দেশবন্ধু। খাদিনির্মিত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য বাজারে যে স্বেচ্ছাসেবকেরা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে তাঁর পুত্রও যোগ দেয়, ফলে গ্রেফতার করা হয়। এরপর দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও বোন ঊর্মিলা দেবী নেতৃত্বের ভার নেন। এই সময়েই যুবরাজ কলকাতায় আসেন। এ দিনটিতে ধর্মঘট করার অপরাধে বাসন্তী দেবীকে গ্রেফতার করা হয়। সারা বাংলা উত্তেজনায় ক্ষেপে ওঠে। শরৎচন্দ্রও মেতে ওঠেন। 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক জলধর সেন শরৎবাবুকে খুবই স্নেহ করতেন, কিন্তু বার বার হতাশ হয়েও লেখা নেবার জন্য তাঁর কাছে আসা তিনি ছাড়েন নি। সেদিন এসে বললেন, 'অনেকদিন হল তুমি কিছু লেখনি, শরৎ। এবার আবার শুরু করো।' শরৎচন্দ্র তখন গড়গড়া টানছিলেন, সেটা সরিয়ে বললেন, 'লিখব? কাদের জন্য? কী লিখব? লিখে কী হবে?

'বাসন্তী দেবী ও তাঁর একমাত্র ছেলে কলকাতার রাজপথে গ্রেফতার হলেন, অথচ সেদিন বাঙালীরা লাটসাহেবের বাড়িতে গিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে এলেন। এখনও লোকে বিলিতি কাপড় পরছে, সরকারী চাকরি করছে, কোর্টে কাছারিতে উকিল ব্যারিস্টারের দল গিজ গিজ করছে, আমরা শুধু ভাড়ার টাট্টু কেনা গোলাম।'

বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডশে দেশবন্ধুর সঙ্গে কিছু একটা বোঝাপড়া করার জন্য ডেকে পাঠান কিন্তু দেশবন্ধু তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে গ্রেফতার হলেন। অন্যান্য নেতাও বন্দী হলেন। শরৎ তখনও বন্দী হন নি। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'যখন চারিদিকে গ্রেফতারের হিড়িক আরম্ভ হল, সেই সময়ে শরৎবাবু একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ওহে হেমন্ত, জেলখানাতে আফিম খেতে দেয়?"

১ ডাকমোহর, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২২

'হেমন্ত সরকার বললেন, "আজ্ঞে না।"

"তামাক খেতে দেয়?"

"আজ্ঞে তাও দেয় না।"

"তবে বাপু আমার জেলে যাওয়া হবে না।"

'দেশবন্ধু তখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হন নি। শরতের কথা শুনে হেসে বললেন, "কি রকম?"

শরৎচন্দ্র বললেন, "আরে দূর দূর! জেলখানাটা মোটেই দেখছি ভদ্রলোকের স্থান নয়, ও আমার পোষাবে না। গভর্নমেন্ট যদি গুলি গোলা চালিয়ে দেয় তার মুখে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু ওই ভেড়ার গোয়ালে বসে বসে দিনরাত্রি কড়ি কাঠ গুণে গুণে মাসের পর মাস কাটানো আমার দ্বারা হবে না।'

প্রচলিত অর্থে শরৎবাবু ঠিক জননেতা ছিলেন না। বরং তাঁকে বন্ধু ও পরামর্শদাতা বললেই ঠিক বলা হয়। সে সময় শুধু কংগ্রেস নয়, কংগ্রেস ভলান্টিয়ার বোর্ডকেও অবৈধ ঘোষণা করা হয় শরৎ ভলান্টিয়ার কোরের সদস্য ছিলেন না, সেজন্য তাঁর গ্রেফতার হওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। তিনি যেমন বরাবর কংগ্রেসের কাজ করে এসেছেন, সেইরকম করছিলেন।

এতদিন পর্যন্ত শরৎ দাড়ি রাখতেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন দাড়ি গোঁফ কামিয়ে 'সার্ভেন্ট'-এর কার্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শরতের দাড়ি বিহীন মুখখানি দেখে সম্পাদক শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন! আপনার দাড়ি কি হল?' শরৎবাবু বললেন, 'আজকাল এই আন্দোলনে যে অপরাধের জন্য একজন হিন্দুকে ছ মাসের দণ্ড দেওয়া হচ্ছে, সেই একই অপরাধের জন্য মুসলমানদের তার দ্বিগুণ অর্থাৎ এক বছরের সাজা দেওয়া হচ্ছে, তাই আমি হিন্দু হয়ে গেছি।'

শুনে সবার কী অট্টহাসি! এই রকম রঙ্গ করে বলার মধ্যে শরতের অবচেতন মনে জেলে যাবার অদম্য স্পৃহা ছিল।

যুবরাজের আসার আগেও একবার তাঁর সম্বন্ধে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, সে বিষয়ে কথাবার্তা হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে একটি দল ভাইসরয়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সে সময় আলিপুর জেলে। জেলের মধ্যেই টেলিফোনযোগে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলা হয় এবং আমেদাবাদ থেকে গান্ধীজীর মত নেওয়া হয়, কিন্তু কয়েদীদের ছাড়া পাওয়া বা পিকেটিং এর বিষয়ে কোনো বোঝাপড়া করা হয়নি।

যুবরাজ কলকাতায় এলেন।[১] কিন্তু কলকাতা মহানগরী সেদিন যেন শ্মশানের মতো নীরবতার আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখেছিল। এমন কি কসাই-এর দোকানগুলি পর্যন্ত বন্ধ থাকে। দেশবন্ধু স্বয়ং আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ওদিকে উপেন্দ্রমামাকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্র খালিপায়ে হাওড়া পুলের কাছে অগণিত জনতার ভিড় সামলাতে ব্যস্ত। পরিপূর্ণ আয়োজনের সঙ্গে আর কখনও এমন ধর্মঘট হয় নি। ধর্মঘটের সাফল্যের জন্য ইওরোপীয়ানরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সরকারের দমননীতি আরও তীব্ররূপ ধারণ করল, অসহযোগ আন্দোলনও হয়ে উঠল তীব্রতর।

এই আবহাওয়ার মধ্যে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। দেশবন্ধু সভাপতি নির্বাচিত হন। তবে তখন তিনি জেলে। সেই জন্য তাঁর বদলে হাকিম আজমল খাঁ কার্যনির্বাহক সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন। দেশবন্ধুর লিখিত ভাষণ ভারত-কোকিলা সরোজিনী নাইডু পড়েন। ভাষণে দেশবন্ধু ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের ব্যাপক ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করার পূর্বে, আপন সভ্যতা ও নিজেকে জেনে নেওয়া উচিত।'

১ ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২১

'গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' এর বিষয়ে তিনি ঘোষণা করেন, 'এই অ্যাক্টকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার সেতু হিসেবে স্বীকার করার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি না। আমি সম্মান বেচে শান্তি কিনতে চাই না। যতদিন পর্যন্ত অ্যাক্ট-এর এই প্রাক্-কথনটি বজায় রাখা হবে এবং যতক্ষণ না নিজেদের ঘর সংসারের ব্যবস্থা, নিজেদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং নিজের ভাগ্য নির্ণয়ের অধিকার আমাদের দেওয়া হচ্ছে, আমি মিটমাটের কোনো শর্তের উপরেই আলোচনা করতে রাজী নই।'

আন্দোলনের সমাপ্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দেশের প্রতিটি কোণায় অহিংস বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু এই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে।

গোরখপুর জেলার চৌরীচৌরা গ্রামে[১] কংগ্রেসের একটি মিছিল বের হয়, সেই সময় হঠাৎ দাঙ্গা বেধে যায়। এই দাঙ্গার ফলে একুশজন সেপাই ও একজন দারোগাকে থানায় বন্ধ করে জনতা থানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। কাউকে বেরোতে দেওয়া হয়নি, সবাই একসঙ্গে পুড়ে মরে যায়।

এর আগে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও এইরকম ঘটনা ঘটে। তিপ্পান্নজন ব্যক্তি মারা যায় ও চারশোজন আহত হয়। এইসব ঘটনায় গান্ধীজী বড়ই বিচলিত হন। বারদৌলিতে কার্যসমিতির[২] একটি বৈঠক হয়, যাতে সামগ্রিক সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার উদ্দেশ্য পরিত্যাগের পরিকল্পনা করা হয়। কংগ্রেসের লোকদের নিকট অনুরোধ করা হয়, তাঁরা যেন গ্রেফতার হওয়া এবং সাজা পাওয়ার জন্যই কোনো কাজ না করেন। একটি গঠনমূলক কার্যক্রম রচনা করা হয়— যার দরুন কংগ্রেসের জন্য এক কোটি সদস্য সংগ্রহ করা, চরকার প্রচার, জাতীয় বিদ্যালয় খোলা, মাদকদ্রব্যের নিষেধের জন্য প্রচার এবং পঞ্চায়েতমণ্ডলীর সংগঠন ইত্যাদি করাই প্রধান কার্যরূপে পরিগণিত হয়।

সংগঠনমূলক ও সৃজনমূলক কার্য-প্রণালীর দ্বারা গান্ধীজী পুনরায় অহিংস পরিবেশের সৃষ্টি করতে চাইছিলেন। কিন্তু যে সব বড় বড় নেতা জেলে বন্দী ছিলেন, তাঁদের মনে হল যে, গান্ধীজী আন্দোলনটিকে একেবারে নিষ্প্রাণ করে ফেলেছেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও লালা লাজপত রায় জেলে বসেই দীর্ঘপত্র লেখেন। তাঁরা বলেন যে, কোনো একটি স্থান বিশেষের কোনো অপরাধের জন্য সম্পূর্ণ দেশকে দণ্ড দেওয়ার কোনো অধিকার গান্ধীজীর নেই। দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্রেরও তাই বিশ্বাস ছিল।শচীনন্দন লিখেছেন,'তাঁর মন একেবারে ভেঙে গেছে।বললেন, "মহাত্মাজী ভয়ানক ভুল করলেন। এ অবস্থায় আন্দোলনকে স্থগিত রাখা মানে টুঁটি টিপে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটানো। Mass revolution একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। এ মুভমেন্ট আর রিভাইভ করবে না।.....ভেবেছিলুম এই আন্দোলনে স্বরাজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, তা মহাত্মাজী আন্দোলন আরম্ভই করলেন না।....গোটাকতক কনস্টেবল Infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে; তাতে কী হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই তো! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে,সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই তো ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে?··· নন-ভায়োলেন্স খুব noble idea কিন্তু achievement of freedom is nobler, hundred times nobler".'

সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবার ফলে মানুষের উৎসাহের জোয়ারে ভাটা পড়ে গেল। সরকার এই সুযোগ ও ক্ষণটুকুর অপেক্ষায় ছিল। সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করল[৩] এবং রাজদ্রোহের অপরাধে ছ'মাসের জন্য গান্ধীজী বন্দী হলেন। চল্লিশ কোটি জনতার নেতা যিনি ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণে আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিলেন, নিজের হাতেই সে আগুন ঠান্ডা করে দৃঢ়

১. ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২
২. ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২
৩. ১৩ মার্চ, ১৯২২

পদক্ষেপে ক্ষীণকায় মহামানব যারবেদা জেলে গিয়ে ঢুকলেন। জেলের ফাটক বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবিনয় অবজ্ঞা আন্দোলনের প্রথম দৃশ্যের উপর যবনিকা পড়ল। সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার জন্য শরৎচন্দ্র মনে বড়ই ব্যথা পান। মহাত্মাজী জেলে বন্দী হওয়ার পর 'মহাত্মাজী' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, প্রবন্ধটি পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কয়েকদিন আগেও তিনি গান্ধীজীর উপর তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু আজ মহাত্মার অন্তরতম সত্যটি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন, এই শব্দ-কয়টি যেন শরতের মনের পুঞ্জীভূত এক বেদনা।

'যিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ, যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিয়া যাঁহার কোন কিছু নাই, আর্তের জন্য,পীড়িতের জন্য সন্ন্যাসী, এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে, যাহার অপরাধে এই মানুষটিকেও আজ জেলে যাইতে হইল।'

৬

সেদিন জলধরদা দেখা করতে গিয়ে দেখলেন, শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কিছু লিখছেন। অদ্ভুত এক প্রসন্নতায় মুখখানি ভরে উঠেছে, চোখে যেন কিসের দীপ্তি, খুব দ্রুতগতিতে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশেই গড়গড়া রাখা, সেদিকে খেয়ালও নেই। ছিলিমের আগুন নিভে গিয়েছে। জলধর দাদা এই সব দেখে খুব খুশি হলেন। আনন্দের আতিশয্যে হাতের ছড়ি তিনি টেবিলে ঠুকে শব্দ করলেন। শরৎচন্দ্রকে চমকে দিয়ে বললেন, 'বেশ! বেশ! এতদিন পরে তুমি কলম ধরেছ, শরৎ! তুমি লিখছ?' মুখ তুলে শরৎ বললেন, 'হ্যাঁ দাদা, লিখছি।' দাদা খুশি হয়ে পাশের চেয়ারটি দখল করে বললেন, 'কী আরম্ভ করেছ? কী লিখছ আজকাল?' বড় ভায়ের মতো এই বন্ধুটির জন্য শরৎচন্দ্রের মনে বড় কষ্ট হল। ম্লান হেসে বললেন, 'লম্বা উপন্যাস লিখছি না দাদা, দেশবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন, তাঁর জন্য সার্বজনিক অভিনন্দনের আয়োজন হয়েছে, সেই অভিনন্দনপত্রটি লিখছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই জলধর দাদার মুখটি ম্লান হয়ে এল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললে, 'না, তোমায় আর বিরক্ত করব না। তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

সবিনয় অবজ্ঞা আন্দোলনকে নতুন রূপ দেবার পরিকল্পনা দেশবন্ধুর মনে জেলে বসেই জাগে। তিনি কাউন্সিলে প্রবেশের জন্য প্রস্তাব পেশ করলেন। অসহযোগের যুগে এই প্রস্তাবটি সবাইকে চমক দেবার মতোই ব্যাপার। শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর বিপক্ষে যাননি। তিনি পরিষদকে ভেঙে ফেলতে চাইছিলেন, কিন্তু কাউন্সিলে প্রবেশ করার পরই এ কাজে হাত দেবার তাঁর মনোগত ইচ্ছা ছিল। তিনি বললেন, 'এই পরিবর্তিত পরিষদ রাজতন্ত্রের মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়। এ মুখোশ খুলে ফেলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। পরিষদগুলিকে নষ্ট করে ফেললে সবচেয়ে প্রভাবশালী বহিষ্কার করা হয়। যদি নির্বাচনে নামা হয় তাহলে তার ফলাফলই স্পষ্ট করে দেবে যে, আমরা যেটুকু করেছি লক্ষ্যহীনভাবে করিনি, তথ্যের উপর ভর করেই এগিয়ে গেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বহুমত আমার পক্ষে থাকবে।'

সারা বাংলা দেশবন্ধুর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। এমন কি, এই কারণে কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে শরৎচন্দ্রকে পদত্যাগ করতে হয়।[৩] দুটি দলে ভাগ হয়ে যায় কংগ্রেস। পরিবর্তনবাদী ও অপরিবর্তনবাদী। গয়া অধিবেশনে[৪] দেশবন্ধু সভাপতিত্ব করেন।

১ 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধ।
২ জুন, ১৯২২
৩ ১৪ জুলাই, ১৯২২
৪ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯২২

শরৎচন্দ্র সে সময় অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন কিন্তু অসুস্থতার দরুন মাঝপথ থেকেই তাঁকে কলকাতা ফিরে আসতে হয়। তবুও তিনি কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাবটির পূর্ণ সমর্থন করে বলেন, 'অসহযোগ আন্দোলনকে হঠাৎ স্থগিত করে রাখার জন্য যে ঘোর নিরাশার সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে নিস্কৃতি পাবার এটাই একমাত্র উপায়।'

চারিদিকে বিরোধ ও অপ্রিয় আলোচনা অশিষ্ট ধরনের আক্রমণের মধ্যেও তিনি ক্রমাগত দেশবন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন এবং যে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রচার নিরলসভাবে করে গেছেন।

গয়া অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু খুব স্পষ্ট ভাবেই পরিষদে প্রবেশের কথাটি বলেন, কিন্তু তাঁর প্রস্তাব পাস হয় নি। দেশবন্ধু তৎক্ষণাৎ সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। পরে মতিলাল নেহরুর সহযোগিতায় স্বরাজ পার্টি[১] গঠন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, দেশবাসীকে একদিন না একদিন তাঁর কর্মপদ্ধতি মানতেই হবে।

এরপর দেশবন্ধু পর্যবেক্ষণের জন্য সারা ভারতে ঘুরে বেড়ান। তাঁর এরকম পরিভ্রমণের সময় প্রচার-কার্য কী ধরনের ছিল, সে বিষয়ে মতভেদ থাকাই সম্ভব। একথাও ঠিক যে, রাজনৈতিক উত্তেজনায় মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাই হোক, অবশেষে দেশবন্ধুর কর্মধারাকে দেশবাসী গ্রহণ করে। কিছুদিন পর বোম্বাইতে কর্ম সমিতি ও মহাসমিতির বৈঠক বসে।[২] সর্বসম্মতিক্রমে দেশবন্ধু মহাসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রীপুরুষোত্তম দাস টন্ডন দ্বারা প্রস্তাবিত এবং শ্রীজওহরলাল নেহরু দ্বারা অনুমোদিত এই প্রস্তাবটি সমিতি দ্বারা পাস হয়, এই মর্মে যে, কংগ্রেসের সব সদস্যদের আপন আপন মতভেদ ভুলে গিয়ে এক হয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী স্বীকৃত প্রস্তাব সম্বন্ধে আর কোন রকমের প্রচারকার্য করা হবে না।

কংগ্রেসের মধ্যে যে বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তা যেন এবার দূর হল। নিজের প্রদেশেই দেশবন্ধুকে সবচেয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। বোম্বাইতে মহাসমিতির বৈঠক হওয়ার দু'সপ্তাহ আগে বরিশালে বঙ্গীয় প্রদেশ কমিটির কয়েকটি বৈঠক হয়।[৩] শচীনন্দন লিখেছেন,'দেশবন্ধু সদলে গেলেন। শরৎচন্দ্র সঙ্গে ছিলেন। সভাতে দেশবন্ধু অনুচরগণ সহ সাধারণ সদস্যদের আসনে গিয়ে বসলেন। কেউ তাঁকে মঞ্চে গিয়ে নেতাদের আসনে বসবার জন্যও অনুরোধ পর্যন্ত করল না। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সভাপতি। দেশবন্ধু সভাপতিকে একটা Ruling সম্বন্ধে কি বলতে উঠলেন, শ্যামবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "I won't hear that man." দেশবন্ধুর চোখ দুটো অভিমানে জ্বলে উঠল। তিনি বললেন, "শ্যামবাবু,আমি অনেকদিন ব্যারিস্টারি করেছি, কখনও হাইকোর্টের কোনো জজ আমাকে বলতে পারেন নি যে, তিনি আমার কথা শুনবেন না; আর আজ আপনি বললেন!" শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "শ্যামবাবু, আপনি দেশবন্ধুকে 'That man' বললেন; 'That gentleman' পর্যন্ত বলতে পারলেন না?"

'শ্যামবাবু উত্তেজিত হয়ে শরৎচন্দ্রকে বললেন, "I can't stand your face" শরৎচন্দ্র অপমান সহ্য করতে পারলেন না। রাজনীতি করতে হলে যে পরিমাণ মোটা চামড়া হওয়া দরকার, শরৎচন্দ্র সেরূপ ছিলেন না। রাগে গরগর করতে করতে তিনি সভা ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন।

'বাসায় ফিরে দেখা গেল শরৎচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় কেবল পায়চারি করছেন। দেশবন্ধু সদলবলে গৃহে প্রবেশ করা মাত্র শরৎচন্দ্র ছুটে এসে আলিপুর বোমার মামলার প্রসিদ্ধ আসামী দ্বীপান্তর ফেরতা শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে

১ ১ জানুয়ারি, ১৯২৩
২. ২৫-২৭ মে, ১৯২৩
৩. ১৩ মে, ১৯২৩

বলে উঠলেন, "উপীন, তুমি তো ভাই বোমা পার্টির লীডার ছিলে, আমাকে একটা বোমা তৈরি করে দিতে পার?" উপীনদা জিজ্ঞেস করলেন, "বোমা নিয়ে কী করবেন আপনি?"

"ঐ শ্যামু চক্কোত্তির মাথায় ছুঁড়ে মারব। ও আমাকে বলে কি না I can't stand your face! আরে বাবা, বারেন্দো বামুন! বামুনের মধ্যে বারেন্দো, আর রোগের মধ্যে—"

'প্রচণ্ড হাসির কোরাসে ঘর পূর্ণ হয়ে গেল। দেশবন্ধু অবধি উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র দারুণ ক্রোধে দেশবন্ধুকে বললেন, "হাসছেন? আপনি শুধু হাসছেন! আমাকে এমন করে অপমান করলে তবুও হাসি আসছে আপনার? যে রাজনীতি করতে ভদ্রলোককে এমন অপমানিত হতে হয়, তাতে আর আমি নেই-"

'দেশবন্ধু সস্নেহ হাস্যে শরৎচন্দ্রের একখানি হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "তাই করুন শরৎবাবু, এবারে আপনি ছেড়ে দিন। আপনি সাহিত্যিক, শিল্পী মানুষ; আপনার অনুভূতি বড় ডেলিকেট। এত ব্যথা আর অপমান আপনার সহ্য হবে না আপনি কংগ্রেস আর পলিটিক্স একেবারে ছেড়ে দিন।"

'শরৎচন্দ্র একখানি চেয়ারে গিয়ে বসলেন। গড়গড়া তৈরি ছিল, সটকায় গোটা দুই টান মেরে বললেন, "কিন্তু কী করে ছাড়ি!"

'সহসা কণ্ঠে যেন তাঁর বেদনা শতধারে ফেটে পড়ল, নয়ন সজল হয়ে উঠল। বুকের গভীর তলদেশ থেকে একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "আপনার এই অসহায় অবস্থা, চারিদিকে এই বাধা বিদ্রূপের বেড়াজাল, এর মধ্যে আপনাকে বিসর্জন দিয়ে, পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করি কী করে? আমাদের ব্যথা তো নিতান্তই সামান্য, কিন্তু আপনি যে দুঃখের মহার্ণব হয়ে রয়েছেন। না, আপনাকে ফেলে পালাতে পারব না!"

'এই বলে তিনি গড়গড়ায় জোরে জোরে টান দিতে লাগলেন।'

এই সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থানীয় শাখা তাঁর সম্মানার্থে একটি সভা করে। সেই সভায় দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায় ও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অভিনন্দন গ্রহণ করার পর তিনি বললেন, 'মহান সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, আমাদের দেশে আজকের এই অবস্থায় সে সাহিত্য সৃষ্টি করা যেতে পারে না। কারণ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো দিক দিয়েই আমরা মুক্ত নই। যেদিন সে মুক্তি পাব, সেদিন মুক্তির সেই আনন্দধারার মধ্যে সত্যিকারের সাহিত্য নিজে থেকেই সৃষ্ট হবে।'

দেশের স্বাধীনতা শরৎচন্দ্র আন্তরিকভাবে কামনা করতেন, তাই তো তিনি কায়মনোবাক্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবন্ধুর সঙ্গে নেমে পড়েছিলেন। দূষিত আবহাওয়া ও সংগ্রামের মধ্যেও বোম্বাই সমিতির সদস্যদের নিজের দিকে করে নিয়েছিলেন। এ ছাড়া মৌলানা আজাদ-এর সভাপতিত্বে দিল্লিতে একটি বিশেষ অধিবেশন[১] অনুষ্ঠিত হয়। দিলীপকুমার রায় এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রও এই সভায় যোগ দিতে আসেন। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের দুটি দলের মধ্যে শেষবারের মতো বোঝাপড়া হয়ে যায় এবং আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবার এবং নিজের নিজের মত ও অধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা সবাইকে দেওয়া হয়। কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে সব রকমের কার্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিধানসভায় আসার পর দেশবন্ধু নতুন সংশোধন ইত্যাদি নিরর্থক প্রমাণ করতে চাইছিলেন। তিনি বললেন, 'আমার বলার উদ্দেশ্য হল, যারা আমাদের রক্ত চুষে নিচ্ছে, সেই সংশোধনগুলি নষ্ট করবার জন্য আমাদের সক্রিয় হওয়া উচিত, নইলে এগোন নিষ্প্রয়োজন। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, এই বোঝাপড়ার প্রস্তাবে অহিংস অসহযোগের সিদ্ধান্তের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরিষদে আমরা সংখ্যালঘু হলে সীটগুলি আমরা শূন্যই রাখব। তারা অসহযোগে প্রদীপের আলো জোগাবে।'

১ ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২২

ঠিক এর পরেই বেঙ্গল কাউন্সিলের নির্বাচন হয়। শরৎচন্দ্রকে দেশবন্ধু বলেন, 'আপনি হাওড়া থেকে দাঁড়ান।'

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, 'তামাশা করছেন? আমি দাঁড়াব কাউন্সিলের নির্বাচনে?'

'দাঁড়াবেন না-ই বা কেন?'

'না, না, তাই কি হয়! আমি একজন সাধারণ লেখক। আমি কি নির্বাচনে দাঁড়াবার যোগ্য? লোকে বলবে কী?' দেশবন্ধু বিস্ময় সহকারে বললেন, 'এ আপনি কী বলছেন, শরৎবাবু?'

শরৎচন্দ্র বললেন,' ঠিকই বলছি! দেশের জন্য আমি কী করেছি? জেলেও যাইনি, ওকালতি বা ব্যারিস্টারিও ছাড়িনি। কোনো রকমের ত্যাগও স্বীকার করিনি, দেশচ্যুত হইনি, হওয়ার শাস্তিও আমি ভোগ করিনি। আপনি আমায় ভালোবাসেন, এ আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি নিজেও একজন কবি ও সাহিত্যিক। সাহিত্যিক হিসেবেই আপনি আমায় ভালোবাসেন। বন্ধুত্বের খাতিরে আমি আপনার প্রিয়জনও হতে পারি, কিন্তু দেশের জনতা তারা কেন আমায় ভালোবাসবে, কেন সম্মান দেবে? আমি আমার সাধনাকে রাজনীতির মূলধন করতে চাই না। বিশেষ করে কাউন্সিলের কাজ এবং ইংরেজিতে ভাষণ দেওয়া ও শোনার কাজ এ দুটোর প্রতিই আমার খুব অরুচি। আপনি আমায় মুক্তি দিন। আমার বদলে এমন কাউকে দাঁড় করান যাকে জনতা মন থেকে নেবে। এমনিতেই তো আপনার বিপদের শেষ নেই। নির্বাচনী মত দেবার অধিকার যাদের হাতে, তাদের উপর নিজের রুচির বোঝা চাপিয়ে নিজের বিপদ আর বাড়াবেন না।'

এমন কথা একমাত্র শিল্পী শরৎই বলতে পারেন। সে সময় তিনি খ্যাতির শীর্ষে। লোকের মুখে মুখে তাঁর নাম। খুব সহজেই কাউন্সিলের সদস্য এবং হাওড়া ম্যুনিসিপাল কমিটির চেয়ারম্যান তিনি হতে পারতেন। কিন্তু আজীবনের সঙ্গী আলস্য ও বৈরাগী মন তাঁকে কিছুই করতে দিতে চাইত না, দূরে দূরে সরিয়ে রাখত। সাহিত্যকে রাজনীতির মূলধন তিনি কোনোদিনই করেন নি।

যখন কলকাতা পুরসভার নির্বাচন হয় অধিকাংশ সীটগুলি নির্বিরোধে পেয়ে যান দেশবন্ধু। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশই ছিলেন কলকাতার প্রথম মেয়র। শরৎচন্দ্র যেমন আড়ালে ছিলেন, তখনও ঠিক আড়ালে থেকেও দেশবন্ধুর পাশেই রইলেন। দেশবন্ধু যখন ' ফরওয়ার্ড' দৈনিক পত্র শুরু করেন, তখন শেয়ার বিক্রির কাজে তিনি যথোচিত সাহায্য করেন। চাঁদা করে টাকা যোগাড়ের প্রতি তাঁর একেবারে রুচি ছিল না, কিন্তু দেশবন্ধু যখন গ্রাম সংগঠনের জন্য তিন লক্ষ টাকার পরিকল্পনা তৈরি করলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা ভিক্ষা করে বেড়িয়েছিলেন।

সেদিন বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল, বৃষ্টি হচ্ছিল। তবুও সেই অন্ধকার বৃষ্টিভরা রাতে শিয়ালদহে কোনো এক বড়লোকের বাড়ির বৈঠকখানায় টাকা পাবার আশায় সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্র বসে ছিলেন। শেষে শরৎ রাগ করে বলেন, 'এ যেন শুধু আপনারই গরজ? কেন? দেশের সাধারণ জনতা যদি এতই বিমুখ, তবে থাক্। কোনো কাজ করার দরকার নেই।'

শরতের কথা শুনে দেশবন্ধু মনে দুঃখ পেয়েছিলেন। বললেন,'একথা ঠিক নয়, শরৎবাবু। দোষ তো আমাদেরই। আমরা কাজ করতে জানি না, নিজেদের কর্মপদ্ধতিও অপরকে ভালোভাবে বোঝাতে পারি না। বাঙালী ভাবপ্রবণ হতে পারে, তবে তারা কৃপণ নয়। আজ হয়তো বুঝতে পারছে না, যেদিন বুঝবে সেদিন সর্বস্ব আমাদের হাতে তুলে দেবে।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও ঠিক এইরকমই আশাবাদী ছিলেন। তাঁর বিষয়ে একবার দেশবন্ধু বলেছিলেন, 'নারী কর্মমন্দিরের দুজন মহিলা ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সঙ্গে নিয়ে ঝড়

---

১ ২৩ অক্টোবর, ১৯২৩

জলের রাত্রে আমরা সবাই আমতা জেলার দিকে গিয়েছিলাম, · আমাদের আসা-যাওয়ার খরচ প্রায় টাকা পঞ্চাশেক লেগে থাকবে।... পুলিশের লোকেদেরও হয়ত এতটাই খরচ হয়েছিল। বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা, বেশ-কিছু ধনী লোক বাস করেন। তবুও স্থানীয় তাঁতঘর ও চরকার উন্নতির জন্য সেখান থেকে মাত্র তিন টাকা পাঁচ আনা চাঁদা আদায় হয়। তারপর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় খুব পরিশ্রম সহকারে আবিষ্কার করেন যে, সেখানকার দু-জন উকিল বিলিতি কাপড় কেনেন না। তাছাড়া তাঁর বক্তৃতা শুনে একজন মুগ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভবিষ্যতে তিনি আর কোনোদিন বিলিতি কাপড় কিনবেন না.....। প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রফুল্ল মনে চুপি চুপি আমায় বললেন,"জেলাটি বেশ, বর্ধিষ্ণু, আমাদের আর একটু লেগে থাকতে হবে"।'

দেশবন্ধুর দেশপ্রীতি শরৎ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারতেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে একমাত্র শরৎই বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। বেশির ভাগ লোকই তো তাঁর অনুগত শিষ্যের দল ছিল। চারিদিকের আঘাত পীড়ন ও নৈরাশ্যে তিনি যখন ব্যাকুল হয়ে উঠতেন, তখন শরৎ তাঁর মুখে হাসি ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। আর্থিক সাহায্য করতেও তিনি কোনোদিন পিছিয়ে যান নি। কতবার চুপি চুপি দেশবন্ধুর হাতে মোটা রকমের চেক তুলে দিয়েছেন।

তারকেশ্বরের তৎকালীন মোহান্ত সতীশ গিরির বিরুদ্ধে স্বামী সচ্চিদানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দ সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন।[১] তাঁরা দু-জনেই সংশোধনী দলের ছিলেন। অবশ্য মোহান্ত সতীশ গিরিও দুর্বল ছিলেন না। অতএব সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বানন্দ দু-জনেই দেশবন্ধুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। একদিন কোনো কারণে তাঁদের দু-জনের মধ্যে তুমুল বিরোধ হয়ে যায়। দেশবন্ধু জীবনে অনেক বড় বড় ঝগড়া ও বিরূপতার নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু এঁদের বেলায় তিনিও ব্যর্থ হলেন। সেদিন যখন দুই স্বামীজীই চেঁচিয়ে নিজের নিজের বক্তব্য বলছিলেন, শরৎ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেশবন্ধু অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন, 'শরৎবাবু, এবার তো মনে হয় প্রাণটাই চলে যাবে।'

শরৎবাবু বললেন, 'তা তো যেতেই পারে।'

দেশবন্ধু চমকে উঠলেন। শরৎ বললেন, 'মশায়, দুটো বউ নিয়ে ঘর করলে মানুষের জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়, আর আপনি তো দু-জন স্বামী নিয়ে ঘর করতে চলেছেন, আপনার জীবন বিপন্ন হবে না তো আর কার হবে?'

শরতের এই কথা শুনে দুই স্বামীজী সহ সবাই হেসে উঠলেন। হয়তো সেই কারণেই দু-জনের মধ্যে আগেকার সহজভাব ফিরে আসে।

শরৎবাবুর পরিহাস বড়ই উপভোগ্য। অনেক সময় প্রতিকূল পরিবেশকে তিনি পরিহাসের দ্বারা হালকা করে তুলতে পারতেন। সে সময় বেশির ভাগ লোকই মোটা খদ্দর পরতেন। অনিলবরণ রায় তো একটা মোটা গামছা পরেই থাকতেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসু অত্যন্ত মিহি খদ্দরের সুতোর ধুতি, পাঞ্জাবী পরতেন ও চাদর গায়ে দিতেন। দারুণ লম্বাচওড়া বিশালকায় মানুষ ছিলেন তিনি। ধুতি হাঁটুর নীচে পর্যন্ত কুলোত না, বেশি ঝুলের পাঞ্জাবী পরতেন, তার উপর চাদর। একদিন কেউ হাসিচ্ছলেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শরৎবাবু, আপনার এই মিহি খদ্দরের সুতো কোথায় তৈরি হয়?'

শরৎবাবু ভাবলেন, মিহি খদ্দর পরার জন্য বুঝি তাঁর প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে। তাই রেগে গিয়ে বললেন, 'ভাগলপুরে।'

একটি অপ্রিয় ঘটনার সূত্রপাত হতে যাচ্ছিল দেখে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বললেন, 'আরে বাবা, আমাদের কাছে সব রকমের নমুনা আছে। বৈচিত্র্য থাকাই তো ভাল। অনিলবরণ রায় হলেন খদ্দরের "মাদারটিঞ্চার" আর শরৎচন্দ্র বসু হলেন গিয়ে "টু-হান্ড্রেড ডাইল্যুইশন"।'

১ ১৯২৪

হোমিওপ্যাথী ওষুধের এই রকম উদাহরণ দেওয়াতে পরিবেশটি হালকা হয়ে ওঠে। সবার অট্টহাসির তোড়ে শরৎ বসুর মনে যে ব্যঙ্গের কাঁটা ছিল তা ভেসে যায়, সবার সঙ্গে তিনিও হেসে ফেলেছিলেন।

অবশ্য কখনও কখনও শরৎ তীব্র ব্যঙ্গও করতেন। দিল্লিতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে দিল্লির দর্শনীয় স্থানগুলি তিনিও দেখতে যান। একদিন সবাই মিলে কুতবমিনারের কাছে এক ধরনের ভয়ংকর খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। তিনতলা সমান উঁচু থেকে পাতকুয়োর মত সামান্য ঘের দেওয়া জায়গার মধ্যে কৃপণের ধনের মত অতি অল্প আলোর রেখা পড়ছে, সেই কুয়োয় ঝাঁপ দেবার জন্য একটি তরুণ পাণ্ডা একটি টাকা দক্ষিণা চাইল। সুভাষ বসু ছেলেটির হাতে একটি টাকা দিলেন। টাকা পেয়ে ছেলেটি সেই তিনতলা সমান উঁচু থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় লাফ দিল। সামান্য এদিক–ওদিক হলে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। ছেলেটি বলল, 'আর একটি টাকা পেলে আর একবার লাফাতে পারি।'

সুভাষ বসু, কিরণশংকর রায়, দিলীপকুমার রায় সবাই বারণ করে দেন, কিন্তু শরৎবাবু তখুনি একটি টাকা বার করে তার হাত দিয়ে বললেন, 'যাও, লাফাও দেখি একবার।'

সুভাষচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, 'আবার কেন? এই তো দেখলেন।'

শরৎবাবু সামান্য হেসে বললেন, 'কে জানে এবারে যদি লক্ষ্য ভুল করে আঘাত লাগে বা ডুবে যায় তাহলে অন্তত একটি দুঃসাহসী পাণ্ডা তো শেষ হবে?'

দিল্লি থেকে শরৎচন্দ্র বৃন্দাবনে ছোটভাই প্রভাসচন্দ্রের (স্বামী বেদানন্দ) কাছে যান। কয়েকটি পাণ্ডা তাঁকে ঘিরে ধরে পয়সা চাইতে থাকে। কেউ ভেবে পাচ্ছিল না কী দেওয়া যায়। কিন্তু শরৎবাবু তখুনি দুটো টাকা নিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দুটো টাকা একসঙ্গে দিলেন?'

শরৎবাবু বললেন, 'দেখলেন, কেমন করে ওই টাকা দুটোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চিরদিনের জন্য আমি তাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিলাম। এ টাকা যে কার, এ মীমাংসা এরা কোনোদিন করে উঠতে পারবে না।'

এ ধরনের নিষ্ঠুর তামাশার দ্বারা বোঝা যায় এ–সবের প্রতি তাঁর কতখানি ঘৃণা ছিল।

৭

শরৎচন্দ্র এ সময় রাজনীতিতে আকণ্ঠ ডুবে যান। সাহিত্য ও সংসার দুটোর প্রতিই তাঁর তখন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবেরা এজন্য বড় মনোকষ্টে থাকতেন। যে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের উপাসক, আড্ডা মারায় যিনি ওস্তাদ, নোংরা কুকুর ভেলু ও প্রাণপ্রিয় পাখিদের জন্য যিনি সব–কিছু সহ্য করতে রাজী ছিলেন, তিনি কোথায় হারিয়ে গেলেন? রাজনীতি যেন আসল শরৎচন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলেছে। কিন্তু সে সময় শরৎচন্দ্র যে একেবারে কিছু লেখেন নি তা নয়। শরৎ গ্রন্থাবলী[১] পঞ্চম খণ্ড ছাড়া 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি ও 'দেনাপাওনা' উপন্যাস ওই সময়েই প্রকাশিত হয়। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্ব, 'পথের দাবী,' 'নব বিধান' ও 'জাগরণ' এই চারটি উপন্যাসও তিনি ওই সময়েই লেখা শুরু করেন। 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প দুটি ছাড়া তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ সেই সময়ে প্রকাশিত হয়। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের অনুবাদও[২] সে সময়ে হয়। অনুবাদ করেন কে. সি. সেন ও থিয়োডেসিয়া টমসন। ভূমিকা লেখেন ই. জি. টমসন। বইটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

১ শরৎ গ্রন্থাবলী, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩। 'নারীর মূল্য' এপ্রিল, ১৯২৩। 'দেনাপাওনা' ১৪ অগাস্ট ১৯২৩, 'মহেশ' সেপ্টেম্বর, ১৯২২, 'অভাগীর স্বর্গ' জানুয়ারি ১৯২৩।

২ ১৯২২

'দেনা পাওনা' উপন্যাসটির সঙ্গে একটি গল্প জড়ানো আছে। বিখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'বিন্দুর ছেলে' পড়ে দারুণ রেগে যান, মনে হয় বইটি না পড়েই তিনি রেগে উঠেছিলেন। কারণ শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় 'সাহিত্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা' পত্রিকায় গল্পটিকে দুর্নীতি প্রচারক হিসেবে প্রচার ও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি 'দত্তা' পড়লেন, মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। তারপর তিনি 'দেনা পাওনা' বইটি পড়েন। কী সুন্দর সহজ সাবলীল ভাষা, কী অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি! তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। নলিনীকান্ত সরকারকে তিনি বলেন, 'আমি শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কেন?'

'তাঁকে প্রণাম করে অভিনন্দন জানাতে চাই।'

বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক এর বেশি আর কী বলতে পারতেন? সত্যিই যখন দুজনের মধ্যে দেখা হয়, ক্ষীরোদবাবু অনেকক্ষণ ধরে শরৎচন্দ্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন, ছাড়তেই চাইছিলেন না।

সেই সময়কার লেখা প্রতিটি উপন্যাসে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মস্তিষ্কে অনুভূতির একটি বিরাট ভাঁড়ার ছিল। এই অনুভূতি তাঁকে প্রেরণা ও বুদ্ধি জোগাত। দারিদ্র্য, জমিদারদের অত্যাচার, স্বাধীনতা লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা এই লেখাগুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "মহেশ" গল্পটি পড়ে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন, "মহেশ" স্রষ্টা ও শিল্পীর লেখার শৈলী দেখে মনে বিস্ময় জাগে, এঁর লেখা পড়লে মনে গভীর আবেগ ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, জেলা বোর্ডের সহায়তাপ্রাপ্ত সরকারী মত প্রচার করা হয়, এমন একটি পত্রিকা 'পল্লীশ্রী'তে এই গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পটি পড়ে একজন হিন্দু জমিদার অভিযোগ করেন যে, বোর্ড দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত পত্রিকায় এ ধরনের গল্প ছাপা অনুচিত। কারণ, প্রজারা জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবে ও তাহলে দেশের সর্বনাশ হবে।

গল্পটি 'পল্লীশ্রী' পত্রিকাটিতে কেমন করে প্রকাশিত হয়, তার একটা ইতিহাস আছে। শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী অক্ষয়বাবু হুগলী গবর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ও 'পল্লীশ্রী'র সম্পাদক হতে তিনি বাধ্য হন। শরৎচন্দ্রের কাছে একদিন তিনি একটি গল্প চান। শরৎচন্দ্র 'মহেশ' গল্পটি লিখে তাঁর হাতে দেন। সেদিন হয়তো শরৎবাবু কল্পনাও করেন নি যে, এই গল্পটি শুধু তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে নয়, বরং বিশ্ব সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। অক্ষয় বাবু হয়তো বুঝেছিলেন, তাই তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে, 'মহেশ' গল্পটি 'পল্লীশ্রী'র মতো একটি সামান্য পত্রিকায় ছাপা হোক। সেইজন্য নিজেই ব্যবস্থা করলেন যাতে 'মহেশ' গল্পটি 'পল্লীশ্রী র সঙ্গে সঙ্গে 'বঙ্গবাণীতে'ও প্রকাশিত হয়।

'অভাগীর স্বর্গে' শরৎচন্দ্র অভাবগ্রস্ত দারিদ্র্যপীড়িত দুলে সমাজের দারুণ ছবি এঁকেছেন। দুলেদের সমাজে মৃতদেহ দাহ করার জন্য কঠোর বিধান নেই। কিন্তু কাঙালীর মার চিতায় পুড়ে স্বর্গে যাওয়ার বড় সাধ ছিল। সে সাধ মেটেনি। মাটিতেই পুঁতে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। নিজের হাতে পোঁতা গাছের কাঠও কাটবার তাদের অধিকার ছিল না। ছোট জাতের দুলেরা কখনও ব্রাহ্মণ–কায়স্থদের সঙ্গে এক সমান কাজ করতে পারে?

'পথের দাবী' শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতীক। নিজের ভবঘুরে জীবনে তিনি অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। সঞ্চয়ের ঝোলায় যেটুকু অনুভূতি সঞ্চিত ছিল, তা তিনি লেখার মধ্যে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। 'পথের দাবী' যে সময় তিনি লেখেন, বাংলা দেশে তখন দারুণ আন্দোলন চলছে। এছাড়া ম্যাকসিম গোর্কির 'মা' তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। শরৎ বিশ্বাস করতেন ম্যাকসিম গোর্কির সাহিত্য পড়ে জীবনের যথার্থতাকে জানা যায়।

ম্যাকসিম গোর্কির সদ্যপ্রকাশিত 'ক্রিচার দ্যাট ওয়াজ ওয়ান্‌স্‌ ম্যান' বইখানি তিনি পড়েছিলেন। পড়বার পর তিনি বলেন, 'এই গল্পগুলিতে জীবনের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে

পাওয়া যায়। গোর্কির নতুন ভাবধারা, নতুন শৈলী, নতুন রকমের টেকনিকে লেখা, মানবতার প্রতি যেন নতুন বাণী বহন করে এনেছে।'

ইলাচন্দ্র যোশী লিখেছেন, 'তখন তিনি পতিত নরনারীর সম্পর্কের যুগ পেরিয়ে এসেছেন। সাহিত্য সাধনার গভীরে এসে পৌঁছেছেন। "পথের দাবী"র কয়েকটি অধ্যায় তাঁর লেখা হয়ে গিয়েছিল। উপন্যাসটিকে তিনি নতুন মোড় দিতে চাইছিলেন। "পথের দাবী"র উপর গোর্কি লিখিত "মা"-এর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

'গোর্কি ও শরতের ব্যক্তিগত জীবনেও কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। দুজনেই জীবনের অনেকটা সময় ভবঘুরের মতন উদ্দেশ্যহীনভাবে কাটিয়েছিলেন। জীবনকে খুব গভীরভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন। দুজনেই মুক্তি সংগ্রামের প্রবল সমর্থক ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে অহিংসাকে মানলেও দেশের মুক্তির জন্য হিংসাপথের পথিকদের শরৎচন্দ্র আন্তরিক ভালোবাসতেন।'

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রমাণ তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণে'ও[১] স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় দু-বছর পর্যন্ত 'বসুমতী'তে উপন্যাসটি ছাপা হয়, কিন্তু উপন্যাসটি তিনি শেষ করতে পারেন নি। যদি পারতেন, তাহলে ভাবীকালের এটি একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হতে পারত। সাহিত্যিক তো মহাকালের স্রষ্টা, আগামী যুগের কল্পনা তাঁর পক্ষে কোনো অসাধ্য ব্যাপার নয়। 'জাগরণ' উপন্যাসটিতে নায়িকার জমিদার বাপ এক জায়গায় বলছে, 'শিক্ষার গুণে হোক, সময়ের গুণে হোক, জমিদারের অত্যাচারের ফলে হোক, দেশের প্রজাদের মধ্যে যদি এতবড় পরিবর্তন এসে থাকে, জমিদার তারা চায় না, দুদিন আগে হোক, পরে হোক তাদের যেতেই হবে, তোমরা কি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, মা?'

জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে স্পষ্ট করে সে সময়কার কোনো লেখকই কিছু লেখেননি। জানিনা কী কারণে তিনি এই উপন্যাস শেষ করতে পারেননি। হয়তো চিরদিনের সেই আলস্যবশত লেখেননি বা দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর রাজনীতির প্রতি তাঁর আর কোনো রুচি ছিল না। 'পথের দাবী'ও তিনি বহুকষ্টে 'বঙ্গবাণী'র বারংবার অনুরোধ ও আগ্রহের জন্যই শেষ করতে পেরেছিলেন।

'নববিধান'[২] পুরোনো পদ্ধতির বই। বইটিতে সাহেবি সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রাচীন রীতি-নীতির গুণগান করা হয়েছে। শরৎবাবু নিজেও বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। একবার অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় শরৎবাবুকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার লেখা কোন্ বইখানি আপনার সবচেয়ে প্রিয় বই?'

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, 'নববিধান'।

একটুক্ষণ চুপ থেকে তিনি বলেন, 'খুব অবাক লাগছে, তাই না? আমার বইটিকে কেউ সমাদর করে না। তাই এই অনাদৃত বইটির নাম আমি উল্লেখ করলাম। দেখ, তুমিও তো লেখক, তোমার লেখাও নিশ্চয় ভালো-মন্দ সাধারণ সব মিলিয়ে।'

সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতে অনেকেই শরৎচন্দ্রের কাছে আসতেন। হিন্দির একজন তরুণ লেখক ইলাচন্দ্র যোশী শরৎচন্দ্রকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। অনেক করে খুঁজে খুঁজে একদিন তিনি শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।[৩] সেখানে পৌঁছে তিনি দেখেন যে, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁতন ঘষছেন। যোশীজী বললেন, 'আমি শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'বলুন কি দরকার? আমিই শরৎচন্দ্র।'

অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে দুটি হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার লেখা

---

১ ১ অক্টোবর ১৯২৩ থেকে এপ্রিল ১৯২৫ পর্যন্ত।তাঁর মৃত্যুর পর 'অমরনাথ' নাম দিয়ে নলীমাধব মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটি শেষ করেন।

২ মার্চ, ১৯২২

৩. মার্চ, ১৯২২

পড়ে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। অনেক দিনের সাধ ছিল আপনার সঙ্গে দেখা করি, আজ আমার সে সাধ পূর্ণ হল . . .'

দাঁতন করতে করতে সেই ভদ্রলোকটি যোশীজীকে বললেন, 'ও-হো, আপনি ঔপন্যাসিক শরৎ চাটুজ্জের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? তিনি ওই দিকে থাকেন। ওই যে গলির বাঁ দিকে লাল বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন।'

যোশীজী খুব হতাশ হয়ে পড়লেন। কথামত লাল বাড়ির বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনেই ছোট মতো একটা ঘর। একটা টেবিলের চারিদিকে ঘিরে চারজন লোক বসে পাশা খেলছিলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়েই যোশীজী চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎবাবু কি এ বাড়িতে থাকেন?'

একজন প্রৌঢ়, যাঁর গোঁফ দাড়ি কিছুই ছিল না, তবে চুলগুলি অর্ধেক পাকা মুখে আঁচিল, ধুতি আর ফতুয়া পরে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাশা খেলছিলেন। চোখ তুলে বললেন,'আসুন, বসুন! কবে এলেন? কী দরকার?'

যোশীজী ভেতরে ঢুকে বললেন, 'আমার তাঁকেই শুধু দরকার।'

'বসুন, বসুন! আমিই শরৎচন্দ্র।'

'বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র?'

একবার ভুল করেছিলেন বলে এবারেও উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে ফেললেন। শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ! তা একরকম বিখ্যাত বটে।'

শরৎচন্দ্র একা ছিলেন না, সঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব থাকাতে যোশীজী একটু লজ্জা পাচ্ছিলেন, তা বুঝতে পেরে শরৎবাবু বললেন, 'চলুন! আমার বাড়ি এখান থেকে খুব কাছে, সেখানে গিয়েই গল্প করা যাক।'

যোশীজীকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্র যেই বাড়ি পৌঁছলেন, অমনি ভেলু বিকট সুরে চেঁচিয়ে উঠল। শরৎচন্দ্র ভেলুকে ধমক দিতে তবে সে চুপ করল। যে ঘরটিতে গিয়ে তাঁরা বসলেন, তা বেশ বড়ই। তবে সাজানো গোছানো নয়, ফার্নিচারও তেমন বিশেষ কিছু নজরে পড়ল না। কতকগুলি চেয়ার ও বেঞ্চি, দেয়ালে ঠেস দেওয়া কয়েকটি বইয়ের র‍্যাক। দুজনে আরাম করে চেয়ারে বসলেন। চাকর তামাক দিয়ে গেল, গড়গড়ায় টান দিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, 'এবার বলুন কী বলবেন।'

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যোশীজীর এই প্রথম সাক্ষাৎ। অনেক কিছুই তাঁর জানার ও জিজ্ঞেস করবার ছিল। শরৎ নিজেও তো কম বাক্যবাগীশ ছিলেন না। সতীত্ব ও নারীত্ব, 'শ্রীকান্ত' ও অন্নদা দিদি, উপন্যাসটির যথার্থতা ও বাস্তবিক জীবনের সত্যতা এক কিনা ইত্যাদি অনেক ধরনের আলাপ-আলোচনা হল। শিল্প বা আর্টের সম্বন্ধে শরৎবাবু নিজের মত ব্যক্ত করে বললেন, 'আমাদের দেশে শিল্পে কল্যাণ ও মঙ্গলের চিন্তাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। যে শিল্পের উদ্দেশ্য কল্যাণকর নয় তা আমার মনে কোনো ভাবের উদ্রেক করে না। শিল্পকে আমি কোনোদিনই খেলা ও কৌতুক হিসেবে দেখিনি। মানব জীবনের চরম সাধনা হল শিল্প, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।'

নিজের জীবনের অনেক পুরোনো ঘটনাও যোশীজীকে শোনান, স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও কথা ওঠে। যোশীজী জিজ্ঞেস করলেন, 'বেশ কয়েকটি উপন্যাস আপনি তথাকথিত বেশ্যা বা অসতী নারীদের নিয়ে লিখেছেন। এর কারণ কি শুধুই আপনার ব্যক্তিগত অভিরুচি, না কোনো বিশেষ আদর্শে ও উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের সিদ্ধান্তের পক্ষকে বলীয়ান করার জন্য এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন?' শরৎচন্দ্র সহজভাবে বললেন, 'দুটোই সত্যি! ব্যক্তিগতভাবে আমি এ ধরনের চরিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসি এবং তাই আমি বড় বেশি করে বুঝতে পারি যে, বেশ্যাদের উপর সমাজের বড় শোষণ, ও তারাই সর্বাধিক অত্যাচারিত, অবহেলিত নারী। অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য তারা যে ধরনের গ্লানিময় জীবন যাপন করে, তা

থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা চেতন ও অবচেতন মনেও সব সময় ছটফট করে মরে। তাদের এই অসহায় ছটফটানি দেখার সুযোগ সবার হয় না, কিন্তু কোন কারণে কেউ যদি সে সুযোগ পায়, তবে সারাজীবনেও তা সে কখনও ভুলতে পারে না। তাদের অন্তরের ওই বিদ্রোহকে সবার সামনে তুলে ধরার প্রতিজ্ঞা আমি অনেকদিন আগেই করেছিলাম, এবং আমার সে উদ্দেশ্য যতটা পেরেছি কার্যকর করেছি। কোনো ত্রুটি রাখিনি।'

যোশীজী বললেন, 'একবার রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রবন্ধে আপনার প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছিলেন, "কাব্যের সম্পর্ক বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক সৌন্দর্যের সঙ্গে। চিৎপুরের নোংরা গলির মধ্যে তার বাস নয়। কাব্য, বাণীর নিষ্কলুষ মন্দিরে বাস করে।" এ সম্বন্ধে আপনার কী মত?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'কোনো অজ্ঞাত কারণে ওই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়েছিলেন। তা না হলে তাঁর মতো মহান্ স্রষ্টা কাব্য বা সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত ছিলেন, এ কথা মানতে আমি রাজী নই। প্রবন্ধটিতে পরে নিজেই তিনি নিজের কথা খন্ডন করেছিলেন। তিনি আনন্দমূলক সৌন্দর্যের কবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখ, দৈন্য, অভাব, শোষণ, অত্যাচারে জর্জরিত জীবনের বাস্তবতাকে তিনি কখনও উপেক্ষা করেন নি। যে কবি একটি কবিতায় বেশ্যা এবং অন্য কবিতায় পতিতা নারীকে সতী শিরোমণির আখ্যা দিয়েছেন, এবং 'পতিত' কবিতাটিতে তিনি একটি বেশ্যার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বড় মর্মস্পর্শী করে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই কবিই যদি আজ বলেন যে, চিৎপুরের নোংরা গলির সঙ্গে শিল্পের কোনো সম্পর্ক নেই, তখন মনে সন্দেহ জাগে, তাহলে এরকম প্রবন্ধ লেখার পেছনে নিশ্চয় কোনো রহস্যময় কারণ আছে। কারণটি ব্যক্তিগতও হতে পারে।'

সেই ব্যক্তিগত কারণটির বিষয়ে অবশ্য কিছুই জানা যায়নি। তবে ঋষিসুলভ নিষ্কলুষ দৃষ্টিস্পর্শে যেমন তিনি পতিতার অন্তরের সুপ্ত দেবতাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই চন্দ্রমুখীর অন্তর্দেবতা চরিত্রহীন কিন্তু সরলপ্রাণ দেবদাসের নিষ্কলুষ আত্মার স্পর্শে জেগে উঠেছে। শরৎ সাহিত্যের এই তো বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তবুও কবিগুরু ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথকে দেবত্ব জাগ্রত করার জন্য বারবার তপোবনের পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করতে হয়েছে, কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই দেবত্বকে চিৎপুরের নোংরা গলির মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন। এ পার্থক্য বোধহয় আভিজাত্য ও ব্রাত্য সংস্কারের। সেই হিসেবে বরং শরৎচন্দ্র অধিকতর মহৎপ্রাণ ব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আনন্দের কবি। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি বিশ্বমানবকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। অপরদিকে শরৎ মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছেন। বোধহয় এজন্যই একদিন শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে দুজনের মধ্যে দারুণ তর্ক ও মতবিরোধ হয়। কিন্তু তা বলে গুরুদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা একতিলও কমেনি। শরতের প্রতি রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন নন, একথা শোনার পর শরৎ তাঁকে একটি চিঠি লেখেন,–

'শ্রীচরণেষু,

ছেলেদের মুখে মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, আপনি আমার উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উত্তেজনার সময় রাগের মুখে হয়ত আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছু বলিয়া থাকিব, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার সত্যাসত্য আপনার কাছে যাচাই করিতে গিয়াছিলেন, তিনিও অপরাধ কম করেন নাই। ইংলন্ডের ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং সমস্তই ওই পাঞ্জাব চিঠিখানার জন্য, ওটা না লিখিলে এ সকল কিছুই হইতে পারে না–এই কথাগুলা আমি যে ঠিক কি ভাবে তখন বলিয়াছিলাম আমার মনে নাই, বানাইয়া বানাইয়া মিথ্যা কথা আমি সচরাচর বলি না, কিন্তু বলা একেবারেই যে অসম্ভব তাহাও নয়। অন্তত, এ সব নিশ্চয় বলিয়াছি যে, এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন, এবং বাংলাদেশের লোকের প্রতি আপনার পূর্বের সে স্নেহ মমতা আর নাই।....

আপনার নিকট হইতে একদিন আমি রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পরেই

হয়ত কতকগুলা মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকিব। হয়ত আমার মনের মধ্যে এ ভাব ছিল যে, লোকে ভুল বুঝে তো বুঝুক। আপনার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রথম বলিয়া আমাকে মার্জনা করিবেন। আপনি ছাড়া আর কোন বড়লোকের বাড়িতে আমি ইচ্ছা করিয়া কোনদিন যাই না, আমার সে পথটাও নিজের দোষে বন্ধ হইয়াছে মনে হইলে ভারি দুঃখ হয়। আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে আমিও একজন, তাহাদের মত এত কাল আমিও কখনো আপনার নিন্দা করিতে যাই নাই, কিন্তু এবার কেন যে আমার এরূপ দুর্বুদ্ধি হইল জানি না।'

তিনদিন পরে শরৎচন্দ্র আবার লেখেন,—

'শ্রীচরণেষু,

ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আপনি দেশের অমঙ্গল করিবেন এতবড় অপবাদ যদি দিয়েই থাকি ত তাহার পরেও চিঠি লিখিয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা নয়, আপনাকে বিদ্রূপ করা। অতএব আপনার পত্রের স্বর যে এরূপ কঠিন হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। আমার অপরাধের কথা যাঁহারা আপনাকে জানাইয়াছেন, তাঁহারা আর কোথাও ইহার সীমা রাখেন নাই। ইহার পরে আমি আর কি বলিব। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।'[২]

নিজের চোখে শরৎ বেশ বিত্তশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর টাকা পয়সা যে কী ভাবে খরচ হত তা খুব কম লোকেই জানত।

এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে তিনি টাকা রাখতেন। এই ব্যাঙ্কটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। তাঁর কথামত আশেপাশের চাষী বা পরিচিত লোকেরাও ওই ব্যাঙ্কে টাকা পয়সা জমা দিতেন। হঠাৎ ব্যাঙ্কটি ফেল হয়, শরৎচন্দ্র বড় বিপদে পড়লেন। তিনি সে সময় নিজের বাড়ি তৈরি করাচ্ছিলেন। কিন্তু নিজের চিন্তার চেয়ে পরের চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। সব খুইয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ল এরা। এ দুঃখ দুর্দশা তিনি সইতে পারেন নি। মনে মনে ঠিক করে ফেললেন যে, ব্যাঙ্ক যদি টাকা ফেরত না দেয়, তাহলে তিনিই এদের পাই পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দেবেন।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত ইংরেজদের জমা খাতাই ওই ব্যাঙ্কে বেশি ছিল। তাই সরকার ব্যাঙ্কটিকে সাহায্য করে এবং যাদের যাদের খাতা ছিল তাদের জমা পুঁজির পঞ্চাশ ভাগ টাকা ব্যাঙ্ক ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু গরিব চাষী ও অন্য চেনাজানা গরিব গেরস্থকে বাকি পঞ্চাশভাগ শরৎচন্দ্র নিজের টাকা দিয়ে পুষিয়ে দেন।

এই সময় হঠাৎ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মারা যান। সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন।[৩] সরস্বতী ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে থিয়োসফিক্যাল হলে তাঁর মৃত্যুর জন্য যে শোকসভা আয়োজিত হয়, শরৎচন্দ্র তার সভাপতি ছিলেন। বক্তৃতা দেবার কথায় তিনি খুব ঘাবড়ে যেতেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি ভালোবাসা ও মমতার জন্য তিনি সভাপতির পদটি এড়াতে পারেন নি। তবুও নির্ধারিত সময়ে সভায় তিনি পৌঁছতে পারেন নি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সভাপতির আসনে বসিয়ে সভা আরম্ভ করা হয়। তখন দেখা গেল যে শরৎচন্দ্র সভায় ঢুকছেন। তাঁকে দেখে অস্থায়ী সভাপতি তখুনি সভাপতির আসনটি ছেড়ে দিলেন। বাধ্য হয়ে শরৎচন্দ্রকে আসন গ্রহণ করতেই হল। সভাপতির ভাষণ দেওয়ার সময় যখন এগিয়ে এল, তখন টেবিলের উপর হাত দুটি রেখে আসনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে তিনি বিড় বিড় করে কিছু বলতে শুরু করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি বোধহয় বুঝতে পারলেন যে, তাঁর কথা কেউই শুনতে পাচ্ছে না। তখন তিনি বেশ জোর গলায় বললেন, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্য

১ ৯ মে, ১৯২২
২ ১২ মে, ১৯২২
৩ ১৯২২

সমাজ আজ শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। অল্পক্ষণের জন্য বেশ মজা করে আমরা খুব খানিকটা কেঁদে নিলাম আর আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। চলুন, এবার সব বাড়ি ফেরা যাক।' সবাই অবাক হয়ে শুনছিলেন, শরৎবাবু বলছিলেন, 'আজ আপনারা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে এখানে এসেছেন;-ভালোই করেছেন। বড় মানুষরা মারা গেলে পাঁচজনে মিলে সভায় গিয়ে শোক প্রকাশ করে, আপনারাও করছেন। বেশ করেছেন। সত্যেনবাবু প্রতিভাবান কবি ছিলেন, তাঁর উপর সকলের শ্রদ্ধা থাকবারই তো কথা,-তাঁর অভাবে দুঃখ হবারই তো কথা। আমাদের বারোজন ইয়ারের তিনি একজন ছিলেন, আমরা তাঁর অভাব বোধ করছি। সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা জানানো হয় তাঁর গ্রন্থপাঠের ভিতর দিয়ে। সত্যেনবাবুর বই আপনারা কে কয়খানা কিনে পড়েছেন, সেটুকুর হিসেব করলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার হিসেবও পাওয়া যাবে। সত্যেনবাবুর লেখা পড়ে থাকলে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তিনি কত বড় কবি ছিলেন। মন্মথবাবু অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন, তিনিও হয়তো পড়ে থাকবেন। আরও অনেকে বললেন। ভালোই বললেন। নজরুল গানটি গাইলে। ভালোই গাইলে। নলিনী, এবারে তুমি গাও হে! ভালোই হবে।'

বক্তৃতা দিতে তিনি চিরদিনই অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু যখন বলতেন স্পষ্ট ভাষায় নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে দিতেন। সত্যের প্রতি তাঁর মনের এই নির্ভীকতা তাঁকে শুধু ভালো লেখকে পরিণত করেনি, তিনি যে মহৎ লোক, তাও প্রমাণ করেছে।

সভা-সমিতি ইত্যাদির প্রতি শরতের কোনোদিনই তেমন রুচি ছিল না। ছেলেবেলার বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্ট ও তাঁর বোন নিরুপমা দেবী বহরমপুরে থাকতেন। একবার শরৎচন্দ্র বহরমপুরে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান। যেখানেই তিনি যেতেন লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরতেন। বহরমপুরেও তাঁর সম্মানার্থে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী সেই বোট পার্টিতে শরৎচন্দ্রের পথ চেয়ে বসে রইলেন, এদিকে উৎসবের রাজার কোনো পাত্তাই নেই!

শরৎচন্দ্র ততক্ষণে কবি যতীন্দ্রমোহন-এর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে চলে গেছেন। পাঁচটার সময় সভা আরম্ভ হওয়ার কথা, বেলা তিনটে পর্যন্ত তাঁরা ঘুরে বেড়ালেন। ক্লান্ত হয়ে গঙ্গার ধারে দুজনে খানিক বসলেন। যতীন্দ্রমোহন বললেন, 'তিনটে বেজে গেছে, এবার কিন্তু দাদা, আমাদের ফেরা উচিত।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'সভা তো পাঁচটায়, আগে চারটে বাজুক।'

এদিকে চারটে বেজে গেল, তখন পর্যন্ত গল্প আর শেষ হয় না। যতীন্দ্র আবার বললেন, 'এবার যদি না উঠি তো পাঁচটার সময় কিছুতেই পৌঁছতে পারব না।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'তুমি কতগুলি সভা দেখেছ? কটা সভা সময়মত আরম্ভ হয়? বস! বস! আরে সভাই তো!'

ওই সময় গঙ্গার জলে একটি মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছিল। শরৎ আনমনা হয়ে পড়লেন। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন মানুষের জীবন-দর্শনের গভীরে তলিয়ে গেলেন। যতীন্দ্র ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, 'দাদা, পাঁচটাও বেজে গেল।'

শরতের দৃষ্টি মৃতদেহটির উপর থেকে সরে গিয়ে কোন্ অদৃশ্যলোকে আটকে গিয়েছিল। আনমনাভাবেই বললেন, 'পাঁচটা বেজে গেছে? সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে ছ-টা বেজে যাবে। আর সেখানে গিয়ে কাজ নেই।' যতীন্দ্র বললেন, 'তা হয় না দাদা, সবাই পথ চেয়ে বসে আছেন।' নির্বিকার চিত্তে শরৎ বললেন, 'তুমি পাগল হয়েছ! পাঁচটায় সভা আরম্ভ আর সাড়ে ছটা অব্দি লোকে বসে থাকবে? কারুর আর কোন কাজ নেই? সবাই যে যার চলে গেছে। যাওয়া বেকার, তার চেয়ে এই ভাল। বসে বসে দুটো মন প্রাণের গল্প করা যাক।'

এরকম শুধু একবারই নয়, বহুবার তিনি কথা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি থেকে গায়েব। সেদিন দুপুরবেলায় নরেন্দ্র দেবের বাড়িতে যেতে নরেন্দ্র দেব জিজ্ঞেস করেন, 'কি ব্যাপার? এত

অবেলায় ?'

'কি আর বলব ! একটা সভায় আজ যাওয়ার কথা তাই তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি। ওরা বাড়িতে আমাকে না পেয়ে ফিরে যাবে।'

'তা হয়ত যাবে, কিন্তু কি ভাববে তারা !'

'যা ইচ্ছে তাই ভাবুক ! আমি যেতে পারব না।'

'তা হলে যাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন কেন ?'

'সে কি আমি মন থেকে হ্যাঁ বলেছিলাম ? জোর করে "হ্যাঁ" আদায় করে নিল।'

কয়েক বছর পরে[১] হরিপদ সাহিত্য মন্দির পাঠাগার, পুরুলিয়ার একটি অধিবেশনে গিয়েও তিনি পুরোপুরি সভায় যোগ দেননি। সম্মেলনটি কয়েকদিন ধরে চলে, কিন্তু এক-আধবারের বেশি শরৎ সেখানে যাননি। সে সময় মামা ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর কাছে লুকিয়ে রইলেন।

এ ধরনের ব্যবহারে অবশ্যই তাঁকে দায়িত্বহীন লোকের পর্যায়ে ফেলা যায়, কিন্তু সাহিত্যিক কোনোদিনই কোনো দায়িত্বের চাদর ঢেকে ঘুরে বেড়ায় না। এই যে পলায়নী বৃত্তি এ যেন তাঁর ভবঘুরে জীবনের একটা অংশ বিশেষ। নিজের স্বাভাবিক দুর্বলতা লুকোবার জন্যই তিনি অমন করতেন।

এ মন্তব্যটি নিশ্চয়ই একপেশে ? জনপ্রিয় লেখককে সবাই নিজেদের মধ্যে পেতে চায়। তাঁর সুবিধে-অসুবিধের কথা লোকে ভাবে না। এরকম পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচাবার জন্য উচিত-অনুচিত যে পথই লেখক বেছে নিক-না কেন, তাকে নিন্দনীয় বলা ঠিক নয়। আর শরৎ তো সভার নামেই ঘাবড়াতেন। কখনও কিছু যদি বলতে হত, তা খুবই ধীরে ধীরে বলতেন। বলতে বলতে একবার উঠতেন, আবার বসতেন, আবার উঠতেন, এইরকম করে কোনো রকমে তিনি বক্তৃতার মঞ্চ থেকে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন।

৮

নিয়মিতরূপে শরৎচন্দ্র কখনও কিছু লিখতেন না। তাঁকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হত। পত্রিকার সম্পাদকেরা তাঁর বাড়িতে ধরনা দিয়ে বসে থাকতেন। 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেন শরৎচন্দ্রের চাকরকে ডেকে বলতেন, 'ওরে ও ভোলা, চা নিয়ে আয়, আর ভেতরে বৌমাকে বলে দে যে, আজ আমি এখানেই নাইব খাব।'

তারপর কাপড়-চোপড় বদলে বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে তিনি চুরুট খেতে লাগলেন। শরৎবাবু কাণ্ড দেখে হেসে বললেন, 'কি ব্যাপার দাদা ? এসবের মানেটা কি ?'

'মানে পাঁচটার সময় চা খেয়ে ফিরব, সঙ্গে তোমার লেখাও নিয়ে যাব। কাজে-কাজেই সময় নষ্ট না করে লিখতে বসে যাও।'

রেলের কর্মচারী শ্রী তুলসী 'বিচিত্রা'র লেখা নিয়ে যেত। স্টেশন থেকে উপেন্দ্রনাথ নিজে গিয়ে লেখা সংগ্রহ করে নিতেন, এই ভেবে যে অন্তত তাঁর খাতিরে শরৎ কুঁড়েমি করে লেখা দেরি করে দেবে না।

সবাই যদি এমন ভাবে তাঁকে দিয়ে জোর করে না লিখিয়ে নিতেন, তাহলে তাঁর দ্বারা সত্যিই সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। কুঁড়েমির জন্য তাঁর অনেকগুলি লেখা অসমাপ্তই রয়ে গেছে।

কাশী প্রবাসের সময় সাহিত্যিক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরতের আলাপ হয়। দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল। কেদারবাবু 'প্রবাস জ্যোতি' নামে একটি পত্রিকা বার

১ এপ্রিল, ১৯২৮

করেছিলেন। 'প্রবাস জ্যোতি'তে তিনি শরৎচন্দ্রকে গল্প লেখার জন্য বলেন। শরৎচন্দ্র উপন্যাস দেবেন বলে কথা দেন। কিন্তু বার বার আগ্রহ অনুরোধ সত্ত্বেও উপন্যাসটির মাত্র একটি কিস্তিই তিনি পাঠাতে পেরেছিলেন। সে সময়ের একটি চিঠিতে তিনি তাঁকে লেখেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমার ব্যবহারটা যথেষ্ট নিন্দার হইয়া পড়িল, কিন্তু নিতান্তই বাধ্য হইয়া। ভরসা করি, ভবিষ্যতে আর হইবে না। প্রথমটা ত শয্যাগত অসুখ ছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তাহার পরে যখন দেহ সুস্থ হইল, তখন অন্য উপসর্গ জুটিল। আপনাদের লেখাটা এ মাসে পাঠাতে পারিতাম, কিন্তু, যেহেতু,"ভারতবর্ষে"দেওয়া হইল না, সেই হেতু আপনাদেরও দিতে পারিলাম না। তাঁহাদের না দিয়া আপনাদের দিলে তাঁহাদের শুধু অপরিসীম ব্যথিত করাই হইত না, অপমান করা হইত।

'এ মাস হইতে আবার সমস্ত নিয়মিত হইবে। আমাকে লইয়া যাঁহারাই যে কিছু কারবার করেন, তাঁহাদিগকেই এইরূপ ভুগিতে হয়। আমি কেবল নিজেই অন্যায় করি না, আরও পাঁচজনকে বিড়ম্বিত করি। এটা আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া লইবেন। স্বভাবং !· · আমি যতটা পারি শীঘ্রই পাঠাইতেছি, এ বিষয়ে এবার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।'[১]

কিন্তু কথামত শরৎ লেখা পাঠাতে পারেন নি। এই অক্ষমতা যেন তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। এর অনেকগুলি কারণ ছিল। যারা মজলিসী লোক তাদের নিয়ম ও সময়ের কোনো খেয়াল থাকে না। এই কেদারবাবুর সঙ্গেই কাশীতে দিনের পর দিন বেহুঁশ হয়ে গল্প করে কাটিয়েছেন। কেদারবাবু সে সময় একটু অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে নিয়ে একটু বাইরে বেড়ানো দরকার। সকাল আটটায় টাঙ্গাওয়ালাকে আসতে বলা হল।

টাঙ্গাওয়ালা যথাসময়ে এসে হাজির। কিন্তু তখন তো চা খাওয়া চলছে কোনো একটি তরুণ আবার দেখা করতে এল। কথায় কথায় বারোটা বেজে গেল। টাঙ্গাওয়ালাকে বিকেল চারটের সময় আসতে বলা হল। 'না, না, ভয় পাবার কিছু নেই, ভাড়া পুরো পাবে।' টাঙ্গাওয়ালা দু-দিন ধরে সকাল আটটায় এসে রাত এগারোটায় পুরো ভাড়া নিয়ে ফিরে যেত। বাইরে বেরোন আর তাঁদের হয়নি।

এই ধরনের গাল্পিক লোক যদি আবার আফিংখোর হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। সময়মত কোনো কাজই তাদের থেকে পাওয়া মুশকিল।

নিজের একটি অক্ষমতার কৈফিয়ৎ হিসেবে একবার শরৎচন্দ্র কবি গিরিজা কুমারকে একটি চিঠি লেখেন, 'এ ভরসা করি, দোষ-স্খালনের রাস্তা যদি আর কোথাও না খোলা থাকে, তোমার কাছে আছেই। কারণ তুমি শুধু কোন একটা মাসিক বা সাপ্তাহিকের সম্পাদক মাত্রই নও, নিজেও কবি। অর্থাৎ আমাদেরই সগোত্র, জ্ঞাতি। সাহিত্য-সেবার আনন্দ বেদনা তুমি জানো, সাহিত্য-সেবকের দুর্দিনের খবর রাখো। তোমাকে স্মরণ করানো চলে যে, সাহিত্যিকের বাহ্য ও অভ্যন্তর সমসূত্রে গাঁথা নয়। একের সাক্ষ্য-প্রমাণে অপরের বিচার করা যায় না। এমন বিড়ম্বনাও ঘটে যখন দেহ দেখায় সুস্থ, কি সুপুষ্ট, মন হয়ত তখন একেবারে দেউলে, মাথাটা হয়ে থাকে মরুভূমি। তাকে নাড়া দিলে ভাবের বদলে অভাবের শুকনো ধুলো বেরিয়ে আসতে চায়। সেই দুঃসময় চলছে আমার এখন।'

কৈফিয়ৎ তো কতরকমেরই দেওয়া যেতে পারে। দেওয়া হতও। কিন্তু এটা ঠিক যে, শরতের কাছ থেকে লেখা আদায় করার জন্য সম্পাদকেরা কখনও কখনও সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ নিতে বাধ্য হতেন। সে বার 'বিজলী'র সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার 'পূজাবার্ষিকীর' জন্য সময়ের অনেক আগেই শরৎচন্দ্রের কাছে একটি লেখা চান। শরৎ বললেন, 'তোমার পত্রিকায় আমি নিশ্চয়ই লিখব।' আশ্বাস পেয়ে নলিনীবাবু নিজেকে ধন্য মনে করলেন। এক

১. নভেম্বর ১৯২০

সপ্তাহ পরে তিনি আবার এলেন। কথাবার্তায় ও আতিথ্যে কোনো ত্রুটি ছিল না। সাধুদের দলে যোগ দেওয়া থেকে বেশ্যালয়ে থাকার কথা, যাত্রাদলে গান-বাজনা-নাটক-অতীত জীবনের কত কথাই না শরৎ নলিনীবাবুকে শোনালেন। ফেরবার সময় নলিনী বললেন, 'আমার লেখার কথা মনে আছে তো?' শরৎ বললেন, 'খুব মনে আছে, তোমায় আমার একটি লেখা দেব।'

দিন যায়, মাস যায়, নলিনী আসা-যাওয়া করেন। গল্পের কী নাম দেওয়া হবে, এ কথায় শরৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'লেখা তো দেবই, নাম দিতে অসুবিধে কিসের?'

গল্পের নাম ছাপা হয়ে গেল, কিন্তু গল্প কোথায়? নলিনীবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়ি দৌড়লেন, কিন্তু গল্পের বদলে তিনি তাঁর লেখা একটি চিঠি পেলেন।

'শ্রীযুক্ত বিজলী-সম্পাদক মহাশয়
পরম কল্যাণীয়বরেষু-

দেশের অনেক প্রকার সমস্যার আলোচনা তোমাদের 'বিজলী' কাগজে স্থান পেয়ে আসছে। এই দেড় বৎসরে আমারও কয়েকটা বিষয় দেখবার সুযোগ হয়েছে। ভেবেছিলাম এ সংখ্যায় তারই কিছু কিছু লিখে জানাব। কিন্তু শরীর এমনি ভেঙে এল যে, কিছুই লিখতে পারলাম না। তবে ভরসা এই যে, তোমাদের কাগজও বন্ধ হবে না, আমিও হয়ত মারা যাব না। দেহটা একটু সুস্থ হলেই লিখতে শুরু করব। কথা না রাখতে পারার জন্য আমি নিশ্চয়ই দুঃখিত, তার উপর যদি আবার তোমরা রাগ কর তো দুঃখ বেড়েই যাবে। এ তোমরা করবে না বেশ জানি।

তোমাদের
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

সে বছরে পূজা-বার্ষিকীতে শরৎচন্দ্রের এই পত্রটি ছাপা হয়। আগামী বছর পূজা সংখ্যায় জন্য নলিনীবাবু আবার অনুরোধ জানালেন। শরৎচন্দ্রও আবার পুরোনো কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত একটি অন্তিম দিন ধার্য করা হয়। সেই দিনটিতে লেখা নিতে এসে নলিনীবাবু দেখেন যে, বাড়ি অতিথির ভিড়ে সরগরম। শরৎচন্দ্র নলিনীকে বললেন, 'দেখছই তো ভাই, এই ভিড়ে কখনো লেখা যায়।' একটু চুপ থেকে নলিনীবাবু বললেন, 'লেখা যে পাব না সে আমি জানতাম। কিন্তু আজ আমি অন্য একটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, দাদা।'

'কি উদ্দেশ্যে এসেছ, বলো।'

'দাদা,"বিজলী"থেকে যা পাই তাতে তো পেট চলে না। ছোট ছোট বাচ্চাদের গান শিখিয়ে কিছু উপার্জন করি। শুনেছি রামকৃষ্ণপুরে অমুক ভদ্রলোকের একটি গানের শিক্ষকের প্রয়োজন। ভদ্রলোক আপনার কাছে আসেন, আপনি যদি তাঁকে বলেন, তাহলে কাজটি আমি পেতে পারি।'

উপন্যাস দেওয়ার হাত থেকে এত সহজে অব্যাহতি পাবেন একথা শরৎ ভাবতে পারেন নি। খুব খুশি হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে যেতে রাজী হলেন। নলিনীবাবু ট্যাক্সি নিয়ে এলেন। ট্যাক্সি চলছে চলছেই। গন্তব্য স্থানটিও পেরিয়ে গেল, তখন শরৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

নলিনীবাবু বললেন, 'দাদা, আমার মেসটি কাছেই। যখন এসেই পড়া গেছে, তখন আমার ঘরে চলুন। সৌভাগ্য যখন হলই, তখন একটু চা খেয়ে কৃতার্থ করুন।' উপরে গিয়ে খুব যত্ন সহকারে নলিনী সরকার শরৎচন্দ্রকে বসালেন, চা ও খাবারের জন্য ফরমাস দিলেন। তারপর এক প্যাকেট সিগারেট, দেশলাই, রাইটিং প্যাড আর ফাউনটেন পেন তাঁর সামনে রাখলেন। অবাক হয়ে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সব কি?'

সরকারমশাই ঠাণ্ডা মেজাজে বললেন, 'দাদা, চা খেয়ে দয়া করে আমার লেখাটা লিখে দিন। লেখা না দিলে আপনি ছুটি পাবেন না। এই ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি পাশের ঘরে রইলাম। লেখা শেষ হলে ডাক দেবেন, আমি এসে দরজা খুলে দেব।'

সত্যি সত্যিই বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে নলিনী চলে গেলেন। বিস্ময়ে হতবাক শরৎচন্দ্র তাঁর যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলেন। বাইরে বেরোবার আর কোনো রাস্তা ছিল না। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, শরৎচন্দ্র ঘরে বন্দী অবস্থায় গল্প লিখছেন। তিন ঘণ্টা পরে দরজার কাছে একটু শব্দ শোনা গেল। শরৎ বললেন, 'নলিনী, দরজা খোলো।'

নলিনী দরজা খুলে দিলেন। শরৎচন্দ্র হাতে লেখা কাগজগুলি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'ধন্য ছেলে বটে, এই নাও তোমার লেখা।'

লেখাটির নাম ছিল 'দিনকয়েকের ভ্রমণ কাহিনী'। কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য যেবার তিনি দিল্লি যান, তারই সরস যাত্রা-বিবরণী লেখেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, দরজা বন্ধ করে দেবার জন্য তিনি একটুও রাগ করেন নি। হাসি মুখেই নলিনীর সঙ্গে শিবপুরে ফিরে এলেন।

অথচ এই শরৎচন্দ্রই একবার নতুন এক লেখিকাকে বলেন যে, লেখায় দ্রুত গতি কেরানীর যোগ্যতা হতে পারে, লেখকের নয়।

৯

শরৎচন্দ্র গল্প ও উপন্যাসের জন্য স্কুল কলেজের ছাত্রদের কাছে বড় প্রিয় ছিলেন। সেবার[২] হঠাৎ প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্য সভার সম্পাদক নতুন কিছু করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সবাই যখন শরৎ-গ্রন্থাবলী এত পড়ে তখন সেই শরৎকে এবার সাহিত্য সভায় ডাকা হোক।

একদিন দুটি ছাত্র[৩] শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। কুকুরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা দেখে যে, ঘরের ছোট্ট বারান্দায় খালি গায়ে একটি লোক ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে গড়গড়া টানছেন। একটি শাড়ী লুঙ্গির মতো করে কোমরে জড়িয়ে আছেন। গলায় পইতে ঝুলছে, অবিন্যস্ত চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ছাত্র দুটি নমস্কার করলে শরৎচন্দ্র শুকনো গলায় বললেন, 'কোথা থেকে আসা হয়েছে?'

'প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে।'

'কি দরকার?'

বেচারী ছাত্রেরা বোধহয় এতটা শুকনো ব্যবহার প্রত্যাশা করে আসে নি। বলল, সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করার জন্য তারা অনুরোধ জানাতে এসেছে। শরৎবাবু শোনামাত্র 'না' বলে দিলেন, বললেন, 'আমি কোন সভায় যাই না। সেদিন একটি স্কুল থেকেও ডাকতে এসেছিল। আমি যাই নি।'

ছাত্র দুটির মনে খুব দুঃখ হয়। তারা বলে, 'আমরা কোনো স্কুল থেকে আসিনি, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এসেছি।'

শরৎবাবু বললেন, 'সে একই কথা। সেটা না হয় ছোট স্কুল আর তোমাদেরটা বড় কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি কি করব বলো? বাংলাদেশে তো আমার কোনো সম্মানই নেই, তার উপর আমি ভালো বলতেও পারি না। এক কাজ করো, জলধর সেনকে নিয়ে যাও। তিনি একে সাহিত্যিক তায় রায় বাহাদুর।'

ছাত্রেরা তবুও তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে, তারা রায় বাহাদুর খেতাব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার লোভে আসেনি। তারা শুধু তাঁর জন্যই তাঁর কাছে এসেছে।

১ আষাঢ়, ১৩৩৫ (আশালতা সিংহ) জুন-জুলাই, ১৯২৮
২ ১৯২৩ সাল। এই অধিবেশনটি ৩০ অগাস্ট ১৯২৩-এ হয়।
৩ একজন হলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক জরাসন্ধ।

এবার শরৎ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা আমার লেখা বই-টই পড় ?'

একটি ছাত্র তৎক্ষণাৎ বলে, 'আপনি আপনার যে-কোনো বইয়ের যেখান থেকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, সব মুখস্থ।'

শরৎবাবু বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম লেখাপড়া জানা ছেলে তোমরা বাংলা পড়োই না। কন্টিনেন্টাল লিটারেচার পড়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তো তাই চলছে।' যদিও সেটা কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের যুগ তবু ছাত্রটি বলল, 'আপনি ঠিকমত খবর রাখেন না। তরুণ সমাজে আপনার খুবই সম্মান।'

তরুণ বয়সের আবেগে তারা আরও না জানি কত কি বলে গেল। শরৎচন্দ্র নীরবে শুনলেন। তারপর বললেন, 'এ তো আমি জানতাম না। আমার কাছে তোমাদের মতো ছাত্র কই আর আসে ? সব বড় বড় লোকেরা আসে। উপদেশ দেয়, এটা করো, ওটা কোরো না, বঙ্কিম যেমন পাপের ক্ষয় ও পুণ্যের জয় জয়কার করে গেছেন, তুমিও তাই করো, পাপের ছবি এভাবে তুলে ধরো না যেন বড় একটা বাহাদুরীর ব্যাপার সেটা ইত্যাদি।'

স্বাধীন চিন্তাধারার উপর কোনো রকমের বন্ধন তিনি পছন্দ করতেন না। গায়ে পড়ে পথ প্রদর্শন করাকেও তিনি একেবারে অপছন্দ করতেন। অপরের কোনো কথায় নিজেকে উপযাচক করে জড়িয়ে ফেলার তিনি রীতিমত বিরুদ্ধে ছিলেন। তাই সভা সমিতি সব-কিছু থেকে দূরে একাকী থাকতে ভালোবাসতেন। কিন্তু ছাত্র দুটির কথাবার্তায় একটু নরম হলেন, বললেন, 'বেশ, সময়মত আমি তোমাদের ওখানে চলে যাব। কিন্তু আমায় কী বলতে হবে ?'

'আপনার যা ইচ্ছে।'

'খুব বেশি ভিড় হবে না তো ?'

'ভিড় কোথায় ? শুধু আমরাই থাকব।'

'আচ্ছা দাঁড়াও, তারিখটা লিখে নিই।'

দেয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের তারিখে দাগ দিয়ে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাদের নিজের ছেলেবেলার অনেক গল্প শোনালেন। একজন জিজ্ঞেস করল, 'লোকে বলে "শ্রীকান্ত" নাকি আপনার নিজের জীবন ? সে কি সত্যি ?' শরৎ হেসে বললেন, 'তোমার কী মনে হয় ?'

'আমরা কেমন করে জানব ! আমরা তো আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।'

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন, 'উপন্যাস লিখতে বসে কেউ হুবহু নিজের কথা লেখে না, তবে নিজেকে বাদ দিয়ে কোনো সৃষ্টি সার্থক হতেও পারে না।'

ছাত্রটি বলে, 'আপনার সাহিত্যে পতিতা স্থান পেয়েছে। এর কোনো বিশেষ কারণ আছে কি ?'

এ কথা শোনার পর তিনি আনমনা হয়ে পড়েন, তীক্ষ্ণ চোখ দুটি বিষণ্ণতায় ভরে যায়। গড়গড়ার নলটি মুখ থেকে সরিয়ে হাতে রেখে বললেন, 'বিশেষ কারণ যে কী তা আমি জানি না। তবে আমি অনেককে জানি, নিজের চোখে দেখেওছি তাদের অনেকের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অনেক বড় ও মহৎ লোকের মধ্যে নেই। ত্যাগ, ধর্ম, দয়া, মায়া, প্রেম, ভালোবাসা মানুষের যতগুলি ভালো গুণ আছে, তার কোনোটারই অভাব তাদের চরিত্রে নেই। ভদ্রতার মোহে পড়ে এ কথা অস্বীকার করলে বড় অধর্ম হবে। কোনো মানুষের সবটাই কালো, নোংরা শোধরাবার মতো কোনো বস্তুই তার কাছে নেই, তা হতে পারে না।'

যেন নিজের মনেই তিনি কথা বলছিলেন। তাঁর ঘরের দেওয়ালে বন্দুক আর রুদ্রাক্ষের মালা একসঙ্গে টাঙানো দেখে কেউ একজন বলেছিলেন, এই রকম আপাত অসংগতির মধ্যে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য-সাধনার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি এত সহজে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্যসভায় গিয়েছিলেন ? ঠিক দিনটিতে বরাবরের স্বভাবমত 'না' বলে দিলেন। কত অনুনয়, বিনয়, আবেদন, নিবেদন, বিক্ষোভ দেখিয়ে তবেই তাঁকে তারা সভায় নিয়ে যেতে পেরেছিল। সভায়

প্রচণ্ড ভিড়, লোকে তাঁকে দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে ছিল। ভিড় দেখে শরৎচন্দ্র চমকে উঠলেন। বললেন, 'একি করেছ ? এত মানুষ ?' সেদিনের সভায় নিজের রচনা ও সাহিত্যসৃষ্টির বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সমাজের তরুণ যুবকেরা আমার পৃষ্ঠপোষক, আমার বল।'

তরুণ ছাত্র ও যুবকের দল দেশভক্তি ও আন্দোলনের চিন্তায় বিভোর। শরতের মধ্যে সেদিন তারা শুধু একজন বিখ্যাত সাহিত্যিককেই দেখেনি বরং এমন এক আলোড়নকারী মানুষের সন্ধান পেয়েছিল যা তাদের পথ দেখাতে পারত। শুধু তরুণের দলই নয়, সে বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দিয়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল। তাঁর আগে শুধু রবীন্দ্রনাথকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্র এফ. এ. পর্যন্তই পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে বি এ. পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র তৈরি করার ভার দেওয়া হয়।

সেই সময় ইউরোপ থেকে সংবাদ আসে যে, এ বছর নোবেল প্রাইজ কোনো ভারতীয় লেখক পাবেন। ডাঃ স্যার মহম্মদ ইকবাল ও সরোজিনী নাইডু এবং শরৎচন্দ্রের নাম সবার আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। এ সম্বন্ধে একবার ইলাচন্দ্র যোশী শরৎবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এসব শুনে আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় ?'

শরৎবাবু বলেছিলেন, 'যদি পুরস্কার পেয়ে যাই তা হলে ভালোই আর যদি না পাই তাহলেও আমার বিশেষ দুঃখ হবে না। পৃথিবীর সব প্রতিভাসম্পন্ন লেখকই যে নোবেল প্রাইজ পাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে যে-কোনও লেখকের পক্ষে এই পুরস্কারটি নিঃসন্দেহে খুবই লোভনীয়।' যোশীজী জিজ্ঞেস করলেন, 'লোভনীয় বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন ?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'যিনি এই পুরস্কারটি পান তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো কবি বা লেখকের মনে এত বড় খ্যাতির প্রলোভন নেই একথা আমি মানি না। আর আমার মনে এর জন্য কোনো লোভ নেই, তেমন মিথ্যে কথাও তোমায় আমি বলতে চাই না।'

শরতের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। এর পরের বছরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।[১] নদীয়াতে তিনি শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেখানকার নামকরা উকিল ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বেয়াই ছিলেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন। সেই সূত্রে দিলীপকুমার রায়ও ললিতবাবুর বন্ধু ছিলেন। তাঁর আগ্রহেই শরৎ সভাপতির আসন গ্রহণ করতে রাজী হন, তবে শেষপর্যন্ত শরৎ আসবে কিনা তাঁদের মনে সন্দেহ রয়ে গিয়েছিল। নির্দিষ্ট দিনে তিনি ও শহরের আরো কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিলে শরৎকে আনতে স্টেশনে গেলেন। ট্রেন এল, কত যাত্রী নামল-উঠল, কিন্তু কোনো কামরার সামনে শরৎকে দেখা গেল না। কামরায় তাঁকে খোঁজা শুরু হল। শেষে অবশ্য পাওয়া গেল। আশ্চর্যের ব্যাপার, তখন তিনি সেকেন্ড ক্লাসের একটি কামরায় নিরুদ্বেগে বসে তামাক খাচ্ছেন। সামনে তাঁর চাকরটি দাঁড়িয়ে ছিল। শরৎকে দেখে সবার চিন্তা দূর হল। খুব যত্ন সহকারে সবাই তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

শরৎকে দেখবার জন্য ললিতবাবুর বাড়িতেও বেশ ভিড় জমে যায়। যে-কদিন ছিলেন, শরৎ সারাদিন চা আর তামাক খেতেন আর নানা গল্প শুনিয়ে সবাইকে আনন্দে মাতিয়ে রাখতেন। সভাপতির ভাষণ শরৎ লিখেছেন কিনা জানার জন্য ললিতবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। জানা গেল, বক্তৃতা আদৌ লেখাই হয়নি। ললিতবাবু দিলীপকুমার রায়কে বললেন, 'তুমি জান যে শরৎবাবু কী রকম নার্ভাস প্রকৃতির লোক, ভিড় দেখলেই ঘাবড়ে যান। সভাপতির ভাষণ ওঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া তোমার কাজ রইল।'

১ ১০ আশ্বিন, ১৩২১ (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪)

ললিতবাবু কোর্ট থেকে প্রায় তিনটে নাগাদ ফিরে এসে দেখলেন, শরৎবাবু তখনও আসর জমিয়ে বসে আছেন। আর দু-ঘণ্টা পরেই অধিবেশন শুরু হবে। শরৎবাবুকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি কাগজ কলম নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। ললিতবাবু চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। অল্প সময়ে উনি কী করে লিখবেন? কিন্তু সাড়ে-চারটের মধ্যে শরৎবাবুর ভাষণ তৈরি। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা কৃষ্ণনগর কলেজের সভাভবনে গিয়ে পৌঁছলেন। ভবনটি লোকে লোকারণ্য। তরুণেরা খুব উত্তেজিত মনে অপেক্ষা করছিল। শরৎ যখন বলতে শুরু করলেন, সভা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনছিল। বক্তৃতা শুনে সবাই খুব খুশি। না-জানি এত অল্পসময়ে এত সুন্দর সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ভাষণ তিনি কেমন করে লিখেছিলেন।

এই সভাতে দিলীপকুমার রায় স্বরচিত 'শরৎসাহিত্যে আদর্শবাদ' নামক প্রবন্ধটি পড়েন এবং নিরুপমা দেবীর লেখা এই গানটি গান—'বাহিরের নও তুমি, আমাদেরই, আমাদেরই একজন।'

সভাশেষে নৈশ ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। মখমলের আসনে সভাপতিকে বসিয়ে সবাই দিলীপকুমার রায়ের প্রশংসা করেছিলেন। কেউ তাঁর গানের, কেউ আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠের, কেউ অভিনন্দন ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্র মাঝপথেই তাদের সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও। মন্টুর গান চমৎকার, আবৃত্তি চমৎকার, উচ্ছ্বাস চমৎকার, তার সবই চমৎকার কিন্তু তার সবচেয়ে চমৎকার বস্তুটি যে কী, সেটা কেউ জানে না কিন্তু আমি জানি।'

সবাই অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। শরৎ বেশ গম্ভীরভাবে বললেন, 'সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হল গিয়ে ওর পেট। সাধু ভাষায় যাকে জঠর বলা হয়। বৃন্দাবন, দিল্লি, আগ্রা সব জায়গায় আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। আমি যা খেতাম তাই বদহজম হয়ে যেত, আর দিলীপ যা খেত তাই হয়ে যেত ওর শক্তি। এত বড় বড় বেলুনের মতো পরোটা, থান ইটের মতো এতটা সর, পাহাড়ের মতো উঁচু পোলাও, কালিয়া-কোর্মা, শিক কাবাব কি জানি সব কোথায় চলে যেত। এত খেয়েও ওর কোনোদিন বদহজম হয়নি। তাই বলছি, ওর সবচেয়ে বড় সম্পদ গান বা আবৃত্তি নয়, তা হল ওর পেট।'

একদিন দিলীপকুমার রায় শরৎকে ওস্তাদ আবদুল করিম-এর গান শোনার জন্য নিমন্ত্রণ জানান। শরৎবাবু বললেন, 'এক শর্তে সেখানে যেতে পারি যদি একটা বিষয়ে তুমি ভরসা দিতে পার।'

'কিসের ভরসা?'

'উনি থামবেন তো?'

একথা শুনে দিলীপ একেবারে অট্টহাস্য করে ওঠেন। একদা শরৎ নিজেও বেশ ভালো গাইতে পারতেন, কিন্তু শাস্ত্রীয় সংগীত, বিশেষ করে গাইয়ে ওস্তাদের প্রতি তাঁর তেমন অনুরাগ ছিল না। একবার কোনো এক বন্ধুর অনুরোধে তিনি গান শুনতে যান। খাঁটি সুর ও আলাপের সঙ্গে ওস্তাদজী একই কথা বারবার গাইছিলেন, 'সঈয়া তুঁ কাহা গৈয়াঁ, আ-রে মোরে সৈঁয়া তু কাঁহা গৈয়াঁ রে।'[২]

অনেকক্ষণ শোনার পর আর শরৎ ধৈর্য রাখতে পারলেন না। গড়গড়ার নল মুখ থেকে সরিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আরে তেরে সঈয়াঁ কাশী মিত্তিরকে ঘাট গঈয়াঁ, উসকে বাদ কেয়া হুয়া বতাও না।'

গান থামাবার জন্যে তিনি এ ধরনের ঠাট্টা করেছিলেন বটে, তবে হাসি-তামাশার আসরে একবার বসলে তিনি নিজেও থামতে জানতেন না। একবার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অফিসে মালিক

---

১ 'সাহিত্য ও নীতি' শীর্ষক। এটি 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে সংগৃহীত আছে।

২ গানটির রূপ- কাঁহা গয়ে সঁইয়া। হাসি-তামাশার ছলে কথার রূপটি বিগড়ে যায়।

আসেন নি, কর্মচারীরা কাজ করছিলেন। শরৎবাবু সেখানে গিয়ে হাজির। সেখানে বসে তিনি আফিং-এর গুলি মুখে ফেললে কর্মচারীরা অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। শরৎ তাঁদের বললেন, 'তোমরাও খাবে? আমার মতো লেখক যদি হতে চাও তাহলে অবশ্যই খাও।'

নানা কথার প্রলোভন দেখিয়ে সবাইকেই তিনি একটু-আধটু আফিং খাওয়ালেন। সেখান থেকে বেরিয়ে হরিদাসকে চিঠি লিখে জানালেন যে, তাঁর সব কর্মচারীরা লেখক হওয়ার লোভে পড়ে আফিং-এর নেশায় ঢুলছে। এখুনি যদি তাদের জন্য মিষ্টির ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে হাতে লোহার শিকল পরাবার ভয় আছে।

হরিদাস বুঝলেন, এ শরতেরই কারসাজি, তবুও তিনি দশটি টাকা পাঠিয়ে দিলেন। তবে একটা কারণে শরতের বন্ধুবান্ধবেরা সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন, সেটা হল অকারণে শরৎ অপরকে রাগিয়ে তুলতেন। এ রকম বিচিত্র প্রবৃত্তির বশে কারও নামে মিথ্যে কথা রটনা করে দিতেন বা তাকে বিরক্ত করার জন্য যা খুশি বলে দিতেন। রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত তিনি রেহাই দেননি। সেদিন রসচক্রের বৈঠকে শরৎ হঠাৎ গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোমরা শুনেছ বোধহয়, আজকাল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও গুরুদেবের মধ্যে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ।'

'সত্যি? কিন্তু কী কারণে?'

'জান না, রামানন্দ ইউরোপে গিয়েছিলেন আর দাড়ির জন্য লোকে তাঁকেই রবীন্দ্রনাথ বলে ভুল করেছিল। এ কথা জানার পর রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বলেন যে, তিনি যেন নিজের দাড়ি কামিয়ে ফেলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর কথা কেন শুনতে যাবেন? এতদিনের এত পরিশ্রমের ফলে বাড়ানো দাড়ি, কেউ কখনও পরের কথায় কামায়? তখন কবিগুরু নতুন একটি প্রস্তাব দেন যে, দাড়ি কামাতে যদি তিনি একান্তই অরাজী, তাহলে অন্তত দাড়িতে যেন তিনি মেহদি লাগান। এই শুনে রামানন্দ ভয়ংকর রেগে যান, বলেন-''আমি কি মুসলমান?''সেই থেকেই দুজনের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ।'

রসচক্রের অধিকাংশ সদস্যই শরতের এই স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর এই পরিহাসে সবাই খুব হাসাহাসি করেন। তবে একথাও ঠিক, যাঁরা শরৎকে চিনতেন না বা অল্প চিনতেন, শরৎ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা খারাপ হয়ে যেত। শরতের প্রতিপক্ষ কেউ এর অনুচিত সুযোগ নিয়ে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। শরৎ এ সম্বন্ধে নিতান্তই উদাসীন ছিলেন, তাই বন্ধুরা বোঝাতে এলেও তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। এই সব করে তিনি মজা পেতেন। চোখ দুটি দেখলেই বোঝা যেত যে, দুষ্টুমি করে অপরকে ক্ষেপিয়ে আনন্দ পাবার জন্যই এসব করছেন। তাই যাদের নিয়ে মস্করা করা হত, তারাও শুনে হাসতেন, তবে সবাই তো আর উদারহৃদয় ব্যক্তি নয় যে, ভাববে দুর্বলতা বাদ দিয়ে কোনো মানুষই পুরোপুরি মানুষ নয়।

ওই বছরই[১] মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। সেই সময়ে তিনি ঢাকা[২] যান ও প্রিয়বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে ওঠেন। সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন সাহিত্যিক। তিনি শরৎকে তাঁর নিজের বাড়িতে আনতে চাইছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মুন্সীগঞ্জে থাকতেই শরৎকে নিজের বাড়িতে থাকার নিমন্ত্রণ জানান, কিন্তু শরৎ সবাইকে একই উত্তর দিয়েছিলেন, 'নিজের বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।'

'চারু আমার ছেলেবেলায় বন্ধু। ওর বাড়ি আমার নিজের বাড়ি। ওর স্ত্রী আমায় যে রকম যত্ন করে তা তোমরা কেউ পারবে না।'

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া সেখানে আর কারও বাড়িতে তিনি থাকেননি। তবে একবার করে সবার বাড়িতেই পায়ের ধুলো দিয়েছেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে যেদিন আসর

১. ১০-১১ এপ্রিল, ১৯২৫
২. বিশ্বভারতী সম্মিলনী শরৎকে অভিনন্দন জানায়।

বসে, সেদিন যে শরৎ কত গল্প শুনিয়েছিলেন, কত কাপ চা আর তামাক খেয়েছিলেন, তার হিসেব করা মুশকিল। সেদিন সুরেশচন্দ্রের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। সেই একই দিনে অপূর্বচন্দ্র কুমারের বাড়িতেও যাবার কথা ছিল। কথার রাজা শরৎবাবুর কি ওসব মনে রাখার কথা! অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে করে শেষে অপূর্বচন্দ্র কুমার রাত এগারোটার সময় তাঁকে নিতে এলেন। শরৎ বললেন, 'লোকের সঙ্গে কথা বলে আমি আনন্দ পাই, তবে আর কেন কৃপণতা করি!'

অপূর্ব কুমারের বাড়ি থেকে রাত প্রায় আড়াইটের সময় শরৎ বাড়ি এলেন। চারুবাবু বললেন, 'শরৎ! সময় সম্বন্ধে তোমার একটু খেয়াল রাখা উচিত।'

শরৎ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'দেখ চারু! মানুষ সময়ের চাকর হয়ে যাক, এ আমি কোনোদিন চাইব না। তুমি তো দাসত্বকে ঘৃণা কর তবুও আমায় বলছ যে, ঘড়ির চাকর হয়ে থাকি! সে আমি পারব না।'

যাযাবরের উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে অব্যাহতি পেলেও তা তাঁর জীবনে একটা দাগ কেটে দেয় যা কোনোদিন মোছেনি। তথাকথিত সভ্যসমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে তিনি কোনোদিন গণ্য হননি সে সময়েও। যখন তিনি বাংলা সাহিত্যের মহান ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও সমাদৃত, তখনও তিনি কোনোদিন অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি হিসেবে নিজের পরিচয় দেননি। বরাবরই একথা বলেছেন, 'আমি বেশি পড়াশোনাও করিনি, আমার জ্ঞানবুদ্ধিও তেমন বিশেষ কিছু নেই। আমার লেখা অনেকে পড়তে ভালোবাসে তার কারণ বোধহয় এই যে, আমি যেটুকু লিখেছি তা আমার চোখে দেখা ও অনুভূতির রসে ভেজা।' কয়েক বছর আগে[১] প্রমথ চৌধুরী একখানি বই শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। তার জবাবে শরৎচন্দ্র বলেন, 'আমার মত দুশ্চরিত্রকে বই উৎসর্গ করার দরুন সমাজ প্রমথ চৌধুরীকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। তিনি হলেন পরম বিদ্বান, সমাজের চৌধুরী আর আমি নেহাৎই শরৎ চাটুজ্জে।'

মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য-সভায় সাহিত্যে শিল্প এবং দুর্নীতি[২] সম্বন্ধে শরৎ বলেন, 'সাহিত্যেও সুশিক্ষা—নীতি ও লাভালাভের অংশটাই এতক্ষণ ব্যক্ত করে এলাম। যেটা তার চেয়েও বড়,-এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য, নানা কারণে তার আলোচনা করবার সময় পেলাম না। শুধু একটা কথা বলে রাখতে চাই যে, আনন্দ ও সৌন্দর্য কেবল বাইরের বস্তুই নয়। শুধু সৃষ্টি করবার ত্রুটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা নাই, এ-কথা কোনোমতেই সত্য নয়। আজ একে হয়ত অসুন্দর আনন্দহীন মনে হতে পারে, কিন্তু এই-ই যে এর শেষ কথা নয়, আধুনিক সাহিত্য-সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন।

'আর একটি মাত্র কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ইংরেজীতে Idealistic ও Realistic বলে দুটি কথা আছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য অতিমাত্রায় Realistic হতে চলেছে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না, অন্তত উপন্যাস যাকে বলে, তা হয় না। তবে কে কতটা কোন ধার ঘেঁষে চলবে, তা নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও রুচির উপরে। তবে একটি নালিশ করা যেতে পারে যে, পূর্বের মত রাজা—রাজড়া জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সেবীর মন আর ভরে না। তা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপসোসের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।'

শরৎ মহৎ ও গুণী ব্যক্তি এতে কোনো সংশয় ছিল না, তবু তাঁর মধ্যে এমন কতগুলি দুর্বলতা

১ ১৯১৯ সাল, 'আহুতি' গল্প সংগ্রহ।
২ 'স্বদেশ ও সাহিত্য' থেকে গৃহীত।

ছিল যে, যার দরুন ভয় হত শেষ পর্যন্ত তাঁর সব কার্যকলাপ নষ্ট না হয়ে যায়। কিন্তু এ ভয় ভিত্তিহীন ছিল, কারণ যে ভুল পথে সংগ্রামের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তিনি অবিরাম এগিয়ে গেছেন, সে পথ তো নিয়তি-নির্ধারিত। দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি বড় হন। পড়ালেখাও বেশি দূর করতে পারেন নি, কিন্তু জীবনের পাঠশালায় অভিজ্ঞতার যে ঝোলাটি তিনি ভরিয়ে তুলেছিলেন তারই জোরে মানুষকে চেনবার, বোঝবার অপরিসীম ক্ষমতা তিনি লাভ করেছিলেন। যদিও লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার বেখাপ্পা ধরনের ছিল, মানুষকে রাগাতে হয়তো ভালোবাসতেন, কিন্তু মস্তিষ্কের ভারসাম্য কোনো দিন হারান নি। মানুষকে তিনি যতটা চিনতেন, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি তাদের ভালোবাসতেন।

১০

পত্রিকা সম্পাদনা করা তাঁর বহুদিনের সাধ ছিল। ছেলেবেলাতে এ সাধ হাতে-লেখা পত্রিকা দিয়ে মেটান। 'যমুনা' সম্পাদনা করে তিনি খ্যাতিও পেয়েছিলেন। বন্ধু নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে তিনি কিছুদিনের জন্য 'রূপ ও রং'[১] পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। 'ভারতলক্ষ্মী' সম্পাদনা করতে রাজী ছিলেন। একটি পত্রে লিখেছেন, "ভারতলক্ষ্মী" অর্থাৎ নূতন একখানা মাসিকের সম্পাদক হতে রাজী হয়েছি, অন্তত শেষ পর্যন্ত হতে হবে। আজ একখানা চিঠি লিখে দিলাম, যদি সে শর্তে তাঁরা সম্মত হন তো সম্পাদকের ভার নিতে পারি। তার কারণ সংসারে বহু লোকেরই যা হয় আমারও তাই হয়েছে, অর্থাৎ, সংসারে বুদ্ধিমান এবং নির্বোধ আছে এবং এক পক্ষের জয় হয়। বেশি টাকা না হলেও ৫/৬ হাজার টাকার দায়ী হয়েছি। ভেবেছি এইটে শোধ করব 'ভারতলক্ষ্মী'তে যোগ দিয়ে। তাঁরা আমাকে সিকি অংশ দেবেন। এবার কিন্তু সংসারী বুদ্ধিমান লোকেরা যেরূপ আচরণ করে আমিও তাই করব। ঠকবো না। পূজোর পরেই সমস্ত ডিটেল স্থির হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিচিত অপরিচিত সাহিত্যিকদের অনেকেই লিখছেন তাদের রচনা নিয়ে আগাম টাকা যেন পাঠিয়ে দিই। হায় রে—এ শক্তি যদি থাকত। কিন্তু এই শক্তিটারই আবার আমার বড় প্রয়োজন।....'

এই ধরনের ক্ষমতা বোধহয় তিনি কোনোদিনই পাননি। তবে নিজের উপার্জনের টাকা থেকে তিনি অনেককে অনেক রকম ভাবে সাহায্য করেছেন। সম্ভ্রান্ত বংশের কোনো একটি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কাশীতে থাকতেন। লেখাপড়া জানা বালবিধবা বৃদ্ধাটি রান্না করে লোককে খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। বুড়ো বয়সে চোখ দুটি তাঁর খারাপ হয়ে যায়। বৃদ্ধা একবার শরৎকে 'ছেলে' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তখন থেকে বন্ধু হরিদাস শাস্ত্রীর মারফৎ তিনি বৃদ্ধাটিকে না জানিয়েই সাহায্য করছিলেন। বৃদ্ধা জানতেন হরিদাসই তাকে সাহায্য করে। গোপনে সাহায্য করা তাঁর যেন একটা স্বভাবই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারই একটু দূরে বিধবা এক মুড়িওয়ালী[২] থাকত। তার কোনো সন্তানাদি ছিল না, বড় বউকে তিনি তাঁর কাছ থেকে রোজ গরম মুড়ি কিনতে বলেন, কেননা গরম মুড়ি তিনি খেতে ভালো বাসতেন। কিন্তু এও এক ধরনের গোপন সাহায্য ছাড়া আর কিছু নয়।

ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের সঙ্গেই থাকতেন। খুব ঘটা করে তিনি ভাইয়ের বিয়ে দেন।[৩] মেয়েটি খুব অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তবুও এতরফ থেকে কোনোরকম দাবি ছিল না। বড় বউ খুব সরল মনেই নিজের সব গয়না ছোট জাকে দিয়ে দেন। শরতের এই ছোট ভাইটি একেবারে নিষ্কর্মা প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোনো কিছু করার মতো শিক্ষা ও যোগ্যতাও ছিল

১. ৪ অক্টোবর, ১৯২৪এ পত্রিকাটির সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেন।
২. ১৯২৫
৩. ১৯২৫

না। অভাবে ও জমিদারদের নাটক দলে মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করে সে বড় হয়েছিল, ওই পরিবেশে যা সহজেই আয়ত্ত করা যায়, তাই সে করেছিল। অর্থাৎ খুব নেশা করতে পারত। শরৎচন্দ্র আজীবন এই ছোট ভাইটিকে ও তার সংসার প্রতিপালন করে এসেছিলেন।

শরতের মন মানবিক করুণায় আর্দ্র হলেও দুর্নীতি প্রচারক হিসেবে তাঁর অখ্যাতি একতিলও কমেনি। চিরদিনই সবাই ভেবে এসেছে, শরৎ এত নেশা করে, ছিঃ ছিঃ! আরো না জানি কত রকমের দোষ আছে তাঁর। লোকের মন থেকে তাঁর দুর্নাম ঘোচেনি। কত সভা সম্মেলনে শরৎ সভাপতিত্ব করে গৌরব অর্জন করে নিলেন, কত সভাতেই না তাঁকে সম্মান ও অভিনন্দন দেওয়া হল, তবুও তাঁর মুখের উপর নিন্দে করে এমন লোকের সংখ্যাও কমল না। প্রত্যক্ষভাবে কখনও অপ্রত্যক্ষভাবে বক্তৃতার মঞ্চে উঠে ভাষণদাতা শরৎকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করার সুযোগ হাতছাড়া করেন না। চিৎপুরে একটি পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্য শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানান হয়। সেই সভাতেই একজন বক্তৃতা দেন, 'আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে পুস্তকালয় স্থাপনের দিকে মন দিয়েছি, ভালো কথা। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবি, কী লাভ? পড়বার মত ভালো বই কি আজকাল প্রকাশিত হয়? ভালো বই কি কেউ লিখেছে? সাহিত্যে আজ নীতি ও রুচি বলে কিছু নেই। সব নোংরামিতে ভরা, আর এই নোংরামিব জন্য বিশেষ কবে আমাদের আজকের সভাপতি মহাশয় বিশেষভাবে দায়ী।'

সভাপতির আসনে বসে শরৎচন্দ্র চুপচাপ সব শুনলেন। যখন তাঁর বলার সময় এল, সংক্ষেপে এইটুকুই বললেন, 'দেখুন, ভালো বই যখন প্রকাশিত হচ্ছে না, তখন এক কাজ করুন, পুস্তকালয়টি বন্ধ করে দিন। তার বদলে একটি সংকীর্তন দল গড়ুন, যারা পাড়ায় পাড়ায় কীর্তন করে বেড়াবে, বেশ সৎকর্ম করা হবে।'

যতীন্দ্রমোহন সিংহ নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। 'সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা' নামে তিনি একটি বই লেখেন। বইটিতে শরৎবাবুর উপর তীব্র আক্রমণ করা হয়। কিন্তু তার উত্তরে ওই বইটির উপরে এমন আক্রমণ করা হয়, যার ফলে বইটি বন্ধ হয়ে যায়। একবার শরৎবাবুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দুর্নীতি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ শরৎচন্দ্র বলেন, 'আমার বিশ্বাস আপনি খুব সচ্চরিত্র ব্যক্তি। বেশ্যাবাড়ি আপনি কোনদিন যান নি বোধহয়?'

একথা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট যতীন্দ্রমোহন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছুই বলতে পারলেন না। শরৎবাবুই আবার বললেন, 'আপনার যখন কোন অভিজ্ঞতাই নেই তখন আর এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কি আলোচনা করব?'

ভবঘুরে জীবনের সমাপ্তি হলেও তা মাঝে মাঝে তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকত। জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় প্রতি বছর শরৎ ভাগলপুরে মামার বাড়ি যেতেন। বর্মা থেকে ফেরার পর তিনি মামার বাড়ির সঙ্গে বিশেষ করে ছেলেবেলার বন্ধু ও সম্পর্কে মামা, মণিমামার সঙ্গে সম্পর্কটা শোধরাবার বহু চেষ্টা করেছিলেন। মণিমামা নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কলকাতা এসেছিলেন, সে সময় সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে পরামর্শ দেন যে, এই বিবাহোপলক্ষে তুমি কিছু একটা উপহার পাঠাও। শরৎচন্দ্র বলেলেন, 'মণিমামা নেবেন না।'

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তুমি আগে পাঠাও তো। বাকিটা আমি দেখব।'

শরৎ তাই করলেন। কিন্তু মণিমামা দেখামাত্র বললেন, 'না, না এ নেওয়া চলবে না। এ ফিরিয়ে দাও।' মামী বললেন, 'উপহার ফিরিয়ে দেওয়া চলে না। নিতেই হবে।'

'না, না।' মণিমামা আরও রেগে বললেন, ঠিক তখনই সুরেন্দ্রনাথ এসে বলল, 'দাদা, শরৎ এসেছে।'

'কোথায়?'

শরৎ এগিয়ে এসে মণিমামার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'আমায় ক্ষমা করে দাও।'

নিমেষের মধ্যে মণিমামার রাগ অভিমান সব দূর হয়ে গেল। চোখে জল, গলা বাষ্পাচ্ছন্ন

হয়ে উঠল। কোনো রকমে শুধু বললেন, 'বিয়েতে এসো, বুঝলে।'

মামার বাড়ির দরজা আবার শরতের জন্য খুলে গেল। মণিমামার মৃত্যুর[১] পরে সেখানে যাওয়া একটা নিয়ম হয়ে উঠেছিল। ভাগলপুরে গেলেই তিনি যেন শৈশবের সেই পুরোনো দিনগুলিতে ফিরে যেতে চাইতেন। চা–তামাক, হাসি গল্পের মধ্যেই দিনগুলো কেটে যেত। দিনের খাওয়া খেতে খেতে বেলা চারটে বেজে যেত, ওদিকে রাত্রে একটা বাজত। মামার বাড়িতে ঢোকামাত্রই সব নিয়মকানুন লন্ডভন্ড করে দিতেন। এই ছিল তাঁর স্বভাব, ছোটরা সবাই তাঁকে খুব ভালোবাসত। গঙ্গার ধারে অনেক খেলনা নিয়ে বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন, কখনও মিষ্টিওয়ালাকে ডেকে বলতেন, 'আরে, একটাতে কী হবে? আরো নিয়ে এসো। চা নিয়ে এসো, তামাক নিয়ে এসো।' বসে বসে, নানান ফরমাস করতেন।

পুজোর সময় নাটক করা হত। সেবার 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি মঞ্চস্থ করা ঠিক হয়। গিরীন্দ্রনাথকে ডেকে শরৎচন্দ্র বললেন, 'এবার "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের একটা দৃশ্য করার ইচ্ছে আছে। চাণক্যের অভিনয় তুমি করো, কাত্যায়নের চরিত্রটি প্রফুল্ল করবে, শচী ভিক্ষুক আর দেবী প্রম্পটার।'

তাঁর কথামত সব কাজ হল। ভিক্ষুকের গাওয়া গানটি শুনতে শুনতে দুঃখে তাঁর মন ভরে ওঠে, কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিজের কামরায় উঠে চলে যান। সেখান থেকেই অন্ধকারে বসে নাটকটি দেখতে দেখতে বলে উঠলেন, 'রাসবিহারী, "ও কুব্জার বন্ধুটি" গাও তো।'

এই গানটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। কিন্তু কোনোদিন পুরো গানটি তিনি শুনতে পারতেন না। অর্ধেক গান শুনেই কাঁদতে কাঁদতে তিনি পালিয়ে যেতেন।

'বলি ও কুব্জার বন্ধু
তোমায় রাধানাথ আর বলব না হে
ও কুব্জার বন্ধু····।'

রাসবিহারী দাস ভালো তুলসীর মালা তৈরি করতে পারত। একদিন শরৎ বললেন, 'আমাকেও একটা মালা দাও।' সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি পরবে?'

'হ্যাঁ, খুব ইচ্ছে করে।'

সেই দিনই রাসবিহারী খুব পরিশ্রম সহকারে একটি মালা তৈরি করে শরৎকে দিল। মালা পেয়ে শরৎ খুব খুশি হলেন, কিন্তু ফেলে আসা যাযাবর জীবনের কথা বোধহয় মনে পড়ে গিয়েছিল। তাই বললেন, 'এবারে স্টিমারে করে ভাগলপুর থেকে কলকাতা যাব। বেশ বেড়ানোও হবে।'

সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওনা হলেন। চাকর ও অন্যান্য জিনিসও প্রচুর ছিল, এত জিনিস যে দু–তিনটে ঘোড়ার গাড়িতেও তা আঁটল না। যাই হোক, স্টিমার ঘাটে পৌঁছে দেখা গেল, ঘাটে কোনো জাহাজ নেই। তখন ঠিক হল যে, প্রথম যেদিক থেকে জাহাজ আসবে তাতেই চড়ে রওনা দেওয়া যাবে। পশ্চিম থেকে যদি আসে তো পূর্ব বেড়িয়ে আসব আর পূর্বদিক থেকে এলে পশ্চিমটা দেখে ফিরব। সুরেন্দ্রমামা বললেন, 'পশ্চিমে কোথায় যাব?' শরৎ বললেন, 'যে কোন জায়গায়। রবীন্দ্রনাথও তো গাজীপুর পর্যন্ত ঘুরে গেছেন।'

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কলকাতাগামী জাহাজটাই আগে এল। যদিও পথ বড় বিশ্রী ছিল, কারণ আগে এগিয়ে জাহাজটিকে পদ্মা পার হয়ে গোয়ালন্দে পৌঁছে তারপর সেখান থেকে সুন্দরবন হয়ে, ডায়মন্ডহারবার দিয়ে খিদিরপুরে আসতে হত।

শরৎ সবাইকে নিয়ে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন। চাকরকে তামাক সাজতে বললেন। ঠিক তার পাশেই জাহাজ ক্যাপ্টেনের কেবিন। গড়গড়ার আওয়াজ পেয়ে

১. ১৯২৯

তখুনি তিনি একজন খালাসীকে পাঠালেন। খালাসীটি শরৎবাবুকে বলল,' এখানে তামাক খাওয়া নিষেধ। আপনি তামাক খাওয়া বন্ধ করুন।' শরৎ তার কথা কানে নিলেন না। শেষে ক্যাপ্টেন নিজেই উঠে এসে বললেন, 'তামাক খাওয়া আপনাকে বন্ধ করতে হবে।'

'কেন?'

'কারণ এটি অত্যন্ত অভদ্র জিনিস। দেখতে মোটেই ভাল লাগে না।'

'কিন্তু আমার চোখে এটি বড়ই সুন্দর। এ তো সভ্যতার পরিচায়ক।'

'এর বিদকুটে শব্দ শুনে যাত্রীরা অপ্রসন্ন হন।'

'বোধহয় স্টিমারের সিটি শুনতেও তাদের খুব ভাল লাগে! শুধু অনিবার্য ভেবেই কি তারা তা সহ্য করবে না?'

'কিন্তু গড়গড়া টানা কি আপনার অনিবার্য?'

'বোধহয় আপনি ধূমপান করেন না?'

'সিগার বা সিগারেটে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'আপনার না থাকলেও অন্য কারোর আপত্তি হয়ত থাকতে পারে।'

'কোন ইওরোপীয়ানের এতে আপত্তি থাকতে পারে না।'

'কিন্তু এটা তো ইওরোপ নয়।'

এই বাক্‌যুদ্ধ কোথায় গিয়ে শেষ হত কে জানে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে যেতে অনুরোধ করে, 'যদি কোন ইওরোপীয়ান আপত্তি জানায় তাহলে কিন্তু তামাক খাওয়া স্থগিত রাখতে হবে।'

শরৎ একথার জবাব না দিয়ে তামাক খেতে লাগলেন। জাহাজ কহোল গাঁয়ে এসে পৌঁছল। কিংবদন্তীতে শোনা যায়, এই গ্রামটিতে আগে খুব কলহ হত, এখন শুধু নামটিই রয়ে গেছে। জাহাজ অল্প সময়ের জন্য দাঁড়াতে শরৎ নেমে কোন্ একদিকে চলে গেলেন। জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে এল, শরতের পাত্তাই নেই। মামা দুজন খুঁজতে এদিক ওদিক দৌড়লেন। দেখেন যে, ঘাটের পাশেই একটা ছোট দোকানের সামনে শরৎ মাটিতে বসে রয়েছেন। চারিদিকে পনেরো কুড়িটা কুকুর দই চিঁড়ে খেতে ব্যস্ত। তার পাশেই বারো-তেরো বছরের একটি ছোট ছেলে হাতে আরো দই চিঁড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'এ সব কি হচ্ছে? জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।'

'আমি জানি, কিন্তু সিটি তো এখনও বাজেনি।' যাই হোক দোকানীর হিসেব চুকিয়ে দিতে বাকি পয়সা ফেরত না নিয়ে শরৎ পরিষ্কার হিন্দিতে বললেন, 'দেনে নেহি হোগ্গে। ইয়ে তুমহারা নফা হ্যায়।'

গ্রামের সরল দোকানী অবাক হয়ে চেয়ে রইল। জাহাজে ফিরে শরৎ বললেন, 'আমি জাহাজ থেকে যেই নীচে নেমেছি, অমনি কুকুরের দল চারদিক থেকে ছেঁকে ধরল। মনে হল এদের কিছু খাওয়ানো উচিত, কতদিন খেতে পায়নি কে জানে। এখানে দই চিঁড়ে ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না, তাই সেই খাওয়াতে খাওয়াতেই দেরি হয়ে গেল।'

পরদিন সন্ধ্যায় আর একটি গ্রামে এসে জাহাজ থামল। এখানে দুধ মাছ তরিতরকারী সব অঢেল। সবাই জাহাজ থেকে নেমে গেল কেনাকাটা জন্য। জাহাজের কাছেই সব বেচতে এসেছিল। জাহাজ যখন ছাড়ে দেখা গেল একজন স্টিমারের ধারে ধারে দৌড়ে আসছে। বার বার হাত জোড় করে মিনতি জানাচ্ছে, হঠাৎ শরৎবাবুর নজরে পড়ে, তিনি ক্যাপ্টেনকে জাহাজ থামাতে অনুরোধ করেন।

উত্তরে ক্যাপ্টেন বললেন, 'এ ভাবে দয়া দেখাতে গেলে দশদিনেও গোয়ালন্দে পৌঁছানো যাবে না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের অনুরোধে জাহাজ থামাতেই হয়। সেই লোকটি কাঁদতে কাঁদতে জাহাজে উঠেই অজ্ঞান হয়ে যায়। মেয়ের মরণাপন্ন অবস্থার খবর পেয়ে মেয়েকে

দেখতে যাচ্ছে।

দূর পথের যাত্রায় এ ধরনের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। পরদিন সকাল হতেই কোলাহল শোনা যেতে লাগল। বেলা দশটা নাগাদ জাহাজ গ্রামে এসে পৌঁছল। গ্রামটির নাম 'প্রেমতলী'। বৈষ্ণবদের খুব বড় মেলা এখানে হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা এই মেলায় যোগ দিতে আসত। আধঘন্টার জন্য জাহাজ থামার কথা। শরৎবাবু বললেন,'এখানে এত বড় মেলা হয় অথচ একদিনও থাকা চলবে না ?'

ক্যাপ্টেন হাত জোড় করে বললেন, 'মাফ করবেন, মাফ করবেন, আধ ঘন্টার একটুও দেরি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

শরৎ মামাকে বললেন, 'আধঘন্টায় তো কিছুই হবে না। 'প্রেমতলীর' মেলা না দেখে আমি কিছুতেই যাব না। জাহাজ যদি চলে যেতে চায় তাই যাক।'

এই বলে শরৎ নিজের মালপত্র নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়লেন। কিন্তু কোথায় যাবেন ? খোঁজ নিয়ে জানলেন, পাশেই জমিদারদের কাছারি বাড়ি, সেখানেই থাকা যেতে পারে। জমিদারদের চাকরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কাছারি-বাড়িতে গিয়ে দেখেন যে, সেখানে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা আসন পেতে বাস করছে। শরৎকে দেখে বৈষ্ণবের দল আর্তনাদ করে উঠল, আসলে দাড়ি-গোঁফধারী শরৎকে তারা মুসলমান ভেবে চিৎকার করে উঠল, 'পালাও পালাও! শ্যামসুন্দর, রাধিকারমণ, সর্বনাশ হয়ে গেল যে।' রান্না তৈরি হচ্ছিল। 'আজ আমাদের জন্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেল। রাধে, রাধে, একি করলে মদনমোহন!'

কিছুক্ষণ ধরে শরৎ আশ্চর্য হয়ে তাদের কান্ড-কারখানা দেখে তারপর বললেন, 'আরে বাবা, তোমরা আগে আমার কথা শোনো, আমি ব্রাহ্মণ হই, ব্রাহ্মণ! ভয়ের কিছু নেই, পইতে পরে আছি।' একজন বুদ্ধিমান বৈষ্ণব বলল, 'শুনতে পাই আজকাল নাকি তাঁরাও সব পইতে পরেন।' তার কথা শুনে শরৎ ও মামারা হেসে উঠলেন। শরৎ বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতেই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা 'শ্যামসুন্দর', 'রাধিকারমণ'কে ডাক দিতে দিতে পালিয়ে গেল। শরৎ তখন বেশ আয়েস করে সতরঞ্চি পেতে বললেন, 'ভালোই হল, আপদ বিদেয় হল।'

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তিনি মেলা দেখতে বেরোলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়, ফেরার আর নামটি নেই। দুই মামা আবার খুঁজতে বেরোলেন। খানিক দূর গিয়ে দেখেন যে, একটি প্রকান্ড বড় গাছের নীচে প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে এক কৃষ্ণবর্ণ বাউল একটি গৌরাঙ্গিনীর সঙ্গে নাচ-গানে মত্ত আর তাই শরৎ তন্ময় হয়ে দেখছেন। মামা বললেন, 'নাওয়া-খাওয়া আজ আর কিছু হবে না কি ?' শরৎ বললেন, 'সে তো রোজই হয়। শোন একবার, এদের মধ্যে কী নিষ্ঠা, ভক্তি! আহা, যদি এদের মতো ভক্তি ও তন্ময়তা আমার থাকত!'

মামা বললেন, 'এদের দলে নাম লিখিয়ে নাও।'

'সত্যি যদি তাই করতে পারতাম!'

ফেলে আসা জীবনের কথা ভেবে বোধহয় তাঁর মুখ থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। অনেক কষ্টে মামারা শরৎকে সেখান থেকে টেনে আনলেন। খেতে বসে শরৎ বললেন, 'আজ এখানেই থাকতে হবে। শুনেছি এখানের বৈষ্ণবী গ্রহণ ব্যাপারটি দারুণ। কিছু টাকা জমা দিলে নাকি যে কেউ বৈষ্ণবী পেতে পারে। একটি চাদরের আড়ালে বৈষ্ণবীদের এমন করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, তাদের শুধু পায়ের আঙুলগুলি দেখা যায়। যে বৈষ্ণবীর আঙুল যে ব্যক্তি ধরবে, তার সঙ্গে বৈষ্ণবী এক বছর পর্যন্ত থাকবে।'

গল্পটি মজার হলেও অবিশ্বাস্য মনে হয়। অনেক খোঁজ নিয়ে শেষে জানা যায় যে, প্রথাটি বন্ধ হয়ে গেছে, এবং তার বদলে নতুন তথ্যের খোঁজ পাওয়া গেল যে, এখানে নাকি রাত্তিরে খুব বড় বড় মশার উপদ্রব।

'আরে বাপরে, মশা! ম্যালেরিয়া! তাহলে তো কিছুতেই এখানে থাকা চলে না। কী করা যায় ? এসময় কোনো জাহাজও যায় না। এক কাজ করা যাক, নৌকো করে যাওয়া যাক, বেশ

মজা হবে।'

সুরেন্দ্রমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কোথায় যাওয়া হবে?'

'যেখানে হোক পৌঁছনো যাবে। রাজশাহী পর্যন্ত অনায়াসে যাওয়া চলবে।'

নৌকো করে আবার সবাই রওনা হলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে গোয়ালন্দগামী জাহাজটি পথেই পাওয়া গেল। নৌকো ছেড়ে সবাই জাহাজে উঠলেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। পরের দিন জাহাজ অন্য একটি ঘাটে নোঙর বাঁধল। সেখানকার জমিদারের সঙ্গে শরতের পরিচয় ছিল। বললেন, 'চলো, জমিদার বাড়ি গিয়ে চা খাওয়া যাক।'

অনেক খোঁজাখুঁজির পর জমিদারবাবুর বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল, দুর্ভাগ্যক্রমে তখন জমিদারবাবু ঘুমোচ্ছিলেন। চাকর তাঁর ঘুম ভাঙাতে কিছুতেই রাজী হল না। ঠিক সেই সময়েই জাহাজ সিটি দেওয়াতে তাঁরা দৌড়ে জাহাজে ফিরে এলেন। কিন্তু চা তো খেতেই হবে। চাকরকে হাঁক দিয়ে বললেন, 'বৈকুন্ঠ, চা তৈরি কর।'

কিন্তু বৈকুন্ঠ থাকলে তো জবাব দেবে! সে তখন পদ্মার ধারে ধারে দৌড়চ্ছে, অনেক কষ্টে একটি নৌকোর সাহায্যে তাকে তোলা হল। কৈফিয়ৎ হিসেবে বৈকুন্ঠ বলল, 'টাটকা দুধ আনতে আমি গাঁয়ে চলে গিয়েছিলাম।'

একথা শোনার পর বৈকুন্ঠের উপর শরতের রাগ করা চলে না, কিন্তু ক্যাপ্টেনের ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রইল না। শরৎবাবু বললেন, 'আরে ভাই, রাগ-টাগ রাখো। বেচারী রসিক মানুষ, সিটি শোনার ফুরসৎ কোথায়? যা বৈকুন্ঠ, চা তৈরি কর গিয়ে।' এইভাবে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে একদিন তাঁরা গোয়ালন্দে এসে পৌঁছলেন। শরৎ ঘোষণা করে দিলেন, 'ব্যাস্, জাহাজ যাত্রা এ পর্যন্তই থাক্। এখান থেকে রেলে করে সোজা কলকাতায় ফিরব।'

এসময় কোনো রেল নেই ভেবে দুই মামা বাজারের দিকে বেড়াতে চলে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এসে দেখেন শরৎ বা চাকরবাকর কেউ কোথাও নেই। এমন-কি মালপত্রও কিছু দেখা গেল না। দুজনে স্টেশনে গেলেন, সেখানেও কেউ নেই। আবার তাঁরা ঘাটে ফিরে এসে একজন খালাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ, বাবু কোথায়?'

পেছনে আর একটি জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল। খালাসীটি আঙুল দিয়ে বলে, 'ওখানে।' দুই মামা সেদিকে তাকিয়ে দেখেন যে, জাহাজের রেলিং ধরে হাসিমুখে শরৎ দাঁড়িয়ে। কাছে যেতে বললেন, 'আগের জাহাজটি পরের দিন ছাড়বে। এ জাহাজটি আজ ছাড়বে আর ডায়মন্ডহারবার হয়ে যাবে। পাঁচ-ছদিন লাগবে কলকাতা পৌঁছতে। ভালোই হল, সুন্দরবন দেখা যাবে, যেখানের জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে, নদীতে প্রকান্ড বড় বড় কুমীর। সুন্দরী-বৃক্ষে নানান ধরনের পাখি কিচির মিচির করবে। ভয়ানক অজগর সাপও হয়তো দেখতে পাওয়া যেতে পারে।'

বলতে বলতে শরতের মনের মধ্যে সুপ্ত যৌবনের শরৎ যেন মূর্ত হয়ে উঠল। এমন সুন্দরভাবে বললেন যে, মামাদের জাহাজে করে যাওয়া মেনে নিতেই হল। তীব্র বেগে জাহাজ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, কুমীর ও তিমি মাছ দেখবার আশায় দিন কাটছিল। কিন্তু এমনই ভাগ্য যে, একটা কাঠবেড়ালীর লেজও দেখতে পাওয়া গেল না।

যাক্, ডায়মন্ডহারবারে জাহাজ বাঁধতে যেন সবার প্রাণ ফিরে এল। সুন্দরবনের অসাধারণ সৌন্দর্যও তাঁদের সহ্যশক্তিকে বেঁধে রাখতে পারেনি। এমন-কি মামা যখন এস্রাজ বাজাচ্ছিলেন, শরৎ অস্থির হয়ে বলে উঠলেন, 'দয়া করে বাজানো বন্ধ করো, নইলে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করব।'

ডায়মন্ডহারবার থেকে খিদিরপুরে আসতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু আর এক ঝামেলা, গিরীনমামার সুটকেশ থেকে সব টাকাকড়ি কেউ বের করে নিয়েছে। শরৎ বললেন, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমরা সবাই মিলে আনন্দ করতে বেরিয়েছি, ক্ষতিও সবাই মিলে ভাগ করে নেব।'

খিদিরপুরে নেমে যে যার মালপত্র নামাতে তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু শরৎ আবার সেখান থেকে উধাও!

বৈকুণ্ঠ বলল, 'বাবু তো ট্রামে করে চলে গেছেন।'

দুই মামা মিলে জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেখেন, শরৎ আরাম-কেদারায় আধশোয়া অবস্থায় আরাম করে তামাক খাচ্ছেন। আর চিরসঙ্গী ভেলু একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

মামারা বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি চলে এলে? বলেও তো আসতে পারতে?'

শান্তভাবে শরৎ বললেন, 'বললে কি আর আসতে দিতে নাকি? আচ্ছা, স্নান করে খেয়ে দেয়ে সব আরাম করো।'

১১

রাজনৈতিক ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ছিল। শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনে যেন ভাটা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গ্রাম উন্নয়ন ও গ্রাম সংগঠনের উদ্দেশ্যে চাঁদা একত্রিত করার কাজ একেবারে বন্ধ হয়নি। দেশবন্ধুর যশ ও প্রতিপত্তির শেষ ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী ও সদ্ভাব বাড়ুক এ জন্য যে 'বেঙ্গল সমঝোতা' হয়েছিল, সে কৃতিত্ব দেশবন্ধুর প্রাপ্য। শরৎ দেশবন্ধুকে ভালোবাসলেও এই সমঝোতাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। একদিন দেশবন্ধু শরৎকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাস করেন?'

'না।'

দেশবন্ধু বললেন, 'কিন্তু আপনার মুসলমান প্রীতি তো সর্বজনবিদিত।'

শরৎ বললেন, 'মানুষের কোন সৎ ইচ্ছা কখনও গোপন থাকে না। আমার এই খ্যাতিটুকু এত বড় মানুষের কানেও পৌঁছেছে। কিন্তু নিজের প্রশংসা নিজের কানে শুনতে আমার বড় লজ্জা বোধ হয়।'

দেশবন্ধু বললেন, 'আপনি বলতে পারেন এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিল? এরই মধ্যে ওরা সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক বেড়ে গিয়েছে। দশ বছর পর কী হবে ভাবতে পারেন?'

শরৎবাবু বললেন, 'এটা ঠিক মুসলমান প্রীতির নিদর্শন নয়। দশ বছর পরে কী হবে, তা ভেবে আপনি চিন্তিত হয়ে উঠেছেন, এ দেখে মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে আপনার বিশেষ তফাৎ নেই। যাই হোক "সংখ্যা" আমার হিসেবে খুব একটা বড় জিনিস নয়। যদি তাই হয় অর্থাৎ সংখ্যার বিশিষ্ট গুণ থাকে তাহলে চার কোটি ইংরেজ একশো পঞ্চাশ কোটি লোকের মাথায় পা দিয়ে সারা পৃথিবীটা চষে বেড়াত না। নমশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী ইত্যাদিদের মিলিয়ে নিয়ে দেশের মধ্যে দশের মধ্যে তাদের একটা মর্যাদার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদের মানুষ করে তুলুন। প্রাচীন যুগ থেকে মেয়েদের প্রতি যে অন্যায়, নিষ্ঠুর সামাজিক অবিচার হয়ে আসছে, তার প্রতিবিধান করুন। তাহলে দেখবেন ওদিকের সংখ্যা নিয়ে আপনাকে বিব্রত হতে হবে না।'

যাই হোক, বেঙ্গল সমঝোতার ব্যাপারে দেশবন্ধুর খ্যাতি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও তাঁর মিল হয়ে যায়। এবার তিনি গ্রাম উন্নয়নের কাজে হাত দিলেন। শরৎবাবু এ ক্ষেত্রেও দেশবন্ধুর সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করেছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। পরিষদে যখন 'কালো বিল'-এর বিষয়ে আলোচনা হয়, তখন তাঁকে স্ট্রেচারে করে পরিষদ ভবনে আনা হয়। ডাক্তার তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দেন। শরৎবাবুকে দেখে দেশবন্ধু ইশারায় কাছে এসে বসতে বললেন, তার পর খুব আস্তে বললেন, 'শরৎবাবু! এই শেষ বার!' শরৎ বললেন, 'কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন নিজের চোখে স্বরাজ দেখে যাবেন।'

একটু নীরব থেকে দেশবন্ধু জবাব দিলেন, 'তার আর সময় পেলাম না।'

শরৎ বললেন, 'আপনি যখন জেলে ছিলেন, তখন কিছু লোক জেলের দেয়ালে প্রণাম জানিয়ে বলেছিল, "আমাদের দেশবন্ধু জেলের ভেতর বন্ধ। তাঁকে চোখে দেখার কোনো উপায় নেই, তাই বাইরে থেকে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে গেলাম।" তাঁরা আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।'

দেশবন্ধুর চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। নিজেকে সামলাতে কয়েক মিনিট লাগল। তারপর আর তিনি কোনো আলোচনা করেন নি। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে ডাঃ দাশগুপ্ত ঘরের কোণ থেকে মোটা লাঠিটা তুলে এনে শরৎবাবুর হাতে ধরিয়ে দিলেন। ডাক্তারের কান্ড দেখে দেশবন্ধু হেসে বললেন, 'ইশারাটা বুঝতে পারছেন তো, শরৎবাবু? এরা আমায় একটু কথাও কইতে দিতে চায় না।'

স্বাস্থ্য লাভের জন্য দেশবন্ধু পাটনা চলে যান। কিন্তু বিধান পরিষদের অধিবেশন আসন্ন তাই তিনি আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। দেশবন্ধু রাজনৈতিক হত্যা ও হিংসার বিপক্ষে ছিলেন। একটি বক্তব্যে তিনি স্পষ্ট ভাবে তা বলেন এবং ব্রিটিশ সরকার প্রভাবিত হয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে চুক্তি করতে সম্মত হন। কিন্তু দেশবন্ধুর কয়েকজন বন্ধু ও সহকারী তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন, প্রচার করে দিলেন যে, 'দাশবাবু গভর্নর হওয়ার লোভে প্রভিনসিয়াল অটোনমি স্বীকার করে জড়িয়ে পড়েছেন।' এই দারুণ বিপদ ও দুঃখের দিনেও শরৎ তাঁর সঙ্গ ছাড়েননি। দেশবন্ধু একদিন শরৎকে বলেন, 'এ পৃথিবীতে যে সমঝোতা করতে শেখেনি সে কিছুই শিখল না। অনুদার দলের সরকার পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম সরকার। দুনিয়ায় এমন কোনো অত্যাচার নেই, যা তারা করতে পারে না। কিন্তু চুক্তি বা বোঝাপড়া ও মিটমাট করে নিলে দেখা যায়, এর মতো বন্ধুও আর কেউ হতে পারে না।'

দেশবন্ধুর এই অগাধ বিশ্বাস তাঁকে চরম লাঞ্ছনার পথে ঠেলে দিল। স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়ল। এবার তিনি পাটনা হয়ে দার্জিলিং যাওয়া মনস্থ করলেন। শরৎ স্টেশনে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শচীনন্দন লিখেছেন, 'একদিন জলভরা চোখের দ্যুতি বন্ধুর দুই চোখের উপর ফেলে করুণ কণ্ঠে তিনি বললেন, "শরৎবাবু, আমি মডারেট হয়ে গেছি, আমি গভর্নর হতে চাই, এই হল শেষকালে বাংলা দেশের ধারণা।"

'শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে নিজের দুটি হাতের মধ্যে দেশবন্ধুর দুটি শীর্ণ কর-পল্লব গ্রহণ করলেন। ধীরে ধীরে সেই শীর্ণ করযুগলে যেন সমস্ত আদর ঢেলে দিয়ে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, "দুঃখ করবেন না। নিজে দুঃখ গ্রহণ করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রায়শ্চিত্তের পথ বন্ধ করবেন না। এ দুঃখ সঞ্চিত থাকুক সমস্ত দেশের জন্যে, সমস্ত জাতির জন্যে। মনে করুন, অগ্নি-পরীক্ষা তো সীতাকেও দিতে হয়েছিল। অসাধারণকেই যদি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে না পারেন, তাহলে আর তুচ্ছের তুচ্ছতা বজায় থাকে কী করে? এ দুঃখ আপনি নেবেন না, রেখে যান আমাদের সকলের জন্যে।" সর্বংসহা জানকীর শেষ আর্তনাদের মতন দেশবন্ধুর অন্তরও সেদিন কেঁদে উঠল, "আর যে সইতে পারি না, মা, এবার তুমি আমায় নাও।"

'শরৎচন্দ্র বসে বসে তাঁর হাতের দশ আঙুল দেশবন্ধুর দশ আঙুলের মধ্যে দিয়ে নিঃশেষে প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা সমস্ত বিশ্বাস ও সমবেদনা সঞ্চারিত করে দিতে লাগলেন। বহুক্ষণ পরে বললেন;"আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, দার্জিলিং থেকে ফিরে আসুন স্বাস্থ্য লাভ করে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি সর্বত্যাগী, আপনি অভ্রান্ত, আপনি অগ্নিশুদ্ধ, আপনিই দেশের নেতা। দেশ আপনারই; Tom, Dick, Harry-র নয়"।'

কিন্তু দেশবন্ধু সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। কিছুদিন পর দার্জিলিং-এ তাঁর মৃত্যু হয়।[2] সারা দেশ কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাংলায় যেন তুফান বয়ে গেল। দেশবন্ধুর গোঁড়া প্রতিপক্ষ শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখলেন,'হে বাংলা, যদি তোমার বুকে কান্না

১ ১১ মে, ১৯২৫
২ ১৬ জুন, ১৯২৫

থাকে, তবে আজ চোখের জল ফেলো।' শ্মশানঘাটে যে শোকসভা হয়, তার একমাত্র বক্তা মহাত্মা গান্ধীও কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের দুঃখের তো তুলনাই চলে না। আরামকেদারায় শুয়ে শোকের আবেগে তিনি হাঁফাচ্ছিলেন। কান্না জড়ানো গলায় বললেন,'সব শেষ হয়ে গেল। আমরাই তাঁকে শেষ করে দিলাম। এত আঘাত কি কেউ সইতে পারে?'

শ্মশানে প্রচন্ড ভিড় দেখে তিনি বলেন,'এরা যদি তাঁর জীবদ্দশায় সামান্যও আনুকূল্যে থাকত তাহলে বোধহয় এমন অকালে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হত না। বাউলকবি গোবিন্দ দাস ঠিকই বলেছিলেন,"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমার মৃত্যুর পর আমার চিতার উপর তোমরা মঠ তৈরি করে দিও"।'

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কয়েকদিন অবধি শরতের মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল। কখনও কখনও উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে বলতেন,'আমার অপরাধ ক্ষমা করো। আমি তোমায় বিশ্বাস করি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে চাই, আমি শুধু তোমারই। তিনি বোধ হয় প্রতিশোধ নিলেন, ঠিকই করেছেন। আমরা কাঁদিয়েছি, তিনিও আমাদের কাঁদালেন। আসল ও সুদ একসঙ্গে উসুল করে নিলেন। তিনি আমাদের মতো লোকের মাঝে বেমানান ছিলেন।'

দেশবন্ধু সম্বন্ধে শরৎ একটি প্রাণস্পর্শী প্রবন্ধ লেখেন। সুদূর 'মান্দালয়' জেলে বসে দেশবন্ধুর পরম শিষ্য সুভাষচন্দ্র বসু শরতের লেখা 'স্মৃতিকথা' প্রবন্ধটি বার তিনেক পড়েন ও শরৎকে একটি দীর্ঘ পত্র[১] লেখেন,'মনুষ্য চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি। দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ করে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা -এই উপকরণের দ্বারাই আপনি কত সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করতে পেরেছেন।'

দেশবন্ধু ও শরতের সম্পর্ক সত্যই বড় অদ্ভুত রকমের ছিল। কতবার কত বিষয়ে পরামর্শ নেবার জন্য দেশবন্ধু শরতের বাড়ি যেতেন। একবার একটি সভাশেষে গাড়িতে ফেরার পথে তিনি শরৎকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অনেকেই আমাকে পরামর্শ দেন যে, ব্যারিস্টারি করে আবার টাকা পয়সা উপার্জন করি। আপনি কি বলেন?'

শরৎবাবু বললেন, 'না, টাকার কাজের তো শেষ আছে। কিন্তু আদর্শের কোনো শেষ নেই। আপনার ত্যাগ চিরদিন আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হয়ে থাক। অসংখ্য টাকার চেয়ে তা অনেক বেশি মূল্যবান।'

শরৎ ও দেশবন্ধুর ভাবধারায় একটা অদ্ভুত সাম্য ছিল। তাই বোধহয় দুজনেই দুজনকে ভালোবাসতেন। 'সমানে সমানে হয় প্রণয়ের বিনিময়।'

১২

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর রাজনীতি সম্পর্কে শরৎ উদাসীন হয়ে পড়েন, যদিও দেশের উন্নয়নমূলক কাজ তিনি ঠিকই করছিলেন, তবে সাহিত্য জগতে ফেরার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, যদিও লেখার ক্ষেত্রে উদ্দাম ভাবপ্রবণতাকে তিনি পেছনে ফেলে এসেছিলেন। এবার তিনি বৈজ্ঞানিক বিবেচনা ও জীবনের ব্যাপক রহস্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এ সময় বেশি-কিছু লেখেন নি। দু-চারটি ছোট-গল্প ও কয়েকটি প্রবন্ধ জাতীয় লেখা লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলির মধ্যে বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গল্পের মধ্যে 'হরিলক্ষ্মী'[২], 'নববিধান'[৩], ও 'পথের দাবী', ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১ ১২ অগাস্ট, ১৯২৫
২ ১৯২৫-এ পুস্তকরূপে এই নামের গল্পসংগ্রহে ১৩ মার্চ ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প দুটিও ছিল।
৩ পুস্তকরূপে ১৯২৪-এ প্রকাশিত হয়।

'পথের দাবী' উপন্যাসটি লেখার পেছনে আছে বেশ একটি রোমাঞ্চকর ইতিহাস। প্রায় তিন বছর আগে[১] স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে তাঁর নিকট আসেন। তিনি 'বঙ্গবাণী' প্রকাশনার কাজ করতেন। তাঁর বড় সাধ ছিল শরতের গল্প 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হোক। এই উদ্দেশ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ব্যবস্থাপক কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী ছ'মাস ধরে শিবপুর আসা-যাওয়া করছিলেন, তবু একটা গল্পও তাঁরা শরতের নিকট থেকে আদায় করতে পারেন নি। একদিন বাইরের ঘরে বসে রমাপ্রসাদবাবু টেবিলের কাগজপত্র এমনিই উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। হঠাৎ 'পথের দাবী'র খানিকটা লেখা অংশ দেখতে পান। সাত-আট পাতার বেশি নয়, তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না, বললেন,'এই তো, লেখা পেয়ে গেছি!'

শরৎ সেদিকে তাকিয়ে বললেন,'এ তুমি ছাপতে পারবে না। তুমি যে আশুতোষের ছেলে।'

রমাপ্রসাদবাবু বললেন, 'কেন ছাপতে পারব না?'

শরৎবাবু বললেন, 'কারণ এটি বড় ভয়ংকর লেখা।'

রমাপ্রসাদবাবু বললেন, 'আমি ছাপব। আপনার লেখা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে?'

শরৎবাবু বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম, প্রকাশকই জুটবে না, তাই আর বেশি লিখিনি। তুমি যদি ছাপো তাহলে লিখি।'

সেদিন যে-কটি পাতা পাওয়া গিয়েছিল, তা দিয়েই প্রথম সংখ্যাটি[২] বের করা হল। তাঁর এই উপন্যাসটি এত আলোড়ন তুলেছিল যে, সরকারের নজর এড়াতে পারেনি। যেমন যেমন 'বঙ্গবাণী'তে লেখাটি বের হয়, তেমন তেমন সরকার সেটির ইংরেজি অনুবাদ করিয়ে সব তথ্য জেনে নিচ্ছিল। সে সময়ের পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন তারকনাথ সাধু। তিনিও সাহিত্যিক ব্যক্তি ছিলেন। শরৎচন্দ্র বড়ই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েরও বন্ধু ছিলেন, তাই সরকারের ভিতরের সব খবরাখবর তাঁদের যথা সময়ে জানিয়ে দিতেন।

সম্পূর্ণ উপন্যাসটি চব্বিশটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র এমনই মেজাজী, অনিয়মিত মানুষ ছিলেন যে, বারবার আগ্রহ ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিন বছর তিন মাসে বইটি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারে। একটি সংখ্যায় কয়েকখানি পাতার জন্য শুধু কুমুদবাবুকেই নয় বরং শ্যামাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদকেও দশবার করে তাঁর বাড়ি তাগাদা দিতে দৌড়তে হত। রমাপ্রসাদের সঙ্গে শরতের খুবই ভাব ছিল তবু তাঁকেও কতবার খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছে।

প্রকাশক বুঝতে পেরেছিলেন যে, সরকার 'পথের দাবী' উপন্যাসটি পুস্তকরূপে ছাপতে দেবেন না। তাই তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কাজ করলেন, উপন্যাসটির শেষ কিস্তিতেও ক্রমশ কথাটি লিখে দিলেন। পুলিসের লোকেরা ভাবলেন, উপন্যাসটি বুঝি এখনও পর্যন্ত শেষ হয়নি, ইতিমধ্যে সেটি বই হিসেবে প্রকাশিত হয়।

প্রথমে এই বইটি এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স-এর কর্তা সুধীরচন্দ্র সরকার প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি নগদ এক হাজার টাকা সম্মান-দক্ষিণা স্বরূপ শরৎচন্দ্রকে পাঠিয়েও ছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বইটি পড়ার পর তিনি ভয় পেয়ে যান। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করেন। উকিল জানান যে, এ বই ছাপলে রাজদ্রোহের মামলা অবশ্যই হতে পারে।

সুধীরচন্দ্র শরৎকে গিয়ে বললেন,'আমার উকিল বলছে এই উপন্যাসটি হুবহু ছাপলে আমার বিপদ হতে পারে। তিনি পাণ্ডুলিপির কয়েকটি জায়গায় দাগ দিয়েছেন, আপনি যদি বদলে দেন বড় ভালো হয়।' একথা শুনে শরৎবাবু বলেন, 'আমি একটি শব্দও বদলাব না, একটি কমা পর্যন্ত নয়। ইচ্ছে হলে ছাপো, নইলে দরকার নেই।'

১ জানুয়ারি, ১৯২৩
২ 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটিও ছিল।

'তাহলে আমার পক্ষে ছাপা অসম্ভব।'

'ঠিক আছে ছেপো না। তোমার টাকা আমি ফিরিয়ে দেব।'

সুধীরবাবু চলে যেতে রমাপ্রসাদ বলেন, 'যদি আর কেউ ছাপতে রাজী না থাকে তাহলে আমি এটি ছাপব।'

শরৎ বললেন,'বেশ, তুমিই ছাপো।'

প্রকাশনের সমস্যা তো মিটল, কিন্তু প্রেসের লোকেরা শেষকালে বইটি ছাপতে অস্বীকার করল। অবশেষে অনেক চেষ্টায় কটন প্রেসে বইটি চুপিচুপি যাতে কেউ জানতে না পারে, এভাবে ছাপা হয়। কিন্তু ওদিকে তৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রী বি এল মিত্র রাজদ্রোহের অপরাধে সরকারকে মামলা করার পরামর্শ দেন। এখন সমস্যা হল কার নাম প্রকাশক হিসেবে দেওয়া যায়। প্রেসে যখন 'কপি' পাঠানো হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কিশোরমোহন ভট্টাচার্যের নাম দেওয়া হবে একরকম ঠিকই ছিল। কিন্তু উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'যদি রাজদ্রোহের মামলা চলে তাহলে বেচারী গরিব মানুষ পথে মারা যাবে। তাই মামলার খরচপত্র সব আমি করব এবং নামও আমারই যাবে।'

সরকার মামলা দায়ের করার জন্য তৈরি ছিল কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধু বললেন, 'মামলা দায়ের করার আগে একবার ভালো করে ভেবে নিন। এই বইটির লেখক হলেন বাংলার জনপ্রিয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এবং প্রকাশক হলেন স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।'

সরকার চট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। কারণ দেশে শরৎ এবং আশুতোষের এত সম্মান যে, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করলে আন্দোলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে বইটি আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

এই রকম চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কয়েকটা মাস কেটে গেল, হঠাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, বইটি নাকি পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়ে গেছে। প্রথম সংস্করণে তিন হাজার কপি ছাপা হয়। এক হাজার কপি প্রথম দিনই বিক্রি হয়ে যায়, বাকি দু-হাজারও বিক্রি হতে সময় লাগেনি। কুড়ি দিন পর যখন সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, মামলা করার চেয়ে বইখানি বাজেয়াপ্ত করাই উচিত, তখন আর কিন্তু বইখানির একটি কপিও অবশিষ্ট ছিল না। পুলিস ওয়ারেন্ট নিয়ে যখন 'বঙ্গবাণী' অফিসে পৌছল, তখন দোকানে বইটির একটি পাতাও আর পাওয়া যায়নি। পুলিস অফিসার জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কি করে সম্ভব যে, একটি বইও প্রেসে নেই?'

রমাপ্রসাদবাবু বললেন, 'আপনি খুঁজে দেখতে পারেন।'

পুলিস অফিসারটি শেষে বললেন, 'আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। খুঁজে দেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটা কপি অন্তত আমায় দিন। আপনি জানেন নিশ্চয় নতুন বইয়ের তিনটি কপি রেজেস্ট্রি করে পাঠানোর নিয়ম।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু তা তিরিশ দিনের মধ্যে পাঠানো নিয়ম। আপনি যে কুড়ি দিনের মধ্যেই এসে পড়েছেন?'

'কিন্তু আমার যে এক কপি চাইই।'

রমাপ্রসাদবাবু বইয়ের খোঁজে এদিক সেদিক লোক পাঠালেন। অতি কষ্টে ছোটবোনের বাড়ি থেকে বই পাওয়া গেল। তাই নিয়েই পুলিসের লোকেরা চলে গেল।

কয়েকটি পুস্তক বিক্রেতা কিছু বই লুকিয়ে রেখেছিলেন। পরে পঞ্চাশ টাকা করে একটি কপি বিক্রি হয়। লোকে তো দুশো টাকাও দেবার জন্য তৈরি কিন্তু ওই পরিবেশে চাহিদা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সংস্করণের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

বিপ্লবীদের মধ্যেও বইখানি খুব প্রিয় ছিল। তারা বইটিকে নিজেদের বাইবেল মনে করত। এই আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে কেউ একজন লুকিয়ে একটি বাজে কাগজে এটি ছাপে, ছাপায় অত্যধিক ভুল থাকাতে বইটি অবশ্য বাজারে বিক্রির জন্য কোনো দিনই আসেনি। শুধু

বিপ্লবীদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র দ্বিতীয় ভাগ লেখার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু কোনো কারণে তা সম্ভব হয়নি।

'বঙ্গবাণী'তে বইটি যখন ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়, তার প্রতিটি সংখ্যা যোগ করে একটি ফাইল তৈরি করা হয়, সেই ফাইলটি হাতে নিয়ে উমাপ্রসাদবাবু একদিন শরৎকে বললেন, 'নিজের হাতে এতে কিছু লিখে দিন।'

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে শরৎ বললেন, 'আর কি লিখব? আমি লিখব আর সরকার তা বাজেয়াপ্ত করবে। এই পরাধীন দেশে সত্যিকারের সাহিত্য লিখতে গেলে শুধু বেদনাই পেতে হয়।'

তবু মোটা ফাউনটেন পেনটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, 'না, কিছুই লিখতে পারব না।' তারপর আপনা হতেই কলম চলতে লাগল। ফাইলটির প্রথম পাতার মধ্যিখানে প্রথমে উমাপ্রসাদের নাম লিখলেন, তার পাশে নিজের নাম লিখলেন, তার নীচে নিজের কোষ্ঠীর ছক আঁকলেন। জন্মতিথি ও সময় লিখলেন। তারপর মৃত্যু লিখে পাশের জায়গাটি শূন্য রেখে দিলেন। অন্য পাতার উপর তেরছাভাবে লিখলেন, 'কিছুই লিখতে পারলাম না। শরৎ।১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩।'পথের দাবী'র দ্বিতীয় ভাগ আমি যদি সম্পূর্ণ না করতে পারি, তাহলে আমার দেশের আর কেউ যেন পারে—এই কামনা করি।'

ফাইলের শেষ পৃষ্ঠায় লেখেন,--

'যে ফুল না ফুটিতে, ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

অস্ফুট স্বরে গানটি গাইতে গাইতে উমাপ্রসাদবাবুর হাতে ফাইলটি ফিরিয়ে দেন।

'পথের দাবী' লেখার সময় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কয়েকবার তাঁর গভীর আলোচনা হয়। প্রকাশকের জেলে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি জেল হয় কী করবে?'

উমাপ্রসাদ বললেন, 'যদি জেল হয়ই তাহলে একা প্রকাশকের তো হতে পারে না, লেখকেরও নিশ্চয়ই জেল হবে। দুজনে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে। এ তো আমার সৌভাগ্য!'

শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তাহলে এমন ব্যবস্থা করো, যেন জেলে হুঁকো নিয়ে যেতে পারি।'

দুজনেই অট্টহাসি করে উঠলেন। শেষ অবধি অবশ্য কাউকেই জেলে যেতে হয় নি। শরৎ যে কাগজে 'পথের দাবী' লেখেন, তা অত্যন্ত সুন্দর লাইন কাটা ও তার উপর শরতের মনোগ্রাম আঁকা ছিল—কাঁচা ভাবের ছবির মধ্যে লেখা শরৎ। খুব দামী পেন দিয়ে উপন্যাসটি তিনি লেখেন। 'বঙ্গবাণী'র কর্তাব্যক্তিরা বিশেষভাবে তাঁরই জন্য এ দুটি জিনিস পাঠিয়ে ছিলেন। শরৎ বরাবরই দামী দামী কাগজে দামী কলম দিয়ে মুক্তোর মতো ছোট হরফে লিখতে ভালোবাসতেন। একবার কেউ জিজ্ঞেস করে, 'শরৎবাবু, আপনি এত দামী কলম ও কাগজে কেন লেখেন?'

শরৎবাবু তখুনি বলেছিলেন, 'মা সরস্বতী যে আমায় এত বড় প্রতিভা দান করেছেন সে কি সস্তা কাগজে লিখে নষ্ট করবার জন্য?'

'পথের দাবী' বই প্রকাশের আগের দিন রাতে শরৎ ছিলেন মুখার্জীদের বাড়িতেই। সারা রাত জেগে উমাপ্রসাদের সঙ্গে নানান কথাবার্তায় সকাল হয়ে এল। মুদ্রিত বই প্রেস থেকে আসার আগেই শরতের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিখানি উমাপ্রসাদ নিয়ে এলেন। শরৎ অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি এত যত্ন করে রেখে দিয়েছে, এত করছ, তুমি আমায় ওটা দাও, ওতে আমি কিছু

লিখতে চাই।'

পাণ্ডুলিপিখানি হাতে নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সুন্দর অক্ষরে লিখলেন, 'বিজু, আমার হাতে লেখা বই এইখানি ছাড়া আর নেই। এ যেন তোমারই কাছে থাকে, তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো।'

দাদা
ভাদ্র, ১৩৩৩
(আগস্ট ১৯২৬ সাল)

'পথের দাবী' পাণ্ডুলিপিখানির উপরে বইটির নাম লেখা ছিল, শেষে লেখা ছিল—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামতাবেড়, ১০ই চৈত্র, ১৩৩৩ (২৪ মার্চ ১৯২৬ সাল)।

যে সময়ে সরকার 'পথের দাবী' বইটি বাজেয়াপ্ত করে, ঠিক সেই সময়ে রেভারেন্ড জে টি স্যান্ডাল্যান্ড-রচিত 'ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ' বইখানিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। বইটির প্রকাশক ছিলেন 'মডার্ন রিভিউ'-এর সঞ্চালক স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বইটির বাজেয়াপ্তকরণের বিরুদ্ধে দাবি দায়ের করেন। শরৎচন্দ্রেরও তখন মনে হয় তাঁর বইটি সম্বন্ধেও কি এ রকম করা যায় না? কিন্তু তাঁর প্রিয় বন্ধু নির্মলচন্দ্র চন্দ্র তাঁকে বলেন, 'আমি আপনাকে এ কাজ করতে পরামর্শ দিতে পারি না।'

নির্মলচন্দ্র জানতেন যে, আদালতে সরকারের প্রভাব বেশি। তার পরাজয়ের কথা সে সময় ভাবাই চলে না। নির্মলচন্দ্রের ধারণা অমূলক ছিল না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আদালতে হেরে যান। শরৎবাবুও অবশ্যই পরাজিত হতেন, পরাজয় অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। বইটির দরুন সরকারকে চূড়ান্ত বিব্রত হতে হয়েছিল। সে বছরের সরকারী বই এ 'পথের দাবী' সম্বন্ধে লেখা হয়—'এই বইটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় রাজদ্রোহের প্রবল প্রচার করা হয়েছে।'

পুলিস কমিশনার শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'জানেন শরৎবাবু, "পথের দাবী" লিখে আপনি আমাদের কত বড় ক্ষতি করেছেন? যেখানেই আমরা বিপ্লবীদের ধরতে যাই দেখি তাদের কাছে অন্তত দুটি বই নিশ্চয় আছে। একটি "গীতা", আর অপরটি, "পথের দাবী", বিপ্লবীদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে।' শুধু বিপ্লবীদেরই নয়, সারা বাংলাকেই সেদিন পাগল করে তুলেছিল। বইটির লোকপ্রিয়তা আজ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। শরতের মনেও উৎসাহের শেষ ছিল না। যদি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা না করা চলে অন্তত এর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন তো করা যেতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ছাড়া গণআন্দোলন তো সম্ভব নয়। তাই শরৎ রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লিখলেন, রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে জানালেন–

কল্যাণীয়েষু,

তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসাবে এটা দোষের না হতে পারে—কেননা লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব, সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলেম—একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবে না। নিজের জোরে নয়, পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজরাজের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয়, তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু

আমরা সেই চারিত্রিক জোরটারই ইংরেজরাজের কাছে দাবী করি, নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোন দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে, সেখানে এমনিই ঘটেছে-রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেচে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত-কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক- বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিবতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য,—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।

ইতি–২৭ মাঘ ১৩৩৩।
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭।
তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথেব চিঠিখানি যুক্তিপূণ এবং পরোক্ষে তিনি শরৎচন্দ্রের প্রশংসাই করেছিলেন। তবু এই পত্রটি থেকে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিঠি পড়ে শরৎ অত্যন্ত বেদনা বোধ করেন। প্রতিবাদ করার অধিকার তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারছিলেন না। বাববার ভাবছিলেন, 'পথের দাবী' পড়ে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন, আমার বই-এ ইংরেজের প্রতি বিদ্রোহের সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। আমাদের :েশের কবির চোখে যদি ইংরেজ শাসন এত প্রিয় ও বড় হয় তাহলে কিসের জন্য এ আন্দোলন? তাহলে তো ইংরেজদের কাঁধে চড়িয়ে সবাই নাচা উচিত। হায় কবি, যদি তুমি জানতে তুমি আমার কত বড় আশা, কত বড় গর্ব, জানলে নিশ্চয় এ কথা বলতে না। কবির চোখে আমার 'পথের দাবী' লাঞ্ছনার পাত্র হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কি মন নিয়ে আমি এ বই লিখেছিলাম, কাউকে বোঝাতে পারব না।

দুঃখের উত্তেজনায় শরৎ রবীন্দ্রনাথের চিঠির জবাব স্বরূপ যে চিঠিখানি লেখেন তার প্রতিটি অক্ষর থেকে যেন আক্রোশ ও রোষ ঝরে পড়েছে। সংযম বাঁধ মানেনি। কিন্তু ভালোই হয়েছিল যে, সে চিঠি তখুনি তিনি তাঁকে দেননি। বোধ হয় মনে ভেবেছিলেন এ ধরনের চিঠি লেখা অন্যায়। শরৎ লিখেছিলেন,

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই, অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে সে সম্বন্ধে আমার দুই-একটা প্রশ্নও আছে বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরেজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম, লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে Politician—দের Propaganda হত, কিন্তু বই হত না। নানা কারণে বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভাণ করে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অথাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন—এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। কিন্তু বাঙলাদেশের গ্রন্থকার হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় তো করতেই হবে,—তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়?

রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ ছানা, মাখন পায় না। চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি। কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি Jail authority-রা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের জ্বালা কণ্ঠ রোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একাব লেখা। সুতরাং দায়িত্ব একার। যা বলা উচিত বলে মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমাব সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরনের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি আমাব প্রশ্ন ইংরাজ বাজশক্তিব এ বই বাজেয়াপ্ত করবাব Justification যদি থাকে, পরাধীন ভাবতবাসীব পক্ষে Protest করার Justification তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদেব ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁদে নিজে গা ঢাকা দেবাব চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না কবে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈচৈ করে নয়, আব একখানা গ্রন্থ লিখে।

আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে, এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোতো। মানুষের ভুল হয়, আমারও হয়েছে মনে কবতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখিনি. যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়।

আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে।

ইতি, ২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩।
সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠিখানি লেখার আগে শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দুঃখ করে একখানা চিঠি লেখেন। শরতের চিঠি পড়ে উমাপ্রসাদ সামতাবেড়ে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা শরতের চিঠি পড়েন। চিঠি পড়ার পর তিনি বলেন যে, এ চিঠি গুরুদেবের কাছে পাঠান ঠিক হবে না। চিঠিটা তিনি নিজের কাছে রেখে দিলেন। দিন দুই পর মন একটু ঠাণ্ডা হলে শরৎ নিজেও বলেন, 'আমার চিঠিটা সত্যিই পাঠাবার দরকার নেই। তর্ক-বিতর্ক করাও ঠিক নয়।'

উমাপ্রসাদকে কারও নিকট এ চিঠির কথা বলতে বারণ করেন। কিন্তু শরৎ নিজেই কয়েকটি সভায় অনেকগুলি পত্র-পত্রিকায় চিঠিখানির উল্লেখ করেন। শ্রীমতী রাধারানী দেবীকে লেখেন, 'একটা কথা তোমাকে জানাই, কারুকে বোলো না। "পথের দাবী" যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে, আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে, পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে গভর্নমেন্ট সাহিত্যের প্রতি কী রকম অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংরাজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে, খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন, পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্নমেন্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্নমেন্টকে যা-তা নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।

'ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এই চিঠি ছাপাবার জন্যেই তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এতবড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেটসম্যান প্রভৃতি ইংরাজী কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেছে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে।'

সেই সময় বেঙগল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। ব্যবস্থাপকদের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র ঘোষালও ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের পরম ভক্ত। অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি শরৎচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মন ও মস্তিষ্ক 'পথের দাবী'র ব্যাপারে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের এই অধিবেশনটি তো বাংলার সব লাইব্রেরি নিয়ে। তুমি এক কাজ করো না। একাজ তুমিই পারবে। "পথের দাবী"কে বাজেয়াপ্তকরণ থেকে মুক্তির জন্য সভায় একটি প্রস্তাব পাস করতে পারবে? সভায় যদি স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ হয় তাহলে খুব ভালো হয়। সরকার হয়তো নরম হতে পারে। আমার অন্য পাঁচখানা বই বাজেয়াপ্ত হলে হয়তো আমার কত দুঃখ হত না।' তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সভায় প্রস্তাব রাখা হয়। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই নিষেধ আজ্ঞার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় সরকারের নিন্দা করেন। কিন্তু পরিণামে কোন ফল পাওয়া গেল না।

একদিন কে এক প্রেন্টিশ সায়েব শরৎচন্দ্রকে ডেকে বললেন, 'তুমি সরকারের পক্ষ থেকে "পথের দাবী"র মতো একখানি বই লিখে দাও, ভালো টাকা পাবে।'

উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'সাহেব, ছেলেবেলায় আমার ঘুড়ি উড়িয়ে লাট্টু আর গুলি খেলে কেটেচে। যৌবনে চা গাঁজাগুলি খেয়ে তারপর রেঙগুনে গিয়ে চাকরি করেছি, আর চার অধ্যায় লেখার বয়স নেই। আমায় ক্ষমা কর।'[১]

এই ঘটনাটি কতরকম ভাবেই না প্রচার হয়েছিল। বোধহয় তিনি বলেও থাকবেন, 'সায়েব, আমার জীবনের তিনটে অধ্যায় তো কেটে গেছে। ছেলেবেলায় দেবদাস, যৌবনে জীবানন্দ, প্রৌঢ়ত্বে আশুবাবু, চতুর্থ অধ্যায় যোগ করার আর ইচ্ছে নেই।'

হয়তো এ-ঘটনাও সম্পূর্ণ সত্যি নয়। তাঁর সম্বন্ধে হাজার কিংবদন্তী শোনা যায়, এটিও হয়তো তারই একটি। কারণ কবিগুরুর প্রতি যতই অপ্রসন্ন হোন-না কেন, তাই বলে তাঁর লেখা বিখ্যাত 'চার-অধ্যায়' উপন্যাসটি নিয়ে বিদেশী অফিসারের সামনে নিশ্চয় তামাশা করবেন না।

'পথের দাবী' নিয়ে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় তাতে শরতের জেল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

১ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—'শরৎ পরিচয়'।

কিন্তু জেলে আফিং খাওয়া নিষেধ। সেই ভয়ে হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে, এবার থেকে আর তিনি আফিং খাবেন না।

আফিং ছাড়ার পরই তিনি জ্বরে পড়েন। তিন সপ্তাহ পরেও জ্বর নামে নি। চিন্তিত ডাক্তার খোঁজ নিয়ে জানলেন, শরৎ আফিং খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। যে লোক দিনের মধ্যে কয়েকবার ছোলার দানার মতো বড় আফিং-এর গুলি খায়, সে হঠাৎ নেশা ছেড়ে দেবে, আশ্চর্যের ব্যাপার বই কি! ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'আফিং খাওয়া আপনি কবে থেকে ছেড়েছেন?'

বড় বউ জবাব দিলেন, 'প্রায় মাস খানেক হল ছেড়েছেন।' ডাক্তার বললেন, 'ডাক্তারী শাস্ত্রে একে "ওপিয়ম ফিবার" বলে। ওষুধের সঙ্গে আফিং-এর মাত্রা যেমন যেমন বাড়ানো হবে, জ্বর আপনা হতেই ছেড়ে যাবে। আফিং ছাড়ার একটা নিয়ম আছে, আপনি যদি সত্যিই ছাড়তে চান তো নিয়ম মেনে ছাড়তে পারেন।' কিন্তু নিয়ম পালন করা শরতের পক্ষে অসম্ভব। তাই জ্বর তাঁকে ছেড়ে গেলেও, আফিং ছাড়ানো গেল না। বর্মা থাকতেও এ নেশা ছাড়ার চেষ্টা করেছিলেন। হয়তো দেশবন্ধুর সাহচর্যে আসার পর এই বদ নেশার জন্য তাঁর আত্মগ্লানি হত। একদিন দুঃখ করে মামাকে বলেছিলেন, 'দেখ! এই নেশা করে যে কি ভুলই করেছি! যখন আফিং খেতাম না তখন পৃথিবীর সব জিনিস স্বচ্ছ, সুন্দর লাগত। যদি নেশা না করতাম, তাহলে এর চেয়ে অনেক বড় লেখক হতে পারতাম।'

অনেক সময় ঠিক এর উল্টো কথাও বলতেন। একবার কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'দাদা, সেদিন যে আপনি এ কথাটা অন্যভাবে বলেছিলেন?'

একটু গম্ভীর হয়ে জবাব দেন, 'কথাটা যখন আমার, তখন সেটা কি ভাবে বলা উচিত সে অধিকারও নিশ্চয়ই আমার।'

সমস্তক্ষণ রঙ্গ, রস নিয়ে কোনো সাহিত্যিক মেতে থাকতে পারেন না। শরৎকেও গুরুগম্ভীর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। 'পথের দাবী' লেখার প্রেরণা সম্বন্ধে কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করতেন, 'দাদা! এ উপন্যাসটি লেখার প্রেরণা আপনি কেমন করে কোথা থেকে পেলেন? দাদা, এর নায়ক কে? দাদা, কোন্ বিপ্লবীকে উপলক্ষ্য করে আপনি সব্যসাচীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন? ভারতী কে?' ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রশ্নে লোকে তাঁকে অস্থির করে তুলত।

এসবই অর্থহীন প্রশ্ন। লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মানে এই নয় যে, সব সময় সে কোনো জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেই উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি করে। সে সময় অবশ্য শরৎ বেশ কিছু রাজবন্দী ও বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। অনেক দিন আগে পিনাং-এ কোনও এক বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সম্ভবত তাঁর সামগ্রিক গুণাবলী লক্ষ্য করে তিনি 'সব্যসাচী'-কে সৃষ্টি করেছিলেন। তার মধ্যে কোনো একজন ব্যক্তিকে খোঁজা বৃথা।

তবুও 'পথের-দাবী'-তে রেঙ্গুনের বিভিন্ন স্থান ও সেখানকার অধিবাসীদের যে চিত্রায়ন হয়েছে, তা যথার্থ এবং বাস্তবভিত্তিক। চন্দননগরের আলোচনা সভায় তিনি স্বীকার করেছিলেন, 'সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও ইত্যাদি সমস্ত দ্বীপে আমি ঘোরাফেরা করতাম। ওখানকার বেশির ভাগ লোকই ভালো নয়। চোর ছ্যাঁচড়।' বর্মাতেও তিনি কোকেনের চোরাকারবারীদের একটি দলের কথা শুনেছিলেন। তাদের নেত্রী ছিল এক মহিলা। সেই মহিলাই তাঁর সুমিত্রা চরিত্র সৃষ্টির কারণ হয়ে উঠেছিল। এইভাবে তাঁর সামগ্রিক অভিজ্ঞতার ফসল হল 'পথের দাবী'। ঘরে বসে থেকে আর আরামকেদারায় পড়ে থেকে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। হ্যাঁ, নকল করে যেতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর সঙ্গে 'পথের দাবী'-র তুলনা করতে গিয়ে একজন বলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' না আছে আদর্শের বিদ্রোহ, না আছে বিপ্লব, না অরাজকতা। ওটা স্বদেশপূজার শাস্ত্র, কিন্তু ওতে আছে বিজাতীয় বিদ্বেষ। 'পথের দাবী'-তে পথের সঙ্কেত নেই। পথেই তার শেষ হয়ে গেছে। শরৎ 'যা আছে' তারই শিল্পী। কল্পনার সাহায্যে তিনি আদর্শকে গড়েননি। যথার্থ বাস্তবকে ভাষা দিয়েছেন।

কিন্তু এটাও কী সত্যি নয় যে, 'আনন্দমঠে' যে বিজাতীয় বিদ্বেষ দেখা যাচ্ছে, তা ইচ্ছাকৃত

নয়। এই বিদ্বেষ শাসকের প্রতি, এবং কেবল ঘটনাচক্রে শাসক বিজাতীয়। তাছাড়া 'পথের দাবী'-তে বিপ্লবীদের যে চিত্রায়ন উপস্থাপিত হয়েছে, অনেকেরই কাছে তা জীবন্ত হয়েও পূর্ণাঙ্গ হয়নি। শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকেও 'পথের দাবী'-র স্থান তাঁর নিজেরই অনেক উপন্যাসের থেকে নীচে। মনের আবেগের ঘাত-প্রতিঘাত শরৎ-সাহিত্যের যে-বৈশিষ্ট্য, এতে তা কোথায় ? আর কোথায়-বা সেই সংযম, যা 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রীর মধ্যে রয়েছে ? এতে শুধু ডাক্তার এবং কয়েকটি গৌণ চরিত্রই এই দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধ হয়।

বস্তুত শিল্প এবং চরিত্রসৃষ্টির সংযমের ক্ষেত্রে 'পথের দাবী'-র মহত্ত্ব ততটা নেই, যতটা আছে রাজনৈতিক জীবনের একটি অস্পৃশ্য অনন্যতাকে সজীব রূপে গড়ে তোলার চেষ্টার মধ্যে। সে-চেষ্টা প্রায়ই আয়াসসাধ্য হয়েছে। এই আয়াসই হয়েছে এর দুর্বলতা। কিন্তু তবুও নিজের সমস্ত দুর্বলতার মধ্যেও 'পথের দাবী'-র সব্যসাচীর নির্মল চরিত্র ভারতের জনমনকে চিরদিন আকৃষ্ট এবং প্রভাবিত করে চলবে।

১৩

যখন তিনি 'পথের দাবী' লিখছিলেন, ঐ সময়ে তাঁর বাড়ি তৈরি প্রায় শেষ। উনি সেখানেই গিয়ে থাকতে শুরু করেন।[১] ওখানে যাবার আগে প্রায় বছরখানেক আগে তিনি শিবপুরে ট্রামডিপোর পাশে কালীকুমার মুখার্জি লেনেও ছিলেন।

ঐ বাড়িটা তিনি তাঁর দিদির গ্রাম গোবিন্দপুরের পাশে সামতাবেড়ে রূপনারায়ণ নদীর ধারে তৈরি করিয়েছিলেন। প্রশস্ত জায়গা, পাশে দুটি পুকুর আর একটি বাগান, এও তিনি নিজে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। নিজের সুবিধামত সবকিছু মনে রেখে তিনি এসব করান। তাতেই তখনকার দিনে প্রায় সতের হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছিলেন।

গ্রামটির আসল নাম ছিল সামতা তবে তাঁর বাড়িটি ছিল একেবারে নদীর ধারে বাড়-এর মত, সেইজন্য তিনি লিখতেন সামতাবেড়। রেলে করে দেউলটি স্টেশনে পৌঁছে সেখান থেকে পালকি করে গ্রামে যেতে হত। বর্ষাকালে রাস্তাঘাটে জল জমে গেলে অসুবিধার সীমা থাকত না। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দরুন সে কষ্ট বোঝা যেত না। চারিদিকে বিস্তৃত ধানের ক্ষেত, প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকত কলা আর খেজুর গাছের সারি, আর কানায় কানায় ভরা নদী তীব্রতায় এবং উচ্ছ্বসিতরূপে জলের সংঘর্ষ নিয়ে লাট্টুর মতো ঘূর্ণীর ফেনা ছড়িয়ে এগিয়ে চলত। রাস্তায় নালাও কম ছিল না। বাঁশের সাঁকো দিয়ে পার হতে হত।

পথের সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও রূপনারায়ণ নদীটি তাঁর শিল্পীমনকে গোড়া থেকেই হাত ছানি দিয়েছে। নিজের কৈশোর বয়সে তিনি দিদির কাছে প্রায়ই আসতেন। অন্তত বর্মা যাবার আগে তো অবশ্যই এসেছিলেন। তাই ওঁর মামা গিরীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'তবুও একবার অবশ্যই এস। দিদি খুশি হবে। বাড়িটা বিশাল রূপনারায়ণের ঠিক সামনেই। শুনেছি, শিকারের ব্যবস্থাও আছে.... যদি তুমি সত্যি আসতে চাও তো অবশ্যই চলে এস। আমরা স্টেশনে দেখা করব। স্টেশনটিও পরিচ্ছন্ন। রূপনারায়ণের ওপর যে পুলটা, সেটা তো আরো ভালো। তাছাড়া আমরা নৌকোবিহার করব। কি বল!....[২]

শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টায় তিনি জীবনের শেষ কয়েকটি বছর গ্রামে কাটানোর সিদ্ধান্ত করেন। এর আগে কিছুদিন ধরে তাঁকে নানাপ্রকার আঘাত সহ্য করতে হচ্ছিল। কিছু প্রিয়জনের মৃত্যু তাঁর মনে খুব আঘাত হেনেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের

১. ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬
২ ২৪ ডিসেম্বর ১৯০২

মৃত্যুতে তাঁর অনেক কিছু ওলটপালট করে দিয়েছিল। কিন্তু তারও আগে তাঁর চিরসঙ্গী ভেলুর মৃত্যু হয়েছিল। ভেলু ছাড়া তাঁর জীবন যে কতখানি অপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেটা ওঁর পাশে থাকবার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছিল, তিনিই জানতেন। ওকে নিয়ে তাঁকে অনেক কিছু সইতে হয়েছে। তবু ওকে তিনি চিরদিন নিজের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসতেন। তাঁর সহজ সরল বিশ্বাস ছিল যে, ভেলু যেমন শান্তশিষ্ট কুকুর, অমন আর হয় না। ইলাচন্দ্র যোশীকে তিনি বলেছিলেন, 'কুকুর ভালোবাসার মধ্যেও কপট ক্রোধের ভাব দেখিয়ে চিৎকার করে। এই সত্য কেবল সেই লোকেই জানে বোঝে, কুকুরকে যে ভালোবেসেছে আর কুকুরের ভালোবাসা পেয়েছে। কুকুর মানুষকে মানুষের চেয়ে বেশি চেনে। আমার একথা তুমি মনে রাখবে।'

তাই তিনি মনে করতেন, ভেলু কাউকে কামড়ে দিলেও আদর করে কামড়ায়। এই আদরের দরুন তাঁকে আদালতে যেতে হয়েছে, কামড়ানো লোককে টাকাপয়সা দিতে হয়েছে, উপরন্তু বার বার ওর লালা পরীক্ষা করাতে হয়েছে। তবু কোনদিন ওর অনাদর করতে পারেননি। খুব আদর করে ওকে পাশে বসিয়ে রাখতেন। একদিন এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁকে থালাভর্তি সন্দেশ পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে একটি চিঠি ছিল। তাতে লেখা—'গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব।-ইলা।'

ভেলু যেমনি সেই থালাটা দেখতে পেল, অমনি তার চারপাশে ঘুর্ ঘুর্ করতে লাগল। খুব আদর করে শরৎবাবু ওকে একটা সন্দেশ খেতে দিলেন। খেয়ে ও আরও চাইল। ও চাইতেই থাকল আর শরৎবাবু কেবলই দিতে থাকলেন যতক্ষণ না থালা খালি হল। কবি নরেন্দ্র দেব বসে বসে সব কিছু দেখছিলেন। বললেন, 'এ আপনি কি করলেন? ঐ মহিলা যে-সন্দেশ শ্রদ্ধাভরে আপনাকে পাঠালেন, তা সবই আপনার কুকুরকে খাইয়ে দিলেন! তিনি শোনেন তো কত কষ্ট পাবেন! ভাবুন তো!'

শরৎবাবু উত্তর দিলেন, 'এই তো তোমার দোষ! কোনো কথার গভীরে গিয়ে বোঝবার চেষ্টা করো না। ইলা আমাকে সন্দেশ কেন পাঠিয়েছিল ? এই আশায় যে, আমি খেয়ে তৃপ্ত হব, তাই না? এখন ভাবো, আমি না খেয়ে ভেলুকে খাইয়ে দিলাম। ওগুলো খেয়ে ও যত তৃপ্তি পেল, আমি কি অতটা পেতাম ? আমার বিবেচনায়, ইলার অর্ঘ্য ব্যর্থ না হয়ে পরিপূর্ণরূপে সার্থক হয়েছে।'

ভেলুকে নিয়ে এইরকম অনেক ঘটনা প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। হতে পারে এসব ঘটনাবিশেষে সত্যতার কিছু অভাব আছে, আর লোকমুখে ফিরতে ফিরতে কল্পনা সেগুলোকে এরকম রূপ দিয়েছে, সুতরাং শেষমেশ ঘটনাগুলো শুনে প্রতিবাদ করাটা মূর্খতা।

কিন্তু একথা সত্যি যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য যখন কেউ বাইরে থেকে ডাকতো 'শরৎবাবু' বলে, তখন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সবার আগে ঘেউ ঘেউ করে দৌড়ে আসতো ভেলু। ভেলুর চেহারা আর ডাক শুনে আগন্তুক ঘাবড়ে যেত। শরৎবাবু তখন আদর করে ডাকতেন, 'এই ভেলু!' আর ভালোমানুষটির মতো ভেলু তাঁর পাশটিতে গিয়ে বসতো।

এক নবাগত আগন্তুক ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কুকুরটা কি কামড়ে দেবে?'

প্রত্যুত্তরে শরৎবাবু তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনাকে কি কামড়ে দিয়েছে?'

এরকম আক্ষেপের আভাসমাত্রই তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলতো। তবু এহেন ভেলুকে নিয়ে মাঝে মাঝে খুবই অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে যেত। একদিন বাড়িওয়ালা বাড়িভাড়া নিতে আসেন। তাঁকে টাকা দিয়ে শরৎবাবু তাড়াতাড়ি চলে যান খেতে, আর খেয়েদেয়ে যখন ফিরে এলেন, দেখেন কী, বাড়িওয়ালা এককোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন। ভাড়ার টাকা তেমনিভাবেই তাঁর হাতে ধরা রয়েছে আর সামনে বসে ভেলু একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শরৎবাবু খুব দুঃখিত হন। তিনি ভেলুকে কাছে ডেকে নেন এবং বাড়িওয়ালার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলেন, 'ছিঃ ছিঃ আপনাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। স্নানাহার এখনো হয়নি। বড় অন্যায় হয়ে গেল। কিন্তু আমি তো জানতাম না।'

এত কাণ্ডের পরেও তিনি ভেলুকে একটি কথাও বললেন না। পাড়াপড়শিরা কেউ কখনও

ভেলুকে বকলে—ব্যস্, আর রক্ষে ছিল না। তামাক খেতে থাকতেন তো হুঁকোটা নিয়েই তিনি দৌড়ে গিয়ে তাদের অনর্গল বকে যেতে শুরু করে দিতেন। আর সেই বকুনির প্রাকৃত ভাষা শুনে পাড়ার লোকেরা একেবারে মাথা নীচু করে পালাবার পথ পেত না।

তিনি ভেলুকে চা-ও খাওয়াতেন। চায়ের পেয়ালায় ভেলুর লোম এসে পড়লেও তিনি নিজে তো কোনই আপত্তি করতেন না, অন্যের আপত্তিও তিনি সইতে পারতেন না। কুকুরের প্রতি এই অসংগত অসীম ভালোবাসার দরুন বন্ধুরা ব্যংগ করে ভেলুকে তাঁর ছেলে বা যুবরাজ বলে ডাকত। লীলারানীকে তিনি নিজেও লিখেছিলেন, 'এখন আমার ছেলে আমার ভেলু কুকুরটি। ওকে সবাই চেনে। সবাই জানে এই কুকুরটা শরৎবাবুর প্রাণের থেকেও প্রিয়।'

তাঁর সেই ভালোবাসার অধিকারী একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি তিনি তাকে বেলেঘাটা হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। তাঁর তখন ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে ওকে তিনি বাড়ি নিয়ে আসেন। স্বাস্থ্য ওর ভালই চলছিল। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর ওর রোগ আবার বেড়ে যায়। ডাক্তার এসে বলেন, অ্যাকিউট গ্যাসট্রাইটিসের কেস।

আর কোনও ওষুধে কাজ হল না। শেষের দিনে ভেলুর ভারি কষ্ট হয়েছিল। আগের দিন শরৎবাবু চামচে করে ওকে ওষুধ খাওয়াবার খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ওষুধ কিছুতেই পেটে যেতে পারল না। রাগ করে ভেলু তাঁর হাতে কামড়ে দেয়। তারপর সারারাত তাঁর গলার কাছে মুখ রেখে ও কাঁদতে থাকে। ভোরবেলা তার কান্না থেমে যায়। তাঁর নিঃসংগ জীবনের চব্বিশ ঘন্টার সাথী, প্রবাসের বন্ধু, এই দুনিয়াতে ও কেবল তাঁকেই চিনত। যখন ও তাঁকে কামড়ে দিয়েছিল, তখন সবাই খুব ভয় পেয়ে যায়, কিন্তু স্বয়ং শরৎবাবুর মনে রবিবাবুর সেই পংক্তিটি গুঞ্জরিত হচ্ছিল, 'তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা।'

ভেলু তাঁর শরীরে আঘাত দিয়েছিল কিন্তু ওর মনে অবহেলা ছিল না, একথা পূণ বিশ্বাসের সংগে তিনি সকলকে বলতেন। তবে এত ব্যথা তিনি এর আগে কোনোদিন পাননি। তিনি শিশুর মতো কেঁদেছিলেন এবং প্রতিবেশীর বাগানে তার জন্য নিজের হাতে সমাধি তৈরি করে দিয়েছিলেন। একটি খাতায় ওর মৃত্যুর খবর তিনি এইভাবে লেখেন, 'ভেলু, দেহত্যাগ করার দিন, ১০ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩২, সকাল ৬টা, ২৩ এপ্রিল ১৯২৫ ইং। সমাধি বেলা সাড়ে নটা, বাজে শিবপুর, হাওড়া। রাত্তির-দিনের সংগী আমার পরম স্নেহের বন্ধু।'

তাঁর স্নানাহার সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু সমাধির পাশটিতে বসে কাঁদতেন। বড় বউ বুঝিয়ে বুঝিয়ে হার মেনে গেছিলেন, তবু তিনি শান্ত হননি। খবর পেয়ে 'ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেন তাঁর সংগে দেখা করতে আসেন। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে শরৎবাবু কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'দাদা, আমার ভেলু আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।'

সেসব দিনে কেউ তাঁর সংগে দেখা করতে গেলেই তিনি তার সামনে এরকম শোকার্ত হয়ে পড়তেন যেন মনে হত তাঁর সর্বাধিক প্রিয়জন কারো বুঝি মৃত্যু হয়েছে। নিজের প্রিয়বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি লেখেন, 'আমার চব্বিশ ঘন্টার সংগী আর নেই। সংসারে এত বড় ব্যাপারও যে আছে এ—আমি ঠিক বুঝতাম না। বোধ হয় তাই এটা আমার প্রয়োজন ছিল। আর একটা জিনিস টের পেলাম, চারু।—পৃথিবীতে objective কিছুই নয়, subjective টাই সমস্ত। নইলে একটা কুকুর বই তো নয়। রাজা ভরতের উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যে নয়।'[২]

সুরেনমামাকে তিনি বলেছিলেন, 'জীবনে কত দুঃখকষ্ট পেয়েছি, সেসব ভেলু বহুবার তুচ্ছ করে দিয়েছে দুঃখের দিনগুলোতে ভেলুর সাহচর্যে আমার সময় সুখেই কেটে গেছে।'

কতখানি একাত্মভাব ছিল ওঁদের দুজনের মধ্যে। একজন পশু, একজন দরদী মানব।

এই কাহিনী থেকে হয়তো একটা ভুল ধারণা হতে পারে যে, তিনি কেবল নিজের কুকুরকেই

১ ৭ ভাদ্র,১৩২৬ (২৩ অগাস্ট, ১৯১৯)
২ ২১ এপ্রিল, ১৯২৫

এত ভালোবাসতেন। কিন্তু একথা সত্যি নয়। জীবমাত্রেই তাঁর প্রেম ছিল। কুকুরদের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রেম ছিল। নিজের মোটরগাড়ির চালককে তিনি আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, 'দেখ বাপু, যদি তুমি কোনো মানুষকে মোটরের নীচে চাপা দাও তো আমি কিছু না বলতেও পারি। কিন্তু যদি কোনো কুকুরকে তুমি চাপা দাও, তাহলে জেনে রেখো, তোমার চাকরি গেল।'

এই আঘাত তাঁর নতুন বাড়িতে আসার পরেও তাঁর পিছু ছাড়েনি। তখন ন'মাসও কাটেনি, আর-এক প্রবল আঘাত তাঁকে সইতে হল। তাঁর ছোটভাই প্রভাসচন্দ্র প্রায় পনেরো বছর আগে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। দু'বছর তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে থাকেন। তারপর কয়েক বছর বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ব্যবস্থাপনার ভার তাঁর ওপর ছিল। কিছুদিন আগে তিনি মিশনের কাজে বর্মা চলে গিয়েছিলেন। শরৎবাবুর মতো স্বাস্থ্যও তাঁর তেমন কিছু ভালো ছিল না। বর্মা থেকে ফেরার পথে তিনি কলকাতায় আসেন এবং বরাবর তিনি যা করতেন, সেইমতো পূর্বাশ্রমের নিজের বড় ভাই শরৎবাবুর কাছেই থাকেন। এখানেই হঠাৎ তাঁর জ্বর হয়। কয়েকমাস আগেও পূর্বস্বাস্থ্য লাভ করে তিনি এখান থেকে গিয়েছিলেন, কিন্তু বরাবর অসুস্থ থাকার দরুন তাঁর শরীর ভেঙে গিয়েছিল। কয়েকবার তিনি বলেও ছিলেন যে, এবার এই শরীর ত্যাগ করার প্রয়োজন হয়েছে। হয়তো প্রয়োজনের সেই ক্ষণটি এসে গিয়েছিল। পরের দিনই তিনি আরও অস্থির হয়ে উঠলেন, বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বাইরে চলে এলেন। শরৎবাবুর বুকের ওপর মাথা রেখে দেহ ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুর সময়ে শরৎবাবু, অনিলা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী আর প্রকাশচন্দ্র, এই চারজন পূর্বাশ্রমের পরিজন তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন।

বাড়ির একটা পশুপক্ষীরও মৃত্যু যে লোক সইতে পারেন না, সেই শরৎবাবু এই ভ্রাতৃবিয়োগে খুব ব্যথিত হয়ে পড়েন। তখনকার লেখা তাঁর একটি চিঠিতে সেই ব্যথার খানিকটা আভাস মেলে— 'আমি যে এত বড় দুর্বল ছিলাম একথা তো জানিতাম না। এ ব্যথা আমার সহিবে কি করিয়া?'

ভাইয়ের সমাধি তিনি নিজের বাড়ির পাশেই নদীর তীরে তৈরি করিয়েছিলেন। যতদিন সামতাবেড়ে ছিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতেন। শুধু তাই নয়, লিখতে লিখতে অনেক সময়ে উঠে দাঁড়াতেন আর সমাধির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর শ্রাদ্ধের দিনে তিনি প্রতি বছর কীর্তন ও ভোজের ব্যবস্থা করতেন।

সন্ন্যাসী হয়ে যাবার পরে প্রভাসচন্দ্র স্বামী বেদানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে বেলুড় মঠের একজন স্বামীজী শরৎবাবুর কাছে আসেন এবং বলেন, 'আপনি স্বামী বেদানন্দের দেহ কেন আমাদের কাছে অর্পণ করেননি? নিজেই কেন তাঁর সৎকার করলেন? তাঁর সমাধি বেলুড় মঠে হওয়া উচিত ছিল, এখানে কেন সমাধি তৈরি করালেন?'

স্বামীজী ঠিকই বলেছিলেন যে, সন্ন্যাসী হয়ে যাবার পর পূর্বাশ্রমের পরিজনের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু শরৎবাবু স্বামীজীর কথা শুনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বলেন, 'আপনি এটা কেন ভুলে যাচ্ছেন যে, তিনি আমার সহোদর ছিলেন। আপনার চেয়ে তাঁর ওপর আমার বেশি অধিকার ছিল। আপনি তাঁর কে?'

শরৎচন্দ্র রীতিনীতির বিধান কখনই মেনে চলেননি। তাঁর সামনে শঙ্করাচার্য প্রভৃতির দৃষ্টান্ত ছিল, যিনি নিজের মায়ের দাহ সৎকার করেছিলেন। তাঁর মতো শরৎবাবুও জড় নিয়মের ওপর আঘাত হেনেছিলেন। এনিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্কও হয়েছিল, তবু বেলুড় মঠের স্বামীজী কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারেননি। তখন শরৎবাবু বলে ওঠেন, 'যা হোক, যা হবার হয়ে গেছে, ওসব কথা যেতে দিন। এখানে আর-এক স্বামীজী আছেন, তাঁকে নিয়ে যান।'

স্বামীজী খুব অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই শরৎবাবু চিৎকার করে

১ বুধবার, ২৭ অক্টোবর,১৯২৬

ডাক দিলেন, 'স্বামীজী! স্বামীজী!'

ত্বরিতগতিতে একটি মোটাসোটা ছাগল দৌড়ে চলে এল। শরৎচন্দ্র সেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেলুড় মঠের এই স্বামীজী তোমাকে নিতে এসেছেন। ইনি বলতে চান যে, কোনো স্বামীজী গৃহস্থের ঘরে থাকতে পারেন না। তুমি চাও তো এঁর সঙ্গে যেতে পারো।'

তারপর স্বামীজীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'একে যদি একটা গেরুয়া চাদর আপনি পরিয়ে দেন, তাহলে আপনাদের দলে মিশে যাবে।'

স্বাভাবিকভাবেই, এই ব্যঙ্গ শোনার পর স্বামীজী বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং অগ্নিশর্মা হয়ে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

এই কথাটা একটা প্রবাদমাত্রও হতে পারে, কিন্তু সত্যি হলেও তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এর অনেক বছর বাদে[১] স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে যে সভা হয়েছিল, সেখানেও তিনি ঐ মঠের কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আপনারা রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দের আদর্শের অনুরূপ কাজ করছেন না।'

এথেকে অনুমান করা যায় তো, এই ঘটনাটিতে কিছু না কিছু সত্যের আভাস আছে? আবার একথা বলাও অন্যায় হবে যে, তিনি অধার্মিক বা নাস্তিক ছিলেন। যৌবনের আবেগে তিনি নিশ্চয় কয়েকবার ধর্ম এবং ঈশ্বরের ওপর আক্রমণ করেছিলেন, তবে সেই আক্রমণ তাঁর অন্তরের বিশ্বাসপ্রসূত ছিল না। তিনি অন্ধবিশ্বাস এবং সঙ্কীর্ণতার ওপরেই আঘাত করতে চেয়েছিলেন। দৈব চমকপ্রদ এবং অলৌকিক কর্মকাণ্ডে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তবে এক সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সত্যিকারের আস্থা ছিল। যা বাস্তবিক ধর্ম, তার প্রতি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধাও নিরন্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর সমগ্র সাহিত্যে এই কথারই প্রমাণ রয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে রাধাকৃষ্ণের যে-মূর্তিটি উপহার দিয়েছিলেন, তার নিত্যপূজার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। এক পুরোহিত বিশেষভাবে তার দেখাশুনো করতেন। যেদিন পুরোহিত মশায় আসতেন না, তিনি নিজেই পুজো করতেন। বলতেন, 'পুজোর ভার দেশবন্ধু আমায় সঁপে গেছেন, যথাসাধ্য তা পূর্ণ করার চেষ্টা করছি।'

তিনি পৈতে পরতেন। গলায় তুলসীর মালাও থাকত। একদিন উনি বলেছিলেন, 'আমার গলায় তুলসীর মালা দেখলে লোকে আশ্চর্য হয়। যে-লোক দুর্নীতিপরায়ণ সাহিত্য সৃষ্টি করছে, সে যে তুলসীর মালা পরবে একথা কেউ ভাবতেও পারে না।'

পৈতে তিনি নিজেই শুধু পরতেন না। বন্ধুবান্ধবদের গলাতেও তা দেখতে চাইতেন। কলকাতায় তাঁর প্রতিবেশী অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য পৈতে পরিত্যাগ করেছিলেন। একদিন শরৎচন্দ্র তাঁকে খালি গায়ে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার পৈতে কী হল?'

নির্মলচন্দ্র উত্তর দেন, 'আমি পৈতে ছেড়ে দিয়েছি।'

শরৎচন্দ্র শুনে দুঃখিত হন। বলেন, 'পৈতে না পরলে পিতৃপুরুষকে অপমান করা হয়।'

তিনি বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থাদি পাঠও করতেন। জীবনের অনেক বিরুদ্ধভাবের মতো তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যেগুলি সাধারণভাবে দেখা বিরুদ্ধভাবকে জটিল থেকে জটিলতর করে তোলার পক্ষেও সহায়ক হতে পেরেছিল। আজ যাতে মানুষের বিশ্বাস আছে, কাল তা বদলে যেতে পারে, সেটা অসম্ভবও নয়, ঘৃণারও যোগ্য নয়। দেশবন্ধুর সান্নিধ্যে আসার পর তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন হয়েছিল, যা শুধু সম্ভবই হয়নি, সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিতও হয়েছে।

সংগ্রাম আর প্রসিদ্ধিলাভের সেই দিনগুলিতে তাঁর স্বভাবের কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু মানবিক করুণা মানুষ শরৎচন্দ্রকে কোনোদিন পরিত্যাগ করেনি। সর্বোত্তম সৌন্দর্যের মতো সর্বোত্তম মানবিক করুণাও কি ঈশ্বর নয়?

১ ১ জানুয়ারি, ১৯৩২

গ্রামে আসার পর তাঁর জীবনধারা একেবারে বদলে গিয়েছিল। এই বদলে যাওয়া জীবনের কথা তিনি নিজের বেশ কয়েকটি চিঠিতে আলোচনা করেছেন, 'রূপনারায়ণের তীরে ঘর বাঁধিয়াছি, একটা ইজিচেয়ারে দিনরাত পড়ে থাকি।'[১]

আর একখানি চিঠিতে তিনি লেখেন, 'তার পরে আমি কলকাতা যাইনি। এখানকার ছোট্ট পরিবেশে যাহোক করে দিন কেটে যাচ্ছে। তবে একবার শহরের মুখ দেখলে তা সামলাতে পাঁচ সাত-দিন কেটে যায়। তাছাড়া বর্ষা বাদলে রাস্তার কাদায় পথ চলাই মুসকিল। অত শক্তি নেই, উদ্যমও নেই। কিছুদিন আগে অন্ধকার রাতে সিঁড়ি ভুল করলে যা হবার তাই হয়েছে। তবে হ্যাঁ, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু পিঠ আর কোমরের ব্যথা আজও দূর হয়নি। সবাই আমায় লিখতে বলছে, কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না কি লিখব। সব কিছুই অর্থহীন অনাবশ্যক মনে হচ্ছে। অন্য লেখকদের মতো নিজের মনটাকে পুরনো দিনের সাহিত্যসেবার মধ্যে যদি আর একবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে হয়তো কতই না"বিন্দুর ছেলে";"চরিত্রহীন"লেখা যেতে পারত। কিন্তু মনে হয় না, তেমন কোনও দিন এ জীবনে আর কখনও ফিরে আসবে। সর্বদা ভাবি যে, লিখে কি হবে? লোকে আনন্দ পাবে, না পেলেও ভালো। আগে পাওয়ার অধিকার লাভ করুক, তারপর"বিন্দুর ছেলে"ও"রামের সুমতি"লেখার মতো অনেকের সৃষ্টি হবে। আমার তো এখন হাত দেখা শিখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে।'[২]

'বিন্দুর ছেলে' বা 'রামের সুমতি' লেখার মতো মানসিক স্থিতি তাঁর আর ছিল না, গ্রামবাসীদের জীবনধারা বোঝবার পক্ষে সেটা ছিল সুবর্ণ সুযোগ। বর্মায় থাকবার সময়ে যেমন নিজের সর্বহারা পাড়া-পড়শিদের দুঃখে-শোকে সহায়তা করবার জন্যে তিনি সদাপ্রস্তুত থাকতেন, সেইরকম এখানেও কোনো অবসর থাকত না। বয়স বেশি হয়ে গিয়েছিল। নামও খুব হয়ে গিয়েছিল। সব সুবিধেই ছিল যা কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির থাকতে পারে। তবু মনের দিক থেকে তিনি সেই শরৎ ছিলেন, যিনি রেঙ্গুন-প্রবাসে ছিলেন। আশেপাশে কারো কষ্ট হলেই 'বামুনের মেয়ে'-র প্রিয়নাথ ডাক্তারের মতোই দৌড়ে যেতেন।

সেদিন মনোজ বসু দেখা করতে আসেন। এসে দেখেন কী, বারান্দায় গ্রামের মেয়ে-পুরুষে ভর্তি হয়ে রয়েছে, আর তারই মাঝে আরামকেদারায় বসে আছেন ওদের দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র। এক-একজনের সঙ্গে ঘর-গেরস্থালীর কথা চলছিল। হঠাৎ এক মহিলাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ছবির মা, তোর মেয়ে কেমন আছে?'

'ভালো আছে, দাদাঠাকুর। আপনার ওষুধ তো একেবারে ধন্বন্তরী।'

এরপর শরৎবাবু বললেন, 'কিন্তু তুমি বাচ্চাটাকে বড় অসাবধানে নদীতে ফেলে দিয়েছিলে। ভাসতে ভাসতে শেষে এই চরায় এসে আটকে যায়। কাক আর শকুনিতে মাংস ছিঁড়ে খাবার জন্য চারপাশে ঘুরছিল। আমি এসব দেখতে পারিনি। নদীতে নেমে মাঝগাঙে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম।

বুড়ী-মা আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকা দিল।

এসব লোক কুলীন নয়। আট বছর বয়সে ছবির বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ছিল ঠাকুর্দার বয়সী। শিগ্গীই মারা গেল। রইল বেচারি মা আর তার সমর্থ মেয়ে। কোন্ ছেলেকে কখন খারাপ করে দেবে, তাই ওকে গাঁ থেকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছিল। দাদাঠাকুরের দয়াতেই বেচারি কোনোমতে বেঁচে ছিল। ছবির একটি ছেলে ছিল। সেটিও গতকাল মারা গেছে। তাকেই বুড়ি অসাবধানে নদীতে ফেলে দিয়েছিল।....

১ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত– ৮ বৈশাখ, ১৩৩৩
২ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত– ২৫ আষাঢ়, ১৩৩৩

এমনি সব ঘটনার শেষ ছিল না। সেদিন শুনলেন কার যেন কলেরা হয়েছে। কেউ তার কাছেও যাচ্ছে না। একলা ঘরের চালের নীচে পড়ে থেকে কাতরাচ্ছে। রেঙ্গুনে অজানা কত প্লেগের রুগীকে তিনি ওষুধপত্র দিতেন। কত লোক তাঁরই কোলে মাথা রেখে প্রাণত্যাগ করেছে। 'গৃহদাহ'–এর সুরেশের মতোই মৃত্যুভয় তাঁকে কখনো জয় করতে পারেনি। ছুটে গেছেন রুগীর পাশে। তাকে ওষুধ দিয়েছেন। প্রিয়নাথ ডাক্তারের হোমিওপ্যাথীর ওষুধের বাক্সটি তখনও তাঁর কাছে থাকত। তারই মতো সেইভাবে রুগী খুঁজে খুঁজে বেড়াতেন।

শুধু তাই নয়, এদের জন্যে পথ্যের ব্যবস্থা করার দায়ও তিনি নিতেন। নানারকমের মাছ, বেদানা, আপেল, সাগুদানা, মিছরি ইত্যাদি সব কিছু কিনে পাঠিয়ে দিতেন। যদি তাঁর ওষুধে তেমন উপকার না হত, তাহলে তিনি পানিত্রাসের স্থানীয় ডাক্তার রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ডাকতেন। তাঁর ওষুধেও কাজ না হলে হাওড়ার নুন্টেরহাটা থেকে ডাক্তার গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্তী আসতেন।

তাঁদের ফীস্–ও তিনি দিতেন, তবে তা নিজের হাতে নয়, রোগাক্রান্তেরই হাত দিয়ে দেওয়াতেন।

তিনি কেবল ওদের শরীরের কথাই মনে রাখতেন না, মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে একটি স্কুলও খুলে দিয়েছিলেন। পথঘাট তৈরি করিয়ে দিতেন। ছোটদের জন্যে তাঁর ভালোবাসার সীমা ছিল না। কত কী জিনিস কিনে ওদের দিতেন, তা কে জানে। প্রথম দিকে গ্রামবাসী ওঁর এসব পছন্দ করত না। কিন্তু তাদের সুখ–দুঃখের সঙ্গে তিনি ক্রমে এমনই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই শরৎবাবু ওদের সকলের প্রিয় হয়ে ওঠেন। মামলা–মোকদ্দমায় অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধেও গ্রামবাসীদের পক্ষ নিতে তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এর ফলে তিনি গ্রামবাসীর 'আপনজন' হয়ে গিয়েছিলেন।

ওঁর বাড়িটা ছিল ঠিক রূপনারায়ণ নদীর ধারেই। জোয়ার আর বন্যার প্রকোপ প্রায়ই হত। বাংলায় বর্ষা বলতে যে কী বোঝায়, তা সেখানকার গ্রামে এক-আধ বছর থাকলে জানতে পারা যায়। সেবার এমন তীব্র জোয়ার আসে যে, বাঁধও ভেসে যায়। চারিদিকে জলে জলময়। মাটি দিয়ে এদিক–সেদিকের গর্তগুলো বোজাতেই দশ–পনের দিন লেগে গেল। একদিন রাত্রে খবর পাওয়া গেল যে, বাঁধ ভেঙে জল খেতের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ফসল বাঁচানোর প্রশ্ন এসে পড়ল। যে কোন উপায়ে বাঁধ দিতেই হবে। গ্রামের সব লোক হঠাৎ একাজে রাজী হল না। তখন শরৎবাবু যেনতেন প্রকারেণ যেভাবে পারলেন, ওদের মন তৈরি করে নিলেন আর ওদের সঙ্গে নিজেও বাঁশ আর মাটি কাটতে লেগে গেলেন। আশেপাশে মাটি কম ছিল। তাই শ্মশানের উঁচু ঢিবিটা খোঁড়া শুরু হল। খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ দেখা গেল, গর্তের মধ্যে একটি শিশুর মৃতদেহ। ক্ষণেকের তরে চোখের সামনে শৈশব ভেসে উঠল। রাজুর সঙ্গে না জানি কত বেওয়ারিশ লাশেরই সৎকার তাঁকে করতে হয়েছিল! খুব যত্নের সঙ্গে বাচ্চাটির মৃতদেহটি নিয়ে একটা নিরাপদ জায়গায় রাখলেন। যখন বাঁধের কাজ শেষ হল, তখন একটা বড় গর্ত খুঁড়ে মৃত শিশুর লাশটিকে যত্ন করে কবর দিয়ে দিলেন।

যদিও তিনি শহর থেকে দূরেই থাকতেন, তবু বন্ধুবান্ধবদের আসা–যাওয়া কম হত না। এমনকি এমনও হত যে, সকালবেলায় কেউ এসে দিনভর আড্ডা জমিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে যেতেন। আগন্তুকদের মধ্যে বন্ধু, পাওনাদার, গুণগ্রাহী সবই থাকত। শিবপুরের মতোই, কেউ আসত কোনো লেখা চাইতে, কেউ হয়ত কোনো সভায় সভাপতি হওয়ার জন্য আগ্রহ নিয়ে। কেউ আসত সম্পাদক হয়ে যাবার প্রার্থনা জানাতে। তাঁর এসব ভালো লাগত না, তবে আনাগোনা ভালো লাগত। নিজেও শহরে গিয়ে বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে আসতেন যেন তারা এসে তাঁর বাগান দেখে যায়। পুকুরের মাছ দেখে যায়। খাওয়ান–দাওয়ানও খুব করতেন। তাঁর বাড়ির গরুর মিষ্টি দুধ অনেকেরই প্রিয় ছিল আর যে–কেউ বাড়িতে আসত, প্রত্যেককেই বড় বড় দু'টা বাতাসা অবশ্যই দেওয়া হত। এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেন, 'এই বাতাসাগুলো কেন?'

উত্তর হয়েছিল, 'এটা তো ভাই, গাঁয়ের শিষ্টাচার।' কাছে পিঠে বাজার ছিল না। মিষ্টি দিতে হলে সব সময়ে কি করে তা পাওয়া যাবে, তাই ঐ বাতাসা তৈরি রাখা থাকত। বলতেন, 'খুব খাবে তবে তো লোকে এখানে আসবে।' তারপর গল্পের পর গল্প শুনিয়ে ভোর করে দিতেন। ভেতর থেকে তাগাদা আসত, 'ওগো শুনছ, ভোর হয়ে গেছে, শোবে কখন?'

জবাব দিতেন, 'দাঁড়াও গো, এঁরা কি রোজ আসছেন?'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাখা মেলে উড়ে যেতেন। কাজের ক্ষতি হত, হতে দাও। বসে থাকতেই হবে। কত কাহিনী বলতেন—নিজের কথা, নিজের পরিবেশের কথা। কেউ বলে উঠত, 'আপনার গল্প আমরা মগ্ন হয়ে শুনছি বটে, কিন্তু বিশ্বাস করি না। সব মিথ্যে, গুলপট্টি, আপনি বানিয়ে বানিয়ে বলে যাচ্ছেন।'

তিনি জবাব দিতেন, 'জীবনটাই তো গুলপট্টি মেরে কাটিয়ে দিলাম, ভাই। তোমরা সবাই স্কুল–কলেজে খেটেখুটে কত কী শিখেছ, সে সময়টা আমি গুলপট্টি দিয়ে আর তামাক খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছি। তারপর সারা জীবন খালি মিথ্যে কথা লিখে লিখে এত ভালোবাসা কুড়িয়েছি।'

আবার বলতেন, 'আমি বোধহয় মিথ্যে কিছুই লিখিনি। কত লোকের সঙ্গে মিশেছি। কতজনকে দেখেছি। লেখার সময় তারা সব আমার মনে ভেসে ওঠে। আর আমাকে নিজেকে থামাতে পারি না।'

বলতে বলতে বিচলিত হয়ে উঠে পড়ে বারান্দায় পায়চারি করতে থাকতেন। উত্তেজিত হয়ে পড়লে মাথায় আঙুল দিয়ে নিজের লম্বা চুলের গোছাটি জড়াতেন। সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে চলতেন, আর বলে যেতেন।

লোকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাঁকে অস্থির করে তুলত। কিন্তু উনি মৃদু মৃদু হাসতেন। কেউ জিজ্ঞেস করত, 'আপনি কিরণময়ীকে শেষে পাগল ক'রে দিলেন কেন?' কেউ জবাব চাইত, 'আপনি আবার অন্নদাদিদির খোঁজখবর নিলেন না কেন? ইন্দ্রনাথকে কোথায় নির্বাসন দিলেন? আপনার "শেষ প্রশ্ন"-এর সমাধান কি?'

কিন্তু একদিন এই রকমই একজন আগন্তুকের সঙ্গে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল। তখন দশটা বাজে। বাইরের বারান্দায় আরামকেদারায় শুয়ে কোনো বই পড়ছিলেন, তখন কারো পায়ের শব্দ পেলেন। বই সরিয়ে আগন্তুককে দেখলেন, আবার ঐভাবেই পড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আগন্তুক আর কেউ নয়, তিনি ছিলেন চিরপরিচিত উপেন্দ্রমামা। সে সময়ে 'বিচিত্রা'[১] পত্রিকা প্রকাশনার কথা উঠেছিল। এই পরিকল্পনাটির ভাবদ্রষ্টা ছিলেন উপেন্দ্রনাথের বেয়াই যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সেই পরিকল্পনায় রূপদান করবার আগেই তিনি স্বর্গলাভ করেন। তখন তাঁর ছেলে তা কার্যকরী করার জন্য হাতে নেন। সম্পাদকের পদে আসীন হন উপেন্দ্রনাথ। স্বভাবতই, তিনি প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র দুজনকেই লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু বার বার চিঠি লেখার পরেও শরৎচন্দ্র কোনও উত্তর দেননি। উনি খুবই আশ্চর্য হন এবং নিজে ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য পানিত্রাসে[২] আসেন। আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য! শরৎ তাঁকে দেখেও না দেখার ভান করলেন। ভাল লাগল না। তবু একটু চেয়ারে বসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ, শরৎ?'

সেইরকমই বইয়ের আড়ালে মুখ ঢেকে রেখে শরৎবাবু বললেন, 'একপ্রকার আছি।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। জিজ্ঞেস করছি, কিরকম আছ? আর তুমি আমার চিঠির জবাব দাওনি কেন?'

শরৎবাবু আগের মতোই বললেন, 'কি জবাব দিতাম?'

১ পয়লা আষাঢ়, ১৩৩৪ (১৬ জুন, ১৯২৭) প্রকাশনা শুরু হয়।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

উপেন্দ্রনাথ আরও আশ্চর্য হলেন, কিন্তু তবু হাসিমুখে বললেন, 'জবাব দিতে যে, তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। উপন্যাস লেখা শুরু করে দিয়েছি। একটি সংখ্যার মতো লেখা হয়ে গেলেই তোমায় পাঠিয়ে দেব।'

শরৎবাবু ধীরে ধীরে বই বন্ধ করে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। সোজা হয়ে বসে আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মামার দিকে চেয়ে বললেন, 'ঐ কয়লাওলার ছেলের পত্রিকায় তুমি আমায় উপন্যাস লিখতে বলছ?'

এরকম অকারণ রাগ দেখানোয় উপেন্দ্রনাথের অহম্‌বোধ জ্বলে ওঠে। সেইরকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তিনি বলেন, 'কয়লাওলা কে? যোগীন মুখুজ্জে? তার ছেলে আমার জামাই, তা জানো?'

শরৎ বললেন, 'জানি আর না জানি, আমি ওর পত্রিকায় লিখব না।'

'জানো, ঐ কয়লাওলা এই পৃথিবীতে আর নেই।'

শরৎচন্দ্র কোন উত্তর দেননি। ক্রোধে এবং অভিমানে উপেন্দ্রনাথের মন ভরে উঠল। মনে মনে উনি বললেন, 'দেখি, তোমাকে বাদ দিয়ে পত্রিকা বার করা যায় কিনা। যেখানে ভালোবাসা গভীর, সেখানে থেকে কিছু আশা করা হয়ত অসংগত নয়। তুমি যদি আমার আত্মীয় না হতে, বন্ধু না হতে, দুজনের মাঝখানে ভালোবাসার সুদৃঢ় বন্ধন যদি না থাকত, তাহলে হয়ত ঝগড়া বা আলোচনা করতে পারতাম, যে-ঝগড়ার নিষ্পত্তিও হয়ত হত... ।'

মনে মনে আরও কি ভাবলেন, কে জানে! কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। উঠে দাঁড়ালেন।

শরৎবাবুও বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'বাড়ি যাচ্ছি।'

শরৎবাবু বললেন, 'খেয়েদেয়ে যাবে।'

উপেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন। বললেন, 'এই বইওলার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতে বলছ?'

শরৎবাবুর কাছে একথা নিশ্চয়ই খুবই খারাপ লাগে। বললেন, 'অনেক দূর থেকে এসেছ! অনেক দূরে যেতেও হবে। অন্তত চা-জলখাবার খেয়ে যাও।'

কিন্তু যেরকম অভ্যর্থনা হয়েছিল, তা দেখে, উপেন্দ্রনাথের পক্ষে থাকা অসম্ভব হল। তিনি থাকলেন না।শরৎবাবু আবার বললেন, 'তুমি রাগ করেছ, উপেন্দ্র।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'করেছি, কিন্তু সেটা তো অকারণে নয়।'

'অন্যায় করছ।'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি অন্যায় করছি না। আমার ওপর অন্যায় করা হয়েছে। ভবিষ্যতে একদিন এর মীমাংসা হবে।'

শরৎ বলেন, 'তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে তা দেখার জন্যে বসে থাকব।'

উপেন্দ্রনাথ চলে গেলেন। তবে এই বিশেষ ঘটনাটিতে কে দোষী, সে আলোচনা এখানে অসংগত। কিন্তু এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যেখানে দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন, সেখানে তিনি তা হতে পারতেন। এই স্বভাবের জন্য কয়েকবার তাঁকে গ্রামবাসীদের মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। পুরোনো জমিদার গোবিন্দপুরের খানিকটা জমি শিবের নামে দেবোত্তর করে রেখেছিলেন। নিচু জমি বলে সেখানে প্রায়ই জল জমে থাকত। নতুন জমিদার তা থেকে অর্থলাভ করতে চাইলেন। জলে ভরা ঐ জমি মাছের ব্যবসায়ের দরুন অন্য লোককে ঠিকা দিয়ে দিলেন। এতদিন গাঁয়ের লোক ইচ্ছামত মাছ ধরত। কিন্তু এইভাবে ঠিকা দেওয়ার পর ওদের সেই অধিকার লোপ পেল।

সেই হল ঝগড়ার সূত্রপাত। হাতাহাতি মারপিট পর্যন্ত গড়াল। ঠিকাদার জমিদারের কাছে অভিযোগ করল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন আর তৎক্ষণাৎ কাছারিতে গিয়ে পঁচিশ জনের নামে ফৌজদারী মামলা দায়ের করে দিলেন। এর মধ্যে শরৎবাবুর এক দিদির দেওরও ছিলেন। তিনি

ছিলেন একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর সঙ্গে আরও যে কয়েকজন লোকের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, ঘটনাস্থলে তাঁরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

শরৎচন্দ্র যখন এ খবর পেলেন, তখন তিনি কাউকে কিছু বললেন না। চুপচাপ জমিদারের কাছে চলে গেলেন এবং তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জমিদার তো অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে ছিলেন। তীক্ষ্ণভাবে তাঁকে বললেন, 'আমি কারো উপদেশ শুনতে চাই না। যা আমি ভালো বুঝব তাই করব। গোবিন্দপুরের লোকেদের উচিত শিক্ষা দেব। শুনছি, আপনি তাদের পরামর্শদাতা। তাই থাকুন, তাই থাকুন। আমি ভয় করি না।'

এর যা পরিণাম হতে পারে, তাই হল। দুদিক থেকে ফৌজদারী এবং দেওয়ানী দুরকম মামলা চলতে থাকে। ওখানে শিবপূজা নিয়ে এক উৎসবও পালন করা হল। এবার গাঁয়ের লোকেরা ঠিক করে যে, যারা জমিটা ঠিকা নিয়েছে, তাদের কোন মতেই উৎসবে যোগ দিতে দেওয়া হবে না। এই কথাতেই আবার ঝগড়া শুরু হয়। জমিদারের শুধু অর্থবল ছিল না, তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। তাই পুলিশের লোকেদের সঙ্গে তাঁর বেশ জানাশোনা ছিল। এই সুযোগে ঝগড়ার সম্ভাবনার কথা বলে তিনি সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করিয়ে দিতে পারলেন। গ্রামের এখানে–ওখানে সবখানে পুলিস ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল।

ধর্ম নিয়ে মামলার মধ্যে পুলিসের এইরকম হস্তক্ষেপ দেখে গ্রামবাসী ক্ষেপে উঠল। দু'দলে আবার উত্তেজনা দেখা দিল। তখন কয়েকজন ভদ্রলোক আবার শরৎবাবুর কাছে এলেন। ক্রোধ এবং দৃঢ়সংকল্পে তাঁর মন ভরে উঠল। তিনি ঠিক করলেন, ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্টেটের কাছেই যেতে হবে। সবাইকে শান্ত থাকতে বলে তিনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে সব বলে দিলেন। বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী এই মামলায় আগ্রহ নিচ্ছেন দেখে ম্যাজিস্ট্রেট ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিশের বড় সাহেবকে ডাকলেন এবং তাঁকে সবকিছু বুঝিয়ে বলে দিলেন, 'আপনি শরৎবাবুকে একটি চিঠি লিখে দিন যাতে থানার অফিসার নিজের পুলিশ বাহিনী নিয়ে ওখান থেকে চলে যায়। মেলার ব্যবস্থা শরৎবাবু স্বয়ং করে নেবেন।'

ওদিকে থানা অফিসার হেড অফিসে রিপোর্ট করে আরও পুলিস আনানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু যোগাযোগ এমন হয়ে গেল যে, শরৎবাবু আর পুলিসের নতুন অফিসার ভুবনেশ্বরবাবু একই ট্রেনে আর একই কামরায় যাত্রী হয়ে গোবিন্দপুর রওনা হলেন। ভুবনেশ্বরবাবু শরৎবাবুর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁকে চিনতেন না। এক বন্ধুর মাধ্যমে ট্রেনের ঐ কামরায় ওঁর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হল। স্বভাবতই, ঝগড়ার কথা উঠলে, শরৎবাবু ভুবনেশ্বরবাবুকে সব কথা খুলে বলেছিলেন।

গ্রামে পৌঁছে দুজনে একই সঙ্গে ঝগড়ার অকুস্থলে রওনা হলেন। শরৎবাবু একটু এগিয়ে গেছিলেন। লোকেরা তাঁকেই প্রথম দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থানা অফিসারকে খবর দেয়, 'শরৎবাবু আসছেন।'

থানা অফিসার রেগে উঠে বললেন, 'রেখে দে, রেখে দে, শরৎবাবুর কথা। দু'চারখানা বই লিখলেই নেতাগিরি করা যায় না। অপদস্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে।'

ততক্ষণে ভুবনেশ্বরবাবুও সামনে এসে পড়েছিলেন। তখন তো থানা অফিসার ভয়ে একেবারে কেঁচোটি হয়ে গেলেন। থর থর করে কাঁপতে থাকলেন। ভুবনেশ্বরবাবু সব কিছু শুনেছিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দারোগাকে বললেন, 'বর্তমান বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সঙ্গে সামান্য শিষ্টাচার পর্যন্ত দেখাতে জানো না? জমিদারের কাছে ঘুস খেয়ে তোমরা এইসব হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছ। খুব হয়েছে, এক্ষুনি এখান থেকে সব চলে যাও। আর পানিত্রাসের হাইস্কুলে আমার জন্যে গিয়ে অপেক্ষা করো।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দারোগা সাহেব সেখান থেকে চলে গেলেন। খুব আনন্দের মধ্যে মেলার উৎসব সুসম্পন্ন হল। শরৎবাবুর অনুরোধে গ্রামবাসীরা ঠিকাদারদেরও শেষ পর্যন্ত উৎসবে যোগ দেবার অনুমতি দিয়ে দিল। শিবের নামে দেবোত্তর জমি আবার সমর্পণ করা হল। কিন্তু

তার আগেই মামলা হাইকোর্টে পৌঁছে গিয়েছিল। বার বার মোকদ্দমায় হেরে যাওয়ার পর অন্তত জমিদারের সুবুদ্ধি জেগেছিল। তিনি শরৎবাবুর বাড়িতে আসেন এবং ঝগড়ার মিটমাট করে ফেলেন।

মিলনান্তক ঐ ঘটনাটির পরে সপত্নীক এক ভদ্রলোক শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এসেই দুজনে শরৎবাবুর পা জড়িয়ে ধরলেন। নানা প্রশ্নের পর তিনি জানালেন, 'আমিই সে দারোগাবাবু, সেদিন আপনার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছিলাম। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।'

শরৎবাবু উত্তর দিলেন, 'আরে ভাই; সেকথা তো সেদিনই মিটে গেছে। আমি কিছুই মনে রাখিনি।'

দারোগাবাবু বললেন, 'কিন্তু আমার তো চাকরি যায় এমন অবস্থা। চাকরি গেলে ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরে যাব। জমিদারের কাছে ঘুস নেওয়ার অপরাধে ভুবনেশ্বরবাবু আমায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। আপনি আমায় দয়া করুন।'

শরৎবাবু বললেন, 'আমি কী করতে পারি, বলো তো?'

'দয়া করে ভুবনেশ্বরবাবুকে আপনি একখানা চিঠি লিখে দিন যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন আর তিনিও যেন আমাকে ক্ষমা করেন।'

একটি কথাও না বলে শরৎচন্দ্র নীরবে সেইমতো চিঠি লিখে দিলেন আর তাদের খাওয়া দাওয়া না হওয়া পর্যন্ত যেতেও দিলেন না।

কিন্তু সারা বছর তো আর এসব সমস্যা থাকে না। বন্ধুবান্ধবরাও সবসময়ে আসতে পারত না। যখন গাঁয়ে কোনরকম আমোদ আহ্লাদ আনন্দ উৎসব না হত, তখন গ্রাম নির্জীব হয়ে পড়ত। তখন সন্ধ্যাবেলায় অবসন্ন দেহমন নিয়ে রেডিয়োর গান শুনতে ভালোবাসতেন। শ্রাবণের ঘন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে আসত। জলেকাদায় জনহীন গ্রাম্য পথ দুর্গম হয়ে উঠত। নিবিড় অন্ধকার বুকের ওপর চেপে বসত। তখন সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় রেডিয়োর তরঙ্গে ভেসে আসা সঙ্গীতের ধারা শুনতে শুনতে তাঁর মনে হত যেন তিনি গানের আসরেই বসে আছেন। আবার কোনও দিন বৃষ্টির পরে আকাশে ছোট ছোট মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঁকি দিত। কানায় কানায় ভরা নদীতে যখন ম্লান জ্যোৎস্না ভরে যেত, তখন শরৎবাবু তাঁর নির্মল নদীতীরে আরামকেদারায় চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতেন—আর অনুভব করতেন যেন, তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে রেডিয়োর বাঁশির সুর মিলিয়ে কী এক মায়াজাল সৃষ্টি করছে।

১৫

গ্রামে থাকলেও শহরকে ছাড়েননি। প্রায়ই যাওয়া-আসা ছিল। স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকত না বলে বেশ কিছুদিন করেই ওঁকে শহরে থাকতে হত। এজন্যই বড় বউ বার বার শহরে বাড়ি করার আগ্রহ প্রকাশ করতেন। এই কারণে এ যাবৎ এবং এর পরেও মৌলিক সৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তেমন বিশেষ কিছু লেখেননি। 'ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদক জলধর সেন শিবপুরে থাকতে যেমন কষ্ট করে আসতেন, তত কষ্ট করে এখানে আর আসতে পারতেন না। এই কারণে এই সময়টাতে কয়েকটি ছোটখাটো গল্প ছাড়া তিনখানি উপন্যাসও তিনি সম্পূর্ণ করে ফেলেন। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয়[১] ও চতুর্থ ভাগ[২] এবং 'শেষ প্রশ্ন'[৩]।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটিও শেষ রচনাগুলির মতোই ঠিক নিয়মিতভাবে লিখতে পারেননি। প্রায় চার বছর ধরে ঐ উপন্যাসটি অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। খুব কড়া তাগাদা গেলে

১ ১৮ এপ্রিল, ১৯২৭
২ মার্চ, ১৯৩৩
৩ ২ মে, ১৯৩১

একবার তিনি উত্তর দেন, 'আমার লেখার ব্যাপারে এই যে ত্রুটি, এ তো আপনারা পনের বছর ধরে দেখে আসছেন, এইভাবেই শেষকালে একদিন বই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।'[১]

আরও দুটি নতুন উপন্যাস তিনি এই সময়ে শুরু করেছিলেন—'বিপ্রদাস' আর 'শেষের পরিচয়'। এর মধ্যে 'শেষের পরিচয়' হচ্ছিল এক মহত্ত্বপূর্ণ রচনাসৃষ্টি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ 'জাগরণ'-এর মতো এটাও কোনদিন সম্পূর্ণ হতে পারেনি। এসময়ে তাঁর দুটি লেখা খুব বিখ্যাত হয়েছিল, 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি',[২] এবং 'তরুণের বিদ্রোহ'[৩]। 'ষোড়শী'[৪] এবং 'রমা'[৫] এই দুটি নাটকও এই সময়ে তাঁর নিজেরই লেখা দুটি উপন্যাস 'দেনা-পাওনা' এবং 'পল্লীসমাজ' অবলম্বনে রচিত।

এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত কাহিনী 'বিন্দুর ছেলে'র ইংরেজি অনুবাদ Modern Review-তে প্রকাশিত হয়। ডাঃ কানাই গাঙ্গুলি 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) ইতালী ভাষায় অনুবাদ করেন। 'বিন্দুর ছেলে'র ইংরেজি অনুবাদ করেন শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। তিনি শরৎবাবুর কাছে আসতেন। একদিন ভালো অনুবাদের কথা আলোচনা হচ্ছিল, তখন শরৎবাবু অশোককে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি কোনোরকম বড় ধরনের পরিবর্তন না করে আমার কোনো লেখা অনুবাদ করতে পারো?'

অশোক তৎক্ষণাৎ রাজী হন, এবং তারই ফলে 'বিন্দুর ছেলে'র ইংরেজি অনুবাদ 'মডার্ন রিভিউ'-তে প্রকাশিত হয়।[৬]

তবে এ সময়ে যাবতীয় লেখার মধ্যে 'শেষ প্রশ্ন' কয়েকটি কারণে খুবই উল্লেখযোগ্য। দিলীপকুমার রায়কে লেখা তাঁর একখানি চিঠি তিনি এই উপন্যাসের ভূমিকায় প্রকাশ করে দিয়েছিলেন—

'মন্টু! "শেষ প্রশ্ন" পড়ে তুমি খুশি হয়েছ জেনে আনন্দ হল। কারণ ভালো লাগা তো তোমাদের ধাত নয়। "প্রবর্তক সঙ্ঘ" থেকে এবছর অক্ষয়তৃতীয়াতে আমাকে আর ডাকেনান। তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন উপন্যাসের শেষের দিকে আমি আশ্রমের গুণগান করি। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ আমার দ্বারা তা হয়নি। "শেষ প্রশ্নে" অতি-আধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেচি। "খুব গর্জন করব, গর্জন ক'রে নোঙরা কথাই লিখবো", এই মনোভাবটাই অতি-আধুনিক সাহিত্যের central pivot নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া। কিন্তু বুড়ো হয়ে গেছি। শক্তি সামর্থ্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে, এখন তোমাদের ওপরেই এর দায়িত্ব পড়েছে।.... আচ্ছা, একটা কথা বল তো, শ্রীঅরবিন্দ কি বাংলা পড়তে পারেন? "শেষ প্রশ্ন" দিলে কি তিনি রাগ করবেন? জানি এসব জিনিস পড়বার সময় তাঁর নেই। কিন্তু পড়তে বললে কি অপমানিত বোধ করবেন? "প্রবর্তক সঙ্ঘ" রাগ করেছে, তাই দেখে ভয় হচ্ছে। নইলে তাঁর মত অগাধ পণ্ডিতের মতামত জানতে পারলে হয়ত আমার লেখার ধারা কোন নতুন পথ খুঁজে পেত। উপন্যাসের মাধ্যমে মানুষকে অনেক কথাই শুনতে বাধ্য করা যায়। একথা কি শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করবেন না? যাকে লঘু (রুচিকর) সাহিত্য বলে তার প্রতি কি তিনি নিতান্ত উদাসীন?'[৭]

এটি প্রকাশিত হতেই তার ওপর চারিদিক থেকে তীব্র আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। কেউ বলল, 'শরৎচন্দ্র মূর্খ।' কেউ বলল, "শেষ প্রশ্ন" কি আদৌ কোনো প্রশ্ন?' কেউ ওটিকে 'শেষের কবিতা'-র অনুকরণ, আবার কেউ 'শেষের কবিতা'-র ব্যঙ্গোক্তি বলে বসল। কোনো এক সমালোচক লিখলেন, 'এটা গোরা সাহেবের ছেলে, তাই কমলের চরিত্র গোরার নকল ছাড়া আর

১. জলধর সেনকে লিখিত,৩০ সেপ্টেম্বর,১৯২৮
২ ১৮ এপ্রিল, ১৯২৯
৩ ১৩ অগাস্ট, ১৯২৭
৪. ৪ অগাস্ট, ১৯২৮
৫. 'বঙ্গবাণী', আশ্বিন, ১৩৩৪ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯২৭)
৬. ফেব্রুয়ারি-জুন, ১৯২৭
৭ ৩০ বৈশাখ, ১৩৩৮

কিছুই নয়।'

এমন লোকও কম ছিল না যারা মনে করত, এই ধরনের সাহিত্য প্রকাশিত হতে থাকলে হিন্দুসমাজ বেঁচে থাকতে পারবে না। পত্রপত্রিকায় তার বিরুদ্ধে লেখাই শুধু বেরুচ্ছিল না, কার্টুনও ছাপা হ'ত। আক্রমণের বন্যা বয়ে গেলেও বাংলার নারীসমাজ 'শেষ প্রশ্ন'কে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিল।

সুনন্দ ভবনের শ্রীমতী .... সেন 'শেষ প্রশ্ন'—এর আলোচনা প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ পত্র তাঁকে লেখেন। তিনি শরৎবাবুর গুণগ্রাহী ছিলেন আর তাঁর সম্পর্কে কটু কথার আলোচনায় খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর চিঠির বিস্তারিত উত্তর দিতে গিয়ে শরৎবাবু লেখেন, 'হ্যাঁ,"শেষ প্রশ্ন" নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ আমার কানে এসে পৌঁচেছে। অন্তত যেগুলি অতিশয় তীব্র এবং কটু সেগুলি যেন না দৈবাৎ আমার চোখ কান এড়িয়ে যায়, যাঁরা অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী, তাঁদের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি। ঐসব লেখায় খুব যত্ন করে লাল, নীল, সবুজ, বেগুনী এমনি অনেক রঙের পেনসিলে দাগ দিয়ে তাঁরা ডাকমাশুল খরচ করে অতি সাবধানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার তারপরে আলাদা চিঠি লিখে খবর নিয়েছেন, আমার কাছে পৌঁচেছে কিনা। তাদের এই আগ্রহ, ক্রোধ, আর সমবেদনা হৃদয় স্পর্শ করে।

'তুমি নিজে খবরের কাগজ পাঠাওনি বটে, তবে রাগ তো তোমারও কিছু কম হয়নি। সমালোচকদের চরিত্র, রুচি এমনই যে, পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে কটাক্ষ করে। একবারও ভেবে দেখে না, যে, কটু কথা বলা পৃথিবীতে কঠিন কাজই নয়। মানুষকে অপমান করলে নিজের মর্যাদার ওপরেই সবচেয়ে বেশি আঘাত এসে পড়ে। যারা জীবনে একথা মনে রাখতে পারে না, তারা একটা বড় কথা ভুলে বসে থাকে। তাছাড়া এও হতে পারে যে, "পথের দাবী" বা "শেষ প্রশ্ন" সত্যিই তাদের ভালো লাগেনি। পৃথিবীর সব বই সবার জন্যে নয়। আর এমন কোনো বাঁধা ধরা নিয়মও নেই যে, একই বই সবার ভালো লাগবে আর সবাই প্রশংসা করবে। তবে ভালো যে লাগেনি একথা বলার ধরনটা তাদের ভালো নয় এ আমি মানছি। অকারণে তাদের ভাষা বড় রূঢ় এবং হিংস্র হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখানেই তো রচনাশৈলীর যথার্থ সাধনা চাই। মনের মধ্যে ক্ষোভ এবং উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকলেও ভদ্রলোকেদের অসংযত ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয়। এমন কথা বড়ই দুঃখ জাগিয়ে মনের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে থাকে। তোমার নিজের চিঠিতেও এ ভুল তুমি তাদের চেয়েও বেশি করেছ। এর চেয়ে বড় আত্মাবমাননা আর কিছু নেই।

'তোমার লেখার ভাব ও ভঙ্গী থেকে মনে হচ্ছে সবে তুমি কলেজ ছেড়েছ অল্প কিছুদিন হল। তুমি লিখেছ, তোমার বন্ধুদের মনোভাবও তাই। তাহলে তো দুঃখের কথা। আমার এ লেখাটা যদি তোমার হাতে পড়ে তাহলে তাদের দেখিয়ো। ভদ্রতা মেয়েদের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। নিজের এই সম্পদ কোনো কারণেই বা কোনো কথাতেই ছাড়া উচিত নয়।

'তুমি জানতে চেয়েছ যে, এসব কথার জবাব আমি কেন দিই না। এর একটাই উত্তর যে, আমার তা ইচ্ছা করে না। কারণ এটা আমার কাজ নয়। আত্মরক্ষার খাতিরে মানুষকে অসম্মান করা আমার দ্বারা হয় না। দেখ না, লোকে বলে, আমি পতিতাদের সমর্থন করছি। সমর্থন আমি করছি না, তবে তাদের অপমান করতে আমার মন চায় না। আমি বলছি তারাও তো মানুষ। তাদেরও অভিযোগ করবার অধিকার আছে, আর মহাকালের দরবারে এর বিচার একদিন অবশ্যই হবে। অথচ কুসংস্কারে অন্ধ হয়ে থেকে লোকে একথা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। এসব আমার একান্ত ব্যক্তিগত কথা, আর বলব না।

'খুব সংকোচের সঙ্গে তুমি প্রশ্ন করেছ, "অনেকে বলে, 'শেষ প্রশ্নে' আপনি এক বিশেষ মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেছেন। তা কি সত্যি?"

'সত্যি কি না তা আমি বলব না। তবে "প্রচার করেছ", "অন্যায় করেছে" বলে চিৎকার ও রটনা করে বেড়িয়ে যারা লজ্জায় মাথা নিচু করে, এবং "না, না", বলে জোর গলায় প্রতিবাদ করে, আমি তাদের দলে নেই। তবে যদি আমি তাদের পাল্টা প্রশ্ন করি, ভালো, এতে অন্যায় কোথায়?

তাহলে আমার বিশ্বাস যে, বাদী-প্রতিবাদী কেউই তার সুনিশ্চিত জবাব দিতে পারবে না। তাদের একথাও বলা যাবে না যে, জগতের চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্যেও কোনো-না-কোনোভাবে এসব জিনিস আছেই। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে। কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে, বঙ্কিমের "আনন্দমঠ" ও "দেবী চৌধুরাণী"-তে আছে, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, টলস্টয়ে আছে···· কিন্তু তাতে কি হয়েছে? পশ্চিম থেকে বুলি আমদানি হয়েছে যে art for art's sake—এসব যেন ওদের নখাগ্রে! গল্পের গল্পত্বই মাটি কারণ চিত্তরঞ্জন হোলো না যে! কার চিত্তরঞ্জন? না, আমার! গাঁয়ের মধ্যে প্রধান কে? না, আমি আর মামা।

'তুমি চিত্তরঞ্জন কথাটি নিয়ে অনেক লিখেচো। কিন্তু এটা একবার ভেবে দেখোনি যে ওটা দুটো শব্দ। শুধু "রঞ্জন" নয়, "চিত্ত" বলেও একটা বস্তু রয়েছে। ও পদার্থটা বদলায়। চিৎপুরের দপ্তরীখানায় গেলে বকাওলির স্থান আছে। ও অঞ্চলে চিত্তরঞ্জনের দাবী সে রাখে। কিন্তু সেই দাবীর জোরে বার্নার্ড শ'-কে গাল দেবার তার অধিকার জন্মায় না।

'শেষে তোমাকে একটা কথা বলি। সমাজসংস্কারের কোনো দুরভিসন্ধি আমার নেই। তাই জন্য এই বইয়ের মধ্যে মানুষের দুঃখ ও বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যার কথাও হয়তো আছে, কিন্তু তার সমাধান নেই। এ কাজ অন্যের। আমি তো শুধু কাহিনী লেখক, তার চেয়ে বেশি কিছুই নয়।'

রাধারানী দেবীকে লেখেন, '"শেষ প্রশ্ন" তোমার ভাল লেগেছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম, এ-বই ভাল লাগবার মানুষ বাঙলা দেশে হয়ত পাবো না; শুধু গালিগালাজই অদৃষ্টে জুটবে। কিন্তু দেখছি, ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়। মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিসের দেখাও মিলচে। কোন কাগজে পড়েছিলাম, এক মহিলা লিখেছিলেন, তাঁর যদি অনেক টাকা থাকত, তাহলে বাইবেলের মতো এই বই বিনামূল্যে তিনি লোকেদের বিতরণ করতেন। একসময়ে তো এরকম কথা শুনেছি, এখন সব কোথায় গেল! অতি আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত, এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত। বুড়ো হয়ে এসেছি। শক্তি সামর্থ্য পশ্চিমের আড়ালে ডুব দেবার আভাস অহরহ নিজের মধ্যে অনুভব করি। এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকু বলে গেলাম। এখন তাঁদেরই কাজ— ফুলে ফলে শোভায় সম্পদে বড় ক'রে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরই বাকি রইল। ভাষার ওপর আমার দখল চিরকালই কম। আমার শব্দসম্পদ খুবই সাধারণ, একথা অন্যের কাছে লুকোতে পারলেও তোমাদের কাছে লুকোবার নয়। বলার মতো তো অনেক কিছুই আছে। কিন্তু যদি সময় না পাই, তাই "শেষ প্রশ্ন"-এ কিছু বলার চেষ্টা করেছি।' (৩০শে বৈশাখ ১৩৩৮)

ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়কে লেখেন, '"শেষ প্রশ্ন" উপন্যাস তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। এতে অনেক রকম সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করা হয়েছে, তবে তার সমাধানের ভার তোমাদের ওপর। ভবিষ্যতের এই কঠিন দায়িত্বের সম্ভাবনাই হয়তো তোমাদের মনে এত আনন্দ জুগিয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা, এই বইটি অনেককেই নিরাশ করবে। তারা কোনোমতেই খুশি হতে পারবে না। প্রথমত গল্প তো খুবই কম। খুব তাড়াতাড়ি সময় কাটানো বা ঘুমের খোরাক জোগানোর মতো নিশ্চিন্ত আরামে অর্ধনিমীলিত চোখে আনন্দ-অনুভবের জিনিস এটা নয়। এ জিনিস ভালো লাগবার কথা নয়। তবুও এই ভেবে লিখেছিলাম যে, অন্তত কিছু লোক তো নিশ্চয়ই বুঝবে, তাতেই আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। সব রকম রস সবার জন্যে হয় না। এই অধিকার ভেদ আমি মানি।

'আর-একটি কথা ছিল যে, এটি অতি আধুনিক সাহিত্য। ভেবেছিলাম, এদিকে একটা নতুন নিশানা রেখে যেতে পারব। বুড়ো হয়ে গেছি। লেখার সামর্থ্য আর তেমন খুঁজেও পাই না। তবু ভাবি যে, ভাবীকালের তোমরা হয়তো এ আভাস পাবেই যে, নোংরামি না করেও ভালো সাহিত্য লেখা যেতে পারে। শুধু কোমল পেলব রসানুভূতিই তো নয়। বুদ্ধির জন্য বলকারক খোরাকও জোগানো অতি আধুনিক সাহিত্যের একটা বড় কাজ। এর পরে যখন তোমরা লিখবে, তখন

তোমাদের অনেক বেশি পড়তে হবে, অনেক ভাবতে হবে। কেবল মনোরঞ্জনের জন্য হালকাভাবে বুঝিয়ে দিলেই ছাড়া পাবে না।' (৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮)

এঁরা সব ছিলেন শরৎচন্দ্রের ভক্ত এবং গুণগ্রাহী। তাঁর লেখা যে ওঁদের ভালো লাগবে, সেটা কোনো আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু বিখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায় কারাবন্দী অবস্থায় এটি পড়েন এবং অত্যন্ত প্রভাবিত হন, সেটা নিশ্চয়ই আশ্চর্যের কথা। তিনি লেখেন,—

'"শেষ প্রশ্ন"-এর তুলনা এযুগের সিনক্লেয়ার লিউইস্-এর বইয়ের সঙ্গে করা যেতে পারে না। তবে আনাতোল ফ্রাঁ, জোলা এবং ইবসেনের সঙ্গে এর বেশ ভালোভাবে তুলনা করা যেতে পারে। এখনও পর্যন্ত এর কোনো বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়নি। বইটির কেন্দ্রবিন্দু—একটি মেয়ে, মেয়েটি যথার্থই ডায়োনিসস, কিভাবে সে আবহমান কাল থেকে চিরাচরিত নিয়ম, রীতি ও প্রথাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর ধর্মীয় আচরণের অনুসরণকারী নবযুবক ভারতবর্ষকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে। যাই হোক না কেন, শরৎচন্দ্রের এই দায়োনিসস – সুলভ মেয়েটিকে যে পাশ্চমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে, সে আর–একজন ভারতীয়কে আর একবার নোবেল পুরস্কার পাবার পথ প্রশস্ত করে দেবে। বিশ্বাস করো, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শরৎবাবু নোবেল পুরস্কারের কম দাবি রাখেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমি "শেষ প্রশ্ন"-কে "গীতাঞ্জলি" -র চেয়ে বড় মনে করি। হতে পারে উচ্চাঙ্গ সাহিত্য পরিপাক করার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার প্রতি লোকের সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু এটা তো রুচির প্রশ্ন। "শেষ প্রশ্ন" ভারতীয় পুনর্জীবনের একটি কষ্টিপাথর, যা বাঙালীর রোম্যান্সবাদ বা রহস্যবাদের ভাববিলাসগ্রস্ত স্থবির আবহাওয়াকে বদলে দিয়েছিল। শরৎবাবুর সাহিত্যের অন্যান্য পাত্রীরা মানসিক দ্বন্দ্বে কষ্ট পেয়েছে, হয়তো বা বিদ্রোহও করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই সানন্দে মাথা নত করেছে। শরৎবাবুর দুটি পথই জানা ছিল—প্রথমত নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পাত্রীদের শ্বাসরুদ্ধ করে দিতেন, কিন্তু না, তিনি দ্বিতীয় পথটি বেছে নেন, এবং তিনি ক্রমশঃ এগিয়ে গিয়ে অবশেষে দায়োনিসস্-সুলভ কন্যাটির সৃষ্টি করেন, যার হাতে বিদ্রোহের নয়—বিপ্লবের পতাকা। হ্যাঁ, এই কৃতিত্বও আদর্শবাদী। দেশের বর্তমান অবস্থায় এরকম হওয়া অনিবার্য। কিন্তু এই আদর্শবাদিতা"শিল্পের জন্যই শিল্প" এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জেগেছে, আর সেই দৃষ্টিভঙ্গি আদর্শবাদের নিকৃষ্টতম রূপ।'

রায় মহাশয় ঠিকই লিখেছেন যে, শরতের নারী চরিত্রের ক্রমবিকাশের চরম পরিণতি হল কমল। সর্ব বন্ধনমুক্ত ভারতীয় নারীর সে প্রতীক। যদিও সে–নারী এখনও পর্যন্ত মানস সৃষ্টি মাত্র, রক্ত মাংসের নয়, তবুও এই চরিত্রটির মাধ্যমে শরৎচন্দ্র নতুন যুগের আলোক সঙ্কেত করেছেন। চন্দননগরের আলাপসভায় তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, 'আমি বলতে চাই, পুরোনো জিনিস নিয়ে গর্ব করে কিছু হবে না। নতুনকে গড়ে নাও। জাতির সম্বন্ধেও সেই একই কথা। জাতি যদি না-ই থাকে, তাহলেই বা কী আসে যায়? এমন অনেক ছেলে আছে, যাদের বংশপরিচয় দেবার কিছু নেই, তবু তারা নিজেদের ক্ষমতায় বড় হয়েছে, সফলকাম হয়েছে। আমার তাৎপর্যও ঠিক তাই। আমার একটা অসমাপ্ত বই পড়ে আছে—"শেষ প্রশ্ন"। তাতে আমি এ সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। আজকাল যা সব হচ্ছে, সে সব নিয়ে তাতে কটাক্ষ করা হয়েছে। বইখানা এখনও শেষ হয়নি। বোধ হয় দু'চারদিনের মধ্যে শেষ হবে।'

আর এক জায়গায় লিখেছেন,' "শেষ প্রশ্ন "শেষ পর্যন্ত হয়তো অনেককেই ব্যথা দেবে। তবুও যা ঠিক বলে মনে করি। তা বলা দরকার। তার পরে যা হবে, দেখা যাবে।'

'শেষ প্রশ্ন'এর বিরোধিতা শুধু বয়োঃবৃদ্ধেরা বা প্রাচীনপন্থীরা করেছিলেন, তাই নয়; নতুন লেখকেরাও বইটির বিরূপ সমালোচনা করেন। অন্নদাশঙ্কর রায় ও প্রবোধ কুমার সান্যাল দুজনেই শরৎচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু 'শেষ প্রশ্ন' পড়ে তাঁরা নিরাশ হন। প্রবোধ কুমার সান্যাল 'স্বদেশ' পত্রিকায় লেখেন, 'শরৎবাবু আধুনিক চিন্তাধারা এবং বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে একেবারেই পরিচিত নন। মুক্তি ও প্রগতির প্রতি তাঁর সমর্থন অসার।'

অন্যান্য কয়েকজন বলেছেন যে, এটি শুধু তর্কজাল। গল্পাংশ নামমাত্রই। চরিত্র অনেকগুলি, কিন্তু সে–সবই রক্তমাংসহীন। এতে না আছে সাহিত্য, রসসৌন্দর্য, কিংবা ভাবসৌষ্ঠব। আছে শুধু বিকৃত যৌনভাব–সংস্কার। সব কিছুই লেখক বলতে চেয়েছেন। চরিত্রগুলির জীবনের আকুলতা এমনভাবে শুনিয়েছেন যা 'চরিত্রহীন' ইত্যাদিতে আছে।

এই ধরনের তিক্ত সমালোচনার দরুন নবীন লেখকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে, এই দোষারোপ ছিল ভিত্তিহীন।'শেষ প্রশ্ন'–এর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল এই যে, এটি এক চিন্তাসর্বস্ব দুঃসাহসিক লেখা, সহজ সৃষ্টি নয়। কিন্তু যে লোক তার্কিক, সে কি চুপ করে থাকতে পারে? সে গলা চড়িয়ে বলতে পারে, 'মশায়, এ সব কথা তাঁর সমগ্র সাহিত্যকে সামনে রেখে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বলা হচ্ছে। যদি তিনি শুধুমাত্র "শেষ প্রশ্ন"-ই লিখতেন, তাহলে কি তাঁর এত সমালোচনা হ'ত? তিনি এক বিপ্লবী লেখকরূপে রাতারাতি প্রসিদ্ধ হয়ে পড়তেন না?'

তর্কের শেষ নেই। তবে সব কথা বলার পরেও এ কথা মানতেই হবে যে, 'শেষ প্রশ্ন'–এর বিচার করতে হবে তার বিকাশ এবং ক্ষমতার ওপর নির্ভর ক'রে। তিনি তাঁর বন্ধু কুমুদিনীকান্ত করকে বলেছিলেন, 'দশ বছর পরে বাংলার ঘরে ঘরে কমলের মতো মেয়ে জন্ম নেবে।'

'শেষ প্রশ্ন' বিপ্লবাত্মক সাহিত্যসৃষ্টি কিনা, তা নিয়ে বিবাদ–বিসম্বাদ হতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য লাগে যে, একদিকে যখন শরৎচন্দ্র এ ধরনের বিসংবাদী সাহিত্য রচনা করতেন, আবার অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে তিনি এমন সাহিত্য রচনা করতেন, যা গতানুগতিক চিন্তাধারার সমর্থক ছিল। 'শেষ প্রশ্ন' প্রকাশিত হবার আগেই তিনি আর একটি উপন্যাস হাতে নেন। যেটি 'বিপ্রদাস' নামে প্রকাশিত হয়। 'শেষ প্রশ্নে' যেমন প্রাচীন আচার বিচারের বিরোধ হয়েছিল, 'বিপ্রদাস' ছিল তেমনি বিচারে–আচারে সংস্কারনিষ্ঠ। একই লেখক একই সময়ে এমন পরস্পরবিরোধী সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারেন, একথা হয়তো অনেকেই মানতে চাইবেন না। এরকম মনে হয় যে, 'শেষ প্রশ্ন'–এর ধ্বংসমূলক নীতিকে তাঁর জীবনের চরম অনুভূতি ভেবে লোকে যাতে ভুল না করে, তাই হয়তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'বিপ্রদাস'–এর মতো সমাজনিষ্ঠ উপন্যাসেরও সৃষ্টি করেছিলেন। আসলে শরৎ নিজের সাহিত্যে বৈজ্ঞানিকের চোখ দিয়ে সমাজের ভুল ত্রুটির দিকে লক্ষ্য দিতেন, সমাজ–সংস্কারকের দৃষ্টিতে নয়। তাই কোনো বিশেষ মতবাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব অনুভব করা যায় না। এরকম তিনি চাইতেনও না। তিনি শুধু অন্যায়ের বিরোধী ছিলেন। অনেক বছর আগে যখন তিনি 'চরিত্রহীন' লেখেন, তখন তাঁর বন্ধু প্রমথ নাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন,[১] 'লোকের যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করুক কিন্তু সে ("যমুনা" পত্রিকার সম্পাদক) যখন বিশ্বাস করে,"চরিত্রহীন"–এর দ্বারাই তাহার কাগজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আর immoral হোক বা moral হোক লোকে খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে—তখন সে যাহা ভাল বোঝে তাহাই করিবে। তবে একটা কাজ করিতে হইবে-"রামের সুমতি"–র মতো সরল ও স্পষ্ট গল্পও সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া"চরিত্রহীন"-এর প্রভাব একটু হালকা করিতে হইবে।'

এই কারণে বোঝা যায় যে, 'শেষ প্রশ্ন'–এর প্রভাবকে হালকা করার জন্যই তিনি 'বিপ্রদাস'[২] লেখেন। বইখানির নামকরণ তাঁর নিজের ছোট মামার নামে করেছিলেন। বিপ্রদাস মামার জীবন ঠিক যেমনটি ছিল, উপন্যাসে ঠিক তেমনটিই তিনি চিত্রিত করেছেন। তিনি অত্যন্ত স্বধর্মপরায়ণ, আচারনিষ্ঠ, গুরু ও দেবতায় ভক্তিমান ছিলেন এবং ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক ও পূজাপাঠ না ক'রে তিনি জলগ্রহণ পর্যন্ত করতেন না। তিনি সুখাদ্য বলতে বুঝতেন, দেবতাকে যা ভোগ

১ ডাকমোহর, ২৪ মে, ১৯১৩
২ গ্রন্থাকারে ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ প্রকাশিত।

দেওয়া চলে তাই। তিনি অখাদ্য খেতেন না। ধর্ম অর্থে তিনি বুঝতেন কেবল সনাতন হিন্দুধর্ম আর ভ্রমণ অর্থে বুঝতেন তীর্থভ্রমণ। সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যে তাঁর অপরিসীম অনুরাগ ছিল। কলেজে পড়বার আগেই তিনি জটিল সংস্কৃতের ব্যাকরণ ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। নিজের এমন ধর্মপরায়ণ মামাকে শরৎ নিজের বই উৎসর্গ করতেও ভয় পেতেন। প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় তিনি ভাগলপুরে যেতেন। সেবার সেখানে গেলে, হঠাৎ বিপ্রদাস মামার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাঁকে দেখে তিনি প্রণাম করতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি যতই এগোন, বড় মামা ততই পেছিয়ে যান। বলেন, 'ব্যাস, ব্যাস্, থাক্। ঢের হয়েছে। এখন আর প্রণাম করে কাজ নেই।'

সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সবাই তা দেখে খুব বিচলিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু মামা চলে যেতেই শরৎবাবু বললেন, 'কিছুদিন আগে মামা আমার কাছ থেকে আমার লেখা বই চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার এই নীতিবাগীশ মামার হাতে "চরিত্রহীন" কেমন করে তুলে দিই? দিইনি বলেই আমার ওপর এই রাগ। প্রণাম পর্যন্ত নিলেন না।'

'বিপ্রদাস' সম্বন্ধেও কয়েকটি অপবাদ শোনা যায়। তার মধ্যে একটি হল এই যে, যাত্রা-মালিকদের কথায় নাকি তিনি এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন। কিন্তু একথা সত্যি হতে পারে না। তিনি অনেক কিছু করতে পারতেন, কিন্তু নীচ কাজ কখনও করতেন না। শিল্পী অন্য লোকের আদেশমত লিখবেন, এর চেয়ে নীচ কাজ আর কি হতে পারে? কিন্তু যাক সে-কথা। শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই বইটি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। স্বদেশিয়ানার যে-ঝংকারের সঙ্গে বইটি আরম্ভ হয়েছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে-ঝংকার সনাতন বিধি-নিষেধের অপরিপক্ব রোম্যান্স মরুভূমিতে পথ হারিয়েছে। মনে হয় এই বইটি লেখার সময়ে শুধু মামা বিপ্রদাসই নয়, বরং মণিমামা ও দাদামশায় কেদারনাথের ভাবমূর্তিও তাঁর সামনে ছিল। একবার কাউকে তিনি বলেও ছিলেন,' "বিপ্রদাস" লিখে আমি মণিমামার ঋণ শোধ করেছি।' তাঁর দাদামশাই কেদারনাথও ঘোর আদর্শবাদী, হিন্দুধর্মের একান্ত অনুরাগী এবং আস্থাবান ছিলেন।

'বিচিত্রা'-য় প্রকাশিত হবার আগে এর খানিকটা অংশ 'বেণু'-তে প্রকাশিত হয়। 'বেণু' ছিল তরুণদের পত্রিকা। তার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় ছিলেন শরতের প্রিয়। ঐ পত্রিকাটির পিছনে বিপ্লবী দলের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। বার বার ওটির ওপরে সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ত। ফলে, পত্রিকাটি চলতে পারল না, আর 'বিপ্রদাস'-এর ধারাবাহিক প্রকাশও বন্ধ হয়ে গেল। পুলিশ সতর্ক ক'রে দিয়েছিল যে, 'বেণু'-তে 'বিপ্রদাস' আর ছাপা চলবে না।[১]

এই পত্রিকাটি থেকে শরৎবাবু কোনোরকম পারিশ্রমিক পেতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন,' "বেণু"- র লোকগুলি সবাই নিজের দেশকে ভালোবাসেন, এটাই তো আমার পারিশ্রমিক। ওরা গরিব, ওরা আমায় কি আর দেবে? আমারই উচিত তাদের কিছু দেওয়া—লেখা দিয়েই নয়, অর্থ সাহায্যও।'

তাই কল্পনা করা হয়তো অসংগত না হতেও পারে যে, 'বেণু'-তে যদি 'বিপ্রদাস' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হ'ত, তাহলে তার শেষে অন্তত সংস্কারনিষ্ঠার জয়ধ্বনি হ'ত না। শরতের ওপরেও তো সরকারের রোষকষায়িত দৃষ্টি ছিল। ওদের রিভলবার ও রাইফেলও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি কোনোদিন নিন্দা করেননি। আন্দোলন বিষয়েও 'বেণু'-তে গল্প ছাপা হ'ত। সেগুলির একটি সংকলন বেরিয়েছিল। তার ভূমিকাটি স্বয়ং শরৎচন্দ্র লেখেন।[২] আর তখন যেমন হ'ত, তেমনি এটিও তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বাজেয়াপ্ত হবার আগেই বইয়ের পুরো সংস্করণ বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

১. ১৯৩২
২. ডিসেম্বর, ১৯২৯

যখন ঐ দুটি উপন্যাস তিনি লিখছিলেন, সেই সময়ে তিনি 'সতী' ও 'অনুরাধা' নামে দুটি ছোট গল্পও লেখেন। পূর্ণ রচনার দিক থেকে বলতে গেলে 'অনুরাধা' তাঁর শেষ রচনা বলা যেতে পারে। 'অনুরাধা'[১] গল্পটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন আধুনিক সাহিত্যে দেহসর্বস্ব প্রেমের বন্যা এসেছিল। এই গল্পটি যেন সেই প্রবৃত্তির প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। কিন্তু শরৎবাবু সেকথা স্বীকার করেননি। এর রচনাশৈলী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 'দেখ, কোনো কিছুর প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি "অনুরাধা" লিখিনি। এতে নায়িকার যে-মাতৃমূর্তি, সেবাপরায়ণতা এবং চরিত্রের মাধুর্য নায়ককে মুগ্ধ করলে—তার ফলে নায়কের চিত্তে যে রঙ রঞ্জিত হ'ল, তা তো অলীক নয়—সেই-ই তো প্রেম। নারী চরিত্রের এই বিভিন্ন রসধারাকে যে-শিল্পী উপভোগ করতে না পেরে তার দেহকেই সর্বস্ব মনে করে, তার সাহিত্যসৃষ্টি কখনোই সার্থক হতে পারে না। প্রেমে দেহের যে স্থান নেই, তা নয়, কিন্তু তার স্থান গাছের শেকড়ের মত-মাটির নীচে।'[২]

'সতী' গল্পটি 'অনুরাধা'-র কয়েক বছর আগে[৩] লেখা। এটির সুর ব্যঙ্গাত্মক। 'একনিষ্ঠ প্রেম আর সতীত্ব ঠিক এক বস্তু নয়।'—একথা যদি সাহিত্যে স্থান না পায়, তাহলে সত্য রক্ষা হয় কি করে? শরৎচন্দ্রের এই মতবাদ 'সতী' গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই গল্পটি লেখার একটি ইতিহাসও আছে। শিবপুরের বাড়িতে তাঁর একটা বড় দেরাজ ছিল। তাতে তাঁর কয়েকখানি অসম্পূর্ণ লেখা পড়ে ছিল। শরৎবাবু উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বলেন, 'ওগুলি এনে আমার কাছে রাখো।'

উমাবাবু তাই করলেন। কতকগুলি অসমাপ্ত গল্পও ছিল তার মধ্যে। তাঁর একটি গল্পের দরকার ছিল। বারবার কথা দিয়েও শরৎচন্দ্র লেখা দিতে পারছিলেন না। তাই সেই অসমাপ্ত লেখাগুলি থেকে সবচেয়ে বড়ো অসম্পূর্ণ গল্পটি নিয়ে উমাপ্রসাদ শরৎবাবুকে বলেন, 'এই গল্পটাকে সম্পূর্ণ করে দিন।'

সেই অসম্পূর্ণ গল্প পড়ে তাঁর মন যেন শূন্যে হারিয়ে গেল। তিনি যেন সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এটা আমার কাছেই থাক্, দেখি কি হয়।'

কিন্তু যখন ঐ গল্পটি তৈরি হয়ে গেল, তখন তার সঙ্গে সেই অসমাপ্ত গল্পের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

'শ্রীকান্ত' (চতুর্থ পর্ব)[৪] 'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হওয়ার আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। দিলীপকুমার রায় তার ভূরি ভূরি প্রশংসা করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। সেটি পড়ে শরৎবাবু বলেছিলেন, · 'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারিনে,—কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন ক'রে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্যই। তোমার মত একটি পাঠকও যে শ্রীকান্তের ভাগ্যে জুটেছে এই আমার পরম আনন্দ, অন্য পাঠক আর চাইনে। অন্তত না হ'লেও দুঃখ নেই।'

নিজের এই রচনাটিকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানতেন। মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু এটা তাঁর সহজ বিশ্বাস ছিল। কেউ যখন এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করত তখন বলে দিতেন, 'একথা তুমি বড় হয়ে বুঝবে।' দিলীপকুমারকে তিনি লেখেন,[৫] 'যদি আর কিছুই ভালো না পেয়ে থাকি, অন্তত অসংযত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে বসিনি।' ....

'শ্রীকান্ত'(চতুর্থ পর্ব) লেখার কাহিনী বড় বিচিত্র। যদি এর পেছনে কারো আগ্রহ না থাকত,

---

১ ১৯৩৪ সাল। এই বছরে 'অনুরাধা, সতী, ও পরেশ' সংগ্রহরূপে প্রকাশিত হয় ১৮ মার্চ, ১৯৩৪। 'পরেশ' ছাপা হয়েছিল 'শরতের ফুল' পূজাবার্ষিকীতে, ভাদ্র, ১৩৩২

২ অজিত ঘোষ, 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার', পৃঃ ৪১১-১২

৩ আষাঢ়, ১৩৩৪ (জুন, ১৯২৭)

৪. ১৩ মার্চ, ১৯৩৩

৫ ১৯ মে, ১৯৩১

তাহলে হয়তো তিনি এটা লিখতে পারতেন না। এটি 'বিচিত্রা'-য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মামা উপেন্দ্রনাথ। কিছুদিন আগে তিনি একদিন শরৎচন্দ্রের কাছে একটি গল্প চাইতে এসেছিলেন। সেদিন তাঁকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। এই মনোমালিন্যের পেছনে একটা পুরো ইতিহাস আছে। হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটির প্রধান হবার সুবাদে সেখানকার মিউনিসিপ্যাল কমিটির নির্বাচনে তাঁরও তরফের একটি দল ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে-পক্ষের সমর্থন করছিলেন, তার বিপক্ষে ছিলেন নিত্যধন মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক। এই নিত্যধনের পরম বন্ধু ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি ছিলেন উপেন্দ্রনাথের বেয়াই।

এর ফলে খুব সহজে আত্মীয়েরাই দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। এই অবসরে সেই সব লোক জুটে গেল যারা ঝগড়া বাঁধাবার কাজই করে বেড়ায়। এই ধরনের লোকেদের মধ্যে এমন একটি লোক ছিল, যার ওপর যোগীন্দ্রনাথের ভরসা ছিল। সে শরৎবাবুর কাছে এসে তাঁর কানে তুলত অনেক কথা। বলত যে, যোগীন্দ্রনাথের বাড়িতে সে রোজ রাত্রে খায় আর সে সময় তাঁর পুত্রবধূ শরৎবাবুর খুব নিন্দে করে। এই পুত্রবধূ ছিল উপেন্দ্রনাথের মেয়ে এবং সম্পর্কে সে শরতের মামাতো বোন হয়। বারবার এই নিন্দাবাদ শুনতে শুনতে যোগীন্দ্রনাথের বাড়ির লোকেদের ওপর শরৎচন্দ্রের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। এটা হওয়া উচিত ছিল না। তবে এটাও ঠিক যে, শরতের প্রতি মামাদের ব্যবহারও কখনও সহজ ছিল না। কেবল সুরেন্দ্রনাথই তাঁর বন্ধু ছিলেন। তবে একই স্থানে থাকার দরুন উপেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর দেখাশুনো হ'ত। কিন্তু সেরকম সদ্ভাব ছিল না। তাই শরৎবাবুর পক্ষে একথা মানতে কষ্ট হয়নি যে, উপেন্দ্রনাথের মেয়ে ওরকম নিন্দেমন্দ করতে পারে।

পাঁচ বছরে পরে[১] হঠাৎ এ রহস্যের সমাধান হয়। শরৎবাবুর কানে লাগাতেন যে-ভদ্রলোকটি, তিনি কখনই যোগীন্দ্রনাথের বাড়িতে খেতে যেতেন না। আর তিনি শরৎবাবুকে যা-কিছু বলেছিলেন, সবই মিথ্যা। একথা জেনে তাঁর খুবই কষ্ট হয়, তিনি উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করতে থাকেন। একদিন হঠাৎ তিনি উপেন্দ্রনাথকে ফোন করলেন। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা বাজে। অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেবল উপেন্দ্রনাথ আর ম্যানেজার সুশীলকুমারই অফিসে বসে ছিলেন। টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যালো।' অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ ভেসে এল, 'উপীন আছে কি?'

পরিচিত কণ্ঠস্বর এবং প্রায় পাঁচ-ছ' বছর পরে শোনা গেল। উপেন্দ্রনাথ তখনি বললেন, 'আমিই কথা বলছি, কেমন আছ, শরৎ?'

'যেমন থাকি, ঐরকমই আছি। তোমার পত্রিকার অবস্থা কি খুব খারাপ?'

'কি দেখে জিজ্ঞেস করছ?'

'আর্থিক দিক থেকে?'

'সে বলা বড় মুশকিল। খুব খারাপ তা একেবারে বলা চলে না। তবে খুব-একটা ভালোও নয়।'

'আমার লেখা পেলে তোমার সুরাহা হবে?'

'হওয়া তো উচিত।'

'চাও?'

স্বয়ং শরতের মুখে একথা শুনে উপেন্দ্রনাথের মন একেবারে আনন্দ আর অভিমানে ভরে ওঠে। শরতের নাম শুনে সুশীলও উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ যখন বললেন, 'শরৎ লেখা দেবার কথা বলছে, তুমি কি নেবে?' শুনে সুশীল রায়ের আনন্দ আর ধরে না বললেন,

১ ডিসেম্বর, ১৯৩১

'এতে জিজ্ঞেস করবার কি আছে ? নিশ্চয়ই নেবো।'

দুজনেই জানতেন, যে, শরতের লেখা ছাপলে 'বিচিত্রা'-র জনপ্রিয়তা বেড়ে যাবে। পাঠক এবং গ্রাহক উভয়েই শরৎকে চায়, তাই, ব্যক্তিগত মান-অপমানের কোন প্রশ্ন নয়। উপেন্দ্রনাথ শরতকে বললেন, 'চাই কি না একথা কেন জিজ্ঞেস করছ, শরৎ ? আমি তো চাইতে গিয়েছিলাম। তুমিই ফিরিয়ে দিয়েছিলে।'

এই অনুযোগ আর অভিমানের কোনও উত্তর না দিয়ে শরৎ বললেন, 'অফিসে কতক্ষণ আছ ?'

'তুমি আসছ নাকি ?'

'ব্যস্। মিনিট কুড়ির মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।'

কিন্তু আট মিনিট যেতে না যেতেই শরৎবাবু হাসতে হাসতে উপেন্দ্রনাথের ঘরে এসে ঢুকলেন। তাব পর এমন আলাপ শুরু হল, যেন কোনদিনই ওদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। দুজনের মধ্যে কেউই পুরোনো কথা তোলেননি। তাই অভিযোগ ও ক্ষমা চাওয়ার কোন কথাই ওঠেনি। শরৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কাছ থেকে কি চাও ?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই উপন্যাস।'

শরৎবাবু বললেন, 'উপন্যাস তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কি বিষয়ে ?'

উপেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিলেন, তৎক্ষণাৎ বললেন, '"শ্রীকান্ত", চতুর্থ পর্ব।'

শবৎ বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'বলো কি ?"শ্রীকান্ত", চতুর্থ পর্ব ? তিন পর্ব পড়ার পর চতুর্থ পর্ব পড়বার ধৈর্য কোন পাঠকের থাকবে ?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই থাকবে।"শ্রীকান্ত" তৃতীয় পর্বের শেষে তুমি রাজলক্ষ্মীকে কাশীধামে সদ্‌গুরুর হাতে সমর্পণ করে তার গল্পের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছ। এর পরে রাজলক্ষ্মী আর শ্রীকান্তকে রাঙামাটি থেকে ফিরিয়ে এনে আবার গল্প শুরু করলে পাঠকদের ধৈর্য শেষ হয়ে যাবে একথা বলা মুশকিল। কিন্তু যে-অভয়ার দুর্নিবার আমন্ত্রণে শ্রীকান্ত সাগ্রহে রেঙ্গুন যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল, সেই অভয়াকে তুমি এমনিই ছেড়ে দিয়েছ, পুষ্পে পল্লবে ভরিয়ে দাওনি। ঐ অবস্থায় অভয়ার যে পরিচয় তুমি দিয়েছ, তার ফুল ফুটে ওঠার কাহিনী যদি লেখ তো সত্যিই অপূর্ব হবে। শুধু "বিচিত্রা"-র পাঠকরাই নয়, গৌড়জনে তা থেকে আনন্দ পাবে।'

সুশীল রায়ও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শরৎচন্দ্র রাজী হয়ে গেলেন। 'বিচিত্রা'-র আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হল যে, 'মাঘ সংখ্যা' থেকে 'বিচিত্রা'-য় ধারাবাহিকভাবে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তঃ চতুর্থ পর্ব' প্রকাশিত হবে এবং তাতে অভয়ার সৌরভে মুগ্ধ 'শ্রীকান্ত'- র পাঠকদের মন বিভোর হয়ে উঠবে।

বিজ্ঞাপন অনুযায়ী 'বিচিত্রা'-য় 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব প্রকাশনা শুরুও হয় কিন্তু আরম্ভ থেকেই অভয়াকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। গল্প আরম্ভ হল গহর আর বৈষ্ণবী কমললতাকে নিয়ে। শরতের মন বদলে গিয়েছিল এবং অভয়ার গল্প অসম্পূর্ণই থেকে যায়। কিংবা হয়তো এ দুটি চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। দুজনের সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। অভিজ্ঞতার এই মোহ নিয়ে অভয়ার শেষ পর্যন্ত পৌঁছনোর পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অভয়া সেও তো সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র নয়। বর্মায় থাকতে মিস্ত্রির একটি বউয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। স্বামী-নির্যাতিতা সেই মহিলাটি কিন্তু যতদিন স্বামী বেঁচেছিল প্রেমিকের কাছে যায়নি। স্বামীর মৃত্যুর পরই তারা একত্র হয়। এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতেই সামান্য পরিবর্তন করে অভয়ার সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই যে সামান্য পরিবর্তন, মহত্ত্বের দিক থেকে তা কতখানি বড় ! অত্যাচারী স্বামী বেঁচে থাকতেই অভয়া তাকে ত্যাগ করার দুঃসাহস করেছে। মিস্ত্রির অত্যাচার শরৎবাবু চোখে দেখে কষ্ট পান, যদি এমন স্বামীকে নারী ত্যাগ করে তাহলে কোনো পাপ হয় না।

শরতের সাহিত্যিক চরিত্রে তাঁর জীবনের সম্পর্কে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের আমরা খুঁজে বেড়াই। খুঁজলে হয়তো অনেক কিছুই পাওয়া যায়। তবে সাহিত্যের মধ্যে এসে মিস্ত্রি বউ বদলে গিয়ে যেমন অভয়া হয়ে যায়—ঠিক তেমনই—'শ্রীকান্ত' শরৎ হয়েও শরৎ নয়। সাহিত্যিকের যাদুর কাঠির পরশ পেয়ে তা এমনই বদলে গেছে যে, মনে হয়, কী থেকে কী হয়ে গেছে। অভয়াকে নিয়ে পঞ্চ পর্ব লেখার চিন্তাও তাঁর মনে এসেছিল। দিলীপকুমারকে তিনি লিখেছিলেন[১], 'পঞ্চম পর্ব''শ্রীকান্ত''লিখে শেষ করে দেব—অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে। আর যদি তোমরা বলো চতুর্থ পর্ব ভালো হয়নি তবে থামল এইখানেই রথ····।'

কিন্তু চিরকালের আলস্যবশত দিলীপকুমার চতুর্থ পর্বের প্রশংসা করার পরেও রথ আর এগিয়ে যেতে পারেনি।

এই সময়ে তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহ 'স্বদেশ ও সাহিত্য' নামে প্রকাশিত হয়।[২] বিগত অনেকগুলি বছরে তিনি যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন বা বক্তৃতা ইত্যাদি দেন, এটি তারই সংকলন। সংকলনটির দুটি খণ্ড ছিল—'স্বদেশ' খণ্ডে রাজনৈতিক প্রবন্ধ এবং 'সাহিত্য' খণ্ডে সেই সব প্রবন্ধ ছিল যেগুলি সাহিত্য বিষয়ক। সংকলনটি এই কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এর সর্বস্বত্ব তিনি আর্য পাবলিশিং কোম্পানির স্বত্বাধিকারী অশ্বিনীকুমার বর্মনকে দান করে দিয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বীর সৈনিক ছিলেন। কিছুদিন কারাবাস করেন। সে সময়ে তাঁর সংস্থাটি অর্থাভাবের মধ্যে দিয়ে চলছিল। পুঁজির অভাবে লেখকদের অর্থ দিয়ে বই নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। তাঁকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই তিনি এরকম করেছিলেন। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' ছাড়া 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রকাশ করার অধিকারও তিনি এই সংস্থাটিকে দিয়েছিলেন। এই সংকলনে 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধটিও সংকলিত হয়েছিল।'[৩]

এই প্রবন্ধগুলি থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, সুস্পষ্ট কোনো দর্শন তাঁর ছিল না, কিন্তু মননশীলতার অভাব তাঁর ছিল না। প্রবন্ধের আকারে নিজের মনের কথা কিভাবে ব্যক্ত করা যায় তা তিনি জানতেন। এমন অনেক রচনা আছে যা তাঁর মৃত্যুর পরেও সংকলিত হয়। সেগুলির মধ্যে 'ক্ষুদ্রের গৌরব'-এর[৪] মতো রম্য রচনা ও 'আমার আশায়'-এর[৫] মতো রূপকথা ছিল। এইসব মাধুর্যমণ্ডিত রচনাগুলি তাঁর কবিমনের পরিচয় দেয়।

১৬

কিশোর বয়সে শরৎবাবু অনেক নাটকে অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছিলেন। সে সময়ে লোকে নাটক দেখতে খুব ভালোবাসত। কিন্তু ভদ্রঘরের ছেলেরা মঞ্চে আসবে, এটা কেউ মেনে নিতে চাইত না। শরৎবাবু ছিলেন আজন্ম বিদ্রোহী, সেজন্য তিনি বরাবরই অভিনয়ে আগ্রহ নিতেন। কলকাতা এবং বর্মাতে গিয়েও তাঁর এই শখ কোনো না কোনোভাবে জেগে থাকত।

রেঙ্গুনে তিনি বিশ্বমঙ্গল থিয়েটার স্থাপনার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু গায়িকা নিধুবালার আকস্মিক মৃত্যুতে এই থিয়েটারটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।[৬] অভিনয়ে যাঁর এমন আগ্রহ ছিল, নাটক লেখার প্রতিও তাঁর বাসনা থাকা একান্তই স্বাভাবিক। যখন তিনি অখ্যাতির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন বন্ধু প্রমথনাথকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'আমিও একটা

১. ১৯ মে, ১৯৩৩
২. অগাস্ট, ১৯৩২
৩. ২৩ অগাস্ট, ১৯৩২
৪. ২৩ অগাস্ট, ১৯৩২
৫. 'যমুনা', মাঘ, ১৩৩১ (জানুয়ারি, ১৯২৪)
৬. জুলাই, ১৯০৭, সতীশচন্দ্র দাস–'শরৎপ্রতিভা'

নাটক লিখব বলে ঠিক করেছি। যদি ভালো হয় তাহলে কোনো থিয়েটারে অভিনয় হতে পারে।'[১]

কিন্তু এটা শুধু মাত্র প্রস্তাব হয়েই থেকে গিয়েছিল। সে নাটক লেখা আর হয়নি। পরে ধীরে ধীরে এদিকে থেকে তাঁর মন সরে যেতে থাকে। গুণগ্রাহীরা তাঁরই উপন্যাস অবলম্বন করে নাটক লেখার প্রস্তাব যখন দেন, তখন আবার তাঁর মন এদিকে আকৃষ্ট হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে এ সম্বন্ধে একটি চিঠিতে লেখেন, 'আমার উপন্যাসগুলিকে নাটক করে অভিনয় করা সম্বন্ধে একটাই সাধারণ ব্যাপার দাঁড়াবে যে, সে–নাটক ছাপানো যাবে না আর তা থেকে কোনো ব্যবসায়ী থিয়েটারওয়ালা অর্থোপার্জনও করতে পারবে না। যদি তা না হয়, তাহলে শখের অভিনয় করার জন্য আর তার জন্য টিকিট বিক্রি করাতে আমার কোনো অমত নেই।'

এক ভদ্রলোক 'দত্তা' উপন্যাস অবলম্বনে একটি নাটক তৈরিও করেন। শরৎচন্দ্র নিজে নাটকটির সংশোধন করেন এবং নাম রাখেন 'বিজয়া'। তাঁর মতে, উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিতে হলে কথোপকথন নতুন ভাবে লেখা উচিত এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনও লোক তা করতে পারে না।

কিন্তু এই নাটক লেখা সহজে হয়ে উঠল না। তাঁর প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় যখন এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন অন্য কোনো লোককে দিয়ে সেটা লিখিয়ে নিতে চাইলেন। শরৎবাবু জবাব দেন, 'আপনি অন্যকে দিয়ে ওটা লিখিয়ে নিতে চাইছেন, কিন্তু সে কী আমার থেকে তাড়াতাড়ি পারবে? তাঁর অনেক অসুবিধা হবে। মাঝখানে লেখক স্বয়ং না থাকলে সেইসব অসুবিধা দূর করা কঠিন হবে মনে হয়। তাছাড়া অভিনয়ের দিক থেকেও যে খুব ভালো হবে, তারও আশা রাখি না। আমার নিজের লেখা হলে সে–বাধা থাকবে না এবং "বিজয়া" নাম দিয়ে আমিও আর একটি উপন্যাস প্রকাশ করতে পারতাম, অন্যের লেখা হলে তো তা পারবো না।

'প্রথম অঙ্ক প্রবোধ গুহ দেখবেন বলে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে আর দিয়ে যাননি। তবে তার নকল ছিল, সেটাই অভিনয়োপযোগী করে লেখার চেষ্টা করছি, তাতেও বিঘ্ন ঘটছে। কিন্তু বিলম্ব করলে (অর্থাৎ "বিজয়া" লেখার আশায়) খুব ক্ষতি হবে। বৃথাই অভিনেতাদের বেতন দিতে হচ্ছে। এ অবস্থায় যে কী করি ভেবে পাচ্ছি না। তবে একরকমে বইটি সম্পূর্ণ তৈরি। শুধু সামান্য রদবদলের দরকার এবং আর একটু লিখে নকল করাতে হবে। যদি এর মধ্যেই ভালো করা যায় তো অবশ্যই করে দেব। কিছুদিন আগেও যদি আপনি এর বিহিত করে নিতেন তাহলে তো কথাই ছিল না।

'পুনশ্চঃ–দেখার জন্য প্রথম অঙ্ক টুনুর হাতে পাঠাচ্ছি। এটা দেখে যদি বোঝেন যে, এর পরের অঙ্কগুলো কাউকে দিয়ে আপনি লেখাতে পারবেন, তাহলে আমায় জানাবেন।'[৩]

শরৎবাবু নাটক লিখতে পারেননি, নিজের অক্ষমতা স্বীকার করেও তাঁর মনে এধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, তিনি নাটক লিখতে পারেন। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর এ ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট —

'নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, যা ভালো না হলে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমনভাবে বলতে হয়, কত সোজা ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হ'য়ে বসে, সে–কৌশল জানিনে, তা নয়। এছাড়া চরিত্র বা ঘটনা–সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি বলেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চরিত্র সৃষ্টির

১ ৮ এপ্রিল, ১৯৩১
২ ২১ জানুয়ারি, ১৯২৭
৩ ২৯ জুন, ১৯৩৩ সাল। পরে ১৯৩৪–এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়।

জন্যেই। দু'রকমের হতে পারে—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রীরা, তাই ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো। এবং তা ভালো মন্দ যে-কোন দিকেই হতে পারে। মনে কর কোন লোক কুড়ি বছর আগে উইলসন হোটেলে খেত, মিথ্যে কথা বলত, এবং অন্যান্য খারাপ কাজও করত। কিন্তু আজ সে ধার্মিক বৈষ্ণব, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—পাতে মাছের ঝোল পড়ে গেলে তা তিনি হাত দিয়ে মুছে দিতেন। এ তার লোক-দেখানো মনোবৃত্তি না হতেও পারে। সত্যিই তার পরিবর্তন হয়ত হয়েছে। কোন ঘটনার দরুন বা দশটা সৎ লোকের সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হয়ে হয়ত সত্যিই সে একেবারে বদলে গিয়েছে। অতএব কুড়ি বছর আগে সে যা ছিল, তা যেমন সত্যি আর আজ যা হয়েছে এও ঠিক তেমনই সত্যি। নাটকে এই জিনিসটিকেই রচনাশৈলীর দ্বারা এমনভাবে দেখাতে হবে যে, দর্শক যেন সেটা যথার্থ বলে বুঝতে পারে। দর্শক যেন নাটকের মধ্যে সেটা খুঁজে না পেয়ে ব্যর্থ না হন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কাজ খুবই কঠিন।

'আর একটি কথা—উপন্যাসের মত নাটকেব elasticity নেই। নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা—তাও হয়তো চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য কাজ হবে না।'[১]

তবুও কেন যে তিনি নাটক লেখেননি, সে-সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই চিঠিটিতেই তিনি লিখেছিলেন, 'কিন্তু ভাবি। ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা-অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোয়িন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী তো নজরে পড়ে না। এমনিধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। আশা করি, একদিন বর্তমান রঙ্গালয়ের এই অভাবটা ঘুচবে। কিন্তু আমরা তা হয়তো চোখে দেখে যেতে পারব না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয়তো লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করিনে।'

তিনি বলেছিলেন, 'থিয়েটার কেবল আনন্দের জন্যেই নয়, লোকশিক্ষার কাজও হয়। কিন্তু দেশের নাট্যকারেরা যদি এই সত্যকে প্রতিপাদন করে কোন নাটক সত্যিই লিখে থাকেন তাহলে অচিরেই তা শান্তিরক্ষার খাতিরে আইনের সাহায্যে রাজ্য সরকার দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। তাই সত্য থেকে বঞ্চিত আমাদের নাট্যশালা আজ দেশের সামনে এত লজ্জিত,ব্যর্থ ও অর্থহীন।'

সম্ভবত এই কারণেই তিনি নাটক লেখার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেননি। কেবল 'দত্তা', 'পল্লীসমাজ' ও 'দেনা পাওনা' এই তিনটি উপন্যাসের তিনি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। 'ষোড়শী' নাটকটি 'দেনা পাওনা'-র রূপান্তর। এর প্রথম খসড়া কবি শিবরাম চক্রবর্তী করেন। কিন্তু শরৎবাবু নিজেই নাটকটির চূড়ান্ত রূপ দেন। 'ভারতী'-তে শরৎচন্দ্রের নামেই এটি প্রকাশিত হয় এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ তিনশো টাকা পান। তা থেকে একশো টাকা তিনি শিবরাম চক্রবর্তীকে দিয়ে দেন।

নাট্যমন্দির রঙ্গমঞ্চে 'ষোড়শী' নাটকটির পরিচালনা করেন তখনকার বিখ্যাত পরিচালক শিশির কুমার ভাদুড়ী[২]। জীবানন্দের মূল চরিত্রের ভূমিকায় শিশির কুমার ভাদুড়ী স্বয়ং মঞ্চে অবতরণ করেন। অভিনেত্রী চারুবালা 'ষোড়শী'-র ভূমিকায়, যোগেশবাবু রায়সাহেবের ভূমিকায় এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সাগর সরদারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। শিশির ও চারুবালার অভিনয় শরৎচন্দ্রের খুবই ভালো লাগে। বন্ধুদের কাছে বার বার এর প্রশংসাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে সর্বদা একটা দুঃখ থেকে যায় যে, শিশিরবাবুর কথায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাটককে শেষ পর্যন্ত বিয়োগান্ত করে দিতে হয়। উপন্যাসে গল্পটি শেষ পর্যন্ত

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ (২৫ আশ্বিন, ১৩৪১)

২ ৬ অগাস্ট, ১৯২৭

মিলনান্ত। নাটকে জীবানন্দকে মেরে ফেলার সার্থকতা তিনি কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। সে বেঁচে থাকলেই 'ষোড়শী'-র বক্তব্য যতটা সার্থক হত, মৃত্যুর ফলে তেমন হয়নি। এবিষয়ে শিশিরকে একটি চিঠিও তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তা শেষ করেননি। কারণ তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, থিয়েটারের সব লোকই একই ধরনের—তারা শুধু সস্তা 'ড্রামাটিক ইফেক্ট–'এর চিন্তাই করে।

'ষোড়শী' নাটকটি আর একটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরতের কয়েকবার মনোমালিন্য ঘটে। এর কয়েকটি কারণের মধ্যে এই নাটকটিও একটি। নাটকে গানের প্রয়োজন হয়। 'ষোড়শী'-র জন্য গান লেখার অনুরোধ জানিয়ে শরৎ তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। কিন্তু ব্যস্ত থাকার দরুন রবীন্দ্রনাথ শরতের এ অনুরোধ রাখতে পারেননি। অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র এই অজুহাত মেনে নিতে পারেননি। বহুদিন থেকেই তাঁর মনের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করেই তাঁকে উপেক্ষা করছেন। তবুও মান–অভিমানের চিন্তা না ক'রে, যখন 'ষোড়শী'[১] প্রকাশিত হল, তখন এক কপি পাঠিয়ে দিয়ে কবির মতামত জানতে চান।

শরৎচন্দ্রের চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'তোমার "ষোড়শী" পেলাম। বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। যদি আমার নাটক লেখার ক্ষমতা থাকত হয়ত সে চেষ্টা করতাম। কারণ নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ। আমার বিশ্বাস যে, নাটক লেখার ক্ষমতা তোমার আছে, অন্তরের প্রকৃতির সাথে বাইরের আকৃতির যখন মিল হয় তখনই সুন্দর চরিত্র চিত্রণ হতে পারে। আমার মনে হয় তোমার কলম যদি ঠিক পথে চলে এবং রূপের সাথে ভাবের তাল রেখে এগুতে পার তাহলে তুমি অনেক কিছু করতে পারবে। দেখার দৃষ্টি তোমার আছে, চিন্তনশীল মন ও দেশের লোকচরিত্র সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতাও বেশি, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রও বেশ বড়। তবে তুমি যদি বর্তমানের দাবী ও লোকেদের অভিরুচি না ভুলতে পার তাহলে তোমার এ ক্ষমতায় ব্যবধান আসবে। যা সত্যিকারের সাহিত্য তার পরিপ্রেক্ষিত সুদূরপ্রসারী হয়। যা তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে, সে–সাহিত্য অবশ্যই টিঁকে থাকতে পারে। কিন্তু যখন আশেপাশের লোকেদের হট্টগোলে দেওয়াল তুলে সংকীর্ণ পরিবেশে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সাহিত্য কুণ্ঠিত ও অসত্য হয়ে যায়।

' "ষোড়শী"-তে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েছ এবং তার দামও পেয়েছ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছ। যে–ষোড়শীকে এঁকেছ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিস। সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকমের ভাবের ভৈরবী হ'তে পারে না—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হ'তে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে–কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করত, সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা। লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেন্ট মিশ্রিত কাহিনী একটি রচনা করা নয়। জানি, আমার কথায় তোমার রাগ হবে। কিন্তু তোমার প্রতিভাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাই সরল মনে আমার মতামত জানাচ্ছি, নইলে কোন প্রয়োজন ছিল না। তুমি সাহিত্যের একজন বড় সাধক। সামান্য প্রলোভনে ইন্দ্র যদি তোমার তপোভঙ্গ করেন, সে ক্ষতি সাহিত্যের। বর্তমানের প্রাপ্য পেয়ে হয়ত তুমি খুশি হতে পারো, কিন্তু শাশ্বত যুগকে কি দিয়ে যাবে?'[২]

শরৎচন্দ্র গুরুদেবের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। নিজের মনোভাব জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন, ' "ষোড়শী" নাটকটি আমার একটা উপন্যাসকে

১ ১৩ অগাস্ট, ১৯২৭
২ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭

অবলম্বন করে লেখা হয়েছে। উপন্যাসে আমি যতখানি বলতে পেরেছি, এবং চরিত্রচিত্রণের জন্য ঘটনাবহুল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছি, নাটকে ঠিক ততখানি পারিনি। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের পরিসর খুব ছোট। ব্যাপ্তির দিক দিয়ে দেখলেও তার স্থান সংকীর্ণ। লেখার সময় একথা আমার বার বার মনে হয়েছে, এটা ঠিক হয়নি। কিন্তু যেহেতু উপন্যাসকে অবলম্বন করে নাটকটি লিখেছি বলে হয়ত কেমন হওয়া উচিত ছিল বুঝতে পারিনি। মনে হচ্ছে, উপন্যাসকে নাটক করলে এমনিই হয়। একদিকে যেমন কাজটি বেশ সহজ, অপরদিকে ভুলত্রুটিও সেই পরিমাণে অনেক থেকে যায়। হয়েছেও তাই।

'আর একটি কারণ, নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটানোর দরুন অনেক কিছুই চোখে পড়েছে। আপনি সেটাকে লোকচরিত্র সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বলেছেন। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধহয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিপি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেই জানাই হ'ল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধহয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে, তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হ'তে পারে কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।

'আপনি ঠিক কি বলতে চেয়েছেন আমি বুঝতে পারিনি। কোন ছবি আঁকার সময় দূর থেকে দেখলে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, বেঁটে জিনিস লম্বা আর সোজা জিনিস বেঁকা মনে হয়। কোন বস্তুর আকার প্রকার কেমন করে কতখানি পরিবর্তন হওয়া উচিত তার একটা বাঁধা নিয়ম আছে। এ নিয়ম থেকে ক্যামেরাও মুক্তি পায় না। কিন্তু সাহিত্যের তো কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। সবই লেখকের অভিরুচি ও বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে। নিজেকে কোথায় এবং কতখানি দূরে দাঁড় করাতে হবে, নির্দেশ পাবার কোন পথ নেই। তাই কোন মূর্তির পরিপ্রেক্ষিত এবং সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত এক হলেও কাজের দৃষ্টিতে ঠিক এক নয়। এছাড়া সাহিত্যে বর্তমান যতটা সত্য, ভবিষ্যৎ ঠিক অত বড় সত্য নয়। নর-নারীর একনিষ্ঠ প্রেম নিয়ে কত কাব্যই লেখা হয়েছে, মানুষ কতই না আনন্দ পেয়েছে, কতই না চোখের জল ফেলেছে, হয়তো এসবই একদিন হাস্যকর হয়ে উঠবে। অন্তত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে আজ তো কল্পনাতেও তা গ্রহণ করা যেতে পারে না।....।

'রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিয়েছে। বানর ও রাক্ষসেরা মিলে কিরকম লড়াই করেছিল, কে কোন্ অস্ত্র ছুঁড়েছিল, এসব সম্পর্কে কতই না নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়। কারো হাত, কারো পা, আবার কারো-বা গলা কাটা গিয়েছিল, সে-বিবরণও উপেক্ষিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ধরনের বিবরণ ছোটও নয়, তুচ্ছও নয়। সে-যুগের লোকেরা হয়ত কবির কাছে সে-ধরনের বিবরণই চেয়েছিল, আর তা পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও তারা পেয়েছিল। কিন্তু আজ এত দিন পরে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী বীরেদের সেই রণকৌশল একেবারে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। সাহিত্যের সুদূরপ্রসারী পরিপ্রেক্ষিতেই হয়ত আপনি সেই ধরনেরই একটা কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'আমি আগে কখনও নাটক লিখিনি। এবার দু'একটা লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বড় বাধা। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকেরা করেছেন, তার ক্ষেত্র বেশ প্রশস্ত। কিন্তু নাটকের বিচারক কারা, তা বোঝা কঠিন। থিয়েটারের লোকেরা, না, বোকা দর্শকেরা? তার হাইকোর্ট যে কোথায়, কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত বা সেইরকম সুপ্রতিষ্ঠিত টড সাহেবের

রাজস্থানের ইতিহাস নিয়ে নাটক্ লিখলে হয়ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব, কিন্তু আপনার কাছ থেকে তো তাড়নাই জুটবে।

'আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনি লিখেছেন,"তুমি যদি বর্তমানের দাবী ও জনতার ভিড়ের অভিরুচিকে না ভোল, তাহলে তোমার ক্ষমতায় ব্যবধান আসবে।"আপনি অনেক কাজে ব্যস্ত কিন্তু বড় ইচ্ছে হয় আপনার কাছে গিয়ে একথা ভালো মত বুঝে নিই। কারণ বর্তমান কাল তো উপেক্ষার জিনিস নয়। তার দাবী না মানলে শাস্তি পেতে হয়। '[১]

শরৎচন্দ্রের এই চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ' তোমার প্রতিভা আছে তাই তোমার কাছে আমি কিছু চেয়েছি। এ চাওয়া সাহিত্যের তরফ থেকে চেয়েছি। এক-একটা যুগে বর্তমানের ভোগ বর্তমানেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সাহিত্যে সব জাতিই চিরকালের সম্পত্তি কামনা করে। সে-সম্পদ সৃজন করবার যাঁর ক্ষমতা আছে, তিনি যেন বর্তমানের কোন প্রলোভনে জড়িয়ে না পড়েন, তাঁর যেন তপোভঙ্গ না হয়, সেটাই আমরা আন্তরিকভাবে চাই। যারা পৃথিবীতে শুধু বর্তমানের চাহিদা মেটাতে এসেছে, তাদের সংখ্যা অসীম, প্রচুর পরিমাণে তারা নগদ বিদায়ও দিয়ে থাকে । তাদের মজলিস ক্ষণিক উৎসবের জন্য তৈরী বাঁশের কঞ্চির উৎসব। তুমি যদি সেখানে পা রাখ, তোমার জাত নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি লিখেছ যে, বর্তমানও বড় জিনিস। সেখানে সে সত্যিই বড়, যেখানে অনুপস্থিতকালেও তার প্রবেশাধিকার রয়েছে। বর্তমানের একটা বড় অংশ ক্ষণজীবীদের জন্য রক্ষিত। আধুনিক ডেমোক্রেসীর যুগে সাহিত্যের দরবারে গলা ফাটিয়ে তারা নিজেদের চাহিদা পেশ করে। আজকের যুগে এ চাহিদা অস্বীকার করে এগিয়ে যাওয়া কঠিন সমস্যা। আগেকার যুগে এ সমস্যা এতখানি কঠিন ছিল না। আজকের যুগের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত শ্লোগান লোকের মুখে মুখে প্রতিধ্বনিত। তোমার মত সাহিত্যিকের উচিৎ তাদের বলা যে, তোমাদের শ্লোগান আমার শ্লোগান নয়। দাশুরায়ের যুগ দাশুরায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল, কিন্তু সে-যুগে যে-চেকের ওপর সই করা হয়েছিল, আধুনিক যুগের ব্যাঙ্কে তা ক্যাশ করতে পারা যায় না। অন্যদিকে ময়মনসিংহের কাব্যগাথা ও লোকসাহিত্যের মেয়াদ আজও ফুরিয়ে যায়নি। তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় রচিত, তবু সে-ভাষা চিরকালের ভাষা।· আমি তোমার যে-গল্প ইত্যাদি পড়েছি, তাতে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, বিনা চেষ্টাতেই চিরকালের সত্যকে মূর্ত করার ক্ষমতা তোমার অপরিসীম। ভিড়ের বাণী তোমার কথায় প্রবিষ্ট হয়ে সত্যের চিত্রণে নিজের ছাপ ফেলতে পারেনি। সে সময়ে তুমি ভিড় থেকে দূরে ছিলে। কিন্তু আজকাল তুমি যা কিছু লিখছ, তা পড়ে ভয় হয় যে, আমি শেষে আবিস্কার না করে ফেলি যে, ভিড়ের বোঝা তোমার লেখনীকে তোমার অজান্তে ভারী করে তুলেছে। সে যে কত বড় ক্ষতি, আমি বোধ হয় তা নিজের চোখে দেখতে পর্যন্ত পারব না।

'তোমার নাটক সম্বন্ধে যে পরিপ্রেক্ষিতের কথা আমি বলেছি তা নাটকের গল্প সম্বন্ধে। তুমি গল্পে যা বলতে চেয়েছ তা যদি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বলতে, তাহলে ভাষা এবং ঘটনায় তা অন্যরূপে প্রকাশ পেত। আসল কথা তাই থাকত তবে স্বরূপ বদলে যেত। শিল্পে বস্তুর সঙ্গে যখন রূপের সামঞ্জস্য ঘটে তখনই তা সত্য। তোমার নাটক সম্বন্ধে যে অভিমত আমি ব্যক্ত করেছি তা যদি তোমার সঙ্গত না মনে হয়, মন থেকে তা দূরে সরিয়ে ফেল। তোমার সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজের মনে। যদি সে আদর্শকে তুমি রক্ষা করে থাক, তাহলে বলার কিছু নেই। তবে চোখ ঝলসানো ভিড়ের প্রলোভনে যদি তোমার লেখনী বিকৃত হয়, বড় চিন্তার ব্যাপার।

'আজকাল আমি কলকাতাতেই আছি, যদি কোনদিন দেখা হয় তাহলে সামনাসামনি

১ মার্চ,১৯২৭

আলোচনা হতে পারে।'[১]

শরৎচন্দ্র নাট্যকার ছিলেন না, কিন্তু তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ বাংলার রঙ্গমঞ্চের দুর্দিনে বড় সাহায্য করেছিল। দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ শরতের ক্ষমতার অনর্থক প্রশংসা করেননি। রচনার জনপ্রিয়তা ও নাটকীয় তথ্যের প্রাধান্য, পারিবারিক পরিবেশ, পাত্রপাত্রীদের মধ্যে আতত্মীয়তা, সামাজিক কুরীতির ওপর আঘাত, বাস্তববাদী অন্তর্দৃষ্টি, প্রসাদগুণ, প্রাঞ্জল সরল অন্তরস্পর্শী ভাষা—এ সকলই তো তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন। এত গুণের মধ্যে একটি দারুণ বৈগুণ্য ছিল তাঁর হৃদয়ের অসাধারণ মহত্ত্ব অর্থাৎ ভাবপ্রবণতার প্রাধান্য। এই কারণেই গল্পের চরম পরিণতি শেষ পর্যন্ত ন্যায়সংগত হতে পারেনি। শরতের নাটকগুলির মধ্যে 'ষোড়শী' সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। নাটকটির গঠনকৌশল নিখুঁত এবং কথোপকথনে মাধুর্য আছে। তবে অন্যান্য নাটকগুলি তেমন সফল হয়নি।

অনেক বছর আগে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিরাজ বৌ'-এর নাট্যরূপান্তর করেন এবং অভিনয় করান স্টার থিয়েটারে । তবে ঐ নাট্যরূপান্তর করার সঙ্গে শরতের কোনও সম্পর্ক ছিল না। তেমনি দেবনারায়ণ গুপ্ত 'রামের সুমতি'-র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, তাও খুব সাফল্যলাভ করে। 'পল্লীসমাজ'-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তাঁর প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। আর্ট থিয়েটার কর্তৃক এটি স্টার রঙ্গমঞ্চে প্রযোজিত হয়।[২] পরে এর পরিবর্তিত সংস্করণ 'রমা'[৩] নামে প্রকাশিত হয়।[৪] রমা'নাটকটির জন্য শরৎচন্দ্র খুব পরিশ্রম করেছিলেন। শিশির ভাদুড়ী এই পরিবর্তিত রূপে এটিকে নাট্যমন্দিরে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছিলেন।

'আঁধারে আলো' শরৎচন্দ্রের একটি অসাধারণ গল্প। অনেক বছর আগে এই গল্পটিকে ভিত্তি করে একটি নির্বাক চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছিল[৫]। সবাক চলচ্চিত্রের প্রচলন তখনও হয়নি। সেটি নির্মিত হবার সময়ে শরৎবাবু তাতে আগ্রহ নিয়েছিলেন। এই ফিল্ম্‌টি নিয়ে খুব আলোচনা হয়েছিল। অনেকেই গদগদ হয়ে এর প্রশংসা করেছিলেন। হিন্দি লেখক ইলাচন্দ্র যোশীও এই ফিল্মটি দেখেছিলেন। যখন তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার ফিল্ম্‌ কেমন লেগেছে, সত্যি করে বলবে?'

যোশীজী সংকোচের সঙ্গে ধীরে ধীরে উত্তর দেন, 'কোন ভালো সাহিত্যিকের গল্পের স্পিরিটকে যথার্থ নিখুঁতভাবে তুলে ধরা খুবই কঠিন। কোন বিদেশী ফিল্মও এখনো পর্যন্ত তেমন সফল হয়নি। তাই উচ্চমানের সাহিত্যিক শিল্পের মাপকাঠিতে এর বিচার করা উচিত নয়। তা যদি করেন, তাহলে"আঁধারে আলো"-র ব্যাপারে খুব নিরাশ হতে হবে। কিন্তু আমার অভিযোগ অন্য কথা নিয়ে।'

কৌতূহলী হয়ে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্‌ কথা?'

'ফিল্ম্‌ নির্মাতারা আপনার এ গল্পটিকে কেন ফিল্মের উপযুক্ত মনে করল? সাহিত্যিক দৃষ্টিতে এর চেয়ে অনেক ভালো গল্প আপনার আছে, যেগুলি ছবি করলে চলচ্চিত্রের পক্ষে আরও উপযুক্ত হ'ত।'

'সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে "আঁধারে আলো" তোমার ভালো লাগেনি?'

'ভালো লেগেছে। কিন্তু আপনার সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্য, শিল্পের যে বিকশিত রূপ তা এতে নেই। গল্পে অবাস্তবতা, কৃত্রিমতা ও অপরিপক্বতার চিহ্ন সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনে হয়, এটি আপনার প্রথম বয়সের লেখা।'

---

১ ১১ মার্চ, ১৯২৮
২ ৩ অগাস্ট, ১৯২৮
৩ অগাস্ট, ১৯২৮
৪ ৪ অগাস্ট, ১৯২৮
৫ ১৯২৩

'না, তোমার এ ধারণা একেবারেই ভুল। পরিপক্ব জ্ঞানবুদ্ধি ও বিকশিত লেখনীশক্তির সাহায্যেই "আঁধারে আলো" লিখেছি।'

যোশীজী অবাক হয়ে বললেন, 'আচ্ছা! আমি ভেবেছিলাম যে, "দেবদাস"-এর আগে হয়তো আপনি ওটা লিখেছিলেন।'

'কিন্তু তুমি তো বললে না যে, গল্পের মধ্যে অপরিপক্বতা এবং কৃত্রিমতা তুমি কোথায় দেখতে পেলে?'

ইলাচন্দ্র যোশী বিস্তারিত আলোচনা করে সবরকমে গল্পটিকে অমনোবৈজ্ঞানিক এবং অবাস্তব প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ শরৎ গম্ভীরভাবে কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'তুমি এ আশা কেন করছ যে, উপন্যাসের সত্য জীবনের বাস্তব সত্যের মতোই হওয়া উচিত। তুমি কী চাও যে উপন্যাস শুধু জীবনের অবিকল ফোটো হয়ে যাক? সম্ভাব্য সত্যের জন্য উপন্যাসে স্থান রাখা দরকার এবং কোনো বিশেষ আদর্শকে দেখাতে গেলে যদি বাস্তবকে ভাঙতে মোচড়াতে হয়ই তো তা কোনোমতেই অনুচিত নয়। আমার এই ধারণা।'

যোশীজী বলেন, 'আদর্শের বিরোধ আমি করছি না। আমি একথাও মানতে চাই না যে, কোনো গল্প বা উপন্যাস শুধু জীবনের অবিকল ফোটো হোক। কিন্তু যে- আদর্শ বাস্তবের ওপর অধিষ্ঠিত নয়, আজকের জীবনে আমি তার মূল্য স্বীকার করতে রাজী নই। এই জন্য রাশিয়ার আদর্শবাদী শিল্পীরা বাস্তবকে বড় সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করেছে। আদর্শবাদী হওয়া সত্ত্বেও টলস্টয় জীবনের প্রত্যক্ষ সত্যকে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বীকার করেছেন। "জোলা"-র মতো প্রকৃতিবাদী শিল্পীদের আমি বিশেষ মর্যাদা দিই না। তারা জীবনের ভালো-মন্দ সব-কিছুকে হুবহু তুলে ধরাই নিজের কর্তব্যের ইতি মনে করেন। আর সেই চরিত্র বা ঘটনা-চিত্রণকে আদর্শ স্থাপনার সাধন মনে না করে নিজের সাধ্যসম্পন্ন কাজ বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু আদর্শ স্থাপনার জন্য জীবনের বাস্তব পরিপূর্ণতা আবশ্যক, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কিন্তু খুব শান্তভাবে বলেন, 'তোমার এই দৃঢ় বিশ্বাসকে খণ্ডন করার একটুও ইচ্ছে এক্ষুণি আমার মনে জাগছে না, এর কোন উপযুক্ত তর্কও ভেবে পাচ্ছি না কিন্তু এটুকু তোমায় আমি বলতে চাই যে, বাস্তববাদী লেখকের টেকনিক আমি কোণদিনই গ্রহণ করব না। তা আমার স্বভাবের অনুকূল নয়। আমার অভীষ্ট সে-ধরনের জীবনের চিত্রণ বা আদর্শ স্থাপনা উপযুক্তও নয়।'

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ যোশীজী আর বেশি বাড়াননি। উচিতও ছিল না। কিন্তু তাঁর অভিযোগ সত্য ছিল। 'আঁধারে আলো' গল্পে এক বেশ্যার হৃদয় পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা অত্যন্ত আকস্মিক ও অবাস্তব। ছোট্ট একটি গল্পে পরস্পরবিরোধী ভাবের প্রস্ফুটন এমনভাবে করা হয়েছে যে, তা অতিনাটকীয় মনে হতে পারে। বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য খুবই চেষ্টার প্রয়োজন ছিল, তাই বিস্তারিত বিশ্লেষণের অভাবে তা সহজ ও সরল হতে পারেনি। ছোট গল্প শরৎচন্দ্র অপেক্ষাকৃত কম লিখেছেন। তাঁর প্রতিভার বাস্তবসম্মত ক্ষেত্র হল উপন্যাস।

নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে 'আঁধারে আলো' ছাড়া 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', এবং 'স্বামী' চলচ্চিত্রায়িত হয়। মনে হয় পনেরো বছরের চুক্তিতে মডার্ন থিয়েটারকে তিনি কয়েকটি গল্প চলচ্চিত্রায়িত করার অধিকারস্বত্ব বিক্রি ক'রে দিয়েছিলেন।[১]

১ ডিসেম্বর, ১৯২৫, নির্মলচন্দ্রকে লেখা চিঠি।

নারীর প্রতি শরতের দৃষ্টিভঙ্গি শরৎ সাহিত্যের মেরুদণ্ড। বারবার তিনি নিজের এই দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। খ্যাতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনেক সভাসমিতিতে যেতে হত এবং সেসব জায়গায় প্রায়ই এসব প্রশ্ন তাঁর সামনে উপস্থাপিত হত। রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পৌরোহিত্য করার জন্য শরৎচন্দ্র মেদিনীপুরে যান।[১] সেখানে তাঁর সম্মানে আয়োজিত একটি বৈঠকে কোনও একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা শরৎবাবু, সতীত্বই তো নারীত্ব। আপনি এ দুটিতে প্রভেদ করেছেন কেন?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আপনাদের একটা গল্প শোনান দরকার। আমাদের গ্রামে একটি বাল্যবিধবা ছিল। গ্রাম সম্পর্কে সে ছিল আমার বড় বোন। দুর্ভাগ্যবশত, বিয়ের কিছুদিন পরেই তার স্বামী মারা যায়। বিধবার বেশে বাপের বাড়িতে সে ফিরে আসে। ভাই বোন কেউই ছিল না। মা–বাবা চিরকাল কারো বেঁচে থাকে না। মেয়েটির যখন তিরিশ বা বত্রিশ বছর বয়স, মা বাপ দুজনেই মারা যান। তারপর থেকে মেয়েটি একাই বাড়িতে থাকত। তার সেই মাটির বাড়ির চারিদিকে উঁচু পাঁচিল ছিল। আসা–যাওয়ার জন্য উঠানের একদিকে একটাই দরজা ছিল। সন্ধে হতে–না–হতেই সে দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যেত।

'সে–গ্রামে এমন একটি বাড়িও ছিল না যেখানে বোনের সম্মান বা আদরের কোন অভাব ছিল। তার কারণ, লোকের রোগে শোকে দুঃখে নাওয়া–খাওয়া ভুলে প্রাণ দিয়ে সে সবার সেবা করত। তার মতো পরিশ্রমী বড় একটা দেখা যায় না। গাঁয়ের প্রতিটি লোক ছিল তার কাছে উপকৃত।

'বোনের বাড়ির উঁচু পাঁচিলের গা ঘেঁষে একটা জাম গাছ ছিল। ভাবলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই গাছে চড়ে ভূতের মত নাকিসুরে এমন ভয় দেখাতে হবে যাতে সারা জীবন তার মনে থাকে।

'নির্দিষ্ট সময়ে গাছের ওপর চড়ে বসলাম। সেখান থেকে বোনের বাড়ির ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যেত। সুযোগ বুঝে নাকিসুরে যেই ডেকেছি, অমনি দেখলাম যে, একটা লোক তড়াক করে লাফ দিয়ে খাটের ওপর থেকে নীচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

'এরপর বোনের প্রতি আমার কি ধারণা হওয়া উচিত? আপনারা বলতে পারেন বোনের সতীত্ব বলে কিছু নেই, আমি তা স্বীকার করছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই সঙ্গে তার নারীত্বও লুপ্ত হয়ে গেল। মানুষের দুঃখে, শোকে, রোগে, যন্ত্রণায়, দিনরাত সেবা ক'রে দীন দুঃখীদের দানধ্যান ক'রে সারা জীবন যে মহত্ত্বের পরিচয় সে দিয়েছিল, তার কি কোন স্বতন্ত্র মূল্য নির্ধারণ করা উচিত নয়? নারীর দেহটাই সব? তার অন্তর বলে কি কিছু নেই? সেই বাল্যবিধবাটি যৌবনের দুঃসহ তাড়নায় নিজের দেহ পবিত্র রাখতে পারেনি বলেই কি তার অন্তরের সব গুণ মিথ্যে হয়ে যাবে? মানুষের যথার্থ রূপ কি তার দেহের আবরণে? না তার অন্তরের আচরণে? আপনারাই বলুন। তাই সতীত্ব ও নারীত্বকে পৃথক করতে আমি বাধ্য হয়েছি।'

প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিম শরৎ সমিতিতে শরৎচন্দ্রের ৫৩তম[২] জন্মদিন উপলক্ষে একটি অভিনন্দনের আয়োজন করা হয়। অভিনন্দন সভায় শরৎ বলেন, 'সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, একথা একদিন বলেছিলাম, সেজন্য গালমন্দও কম শুনতে হয়নি। লোকে যেন ক্ষেপে উঠেছিল। অত্যন্ত সতী নারীকেও আমি চুরি বাটপাড়ি করতে ও মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে দেখেছি।

'সতীত্বের সংজ্ঞা চিরদিন এক থাকতে পারে না। আগেও ছিল না, ভবিষ্যতেও বোধহয়

১ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪
২ ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮

কোনদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব একই জিনিস নয়, একথা যদি সাহিত্যে স্থান না পায়, সত্যকারের সাহিত্য কেমন করে বাঁচবে?'

কয়েকবছর আগে ইলাচন্দ্র যোশী ভারতীয় নারীর সতীত্বের আদর্শ জানতে চেয়ে শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠি লেখেন। তখনও একথাই তিনি বলেন, 'মানবধর্মকে আমি সতীধর্মের চেয়েও বড় বলে মনে করি। সতীত্ব ও নারীত্ব, এই দুটি আদর্শ এক না। নারীমনের মঙ্গলময়ী করুণা, তার জন্মগত মাতৃপীড়া, তার সতীত্বের চেয়ে অনেক বেশি মহত্ত্বপূর্ণ। এমন অনেক নারীকে জানি, পরপুরুষের সঙ্গে যাদের কোনদিন শারীরিক বা মানসিক সম্পর্ক ঘটেনি, তবুও তাদের স্বভাবে অত্যন্ত নীচতা, ঘোর সঙ্কীর্ণতা, বিদ্বেষ এবং চৌর্যবৃত্তি দেখা যায়। আবার, ঠিক এর উলটো এমন পতিতা মেয়েদের আমি জানি, যাদের মনে মাতৃহৃদয়ের নিঃস্বার্থ মমতা এবং করুণার ধারা অজস্র ধারায় উপচে পড়ছে।' [১]

যোশীজী জিজ্ঞেস করেন, 'যদি তাই হয়, তাহলে "শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বে আপনি অন্নদা দিদির সতীত্বের মহিমা এমন সোচ্চারে বর্ণনা করেছেন কেন–যার দীপ্তিতে অন্যান্য সব চরিত্র ম্লান হয়ে গেছে?'

একথা শুনে শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বলেন, 'তোমার একথা আমি মানি। অন্নদাদিদির ওপর সত্যি আমার ভারি শ্রদ্ধা ছিল। যাই হোক না কেন, আসলে আমার আজন্মের সংস্কার তো ভারতীয়। তবু আমি বলতে চাই, অন্নদাদিদির একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যকে আমি ততটা শ্রদ্ধা করিনি, বরং তাঁর প্রেমপ্লাবিত আত্মার মুক্তপ্রবাহ দেখে ভক্তি না করে আমি পারিনি।'

শরৎচন্দ্র নিজের সমগ্র সাহিত্যে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পুরুষের তৈরি শাস্ত্রের মিথ্যে জাল শুধু নারীকে বেঁধে রাখার জন্য। যে কোন রকমে তাকে বন্ধনের মধ্যে রেখে তার কাছ থেকে প্রচুর সেবা যত্ন ভোগ করার লালসায় পুরুষেরা শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছে। সতীত্বের মহিমা শুধু মেয়েদের বেলায়? পুরুষের জন্য কোনো বাধা নেই! এ মিথ্যা, ঠকানো। যোনি পরীক্ষার দ্বারা নারীর যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পাওয়া অসম্ভব।

তিনি বারংবার প্রশ্ন করেছেন, নারী জীবনের সার্থকতা কোথায়? মেয়েদের শরীরে কি আত্মা নেই? সে কি পৃথিবীতে শুধু পুরুষের সেবাদাসী হয়ে থাকতে এসেছে? [২]

'শেষপ্রশ্ন'–এর কমলও বলেছে, 'সমস্ত সংযমের মত যৌন সংযমও সত্য, তবে তা গৌণ সত্য। তাকে সর্বস্ব মনে করা এক ধরনের অসংযম এবং তার শাস্তিও পেতে হয়। আত্মনিগ্রহের উগ্রদম্ভে আধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হয়ে পড়ে।'

তথাকথিত পতিতা নারীদের তিনি এমন সম্মান দিয়েছিলেন যে, অত্যন্ত কলুষিত মনের ব্যক্তিও তার সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তার মধ্যে দেখা দেয় নিজেকে সংশোধন করার প্রবৃত্তি। রূপকার শুধু আকার এবং রূপকেই উদ্ভাসিত করে না। বরং অন্তরকেও অনুরঞ্জিত করে।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা মেয়েদের মানুষ হতে দিইনি। স্বরাজ পাবার আগে দেশবাসীদের সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। নিতান্ত স্বার্থের খাতিরে যেদিন থেকে দেশ তাদের সতীত্বকে বড় করে দেখেছে, তার মনুষ্যত্বের দাম দেয়নি, সে–ঋণ আগে পরিশোধ করতে হবে।' [৩]

'স্ত্রীলোককে কখনও আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরং ঠকাও ভালো, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই। বহুদিন থেকেই যেন নারীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা নিজেরাই ভুলে গিয়েছিল। নীরবে মুখ বন্ধ করে সবরকম নির্যাতন সয়ে এসেছে। বুক ফেটে গেছে,

১. মার্চ, ১৯২২
২. 'স্বামী' গল্প
৩. 'স্বদেশ সাধনায় নারী'

তবু মুখ ফোটেনি। এর প্রতিকার যে দরকার, সে-অনুভূতিও তারা হারিয়ে ফেলেছিল।'

নারীমনের এই বেদনা শরৎচন্দ্র অন্তর দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি স্বীকার করেছেন যে, নারীর প্রতি পুরুষ কোনদিনই ন্যায্য আচরণ করেনি। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে নারীজাতির পক্ষ সমর্থনে তিনি লেখেন, 'যে-ধর্মের ভিত আদম জননী ইভের পাপের ওপর দাঁড়িয়ে, আর যে-ধর্মে পৃথিবীর সমস্ত অধঃপতনের মূল নারী, সে-ধর্মে যারা বিশ্বাসী, তারা কোনদিনই নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে না। যেটুকু সম্মান সে দেখাবে, তা নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি—সে শ্রদ্ধাই হোক বা ন্যায্য অধিকারই হোক, তা আজ থেকে হাজার বছর আগেও পুরুষ তাকে দেয়নি, হাজার বছর পরেও দেবে না।'

এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন, 'স্বামী নারীর পূজনীয় ও গুরুজন ব্যক্তি, কিন্তু সেই কারণে স্ত্রী তার দাসী নয়। এই কুসংস্কার নারীকে যত ছোট করেছে, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ করেছে, তার আর তুলনা নেই।'[১]

এক বন্ধুর স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন, 'দিদি, পুরুষজাতি তোমাদের সাথে অন্যায় করেছে। তাদের বিরুদ্ধে চিরদিন আমি লড়াই করব।'

সত্যিই নারীজাতির হয়ে সমাজ ও দেশের সঙ্গে চিরদিন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। তাই নারীর চোখে তিনি 'প্রফেট'। বাংলার নারীরা তাঁকে অভূতপূর্ব অভিনন্দন জানিয়েছিল। তাঁর ৫৭তম জন্মদিবস[২] উপলক্ষ্যে অভিনন্দন পত্র দেওয়ার সময়ে গদগদচিত্তে তারা বলেছিল, 'পরাধীন দেশের অধঃপতিত সমাজের অসহায়া অন্তঃপুরচারিণীর হৃদয়ের মূক আনন্দ ও বেদনাকে তুমি ভাষা দিয়েছ। তাদের দুর্গতিময় জীবনের সুখদুঃখের সকল অনুভূতিকে নিবিড় সহানুভূতির সঙ্গে সাহিত্যে সত্য বলে সকলের চোখের সামনে প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরেছ। তোমার অনাবিল্ট দৃষ্টি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, সুগম্ভীর উপলব্ধি বিচিত্র মানবচরিত্রের অতলস্পর্শী অভিজ্ঞতা, নিখিল বিশ্বের নারীচরিত্রের নিগূঢ় প্রকৃতির গোপন ঠিকানা যেন খুঁজে পেয়েছে। হে নারীচরিত্রের পরম রহস্যজ্ঞাতা, আমরা তোমার বন্দনা করি।

'সবরকম অসম্মান ও হীনতার মধ্যেও নারীর প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য তা সব দেশে সব কালে সব সমাজে চিরদিনই বিদ্যমান। তুমি তার অকৃত্রিম এই রূপকে চিনতে পেরেছ। নারীচরিত্রের প্রকৃত সত্যের সঙ্গে তোমার নিবিড় পরিচয় ঘটেছে। হে নারীমনের অন্তর্যামী, আমরা তোমার বন্দনা করি।

'আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা তোমায় সম্মান জানাবার জন্য মিলিত হয়েছি। আমরা তোমায় শ্রদ্ধা করি। তোমায় ভালোবাসি। তোমায় আমরা আপন মনে করি। হে নারীর পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু! তুমি আমাদের পরম প্রিয়, পরম আত্মীয়, আমরা তোমায় বন্দনা করি।'

এমন প্রশংসা বোধহয় কদাচিৎ কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে জোটে। শরতের নারী বাংলার হয়েও শিল্পের দৃষ্টিতে কোন গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আবহাওয়া ও পরিবেশ সৃষ্টির সময় শরৎচন্দ্র বাঙালী, কিন্তু জীবনের রস পরিবেশনের সময় তিনি যথার্থ শিল্পী। শরতের জননী বাংলার জননী, কিন্তু তার প্রেয়সীর পরিবেশ সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত। যে-ব্যথা ভোগ করেছেন, যে-অপমান লাঞ্ছনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তা বিশ্বের প্রতিটি নারী কোন-না-কোন রূপে চিরদিনই সয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে বিধবা বিবাহের পরিণাম মারাত্মকভাবে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ নারীকে কেবল স্নেহই দিয়েছেন। একমাত্র শরৎচন্দ্র নারীকে সহানুভূতি দেখিয়েছেন। এ সহানুভূতি দেখানো নয়। শরৎ-সাহিত্যে বিধবার বিয়ে কোথাও নেই। 'পণ্ডিতমশাই'-এর কুসুম তো এমন লোকেদের কুকুর বেড়ালের সামিল মনে করে, 'পথনির্দেশ'-এর হেম বার বার বিধবা-বিবাহের নিন্দে করেছে, কিন্তু তার সপক্ষে দলিল কিছু কম নেই। গুণেন্দ্র বলেছে, 'এক হিন্দু

---
১. ২৯ জুলাই, ১৯১৯
২. ১৯৩২

ছাড়া পৃথিবীর সব জাতির মধ্যেই তো বিধবা-বিবাহের প্রচলন আছে।' এমন কি ছেলেবেলার রচনা 'শুভদা'-য় যখন সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন ? বিধবাকে কি বিবাহ করিতে নাই ?' মালতী বলেছে, 'বিধবাকে বিবাহ করিতে আছে, কিন্তু বেশ্যাকে নাই।' অনুপমার পিতা তো একথাই বলেছেন, 'অনেক ভেবে দেখলুম, দু'বার বিবাহ দিলেই ধর্ম যায় না। বিবাহের সঙ্গে ধর্মের সঙ্গে এ বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই, বরং নিজের কন্যাকে এমন করে খুন করলেই ধর্মহানির সম্ভাবনা।'

কিন্তু অনুপমা নিজেই রাজী হয়নি, অর্থাৎ শরৎ রাজী হননি, কারণ সমাজ রাজী ছিল না। তবুও শরৎ মানতেন, নারীর দাসত্ব মানে মানবিক অধিকারের হনন, কিন্তু আন্দোলনের স্বর তো হৃদয়ের অন্তস্থল থেকেই ওঠা উচিৎ। সমাজ যদি বাঁচতে চায় তো হৃদয়ের গুণ নিয়েই বাঁচতে হবে। তাই সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর সাহিত্যে তেমন সুখের হয়ে ওঠেনি। 'শেষপ্রশ্ন' ও 'শ্রীকান্ত'(দ্বিতীয় পর্ব)-এর অভয়া ব্যতিক্রম মাত্র। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, পাঠকের মনে বিদ্রোহের অনিবার্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতির চিত্রণে শরৎ নিশ্চয়ই সফলকাম। তিনি বার বার বলেছেন, বিধবা হওয়া নারী জীবনের চরম হানি এবং সধবা থাকাই যে চরম সার্থকতা-এ দুটির কোনটিই সত্য নয়।

'শাস্ত্রে' বিশ্বাস করলেও হৃদয়ের মূল্যকে শরৎ শাস্ত্রের চেয়ে বেশি মনে করেছেন। কমল বিবাহকে সংসারের অনেক ঘটনার একটি ঘটনা মনে করে। এও মনে করে, বিবাহ যেদিন নারীর সর্বস্ব হয়ে উঠেছে, সেদিন থেকেই তার দাসীজন্ম শুরু হয়েছে। মনে যদি ভালোবাসা না থাকে, তাহলে মন্ত্রপড়া বিয়ে বিড়ম্বনা ছাড়া কিছু নয়। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে তিনি যেন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, 'এমন একটা সময় একদিন আসবে, যখন ভালোবাসার সাহায্যে দুজনের এক হওয়া বেশি মূল্যবান হয়ে উঠবে, এবং আইনতঃ দুজনের বৈবাহিক সম্বন্ধ গঠন হয়ে যাবে।'

শরৎ-সাহিত্যে প্রিয়া জায়া, জননী, পতিতা, বিপ্লবী-সবই দেখতে পাওয়া যায়। বাইরে থেকে এক মনে হলেও তারা সবাই কিন্তু এক নয়। রাজলক্ষ্মীর দুঃখ এত রহস্যময় ও গূঢ় যে তাকে বোঝা যেন অসম্ভব। তার অন্তর্বিরোধ ও দ্বন্দ্বই সার্থকতা। রাজলক্ষ্মীর বিষাদের মধ্যে শিল্পীর চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। যারা ভালোবাসা পেয়েছে, সুখ পেয়েছে, তারা কারুর হৃদয়কে উদ্বেলিত করতে সক্ষম হয়নি। সক্ষম হতে পেরেছে রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, পার্বতী। অন্নদা ও মৃণাল স্বামীকে ভালোবেসে শুধু যাতনা ও মনোকষ্ট পেয়েছে। অচলা দরিদ্র মহিমকে একনিষ্ঠ ভালোবাসা দিতে পেরেছিল, কিন্তু তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য তাকে দরিদ্র পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে দেয়নি। অনিচ্ছা ও অজান্তে সে সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তবু শেষ পর্যন্ত একথা বলার সাহস অচলার আছে, 'চিঠি লিখলে তুমি জবাব দেবে ?'

ভোলা যায় না অভয়াকে। শরৎ সাহিত্যে অভয়া মাত্র একটিই। সতীত্ব ও নারীত্ব যে এক জিনিস নয়, শরতের এ বিশ্বাসের সে জীবন্ত প্রতীক। সে এই সত্যেরই প্রতীক যে, স্ত্রী-পুরুষের মিলন ততক্ষণই সত্য, যতক্ষণ তা থেকে স্বামী-স্ত্রীর প্রসন্নতার কারণ সৃষ্টি হতে থাকে। যে-ক্ষণটিতে লাভের চেয়ে ক্ষতির পাল্লা ভারী হয়ে যায়, স্বামী যখন একমাত্র বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকারকে কেড়ে নেয়, সেই ক্ষণটিতে তাদের মিলনের সত্য আপনা থেকেই শেষ হয়ে যায়। অভয়া প্রেমিকের জন্য অত্যাচারী স্বামীকে শুধু যে ত্যাগই করেছে তাই নয়, একথা বলারও তার সাহস আছে, 'এমন লোকের সারা জীবনটা পঙ্গু করে সতী সাজতে আমি চাই না, শ্রীকান্তবাবু। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, আমাদের নিষ্পাপ প্রেমের সন্তান পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে কোন অংশে ছোট হবে না। তার মা তাকে এ-শিক্ষা দিয়ে যাবে যে, তার জন্ম সত্যের সাহচর্যে। সত্যের চেয়ে বড় অবলম্বন পৃথিবীতে আর কিছু নেই। এ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তার পক্ষে কঠিন।'

১ পরিচ্ছেদ ১৮, দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

'আমার স্বামীও তো আমার সঙ্গে একই মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তবু সে তো নিতান্তই অর্থহীন হয়ে গেল, সে মন্ত্রশক্তি তো তাঁর উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে বেঁধে রাখতে পারল না। আমি মেয়ে বলে কি সব বন্ধন, সব দায়িত্ব শুধু আমার একার?' এ প্রতিবাদ শুধু বাংলার নারীর নয়, এ স্বর শাশ্বত নারীর। শরতের সবচেয়ে দুর্বল নারী হল বিপ্লবী নারী, সে শুধু ভাবনা ও চিন্তার প্রতিমা। রক্তমাংসের সহজ সুখ-দুঃখময়ী নারী সে নয়। শরতের শক্তিময়ী নারী হল পতিতা। শরৎ এদের শুধু সহানুভূতিই দেননি, তার অন্তরে লুকোনো নারীকে মর্যাদাও দিয়েছিলেন। প্রেমিকের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করার সাহস জুগিয়েছেন। চন্দ্রমুখী বলেছে, 'রূপের মোহ তোমাদের চেয়ে আমাদের অনেক কম, তাই তোমাদের মত আমরা উন্মত্ত হয়ে উঠি না।'

নারীর প্রতি শরতের যে সহানুভূতি তা মৌখিক ব্যাপার ছিল না। ব্যবহারিক জীবনেও নারীর প্রতি তাঁর মন বড় সংবেদনশীল ছিল। ইলাচন্দ্র যোশী লিখেছেন, 'সাধারণের থেকেও সাধারণ যে মহিলারা তাঁর সম্পর্কে আসেন, সবার প্রতি শরতের মনে করুণা, সংবেদনশীলতা ও সহৃদয়তা দেখা গেছে। কখনও কোন নারীর অর্থ বা তার ভালমানুষীর ও বিবশতার সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে কোনরকম অনুচিত ব্যবহার করার প্রবৃত্তি পর্যন্ত শরতের মনে উদয় হয়নি। শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার দরুন তাঁকে আমি যতটুকু চিনেছি এবং বুঝেছি, তার দাবীতে আমি একথা বললাম।'

অসহায়া নারীদের তিনি কেবল অর্থসাহায্যই করেননি, বরং কয়েকজনকে নিজের বাড়িতেও স্থান দিয়েছিলেন। শিবপুরের প্রতুল মুখার্জী নামে একটি ছেলেকে তিনি অনেকদিন থেকে চিনতেন। আত্মীয়স্বজনের প্রচণ্ড অমতে সে দুর্গা দেবী নামে একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে। অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে কিন্তু বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেই শরৎচন্দ্র দুর্গা দেবীকে কিছুদিন পর্যন্ত নিজের বাড়িতে রাখেন ও তাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেন।

শরৎচন্দ্রের নিজের বিবাহ কি এসবের মস্ত বড় একটা প্রমাণ নয়? খ্যাতির শীর্ষে উঠেও তিনি তথাকথিত দুশ্চরিত্র সেইসব রমণীদের ভুলে যাননি, যাদের বাড়িতে রেঙ্গুন থেকে এসে থাকতেন। তাদের সঙ্গে শরৎকে কথা বলতে দেখে অনেক বন্ধুরা লজ্জা পেতেন।[১]

সেদিন শরৎ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে জোড়াসাঁকো থেকে ফিরছিলেন। বেশ দেরি হয়ে যাওয়াতে কবি কাউকে বলেছিলেন, 'যাও, শরৎকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এস।' পথে নেমে শরতের মনে হল যে, বহুক্ষণ একভাবে বসা গেছে, এবার একটু হাঁটা দরকার।

শরৎ এবং সঙ্গের লোকটি কথা বলতে বলতে অন্য এক পাড়ায় এসে পড়লেন। হঠাৎ একটি স্ত্রীলোক পিছন থেকে ডাক দিল, 'দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর!'

শরৎচন্দ্র চিনলেন—পাঁচুর মা। কাছে এসে প্রণাম করে পাঁচুর মা বলল, 'আজ আমার কী সৌভাগ্য যে দাঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আপনি বড্ড ইয়ে। আমাদের একেবারেই ভুলে গেছেন। বলো তো, কতদিন এদিকে আসোনি? আজ আমি কিছুতেই যেতে দেব না। আমার বাড়ি গিয়ে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।'

সঙ্গের লোকটি অবাক হয়ে তাঁদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। শরৎচন্দ্র তাকে বললেন, 'এবার আপনি যেতে পারেন। ধরা যখন একবার পড়েছি, ছাড়া পাওয়া মুশকিল।'

লোকটি ফিরে যেতে শরৎচন্দ্র পাঁচুর মায়ের সঙ্গে পাঁচুদের বাড়ি গেলেন। ছেলেমেয়েদের দল নিমেষের মধ্যেই তাঁকে ঘিরে হল্লা করতে লাগল—'কি মজা! দাঠাকুর এসেছেন। দাঠাকুর এসেছেন!' কোনমতে তাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখেন যে, সাতবছরের পাঁচু বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' খুলে মুখ নিচু করে বসে আছে।

শরৎচন্দ্র বললেন, 'পাঁচুর মা, তোমার ছেলে অমন মুখ করে বসে আছে কেন? পড়তে হচ্ছে, বোধহয় সেই জন্যে, না?' পাঁচুর মা বলল, 'দেখুন না, দাদাঠাকুর—কবে থেকে বলছি, কাজ

১ এই ধরনের একটি ঘটনার কথা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লেখককে বলেন।

স্কুলে যেটুকু পড়ানো হয়েছে, বাড়িতে বসে ভালো করে পড়ে নে, তবে না মাস্টার মশায়কে পড়া দিতে পারবি। তা হতভাগা ছেলে কথা কানেই তোলে না। বাড়িতে মাস্টার রেখে পড়াবার মতো পয়সা তো আমার নেই।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি একটু তামাক সেজে আনো। আমি তোমার ছেলেকে পড়াচ্ছি।'

তামাক সেজে এনে পাঁচুর মা আবার বলল, 'দাদাঠাকুর, তুমিই বল, হতভাগা ছেলেকে কত বোঝাই যে, বেশি না পড়িস্ অন্তত প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগটা পড়ে নে। আমি ওকে বলি, এই যে দাদাঠাকুর, শুনতে পাই বই লেখেন। যদি জীবনে আর কিছু করতে না পারিস্ তো প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ পড়ে দাদাঠাকুরের মতো বই লিখে অন্তত পেট চালাতে পারবি। কিন্তু হতভাগা পড়তে চায় না। আপনি একটু ওকে বুঝিয়ে বলুন দাদাঠাকুর। আপনার কথা শুনে যদি বুদ্ধি হয়। ততক্ষণে আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা দেখিগে। তা হয় না, দাদাঠাকুর, কতদিন পরে আজ এলেন। একটু কিছু না খাইয়ে যেতে দেব না।'

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে আব বস্তির সবার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে দিতে সারা দিনটাই কাবার হয়ে গেল।

এই সব কারণেই দুর্নীতিপরায়ণ বলে তাঁর অখ্যাতি লোকেব মন থেকে ঘুচতে চাইত না। তা না হলে উচ্চশিক্ষিতা মহিলা বীণা দেবী সরস্বতীর বাড়িতে লোকেরা তাঁকে এভাবে লাঞ্ছিত করত না। বীণা দেবী লেখিকা ছিলেন, শরৎচন্দ্রকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, প্রায়ই শরতের বাড়ি গিয়ে আলাপ আলোচনাও করতেন। একদিন তিনি শরৎচন্দ্রকে নিজেব বাড়িতে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ কবলেন।

নেমন্তন্নের দিন বীণা দেবীর অল্পশিক্ষিতা এক ননদ মাকে গিয়ে নালিশ জানাল, 'জানো মা, আজ বৌদি কাকে খাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করেছে ? আরে বাবা, সেই যে সেই শরৎ চাটুজ্জে ! এক নম্বরের চরিত্রহীন, নেশাখোর। শুনেছি, বেশ্যাদের বাড়ি দিন রাত পড়ে থাকেন।'

মা টি ছিলেন একেবারে নিরক্ষরা ভট্টাচার্য। শুনে রীতিমত রেগে গিয়ে বললেন, 'বৌমা, এ তুমি কি করেছ ? আমি যদি আগে জানতাম তাহলে মাছ-টাছ আনতে দিতাম না। সে যাই হোক, এ বাড়িতে কোন মতেই তার আসা চলবে না।'

বীণা দেবী মহাবিপদে পড়লেন। অনেক কাকুতি-মিনতি করে শাশুড়িকে বললেন, 'আজকের মত অমত করো না, আর কোনদিন তাঁকে ডাকব না। নেমন্তন্ন করে "না" বলে পাঠালে তাঁকে বড় অপমান করা হবে।"

কিন্তু শাশুড়ি রাজী হলেন না। শেষ রায় জানিয়ে বললেন, 'তুমি এক্ষুণি তাঁকে গিয়ে জানিয়ে এস যে, হঠাৎ শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারেনি।'

অত্যন্ত দুঃখিত মনে বীণা দেবী শরৎচন্দ্রের বাড়ি গেলেন, কিন্তু তিনি মিথ্যে কথা বলতে পারলেন না। চোখের জলে সব সত্যি কথা বলে ফেললেন; এ কথাও বললেন, 'আজ যদি বাড়িতে আমার স্বামী বা ভাসুর কেউ থাকতেন, মাকে বোঝাতে পারতেন। আমার কথা তিনি কিছুতেই শুনতে চাইছেন না।'

হঠাৎ শরৎচন্দ্র খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এ ব্যাপারে তুমি এত দুঃখ পেও না। আমার সম্বন্ধে লোকেরা এই রকমই ভুল করে। না জানি কত কথাই না তারা বলে। তোমার বৌদিকে আমি ধর্মতঃ বিয়ে করেছি, তবু লোকে বলে, সে নাকি আমার রক্ষিতা।'

অন্যদিকে আবার এমন মহিলারাও ছিলেন, যাঁরা শরৎ সম্বন্ধে এ ধরনের ভুল কখনও করেননি। কানপুরের লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অজস্র পত্রবিনিময় হত। লীলারানীর বাড়িতে গিয়ে শরৎচন্দ্র কয়েকদিন কাটিয়েও এসেছিলেন। তাঁর স্বামী খুবই উদারপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। শরৎচন্দ্রের বড় ইচ্ছে ছিল, লীলারানীকে নিরুপমা দেবী করে গড়ে তোলার। একবার নবদ্বীপে তাঁর বাড়িতে বসে সারারাত তিনি তাঁর সঙ্গে গল্প

করেছিলেন। ভোর রাতে বন্ধু চোখ খুলে দেখেন, তখনও দুজনের আলোচনা চলছে। লীলারানী শরৎকে লিখেছিলেন, 'দাদা, একবার দেখা করতে চলে এস।'

অমনি দাদাও দেখা করতে দৌড় দিলেন। লীলারানী তাঁর আদর-আপ্যায়নের বিরাট আয়োজন করেছিলেন। যাবার সময় চোখের জলে আবার আসার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। কী অকপট প্রীতির সম্পর্কই না ছিল দুজনের মধ্যে !

সমাজের সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁর সহজ সম্পর্ক ছিল। তাঁর গল্প পড়ার জন্য তারা লালায়িত হয়ে থাকত। শরতের লেখার ভাব-ভঙ্গিমায় ও চিন্তাধারায় তারা মুগ্ধ। এমন নিঃস্বার্থ, উদার প্রাণ খোলা লোক এর আগে তারা কোথাও দেখেছে? স্ত্রীলোকের এই অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসার জোরেই তো শরৎ তাদের ঠিকমতো চিনতে পেরেছিলেন, তাদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করতে পেরেছিলেন। তাদের মানুষের মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন। মূক নারীর মুখে তিনি ভাষা জুগিয়েছেন, বেশ্যার অন্তরে লুকোনো মানুষের আত্মাকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এত করেও কি তিনি নিজের মনের আদর্শ নারী রাজলক্ষ্মী-কে জীবনে পেয়েছিলেন?এই যে না-পাওয়া এই তো শরৎ সাহিত্যের শক্তি।

১৮

কেবল নারী এবং শিক্ষার্থীরাই নয়, অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরাও কখনো কখনো তাঁর সান্নিধ্য পাবাব জন্য আকুল হতেন। ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজনে সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রাণখোলা গল্প করতেন। শরতের না ছিল নিজেকে রহস্যময় করে তোলার আয়োজন, না ছিল কোন কথা গোপন করার প্রচেষ্টা। মেদিনীপুরে এমনি এক বৈঠকে শরৎ সতীত্ব ও নারীত্ব ছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি সতীত্বের চিরন্তন ধারণার বিরুদ্ধে রিভোল্ট করেছেন। কিন্তু কেন? একথা আমাদের বুঝিয়ে বলুন।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'কোনরকম রিভোল্ট আমি করিনি। এ প্রভাব তো যুগের প্রভাব। কোন ধারণা শুধু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে বলেই তা সত্য হতে পারে না, কোন জিনিসই চিরকালের সত্য হতে পারে না। সতীত্ব পূর্ণ মানবিকতার একটি অঙ্গ মাত্র। মানবিকতার উর্ধ্বে তা নয়। কর্তব্য ও অধিকারের সম্বন্ধ এমনই অবিচ্ছিন্ন যে, একটির অভাবে অপরটি নিরর্থক। সব শাস্ত্র আমার জানা—এ দাবী আমি করছি না। সত্যি বলতে আমার কোন ধর্মই নেই। কিন্তু এ পর্যন্ত যা কিছু আমি দেখেছি তাতে মনে হয় শাস্ত্রে পুরুষের কোন কর্তব্যের উল্লেখ নেই। তাদের শুধু অধিকার দেওয়া হয়েছে। পুরুষের জন্য কোন কিছুই বর্জিত নয়, তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু কোন যুবতী মেয়ের সামান্য পদস্খলন হলে তার মুক্তি পাবার আর পথ নেই। কিন্তু কেন? সমাজে আবার সম্মান ও গৌরবের স্থান কেন সে পাবে না? তার সব পথ কেন বন্ধ করে দেওয়া হবে? মেয়েমানুষের মধ্যে কি হৃদয় বলে জিনিসটা নেই? আমার তো মনে হয় তাদের এত বড় এমন একটা প্রাণ আছে যা গৃহস্থ সংসারের সতী নারীর মধ্যেও দুর্লভ।'

'পুরুষ তো যা খুশি তাই ক'রে নিজেকে পতিত করে। তাই ব'লে সেই একই কারণে আপনি কি মেয়েদেরও পতিত হতে দেবেন?'

'দেওয়ার কি অর্থ হয় এখানে? আমার শুধু এটুকুই বক্তব্য যে, যে-কষ্টিপাথরে পুরুষ নিজেকে খাঁটি বলে প্রমাণ করতে পারবে না, সে-কষ্টি পাথরে মেয়েদের খাঁটিত্বের জোর জবরদস্তি যাচাই করার কি আছে?'

'অন্যায় এবং পাপের প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন করা কি এতই অনুচিত মনে করেন?'

'হয়তো উচিত; কিন্তু মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে এ-চিন্তা আমার পক্ষে কষ্টকর। তারক

---

১ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯

গাঙগুলীর "সরলা" বই-এর প্রমদাকে দেখুন। অত বড় স্কাউন্ড্রেল বড় একটা দেখা যায় না, তবুও আপনাদের সনাতন মানদণ্ডে সে সতী নারী। দৈহিক শুচিতা কি এতই বড় গুণ যে, স্বামী জেলে গেলেও স্ত্রী তাঁকে বাঁচাবার জন্য গায়ের গয়না খুলে দেবে না, টাকা পয়সা বার করবে না, তবুও সে সতী? তার সে সতীত্বের কি মূল্য, তা আমি বুঝতে পারি না।'

'পাপের ভয়ঙ্কর পরিণামের বীভৎস রূপকে চিত্রিত করা কি কর্তব্য নয়, যা দেখে মনে ভয় হবে, আতঙ্ক হবে? পাপের ভয়ের প্রয়োজনকে আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন?'

'ভয় দেখালে কতখানি উদ্দেশ্য সফল হবে? ভয় তো চিরদিনই রয়েছে। দেখেননি, ফাঁসির শাস্তি দেওয়া হয়, এ জেনেও লোকে হত্যা করে।'

একজন ভদ্রলোক বললেন, 'বেশ্যাদের মধ্যে যদি সদ্গুণ দেখান, তাহলে লোকেদের চোখে বেশ্যাবৃত্তির অপরাধ কম করা হয় না কি?"

শরৎচন্দ্র বললেন, 'হয়তো হয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? আমি প্রাচীন কালের কোনরকম রাক্ষস আর রাজপুত্রের গল্প তো লিখছি না। রাজপুত্র অত্যন্ত গুণবান্ আর যত দোষ সব রাক্ষসের। যা সত্যি তা আমি কেন বলব না? আপনার বদ্ধ ধারণা, যা চিরদিন হয়ে এসেছে তাই ভালো। এই মানদণ্ড থেকে যেই আমি একটু সরেছি, অমনি আপনারা আমার হাত থেকে কলম কেড়ে নেবার জন্যে তৈরি হয়েছেন। পুরোনোর সঙ্গে যা মেলে না, তা কি সবই খারাপ?'

এক বন্ধু বললেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে শাস্তি দিয়েছেন। ঐরকম শাস্তি দেওয়া কি খুব অনুচিত?'

'আমি কাউকে শাস্তি দিতে পারব না।'

'কিন্তু বিরাজ-বৌকে তো আপনি শাস্তি দিয়েছেন।'

'বিরাজের কথা আলাদা। সে-শাস্তি তার স্বেচ্ছাকৃত। তার অন্তর্মনের শাস্তি সে ভোগ করেছে। স্বামীকে সে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। রাজেন্দ্রকে সে কোনদিন ভালোবাসেনি। তার শাস্তি বড় পিকিউলিয়ার এবং ফোর্সড্ মনে হয়। মনের ওপর তার জোর নেই। বঙ্কিমবাবুকে অনেকরকম সাইকিক শক্তির সাহায্যে সে-সময়ের সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হয়েছে। আমার কথা হল, আমার সাহিত্যে মানুষের আত্মাকে আমি অপমান করতে পারতাম না। পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে-ই হোক, পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়াবার রাস্তা সবার জন্যে খোলা থাকা উচিত। হিন্দুর সমাজ বড় নিষ্ঠুর। তুলনা করে দেখলে মুসলমান সমাজ ঢের ভালো। ক্রিশ্চান সমাজ তার চেয়েও ভালো। আমার "পল্লীসমাজ"-এর রমা আর রমেশের কথাই ধরুন। দুজনেই মহৎপ্রাণ। অপরের যাতে ভালো হয়, তা করার তাদের অসীম ইচ্ছা ও শক্তি। তবু দুজনের জীবনটা কিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে! তাদের দুজনের মিলন একটি রিলিজিয়স ইউনিটি হতে পারেনি। কেন এমন হল, তা ভাবা কি অন্যায়? এত বড় প্রাণ নষ্ট হয়ে গেল, অন্য কোন সমাজে কি এরকম হতে পারত? আমি তো শুধু চিন্তা করবার, ভাববার সঙ্কেতটুকু দিয়ে চুপ করে যাই। সমস্যার সমাধান আপনারা করুন। বাইরেরটুকু দেখেই আমরা বিব্রত হয়ে পড়ি। অন্তর বলেও তো কিছু আছে? প্রেম যে কতবড় জিনিস, কী অসীম তার ক্ষমতা, তা বলাও হয়তো সম্ভব নয়। প্রেমের দরুন মানুষের সব দোষ, ত্রুটি ঢাকা পড়ে যায়।'

মনে হয়, এখানে শরৎচন্দ্র সমাজের অমানুষিক বাধার কথা বলতে চেয়েছেন। এ বাধা যেমন করেই হোক, দূর করতেই হবে। যতক্ষণ না সমাজ মন থেকে সবরকম জটিল আবিলতা দূর করবে, ততদিন পর্যন্ত সেই বদ্ধ কপাটে মাথা ঠুকে ঠুকে আপত্তি জানাতেই হবে। কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমাদের প্রাচ্য আদর্শের আত্মত্যাগ আপনার সাহিত্যে কতটুকু স্থান পেয়েছে?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'আত্মত্যাগ অবশ্যই আছে। আপনারা অনেকেই জানেন না এবং জানবার সুযোগও হয়তো পাননি। নানা জায়গায় ঘুরে আমি দেখেছি যে, অন্যান্য সমাজে বিয়ের আগে মেয়ে ও ছেলেরা পরস্পরের মন জয় করার জন্য কী বিরাট আত্মত্যাগ করে।

আত্মত্যাগের শিক্ষা ও প্রেরণা দিতে প্রেমের চেয়ে বড় আর কি আছে ? একটি কর্মী মেয়েকে আমি তার প্রেমিকের সঙ্গে সামান্য দুটো কথা বলার অজ্ঞাত আনন্দে সাপে-ভরা জঙ্গলে ক'রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে দেখেছি। যৌন মিলনের পূর্বের কথা আমি বলতে চাইছি । প্রেমিকার মন জয় করার জন্য কী বিপুল চেষ্টা, কত আন্তরিক সাধনাই না করতে হয় এবং তার যে কী মাধুর্য তা আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। সে-সব আমি ভুলতে পারব না কোনদিন। প্রেম প্রাপ্তির জন্য যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, ও চেষ্টা করতে হয়, তার দরুন মানুষ নোব্‌ল ও মহৎ হয়ে ওঠে। আমাদের এখানে কোনো দম্পতির মধ্যে সে-সম্ভাবনা একেবারেই নেই। ভালোবাসার জয়ের মধ্যে যে-আনন্দ, জীবনে তার প্রভাব বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। যাদের এ জোটে না, তারা চিরদিন বঞ্চিতই থেকে যায়। জয়ের ব্যগ্রতা ও আকুলতায় মানুষ নিজের শক্তি ও যোগ্যতা বাড়াবার চেষ্টা করে, প্রয়োজন হলে মারামারি করতেও পিছপা হয় না। কারণ প্রেমের মর্যাদা জানে, তাই সম্মানও সে দিতে পারে। আমাদের এখানে কি হয় ? সমাজ দুটি নর-নারীকে ধরে বেঁধে মন্ত্র পড়িয়ে এক করে দেয়, তাদের একসঙ্গে থাকতে হবে, শুতে হবে, নিজেদের কিছুই করতে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই সন্তান-সন্ততি হয়। বেশ জমজমাট সংসার, মধ্যে মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও হয়। কিন্তু জীবন্ত প্রেমের আনন্দ তারা পেতে পারে না।'

'পশুর মধ্যে এই ব্যগ্রতা ও আকুলতা অনেক বেশি, তাই বলে কি তারা শ্রেষ্ঠ ?'

'বলতে পারেন, এটা পাশব বৃত্তি। কিন্তু সেই কারণে সেটা মোটেই হেয় নয়। তাতে যে-আনন্দ, তা অতি দুর্লভ জিনিস, ক্ষণিক হলেও তা প্রভাবশালী। জয়ের আনন্দ ছোট হতে পারে না। নিজেরই সৃষ্টি মানুষ যেমন মহান্, তেমনই যে নিজের প্রেমিকাকে জয় করতে পারে, সে-ও ঠিক ততটাই মহান্। তবে সদাচার আমিও মানি। কিন্তু সৌন্দর্যচর্চাই তো জীবনের সব কিছু নয়।'

'আপনার এই চিন্তাধারা হিন্দুধর্মের প্রতিকূল নয় কি ?'

'কোন বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে আমি কখনও কিছু বলি না এবং বলতেও চাই না। বোধ হয় কোনও ধর্মের প্রতিই আমার আস্থা নেই। কিন্তু একথা আমি অবশ্যই বলব যে, যাকে আপনারা হিন্দুধর্ম বলেন, আমাদের পঙ্গু ও জড় পদার্থ করে রাখার সব দোষ ও দায়িত্ব সেই ধর্মেরই। ইসলাম ধর্মে মানবিকতার সম্মান আমাদের চেয়ে বেশি। ক্রিশ্চান ধর্মে তার চেয়েও বেশি। আমার সাহিত্যে আমার সৃষ্ট পাত্রেরা অনেক কিছু বলেছে। তাদের কোন বক্তব্যে আমি আমার বক্তব্য বলিনি। আমি সেই সব কথা বিশ্বাস করি না, মানতেও চাই না। আমার কাছে জীবনটাই সব। জীবনের পরে অন্য কোন জীবন আছে কিনা আমি জানি না। থাক্, এসব কথা। হয়তো শুনতে আপনাদের ভালোও লাগছে না। আমি যে-জয়ের কথা বলেছি, তা বোধহয় আগেকার দিনেও ছিল। নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেখিয়ে নারী-হৃদয়কে জয় করতে হত। সব সমাজে সব জাতির ভেতরে তা হত। কোনরকমে লক্ষ্মণের গণ্ডির মধ্যে জীবন কাটানো তাদের রুচিতে বাধত। হয়তো তাই তাদের মধ্যে অনেকেই জীবনের বিভিন্ন ধরনের বাস্তবিক আনন্দের অন্বেষক হতে পেরেছিল।'

শরৎচন্দ্র নিজে আনন্দের উপাসক ছিলেন, তবে তাঁর আনন্দ সংযমকে বাদ দিয়ে নয়। এ তাঁর সাহিত্যিক অভিব্যক্তির প্রাণ। এর পরের বছর[১] চন্দননগরের এক বৈঠকে তিনি সংযম সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন এবং নিজের সাহিত্য সৃষ্টি ও পরিবেশ সম্বন্ধে আলোকপাত করেন।

স্থানীয় প্রবর্তক সঙ্ঘের নিমন্ত্রণে তিনি চন্দননগরে যান। বিপ্লবীযুগের নেতা, চারুচন্দ্র রায়, মতিলাল রায় এবং বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা সক্রিয় নেতা ছিলেন। মুক্ত রাজবন্দী বলাই চন্দ্র স্বয়ং শরৎচন্দ্রকে পানিত্রাস থেকে চন্দননগরে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। শরৎচন্দ্রকে

১ নভেম্বর,১৯৩০। এই বইটির কয়েকটি জায়গায় এর উল্লেখ আছে।

ঘিরে বসে সবাই সেদিন একটি অন্তরঙগ ঘরোয়া পরিবেশের সৃষ্টি করেন। শরৎচন্দ্রের বংশ পরিচয় জানার আগ্রহ নিয়ে বৈঠক শুরু হয়। শরৎচন্দ্র বললেন, 'শুনে হয়তো আপনাদের দুঃখ হতে পারে। পরিচয় দেবার মতো বংশগৌরব আমার নেই। যাঁরা ইতিহাসের ইঁটপাথরের অনুসন্ধান ক'রে ব'লে থাকেন যে,''আমাদের এই ছিল,তাই ছিল'', আমি শুনে আনন্দ পাই না। আমি বলতে চাই আমাদের কিছুই ছিল না। সেজন্য দুঃখ করার কী আছে ? পুরোনো জিনিস নিয়ে গর্ব করে কী লাভ ? নতুনকে গড়ে নিতে হবে ?

'মতিবাবুর[১] লেখা বই আমি খুব পড়ি। তিনি দেশকে পুরোনো পথে দাঁড় করিয়ে নতুন দল গড়তে চাইছেন। ধর্ম ও ভগবৎ ভক্তির দ্বারা তাদের পরিচালিত করতে চাইছেন। শাস্ত্রে অনেক রকমের সাধনার কথা লেখা আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার মন উল্টো পথের দিশারী। সাধনার কোনও মূল্য আমি খুঁজে পাই না। শাস্ত্রের সাধনা যদি এতই বড় হয়, তাহলে আমরা কি করে এত ছোট হয়ে গেলাম ? অনেকে অনেক রকম কথা হয়তো বলবেন। সকল জাতিই, যাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ খুব প্রবল, পৃথিবীতে নিজেদের তারা স্বাধীন বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। আমরা এত বড় হয়েও পাঠান, মোগল ও ইংরেজের পদদলিত। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন খুব উচ্চমানের। তাই যদি হয়, তাহলে আমরা আজ এমন ছোট কেমন ক'রে হয়ে পড়েছি। যে-ত্যাগের ভেতর দিয়ে দেশকে সময় কাটাতে হচ্ছে, আমার মনে হয়, সেই ত্যাগের ভেতরেই কোনো গলদ রয়েছে। সে-গলদ যে কী, তা খুঁজে বার করতেও আমরা পারছি না। ক্রমশ আরো অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দু'চারজনকে শুনিয়েই আমি বলছি যে, তারা বলুক, হাজার বছর থেকে কেন আমাদের এই দুর্দশা ? কী করে এ সম্ভব হল ? যদি কেউ এর কারণ খুঁজে বার করতে পারে, তাহলে সত্যিই দেশের মহৎ উপকার হবে।

'আসল কথা হল, আমি কুসংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরাণ নামক বইখানির ওপরের মলাটটুকু বদলে দিয়েই আমি ক্ষান্ত হতে চাই না।''পথের দাবী''-তে আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কুসংস্কার কী জিনিস। ভালো তা কোনোমতেই নয়। যে-জিনিস খারাপ, বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত হওয়ার দরুন তার অবস্থা আরো শোচনীয়, নড়বড়ে হয়ে যায়। তাকে সংশোধন ক'রে আবার দাঁড় করাতে হবে। যেমন গভর্নমেন্টের শাসনপ্রণালী। দ্বিতীয় দল যারা আন্দোলনের পক্ষপাতী, তাব একটাই মানে হয় যে তারা সবকিছুর আমূল পরিবর্তন চায়। আমরা বুড়োর দল তা চাই না। কিন্তু আমার মনে হয়, মেরামত-করা জিনিস ভালো হয় না। যা আসল, খারাপ, তাকে একটু-আধটু বদল ক'রে দাঁড় করানো উচিত নয়। মতিবাবু বোধহয় ভেবেছেন, ধর্মকে পরিমার্জিত ক'রে আবার দাঁড় করাবেন। আমি বলছি, পরিমার্জনার দরকার কি ?—এই ধর্মকেই ত্যাগ করুন না। জীর্ণোদ্ধার ক'রে তাকে পুনর্জীবন দেওয়ার কী প্রয়োজন ?'

যাই হোক, এই বৈঠকে শরৎচন্দ্র নিজেকে সাহিত্যিক বলে মানতে চাইছিলেন না। বলেছিলেন, 'পেটের জন্য আমাকে সাহিত্যিক হতে হয়েছে।' তারপরে গম্ভীর হয়ে বলেন, 'সাহিত্যের মূল কথা হল, সবার প্রতি সহানুভূতি। ঘরে বসে আরাম কেদারায় শুয়ে সাহিত্যসৃষ্টি হতে পারে না। তবে নকল হয়তো করা যায়। সাহিত্যিক যদি মনুষ্য চরিত্র না দেখে, না বোঝে, তা সাহিত্যই নয়। সাধারণত লেখক কোনো বইয়ের একটি ক্যারেকটারকে সামান্য রদবদল ক'রে নতুন আর-একটি চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন, জীবনের সঙেগ ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে এমন হওয়াই স্বাভাবিক। অত্যন্ত কুৎসিত নোংরামির মধ্যেও আমি এমন মানবিকতার খোঁজ পেয়েছি, যা কল্পনা করাও মুশকিল। আমার স্মৃতি শক্তি খুব ভালো, এবং কোনোকিছু জানার ইচ্ছেও আমার চিরদিনই প্রবল। মানুষের ভিতরের সত্তাকে জানাই আমার উদ্দেশ্য। সামান্য পা পিছলে গেছে বলে মানুষকে একেবারে ফেলে দিতে হবে, এ কী কথা ?

১ প্রবর্তক সঙেঘর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

'মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আমি তাকে চিনতে চাই। এ এই বলল, সে তাই বলল, অপরের কাঁধে রেখে বন্দুক চালানো বা অন্যের অভিজ্ঞতাকে নিজের বলে চালানোর চেষ্টা আমি কোনোদিন করিনি। অতি অভাগা ছাড়া একাজ কেউ করে না। জীবনের বাস্তবিকতাকে জানতে হলে শুচি-অশুচির বাছবিচার করা চলে না। অভিজ্ঞতার জোরেই গোর্কি, টলস্টয়, সেক্সপিয়র এঁদের মধ্যেই কেউই শুচিতার ধার ধারেননি। সত্যিকারের সাহিত্যসৃষ্টি কল্পনার সাহায্যে কোনোমতেই টিঁকতে পারে না। তার জন্য চাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। অপরের রচনা আমি খুব কমই পড়েছি। আমার বাড়িতে বেশির ভাগ বই-ই সায়ান্সের। তাই আমার সাহিত্যে যুক্তি ও সমন্বয়াত্মক পরিণাম বেশি। রূপ ও স্বভাবের বর্ণনা নেই বললেই হয়। সে-চর্চা আমি দু-চারটে কথায় সেরে নিই, বেশি সময় নষ্ট করি না। আসল জিনিস হল—তার সত্তা, বা মন, বা অন্তর—সে আপনারা যাই বলুন, তাকে জানতে হলে গভীর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আমি আমার অভিজ্ঞতা কেমন করে বাড়িয়েছি, সে-বিবরণ আপনাদের শোনাবার মতন নয়। স্বভাববশত বা দুর্বলতাবশত মানুষ সে-সব সহ্যও করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথের সেই গানের মতোঃ বিষের ভাগ সে যে আমারই ভাগে পড়েছে। আর তা থেকে যে-অমৃত পাওয়া গেছে, তা নিজের সাহিত্যের দ্বারা সবাইকে দিয়ে গেছেন। অনেকে ঠিকই বলেন যে,"আপনার চরিত্র পড়ে মনে হয়, সেগুলো কাল্পনিক নয়।" শতকরা নব্বই ভাগ চরিত্রেরই মূলগত আধার সত্যের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথাও খেয়াল রাখা আবশ্যক যে, শুধু সত্য, সাহিত্য হতে পারে না। এমন অনেক সত্য ঘটনা আছে, যাকে সাহিত্যের আখ্যা দেওয়া যায় না। তবু চরিত্রের আধার যদি সত্য না হয়, তাহলে সে জীবন্ত হতে পারে না। ভিত যদি পাকা হয়, তাহলে ভয়ের কিছু নেই। আমি যে-চরিত্রগুলি দেখেছি, পারিপার্শ্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের দরুন তাদের যে পরিণতি হয়েছে, তাই আমি সাহিত্যে চিত্রিত করেছি। তাই আমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। লোকেরা যদি সে-সাহিত্য ও পাত্রকে অস্বাভাবিক বলে, সেকথা আমি মানব কেন?'

'গভীরতর সাহিত্যিক উপলব্ধি আপনি কেমন ভাবে অর্জন করেছেন? কোনো চিন্তা বা ভাবকে আপনি কেমন ক'রে মূর্ত ক'রে তোলেন? বলার কায়দা, গঠনসৌষ্ঠব, লেখায় আদ্যোপান্ত যে রস আকাঙ্ক্ষা, ও লালিত্য আপনি ফুটিয়ে তোলেন, সে-অনুভূতি আপনি কোথা থেকে পান? আপনার কথা বলার ভাষা, ও লেখার ভাষায় কোনও মিল নেই।"পথের দাবী"-র ভাষাও তা নয়, অন্য কোনো বইএর ভাষাও তা নয়।'

'তা আমি বলতে পারব না। ভাষা তো আপনা হতেই আসে। আমার লেখার কায়দা সাধারণের থেকে আলাদা ধরনের। আমি তো আগেই বলেছি, আমার স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। ছেলেবেলা থেকে যা কিছু দেখেছি, শুনেছি, মনের মধ্যে সব সময় তা ছেয়ে থাকত, তা নয়, তবে দরকার হলে হুবহু মনে পড়ে যেত। লেখার আগে সর্বপ্রথম আমি পাত্র ঠিক করে নিই এক, দুই, তিন, ইত্যাদি। তারপর গল্প শুরু করা বা, পাত্রদের সামনে এনে দাঁড় করানো খুবই সহজ। অনেকে বলেন,"আমার কাছে গল্পের প্লট নেই, তাই আমি লিখছি না।"আমি শুনে অবাক হয়ে যাই। এতবড় পৃথিবীটা পড়ে রয়েছে, কত রকম বৈচিত্র্যই না ছড়িয়ে রয়েছে আর এরা প্লট খুঁজে পাচ্ছে না! কারণ এরা মানবিকতার খোঁজ নেয় না, নিজের কথা নিয়েই সবসময় ব্যস্ত। কিসে লোকে আমোদ পায়, তার পরোয়া আমি করি না, কোনো চরিত্রের ব্যক্তিত্ব আমি নষ্ট করতে চাই না এবং কোনো ঘটনাকে ইচ্ছেমত দুমড়ে মুচড়ে লেখার চেষ্টাও করি না। মনে হয়, বিজ্ঞানের বই পড়তে পড়তে আমার ভাষাও ঐরকম হয়ে যাবে। ভাষায় আমার দখল কম। শব্দের ভাঁড়ারও অল্প, তবু লোকের তা ভালো লাগে। কেন বুঝতে পারি না। আমি যা বুঝি এবং বলতে চাই, মনের মধ্যে সাজিয়ে রাখি, তার জন্য আমায় বেশ পরিশ্রম করতে হয়।"সে"এবং"তিনি"-র ব্যবহার খুব সাবধানে করতে হয়। লেখার পর খুব ঘষা-মাজা করতে হয়, ঝরনার মতো অজস্র ধারায় তা আপনা হতেই প্রবাহিত হয় না। যারা ভাবে যে, যা লিখব তাই অতি উৎকৃষ্ট হবে, তারা খুব ভুল করে। মানুষের কথাবার্তার মতো লেখাতেও অনেক অসংলগ্ন কথা থাকে,

সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়। যেমন–তেমনভাবে কাজ করতে আমার ভাল লাগে না। তাই ভূমিকা লিখে আমায় বোঝাবার দরকার হয় না। আমার কোনো বইয়ে কোনোরকম ভূমিকা নেই।

'আর একটা ব্যাপার বরাবর লক্ষ্য করে আসছি যে, সাহিত্য রচনারও একটা নিয়মকানুন আছে। খেয়াল রাখতে হয় যে, রস–বস্তু যে অশ্লীলতার সীমা না পেরিয়ে যায়। শ্লীলতা ও অশ্লীলতার মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম রেখা আছে, যার এক–পা এদিক–ওদিক হলে সব অশ্লীল হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য আমি রসিক লোকেদের কথা বলতে চাইছি। অশ্লীল সাহিত্য সর্বদা বর্জনীয়। মনোরঞ্জনের খাতিরে আমি মিথ্যে কখনও বলি না, অন্তত যথাসাধ্য সে চেষ্টাই করি।

'আমার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা হয়েছে, গালমন্দের বন্যা বয়ে গেছে। দেশের লোকেরা বোঝে না যে, গ্রন্থকার, কবি, চিত্রকর—এদের জীবন সর্বসাধারণের জীবন থেকে আলাদা। এখানের লোকেরা এও জানে যে, এদের স্নেহচ্ছায়ায় ঘিরে রাখা দরকার। লোকেবা চায় যে, লেখকের অভিজ্ঞতাও থাকুক অথচ আমাদের মতো শান্তশিষ্ট ভদ্র জীবন সে যাপন করুক। তা হতে পারে না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে যে–সমালোচনা হয়, তার বারো আনাই ব্যক্তিগত অভিযোগ আক্ষেপ। সমালোচনা বইয়ের নয়, লেখকের করা হয়। সেইজন্যই অনেকে ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন।'

এ ধবনের প্রশ্নের যেন আর শেষ ছিল না। কিন্তু শরৎচন্দ্র এতটুকু ক্লান্তিবোধ করেননি। শেষে বলেন, 'আজকের এই আলাপ–আলোচনায় বেশ আনন্দ পেলাম। কেবল মনোরঞ্জনের জন্য নয়, এ ধরনের গোষ্ঠী ও বৈঠকের সত্যিই প্রয়োজন আছে। কি করে দেশের উন্নতি হবে, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত। মাঝে মাঝে লেখক ও পাঠকদের বিভিন্ন বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলাপ–আলোচনা করা উচিত। এতে অনেক লাভ। আজকাল অনেকেই লেখেন কিন্তু তাঁদের ঠিক লেখক বলা চলে না। তাঁদের লেখায় সংযম নেই। যৌনবিষয়ক ব্যাপার বলতে গিয়ে এমন গোলমাল বাধিয়ে বসে যে, তাঁদের লেখা সাহিত্য পদবাচ্য কিনা সন্দেহ। এধরনের প্রায় সমস্ত রচনাই বিদেশ থেকে ধার করা, নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফল নয়। অপরের ধার–করা জিনিস বাজারে চালাবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁরা এমন অশোভন কান্ড করেন, কেউ কিছু বলতে গেলে জিদের বশে তাঁরা বলেন,"বেশ করব, বলব, লিখব—কার কী"? কিন্তু এ ঠিক নয়। এ ধরনের বৈঠকের আয়োজন ক'রে যদি তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয়, তাহলে মনে হয় ফল ভালো হবে।'

এই সভায় তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'আমি মানুষকে অনেক বড় বলে মনে করি। তাকে হেয় মনে করতে পারব না।' লিঙ্কন একবার বলেছিলেন, 'আমি কোনো মানুষকে পতিত দেখতে চাই না।'

> শুন রে মানুষ ভাই!
> সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।–চণ্ডীদাস

পরের বছর শরতের ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে বিখ্যাত লেখক প্রমথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সর্বজনীনভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।[১] সবারই ইচ্ছে ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ সভার অধ্যক্ষতা করেন, কিন্তু তিনি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। তাঁর পরিবর্তে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথকে সভাপতিত্ব করার জন্য পরামর্শ দেন এবং—নিজের আগ্রহ জানিয়ে এই মর্মে একটি চিঠিও লিখে দেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য জগদিন্দ্রনাথ না আসাতে সভাপতির দায়িত্ব প্রমথ চৌধুরী পালন করেন।

গুরুদেব নিজে আসেন নি, তবে আশীর্বাদ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, 'শ্রীযুক্ত

১ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৮

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলার সমস্ত পাঠকের সঙ্গে আমিও আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজও সশরীরে পৃথিবীতে রয়েছি, সময় লঙ্ঘনের অপরাধ প্রতিক্ষণে অনুভব করি, অনেক উপলক্ষ্যও আবার তা মনে করিয়ে দেয়। আজ সভায় সবার আনন্দে যোগ না দিতে পারার অক্ষমতা তারই একটা কারণ। আজ অতীতের প্রদোষান্ধকারে দাঁড়িয়ে দুর্বল হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করে যাই। বাংলা সাহিত্যের উদয় শিখায় সে নিজে উজ্জ্বলতা আরও বাড়াক।'

অভিনন্দনের জবাবে আরও অনেক কথার সঙ্গে শরৎচন্দ্র একথাও বলেন, 'বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির বিপর্যয়ের মাঝে নানান লোকের সম্পর্কে আমায় আসতে হয়। তার দরুন যে কোনো ক্ষতি হয়নি, তা নয়; তবে যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তারা আমার সে-ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে। তারা আমার মনে এ অনুভূতি জাগিয়েছে যে, ত্রুটি, স্খলন, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবকিছু নয়, তার ভেতরের মানুষটা, যাকে আত্মাও বলা হয়, সে-আত্মা সব অপরাধ থেকে মুক্ত। আমার সাহিত্যে আমি তার অপমান করতে পারব না। কিন্তু অনেকেই এটা অপরাধ বলে মনে করেন। আমার তুলিকায় নাকি পাপীর চিত্রও মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে সেটাই তাদের চরম অভিযোগ।

'এটা ভালো কি মন্দ তা' আমি জানি না, এতে মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ কিছু হতে পারে কিনা তাও আমি ভেবে দেখিনি। যা আমি সত্য বলে মনে করেছি, তা অকপটভাবে প্রকাশ করেছি। সে সত্য চিরন্তন এবং শাশ্বত কিনা, সে আমার ভাববার কথা নয়। একথা যদি কখনও মিথ্যা হয়ে যায়, আমি কারুর সঙ্গে বিবাদ করতে যাব না।'

শরতের জন্মস্থান দেবানন্দপুরে 'শরৎচন্দ্র পল্লী পাঠাগার' স্থাপনা হয়। পাঠাগারটি স্থাপনার সময় শরৎচন্দ্র একটি আলমারি, নিজের লেখা সমস্ত উপন্যাস এবং অন্যান্য বই উপহারস্বরূপ দেন। দেবানন্দপুরে যখনই যেতেন, সেখানকার পথে ঘাটে একাকী ঘুরে বেড়িয়ে যেন শৈশবের দিনগুলিতে ফিরে যেতেন। যে পৈতৃক বাড়িখানি অভাবের দরুন একদিন মতিলালকে বিক্রি করতে হয়েছিল, সেটা শরৎচন্দ্র কিনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোনো কারণবশত তা সম্ভব হয়নি। বঙ্কিম-শরৎ সমিতি সে বছর থেকে প্রতি বছরই শরতের জন্মদিন উৎসব পালন করে এসেছে। শরতের ৫৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে সমিতির কয়েকটি অধিবেশনে শরৎ-সাহিত্যের আলোচনা হয় এবং একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়। এই পুস্তিকাটির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বাংলা উপন্যাসের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি শরৎ সাহিত্যে কীভাবে স্থান পেয়েছে, তারই বিস্তারিত আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ""বিষবৃক্ষ"-এর পর "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর পর অনেকদিন কেটে গেল। আবার দেখি গল্প-সাহিত্যে আর একটা যুগ এসেছে। অর্থাৎ আরও একটা পর্দা উঠলো। সেদিন যেমন ভিড় করে রবাহূতের দল জুটেছিল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে, আজও তেমনি জুটেছে। তেমনি উৎসাহ, তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা। এবারে নিমন্ত্রণ-কর্তা শরৎচন্দ্র।

'তাঁর গল্পে যে রসকে তিনি নিবিড় করে জাগিয়েছেন যে হচ্ছে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পূর্বের চেয়ে পাঠকের আরো অনেক কাছে এসে পৌঁছল। তিনি নিজে দেখেছেন বিস্তৃত করে, স্পষ্ট করে, দেখিয়েছেন তেমনি সুগোচর ক'রে। তিনি রঙ্গমঞ্চে পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালী সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উদ্ঘাটিত করেছেন, সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশ সহজ হ'ল। তাদের আনাগোনাও চলছে। একদিন তারা হয়তো সে কথা ভুলবে এবং তাঁকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশা করি পাঠকেরা ভুলবে না। যদি ভোলে, সেটা তাদের অকৃতজ্ঞতা হবে। তাও যদি হয়, তাতে দুঃখ নেই; কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে সেই যথেষ্ট। কৃতজ্ঞতাটা উপরি পাওনা মাত্র; না জুটলেও নালিশ না করাই ভাল। নালিশের সময়ও বেশি থাকে না, কারণ সব

---

১ ১৯৩১

শেষে যাঁর পালা, তিনি যদি বা দলগুলিকে রক্ষা করেন স্বত্বাধিকারীকে পার করে দেন বৈতরণীর ওপারে।'

পরের বছর শরতের ৫৭তম [১] জন্মদিন বন্ধু-বান্ধবেরা খুব ধুমধামের সঙ্গে পালন করার ব্যবস্থা করেন। বাংলার মহিলারা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা আলাদাভাবে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

যেদিন টাউন হলে আসলে উৎসব হওয়ার কথা, কুমন্ত্রণার ফলে সব আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়। বেহালার জমিদার মণীন্দ্রনাথ রায় শরতের পরম ভক্ত ছিলেন। এ সভার আয়োজন তিনিই করেছিলেন। সভাপতি রবীন্দ্রনাথকে করা হয় কিন্তু এবারও তিনি আসতে পারেন নি। বাংলায় তখন কংগ্রেসের দুটি দল ছিল। শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্র বোসের সমর্থক ছিলেন, তাই ফরোয়ার্ড দলের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। অভিনন্দন সমিতিতে ফরোয়ার্ড দলের লোক আছে, একথা মনে রেখে তাদের বিপক্ষ দল অর্থাৎ অ্যাডভান্স দলের লোকেরা শরতের অভিনন্দনের আয়োজনকে পণ্ড করার জন্য সক্রিয় হয়। শরতের জন্মদিন যে তিথিতে পড়েছিল, ঘটনাক্রমে গত বছর ওই দিনটিতে পুলিসের গুলিতে দু-জন বন্দী মারা যায়। ওই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে একটা অজুহাত দেখিয়ে অ্যাডভান্স দলের লোকেরা সাহিত্যের দিকপালের অভ্যর্থনা-সমারোহ ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন।

যাঁরা শরৎচন্দ্রের বন্ধু ও প্রিয় ছিলেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ—তাঁরা বলেন যে, উৎসব করার প্রয়োজন নেই। ওদিকে অমল হোম এ ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন কিন্তু তিনি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। নির্দিষ্ট সময় সভার আয়োজন করা হলে অ্যাডভান্স দলের লোকেরা হাঙ্গামা বাধিয়ে দেয়। শরৎচন্দ্র অভ্যর্থনার দরজা থেকে ফিরে যান। 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। পারস্পরিক মতভেদ ও দলাদলির জন্য এরকম অপ্রিয় ব্যাপারটি ঘটে। তা না হলে জন্মদিন উপলক্ষ্যে উৎসব পালন করা কোনো সময়েই কোনো বাধা থাকে না, কিম্বা কিছুদিনের জন্য তা স্থগিত রাখলেও চলত। রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় ব্যক্তিগত উৎসবকে এত প্রাধান্য না দিলে হয়তো উদারতার পরিচায়ক হত। শেষ পর্যন্ত দুদিন পরে 'শরৎ-বন্দনা' সমিতি জন্মদিন পালন করেন।[২] শরৎচন্দ্রের সম্মানে 'শরৎ-বন্দনা' নামে একটি বই তাঁরা প্রকাশ করেন ও শরৎকে অনেক রকম বহুমূল্য উপহার দেন।

উৎসব পণ্ড করার পেছনে রাজনৈতিক দলাদলিই একমাত্র কারণ ছিল না। সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির জন্য সারা দেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী আমরণ অনশনের শপথ গ্রহণ করেন। গান্ধীজীর এ সংকল্পে জনসাধারণের উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। জন্মদিন উদ্‌যাপনের ব্যাপারে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বিরোধিতার কারণ বোধহয় এটাই। 'শরৎ-বন্দনায়' তাঁর লেখা থাকায় এই অনুমান করাই সংগত। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়তো সে কারণেই সভায় যাননি। রবীন্দ্রনাথের না আসার আর একটি কারণ এও হতে পারে যে, কিছুদিন আগেই তাঁর দৌহিত্র জার্মানিতে মারা যায়। নিজের চিঠিতে তিনি বিশেষ উদ্বেগপূর্ণ সাংসারিক ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছিলেন,[৩]

'বিশেষ উদ্বেগপূর্ণ সাংসারিক ঘটনায় তোমার জন্মদিনের উৎসবে সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হলো। অগত্যা আমার আন্তরিক শুভকামনা এই উপলক্ষ্যে পত্রযোগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।

'তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার দৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার

১ ১৯৩২
২ আশ্বিন, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২
৩ ৬ অগাস্ট, ১৯৩২

জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই, তোমার ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করছে।

'সত্তর বছর উত্তীর্ণ করে কর্মসাধনার অন্তিমপর্বে আমি পৌঁছেছি। কর্তব্যের চক্ররথ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার পরেও এখনো যদি আমাকে চলতে হয় সেটা পুনরাবর্তন মাত্র। এই কারণেই অল্প দিন হলো আমার দেশ আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ করে চুকিয়ে দিয়েছে। সাধারণের কাছে আমার পরিচয় সমাপ্ত হয়ে গেছে বলেই এই শেষকৃত্য সম্ভবপর হয়েছে। আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয়, তখনি ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি। তারপরেও মেঘ যদি সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করে,সেটা হয় বর্ষার পুনরাবৃত্তি মাত্র, সেটা বাহুল্য।

'সেই দাঁড়িটানা সময় তোমার নয়, এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব–নব রচনা বিস্ময়ে নব–নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুইপাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে—তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে, তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, পথের চরম প্রান্তবর্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তি বাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয়, এ কথা নিশ্চিত মনে রেখো।

'তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে "কালের যাত্রা" নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নর-নারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে। তাই চলছে না এই রথ। সেই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহন রূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে। কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক, এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শুভানুধ্যায়ী—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

এই আশীর্বাদ পত্রটিতে কবি বলেছেন, 'তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক।' এই কথাটির অনেকেই ভুল অর্থ করেন। স্বয়ং শরৎচন্দ্রও মনে মনে খুব একটা প্রসন্ন ছিলেন না। একদিন বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যথোচিত সমাদর করেন না। তিনি 'কালের যাত্রা' নামে যে নাটিকাটি তাঁকে উৎসর্গ করেছেন তা এতই নগণ্য যে, তার নাম পর্যন্ত লোকে জানে না। 'তিনি যদি আমায় কোন বইই না উৎসর্গ করতেন, আমার বেশি আনন্দ হত। যাই হোক, সে দান গুরুর আশীর্বাদ ভেবে আমি গ্রহণ করেছি। কিন্তু তা বলে আমার মনে ক্ষোভ কিছু কম হয়নি।'

গুরুদেবের চিঠির জবাবে যে চিঠিটি শরৎচন্দ্র লেখেন, তাতে তাঁর মনের ক্ষোভের এতটুকু আভাস মেলে না। তিনি লেখেন, '"কালের যাত্রা"র সঙ্গে যে আশীর্বাদ আপনার পাইলাম সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে কোন সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম। আমার ভাগ্য ভালো যে, ৩১শে ভাদ্র আপনার কলিকাতায় আসা সম্ভবপর হয় নাই—আসিলে সেদিনের অনাচার দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। আর সবচেয়ে পরিতাপ এই যে, আমার প্রায় সমবয়সী সাহিত্যিকেরাই এই উপদ্রবের সূত্রপাত করিয়াছিল। শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে হয়তো এটাই ইহারা ভালোবাসে,—আমি উপলক্ষ মাত্র। কারণ, গত বৎসরের জয়ন্তী উৎসবেও ইহারা কম দুঃখ দিবার চেষ্টা করে নাই।

'আমি একদিন নিজে গিয়ে আপনাকে প্রণাম করিয়া আসিতে চাই, শুধু সংকোচে যাইতে পারি না, পাছে কেহ কিছু মনে করে।'

এর উত্তরে গরুদেব বড় সুন্দর ভাবে লেখেন, 'তোমার প্রতি যে অত্যাচার হয়েছিল তার বিবরণ শুনে লজ্জা বোধ করেছি। কিন্তু এ কথাও নিঃসন্দেহ যে, দেশের লোকের হৃদয় তুমি অধিকার করেছ—এই ভালবাসার চেয়ে মূল্যবান অর্ঘ্য আর কিছু নেই। এই ভালবাসা পেয়েছ বলেই তোমাকে আঘাত সইতে হবে। কেবল মাত্র যদি যশ পেতে, তা নিয়ে কারো মনে যদি কোনো বিরোধ না থাকত, তাহলে সে যশের গৌরব থাকত না। তোমার প্রতিষ্ঠা যতই ব্যাপ্ত হতে থাকবে, ততই তার সঙ্গে তোমার দুঃখও বাড়বে। এজন্য মনকে শক্ত করে নিয়ো।'

গুরুদেবের আশীর্বাণীতে কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না, যা সত্য অর্থাৎ আদব অভ্যর্থনা মানষকে যে গতিহীন করে তোলে তাই তিনি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎ সাহিত্যের প্রশংসক ছিলেন। বহুবার তিনি নিজের লেখা প্রবন্ধ ইত্যাদিতে সে প্রমাণ দিয়ে গেছেন। বছর পাঁচেক আগে সাহিত্যে 'নবত্ব' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'শরৎ চাটুজ্জের গল্পটা বাঙালীর,কিন্তু গল্প বলাটা একান্ত বাঙালীর নয়; সেই জন্য তাঁর গল্প সাহিত্যের জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জাত-বিচারের কথা উঠতেই পারে না। গল্প বলার সর্বজনীন আদর্শটাই ব্যাপক ক্ষেত্রে সকল লোককে ডাক দিয়ে আনে। সেই আদর্শটা খাটো হলেই নিমন্ত্রণটা ছোট হয়—সেটা পারিবারিক ভোজ হতে পারে, স্বজাতের ভোজ হতে পারে কিন্তু সাহিত্যের যে তীর্থে সকল দেশের যাত্রী এসে মেলে সে তীর্থের মহাভোজ হবে না।'

'সাহিত্য বিচার' নামক প্রবন্ধে পুনরায় তিনি লেখেন, 'শরৎ চাটুজ্জের গল্প বেতাল পঞ্চবিংশতি, হাতেমতাই, গোলেবকাওয়ালি অথবা কাদম্বরী বাসবদত্তার মতো যে হয়নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে করে অবাঙালীত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না, তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে প্রভাব ভেসে বেড়ায়, তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত, যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায় এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘাচতে অনেক দেরি হয়। এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে। তাই বলি সাহিত্য বিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।'

শরৎচন্দ্রের গল্প রচনা শক্তির অকুণ্ঠ প্রশংসা করে কবিগুরু একবার তাঁকে বলেছিলেন, 'এবারে যদি তোমার লক্ষ্ণৌ সাহিত্য সম্মেলনে যাওয়া হয় তো, অভিভাষণের বদলে একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও।'

শরৎ নারীচরিত্রের 'প্রফেট' ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ কবিতা 'সাধারণ মেয়ে'তে বলতে চেয়েছেন যে, সাধারণ নারীরা শরৎকে তাদের দুঃখ-বেদনার মনোজ্ঞ লেখক বলে মনে করে। তারা জানে যে, যদি শরৎবাবু তাদের কথা লেখেন, তাহলেই তাদের মুক্তি পাবার

সম্ভাবনা। তাই সেই সাধারণ মেয়ে তাঁকে মিনতি করে বলছে,

'পায়ে পড়ি তোমার,
একটা গল্প লেখো তুমি, শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প।'

এই নামেরই আর একখানি কবিতা শরতের মামা উপেন্দ্র নাথ লেখেন, তাতেও তিনি শরৎকে বলেছেন, 'তুমি যদি সাধারণ মেয়ের গল্প না লেখ তাহলে আমি লিখব, কিন্তু তা এমন কোন অসাধারণ গল্প হবে না আর বাংলার নারীরা তা পড়ে শরৎচন্দ্রকে অভিশাপ দেবে।'

রবীন্দ্রনাথ শরৎ-প্রতিভাকে বরণ করেছিলেন, শরৎও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তবুও মাঝে-মাঝে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটত, সেই সূত্রে অপরিচয়ের দূরত্ব বেড়ে যায়। কয়েক বছর আগে[১] রবীন্দ্রনাথ নিজের পরম ভক্ত দিলীপ কুমার রায়কে তাঁর সঙ্গে শরতের মানসিক সংঘাতের উল্লেখ করে একটি চিঠি লেখেন। দিলীপ কুমার রায় তাঁদের দুজনকেই গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'এইমাত্র কোনো পত্রলেখক আমাকে জানিয়েছেন যে, শরতের বিশ্বাস আমি তাঁর উপর বিরক্ত। যাঁরা আমাকে ভালরকম জানেন, তাঁরা এতবড় ভুল করতেই পারবেন না।-রাষ্ট্রনীতি বা কোনো বিষয়ে মতের মিল না হলে তা আমি ফৌজদারী দণ্ডবিধানের অন্তর্গত মনে করি না। যদি আমি কোনদিন স্বরাজ সরকারের অধিনায়ক হই তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে তোমার সঙ্গীতের সঙ্গে তার মিল না হলেও তোমার জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকবে।

'শরৎ আমার সম্বন্ধে কোন অপরাধই করেননি-বোধ করি তুমি জানো, শরৎ সম্বন্ধে আমি কখনই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিনে (সাহিত্য সম্বন্ধে), প্রথম থেকেই আমি তাঁকে প্রশংসাই করে এসেছি। অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে থাকে, তাতে আমার ভাবনার কারণ এই জন্যে নেই যে, কাব্য রচনা সম্বন্ধে আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে কথা অতি বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবে না।—বোধহয় তুমি জান যে অনেকদিন থেকে হোমিওপ্যাথী করছি, তবু জনসাধারণ তোমার স্বর্গত দাদা মশায়কে আমার চেয়ে বড় ডাক্তার মনে করে। তখন আমার মনে একটাই সান্ত্বনা থাকে যে, তিনি আমার মত ছোট গল্প লিখতে পারতেন না।

'সকলেই বলে আমার চেয়ে তোমার কণ্ঠস্বর ভালো—তা নিয়ে বৃথা অশ্রুপাত না করে আমি বলে থাকি, মন্টুর চেয়ে আমার হাতের অক্ষর অনেক ভালো।

'সকল বিষয়েই আমার ক্ষমতা যদি সকলের সমান না থাকে, তাই বলেই ক্ষমতাশালীদের যদি ঢুঁ মেরে বেড়াতে থাকি, তা হলে ভাঙা কপাল যে আরো ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। আমার দেশে যে-কেউ, যে-কোন বিষয়েই শ্রেষ্ঠতা লাভ করুক না কেন, আমি যে সে গৌরবের শরিক, সেই শ্রেষ্ঠতাকে নামঞ্জুর করার দ্বারা নিজেকেই বঞ্চিত করা হয়। আমার দেশে আমার চেয়ে নানা বিষয়েই নানা লোক বড়, এই অহংকার জগতের কাছে যেন করতে পারি। শরতের এককালীন চরকা ভক্তি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে বারবার হেসেছি, কখনো হাসতুম না, গম্ভীর হয়ে নীরব হয়ে থাকতুম যদি আমার মনের মধ্যে লেশমাত্র কাঁটার ক্ষত থাকত। কারণ, ব্যক্তিগত কারণে যার উপরে আমার বিমুখতা আছে তাকে নিন্দা করতে আমি ভারি লজ্জা বোধ করি। যাকে প্রশংসা করতে পারিনে, তাকে আমি নিন্দাও করতে নারাজ। যখন আমার হাতে "সাধনা" কাগজ ছিল, তখন আমি সাহিত্যিক স্বল্পায়ুদের ভালোও বলিনি, মন্দও বলিনি। বঙ্কিমকে দুই- একবার নিন্দা করেছি, কেননা তাঁকে প্রশংসা করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাঁর ঠিকানা জানিনে, তুমি নিশ্চয়ই জানো, অতএব তাঁকে মোকাবিলায় বা ডাকযোগে জানিয়ো যে, সর্বান্তঃকরণে আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করি। তিনি চরকা ছেড়ে কলম

---

১ বিস্তৃত তথ্যের জন্য অধ্যায় ২১ দ্রষ্টব্য।

ধরেছেন, তাতে আমি খুশি হয়েছি এই জন্যে যে, তাঁর কলম থেকে দেশোন্নতির যে সূত্রপাত হবে, চরকার থেকে তা হবে না—কিন্তু খেয়ালের বশে যদি তিনি চক্রধর হয়েই থাকেন, তা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে আমি কখনই চক্রান্ত করব না।'

এই চিঠিখানিতে কবিগুরুর আমুদে মনের পরিচয় বেশি মুখর, তবু তাঁর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব তাতে ফুটে উঠেছে। শরতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনে কোন রকম বিরূপভাব ছিল না। গিরিজা কুমার বসুকে লেখা তাঁর একটি পত্রে একথা স্পষ্ট জানা যায়।– 'শরৎকে বলো যে, তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হওয়া বড়ই কষ্টদায়ক, কারণ তা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর যেটুকু ভাল, তা ভাল বলবার ব্যাকুলতা আমার বড় বেশি, তাই প্রতিকূলতা হওয়া সত্ত্বেও আমি প্রতিকূল হতে পারি না। শরৎ আমার প্রতি কোন অন্যায় করেছে কিনা তা আমি জানি না। কোন বিষয়ে তার সঙ্গে যদি আমার মতের অমিল হয়, সে নিয়ে বিবাদ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিজেও স্বতন্ত্র মতের পক্ষপাতী। অপরের নিজস্ব মতামতকেও আমি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। সাহিত্যে শরতের গৌরব শাশ্বত হোক, পরিব্যাপ্ত হোক, তার গৌরবে দেশের গৌরব বাড়ুক–সেটাই আমার আন্তরিক কামনা।'

গুরুদেবের আন্তরিক কামনা বিফল হয়নি, শরতের গৌরবে দেশ গৌরবান্বিতই হয়ে উঠেছিল। দেশের বাইরে বিদেশেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের ইংরেজি অনুবাদ আগেই হয়ে গিয়েছিল। ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী সেটা ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদটি পড়ে ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ 'প্রবাসী'-র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, 'শরৎচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক। তিনি আর কোন্ কোন্ বই লিখেছেন ?'[১]

'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক দিনেশচন্দ্র দাসকে রোমাঁ রোলাঁ একটি চিঠি লেখেন, 'আমরা কয়েকজন ইউরোপবাসী বন্ধু ভারতবর্ষের বর্তমান সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনাবলীর পরিচয় পেলে খুশি হব। কে সি সেন ও টমসন দ্বারা অনূদিত শরৎচন্দ্রের"শ্রীকান্ত"প্রথম পর্ব পড়ে অভিনব ব্যক্তিত্ব ও রচনা-কৌশলে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারিনি।'

সেদিন 'লীগ অব নেশনস'-এর কার্যালয়ে কয়েকজন বাঙালী বন্ধুদের সঙ্গে বাংলা সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার বড় দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, 'এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পশ্চিমের দেশগুলিতে অন্য কোনো বাঙালীর নাম শোনা যায় না।'

তাঁর পাশেই একজন বিদেশী মহিলা বসে ছিলেন। তিনি বললেন, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাঙালী লেখককে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা মনে মনে খুবই শ্রদ্ধা করে। তাঁর দু–একটি বইয়ের নাট্যরূপান্তর ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষায় হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিদেশী নাট্যমঞ্চে তা অভিনীতও হয়েছে।'

শরৎচন্দ্রের কাছে পাশ্চাত্য বিদ্বান মনীষীদের অনেক চিঠিপত্র আসত। একজন ইতালীয়ান 'শ্রীকান্তে'র প্রশংসা করে লেখেন, 'এই উপন্যাসটি বিশ্ব সাহিত্যে খুব উচ্চমানের রচনা হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। আমি মূল বাংলায় বইখানি পড়েছি এবং ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করছি।[২] যে–কোনো দেশের পক্ষে এ কি গর্বের বিষয় নয় ?

১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬
২ ইলাচন্দ্র যোশী, 'শরৎচন্দ্রঃ ব্যক্তি অওর কলাকার', পৃঃ ৫১

চন্দননগরের একটি সভায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'পলিটিক্স-এ যোগ দিয়েছিলুম, এখন তা থেকে অবসর নিয়েছি। ও হাঙগামায় সুবিধা করতে পারিনি। অনেক সময় নষ্ট হল। ততটা সময় নষ্ট না করলেও হত। যা গেছে তা গেছে- খানিকটা অভিজ্ঞতা জমা হয়ে রইল। এখন থেকে আমি আমার লেখা নিয়েই থাকব।

সে সময়ে দেশে লবণ-সত্যাগ্রহ চলছিল। সভার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলুন। আন্দোলন কেমন চলছে এবং আপনার কী মনে হয়?' শরৎচন্দ্র বললেন, 'ভালোই চলছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না।'

একথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, রাজনীতি থেকে তাঁর মন সরে গিয়েছিল। তাঁর মতে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনীতিকদের মতো সাহিত্যিকদেরও যত্নবান হওয়া উচিত, এ কথা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন। তাই বোধহয় অহিংসা ও চরকার আস্থা না রেখেও তিনি অনুশাসনের মর্যাদায় স্বাধীনতা সংগ্রামকে যথাশক্তি সম্মান দেখিয়ে গেছেন। 'পথের দাবী' প্রকাশনের সময় কয়েকজন কংগ্রেস সেবী পরামর্শ ইত্যাদি নেবার জন্য তাঁর কাছে প্রায়ই আসতেন। একদিন তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অহিংস সত্যাগ্রহ এবং হিংসাত্মক বিপ্লব— এই দুটোর মধ্যে আপনি কোনটা সমর্থন করেন? আপনি হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি এবং আপনার প্রতি কংগ্রেসের হাইকমান্ডের নির্দেশ হল অহিংস সত্যাগ্রহ, কিন্তু আপনার "পথের দাবী" উপন্যাসে হিংসার সংকেত পাওয়া যায়।'

উত্তরে শরৎ বলেন, 'এ কথা সত্য যে, হিংসার সমর্থন আমি করি না। তবে জানি না কেন আন্দোলনকারীদের জন্য আমার মনে একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে। তাই ঝুঁকি নিয়েও আমি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি এবং যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করতে দ্বিধা করি না।

'সেদিন বিপ্লবী দলের একটি লোক এসে খবর দেয় যে, দুপুরবেলায় আলুর ঝুড়ি নিয়ে "আলু চাই" "আলু চাই" বলতে বলতে সে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবে, আলু কেনার অছিলায় তাকে আমি ঘরের ভেতর ডেকে আনব।

'আমি "আলু চাই" ডাক তো শুনতে পেলাম, কিন্তু হঠাৎ তাকে ডাকি কি করে? এখানে আসার পর কোনোদিন কিছু নিজে হাতে কেনাকাটা করি না। হঠাৎ যদি আলুওয়ালাকে ডাকি তো লোকেদের সন্দেহ হতে পারে এবং সব গোপনতা ফাঁস হয়ে যাবে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে গৃহিণীর শরণাপন্ন হলাম, ডেকে বললাম—বড় বৌ, আলুওয়ালা ডাকছে, নেবে কি?

'গিন্নি বললেন, "বাড়িতে অনেক পড়ে রয়েছে, আজই তো বাজার থেকে এল।"

'আমি আকুল হয়ে বললাম, এই প্রচন্ড রোদে বেচারী "আলু" "আলু" চেঁচাতে চেঁচাতে খালি হাতে ফিরে যাবে? বোধ হয় সকাল থেকে বউনি হয়নি। সামান্য কিছু না হয় নিয়েই নাও। আলু তো খারাপ হওয়ার জিনিস নয়। আহা! বেচারী এই ভর দুপুরবেলা চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর ওপর আমার বড়ই মায়া হচ্ছে।

'"তোমার সবই অদ্ভুত!" বলে গিন্নি নবীকে আদেশ দিলেন যে আলুওয়ালাকে ডেকে নিয়ে আসতে। যাই হোক, আলুওয়ালার কাছ থেকে সামান্য খানিকটা আলু কিনলেনও তিনি। আমি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, ভাবছিলাম এবার কী করা যায়? শেষে বললাম, "বেলা পড়ে এল, তুমি কিছু খেয়েছ ভাই?"

'সে বলল, "কেমন করে খেলাম, বাবু? আলু বেচে যে কখন বাড়ি ফিরব তার ঠিক নেই। সন্ধে নাগাদ খাওয়া জুটবে।"

'আমি বললাম, তাহলে বরং এক কাজ করো! এখানেই দুমুঠো খেয়ে নাও। ভর দুপুর

---

১ নভেম্বর ১৯৩০

বেলায় ব্রাহ্মণের দোর থেকে অভুক্ত ফিরে যেতে পারবে না।

'সে বলল, "বাবু, ব্রাহ্মণের বাড়িতে কতদিন যে প্রসাদ পাইনি, আজ যদি জোটে সে আমার পরম সৌভাগ্য।"

'এদিকে গিন্নি কানে কানে বললেন, "অনর্থক ঝামেলা বাড়াচ্ছ! আলু বেচতে এসেছে তাকে খাওয়াবার কী দরকার? ও কি আমার অতিথি না ভিখারি, যে, ডেকে খাওয়াতে হবে? তা ছাড়া হেঁসেলের পাট চুকে গেছে। মাছটাছ কিছু নেই।"

'আমি বললাম, জানো ভর দুপুর বেলা না খেয়ে বাড়ির দোর থেকে ফিরে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। আর মাছের কথা বলছ, ননীকে বললে এখুনি পুকুরে জাল ফেলে ধরে নিয়ে আসবে।

'অকল্যাণের কথায় গিন্নি রাজী হয়ে গেলেন। এত গোপনতার একটা কারণ ছিল। লোকটির আসল পরিচয় জানতে পারলে জানাজানি হবার ভয় ছিল। তাছাড়া আমার বাড়ির সামনেই চৌকিদারের ঘর ছিল; জানতে পারলে থানায় নিশ্চয় রিপোর্ট করে দিত। তাই বাধ্য হয়ে এত সাবধান হতে হয়েছিল। দেশের জন্য যারা কাজ করে তাদের আমি খুবই শ্রদ্ধা করি, তা সে হিংসাত্মক আন্দোলনকারীই হোক বা অহিংস সত্যাগ্রহী হোক। আমার চোখে দুজনেই সমান শ্রদ্ধার পাত্র। অসময়ে গিন্নিকে দিয়ে রান্না করানোর জন্য আমার মনে একটু দ্বিধা হচ্ছিল কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কোনও উপায়ও তো ছিল না। ননী জাল নিয়ে পুকুরে চলে গেলে বড় বৌ অতিথি সৎকারের জন্য রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'এই সুযোগে আলুওয়ালার মুখে তার গল্প শুনলাম। তার সামান্য টাকার দরকার ছিল তা দিলাম। একথা কেউ জানতে পারল না কারণ মাঝে মাঝে বেশ জোরে জোরে আলুওয়ালার অনুরূপই কথাবার্তা কইছিলাম। রান্না হলে খেয়েদেয়ে "আলু চাই" "আলু চাই" বলতে বলতে আলুওয়ালা চলে গেল।'

হাওড়ায় যে ডাকাতির কান্ড হয় সে ব্যাপারে লালবিহারী নামে এক ব্যক্তি অভিযুক্ত ছিল। জেল থেকে পালিয়ে সোজা সে শরৎচন্দ্রের কাছে চলে আসে। তখনকার দিনে ব্রিটিশ সরকারের ভয়ে লোকে এমনই আতঙ্কিত হয়ে থাকত, জেলের ফেরারী আসামীকে বাড়িতে জায়গা দেবার কথা ভাবতেও ভয় পেত। শরৎচন্দ্র লালবিহারীকে শুধু বাড়িতে আশ্রয়ই দেন নি বরং নিজের অনুচর হিসেবে মাসে মাসে মাইনেও দিতেন। আলুওয়ালা, লালবিহারী, স্বদেশরঞ্জন দাস, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী—কত আর নাম করা যায়! বয়সে ছোট হলেও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী শরতের মামা ছিলেন। শরৎ তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। দুঃখ করে একদিন তাঁকে বলেছিলেন, 'এই বিপ্লবী ছেলেরা যে কী অদ্ভুত! তার দৃষ্টান্ত হল আমার বিপিন। দেশের জন্য কী কষ্টেই না সারাটা জীবন কাটাল। অর্ধেক জীবন তো জেলেই কাটিয়ে দিল। কতবার বলেছি যে বিপিন, মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে দু-চার দিন থেকে যাও, ভালো কিছু খাও, ভালো বিছানায় একটু আরাম করে শোও, একটু আদর যত্ন ভালোবাসা নাও। কিন্তু তার সে সময়ই নেই। সময় থাকবেই বা কোত্থেকে? দেশের চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা তার আছে নাকি?'

থাকবার জন্য নয়, তবে কোনো-না-কোনো সাহায্যের জন্য বিপিন শরতের কাছে প্রায়ই আসত। একবার সে একজন মহিলার বেশে এসেছিল। শরৎ হেসে বললেন, 'বিপিন যখনই আমার কাছে আসে পিস্তল নিয়ে আসে, যেন পিস্তলের ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে পয়সা আদায় করবে। সেদিন এসে বলল, তার সাতশো টাকার দরকার। কয়েক ঘণ্টা থেকে চলে গেল। তার পিছনে পুলিস লেগেছে, যদি ধরত তাহলে আমি কী-ই বা করতে পারতাম? কিন্তু আমি জানি যে ধরা পড়লেও সে কিছুতেই বলবে না যে টাকা আমার কাছ থেকে পেয়েছে। ওর মতো বিপ্লবী খুব কম হয়।'

আন্দোলনকারীরা 'পথের দাবী' ও শরতের নির্ভীকতার প্রশংসা করত। তারা

সিদ্ধান্তবাদী ছিল না। তাদের নীতি ছিল অন্যায়ের প্রতিকার। দাসত্বের চেয়ে বড় অন্যায় আর কী হতে পারে? দেশের মুক্তিই ছিল তাদের চোখে পরম সত্য.সেখানে পৌঁছোবার কোনো বিশেষ পথ নয়।

সেদিন একজন কংগ্রেসী কর্মকর্তা অহিংস প্রতিরোধের একটি ঘটনা খুব গর্ব করে শোনালেন,—স্কুল কলেজের ছেলেরা রাষ্ট্রীয় পতাকা নিয়ে একটি মিছিল বার করেছিল। পুলিস লাঠি চালনা করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এমন-কি বাড়ির লোকেদের খুব উত্ত্যক্ত করে ও মহিলাদের প্রতি অমানুষিক বর্বরতা ও তাদের অপমানিত করে।'

রাগে শরতের মুখ থমথমে হয়ে উঠল, বললেন, 'এ কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না?'

শরতের রুষ্ট চেহারা দেখে ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন, তবু সাহস সঞ্চয় করে বললেন, "কী ব্যাপার লজ্জিত হওয়ার কথা আপনি বলছেন?"

শরৎচন্দ্র বললেন, 'মেয়েদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হতে দেখেও ক্লীবের মতো মূক দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে সে কাণ্ড দেখলে, তারপর গর্ব করে বলতে এসেছ যে সংযম ও অহিংসার খুব মান বজায় রাখা গেছে! এক গণ্ডূষ জলে তোমাদের ডুবে মরা উচিত।'

পদদলিত নারীদের যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই শরৎচন্দ্র নারীদের প্রতি এরকম নিষ্ঠুর আচরণ শুনে কেমন করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবেন? কিন্তু সেই ভদ্রলোকটি তখনও পর্যন্ত বুঝতে পারেননি শরৎচন্দ্র তার উপর প্রসন্ন হওয়ার বদলে কেন রাগ করছেন? অবরুদ্ধ গলায় তিনি বললেন, 'আপনি একি কথা বলছেন? হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়ে আপনি এসব কী বলতে চাইছেন, পুলিসের বিরুদ্ধে আমাদের হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করা উচিত ছিল?'

শরৎচন্দ্র ক্রোধের সঙ্গেই বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তাই বলতে চাইছি। আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম তাহলে তাই করতাম।'

'কিন্তু তাহলে কি কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সবিনয় অবজ্ঞা আন্দোলনের সিদ্ধান্তকে হত্যা করা হয় না?'

'অবশ্যই হয়! তবে মহিলাদের মর্যাদা হানির চেয়ে সে হত্যাকে আমি একেবারেই নগণ্য মনে করি।'

সকলেই অত্যন্ত বিস্মিতভাবে শরৎচন্দ্রের দিকে চেয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ নীরবতার পর শরৎ বললেন, 'আজ একটা কথা আপনাদের কাছে স্পষ্ট বলতে চাই যে, অসহযোগ আন্দোলনের এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সবিনয় অবজ্ঞা আন্দোলন নীতির সঙ্গে আমার স্বভাব খাপ খায় না। একথা আমি জানি যে ব্রিটিশ সত্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে অহিংস আন্দোলন নীতি ছাড়া আজ আর অন্য কোনো পথ নেই। তবে এই পরিমাণে অহিংস নীতি মানতে আমি রাজী নই যে, মেয়ে-বউয়ের ইজ্জত-আব্রু নষ্ট হতে দেখলেও হাত গুটিয়ে বসে থাকব। প্রত্যেক নিয়মের কোনো-না-কোনো অপবাদ থাকে, বর্তমান অহিংস আন্দোলনও অপবাদ-রহিত হতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিরীহ লোকেদের মতো বিনা প্রতিবাদে নীরবে মার খেতে কখনও অভ্যস্ত নই। আমার ভবঘুরে জীবনের দিনগুলোয় কয়েকটি ইংরেজকে প্রহার করার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে। যখন আমি বর্মা ছেড়ে আসি, সে সময় যে অফিসে কাজ করতাম সেখানের ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে আমার প্রবল ঝগড়া হয়ে যায়। সে ভারতীয় জনতা সম্বন্ধে অপমানজনক কথা ও গালমন্দ করেছিল। আমার এ কথায় তোমরা এ কথা ভেবো না যে আমার স্বভাবই হল হিংসাবাদী। আমার মতে অহিংস নিরীহ লোক খুব কমই পাওয়া যায়। তবে আমার সে অহিংসা কাপুরুষের অহিংসা নয়।'

এই ঘটনাটির বিষয়ে আলোচনা করে ইলাচন্দ্র যোশী বলেন যে, 'শরতের মুখে এই ভাষণ শোনার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ মুখ খোলেন নি। শেষে সেই ভদ্রলোকটি সাহস করে বললেন, "তাহলে কি গান্ধীজীর নীতিকে আপনি কাপুরুষের নীতি মনে করেন?"

'এ প্রশ্নে ব্যঙ্গ নিহিত ছিল। শরৎবাবু নিজের একটি কথার উপর জোর দিয়ে বলেন যে, "আমি ব্যক্তি হিসাবে গান্ধীজীকে এত বড় বীর মনে করি যার তুলনা খুঁজলেও সহজে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রতি আপনাদের চেয়ে আমার অনেক বেশি শ্রদ্ধা আছে। মনে যদি শ্রদ্ধা না থাকত তাহলে কারও কথায় বা কারও অনুরোধে হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতিপদ আমি কিছুতেই গ্রহণ করতাম না। তবে আক্ষরিকভাবে তাঁর সম্পূর্ণ মতামত বা সিদ্ধান্তকে যে মানতেই হবে, এ শপথ আমি নিইনি। আমি মানুষ, মাটির জড় পুতুল নই। তাই কোনো সাধারণ বা মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করবার সামর্থ্য আমার আছে"।'[১]

এই স্বাধীন চিন্তার মানসিকতার জন্য কংগ্রেসে থেকেও বিপ্লবীদের ভালোবাসতে পেরেছিলেন। নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদীর দল শরৎকে ভ্রান্ত ও তাঁর কার্যপ্রণালীকে অহিতকর মনে করতেন। শরৎচন্দ্র এসব শুনে দুঃখ পেতেন। বলতেন, 'আমি অহিংস নীতি গ্রহণ করেছি। যে করে নি সে যে ভ্রান্ত এ কথা কেমন করে বলা যেতে পারে? মহাত্মার কথা আলাদা। অহিংসা তাঁর মনের এক জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁর আদর্শ—এর চেয়ে বড় ধ্রুব সত্য তাঁর জীবনে আর-কিছু নেই। দেশের স্বাধীনতার চেয়েও অহিংসা তাঁর কাছে অনেক বড়। এই শক্তি ও আন্তরিকতার জন্যই তাঁকে আমি এতখানি শ্রদ্ধা করি। এই রকমই দেশেব স্বাধীনতা যার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য, সমান আন্তরিকতাব সঙ্গে যিনি হিংসা পথের পথিক, ফাঁসির মঞ্চে উঠে যারা স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করেছে, তাদের প্রতিও আমার ততখানিই শ্রদ্ধা। তাদের আমি আমার প্রণাম জানাই।'

শরতের এই বিশ্বাসের ফল তাঁর 'পথের দাবী'। তিল তিল করে যেমন বিধাতা তিলোত্তমার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনই যে-সব বিপ্লবী তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের সবার মিলিত গুণের দ্বারা তিনি সব্যসাচীর সৃষ্টি করেন। এই উপন্যাসটিতে হিংসা ও অহিংসার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কিছু বলা হয়েছে, শরতের অন্তরের যে দ্বন্দ্ব তাই পরিস্ফুট হয়েছে, কোনো স্পষ্ট সমাধান তিনি দেন নি। সমাধানের প্রয়োজনও তিনি কখনও স্বীকার করেন নি।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি এর চেয়ে বড় আর একটি কাজ করেছিলেন। তিনি রাজবন্দীদের জন্য একটি সর্বজনীন অভিনন্দনের আয়োজন করেছিলেন।[২] অনেক রাজবন্দী চার-পাঁচ বছর ধরে জেলে আটক ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস তাদের মুক্তির জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন, ফলে সবার আগে সুভাষচন্দ্র বসু মুক্ত হন। চার বছর ধরে তিনি মান্দালয় জেলে ছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। লর্ড লিটন তাঁকে মুক্ত করার বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু তাঁর জায়গায় স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন আসেন এবং তিনি রাজবন্দীদের প্রতি নরম নীতি গ্রহণ করেন। ক্রমশ সমস্ত রাজবন্দীই মুক্ত হন। প্রায় দুশো জনেরও অধিক রাজবন্দী কারাগার থেকে বেরিয়ে আবার কর্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালেন।

যখন এঁরা সবাই জেলে বন্দী ছিলেন, বিশেষ করে দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র বড় একাকী হয়ে পড়েছিলেন। উদাসীন দুঃখিত মন নিয়ে যন্ত্রের মতো শুধু কোনোরকমে কংগ্রেসের নাম বজায় রেখেছিলেন। কেমন যেন তিনি বীতরাগ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এবার যখন রাজবন্দীরা মুক্তি পেয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর মনে আগের সেই ফুর্তির জোয়ার যেন ফিরে এল। রাজবন্দীদের মধ্যে অনেকেরই ঘরদোর আত্মীয় পরিবার ছিল না। দেশ ও সমাজের দরজা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেউই তাদের সহজ মনে অভ্যর্থনা জানাল না। বন্ধুবান্ধব, দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-পরিজন, মেস, বোর্ডিং যেখানেই তাদের আশ্রয় দেওয়া হত, সেখানেই সি. আই ডি. গিয়ে উপস্থিত হত। সৌভাগ্যক্রমে যদি কোনো রাজবন্দী চাকরি পেয়ে যেত, তাহলে সেখানেও গুপ্তচরদের আনাগোনা শুরু হত। সরকার তাদের মুক্তি দিলেও এ-ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন, যাতে তারা সুখশান্তিতে বাঁচতে না পারে। কংগ্রেসও তাদের জন্য সদা

১ ইলাচন্দ্র যোশী, 'শরৎচন্দ্রঃ ব্যক্তি অওর কলাকার'।
২ ১৯২৮

আতঙ্কিত হয়ে থাকত। গান্ধীবাদীরা এদের বিপক্ষেই ছিলেন। এভাবে মুক্ত রাজবন্দীদের বেঁচে থাকা প্রকৃতপক্ষে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

তাদের এই হাহাকার বঞ্চনা শরৎচন্দ্র নিজচোখে দেখে মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠতেন। শিল্পীর মনে বাণী যেন তাঁকে জাগ্রত করে তুলছিল। প্রতিজ্ঞা করলেন, রাজবন্দীদের এ লাঞ্ছনা যেমন করেই হোক ঘোচাতে হবে। নিজের সঙ্গী–সাথী ভক্তদের ডেকে বললেন, 'ওহে, হাওড়াতে সমস্ত মুক্ত রাজবন্দীদের নাগরিক সংবর্ধনা দেব। জমকালো সভা করতে হবে। এমন ভাবে ওদের অভ্যর্থনা করতে হবে যাতে দেশের মধ্যে একটা Moral impression হয়। হাওড়ার সমস্ত youths যাতে এই সভাতে এসে যোগদান করে তার বন্দোবস্ত কর।

'দেশের জন্যে যারা নিজেদের রিক্ত করেছে, নিঃস্ব করেছে, আজকে তারাই হবে দেশের লোকের ভয়ের পাত্র? দেশ ছাড়া যাদের আর কিছু নেই, দেশ হবে তাদের প্রতি বিমুখ? কংগ্রেসের কাজ করতে করতে যারা ধরা পড়ল, রাজবন্দী হল, আজ কংগ্রেস তাদের বরণ করবে না কেন, সংবর্ধনা জানাবে না কেন? গভর্নমেন্ট তাদের রিভলিউশনারি বলছে বলে? তারা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে এই কথা গভর্নমেন্ট রটিয়েছে বলে? গভর্নমেন্ট কি হবে আজ আমাদের conscience keeper? আমাদের নীতিবুদ্ধি কি আমরা Identify করব গভর্নমেন্টের নীতিবুদ্ধির সঙ্গে? By no means, we must receive them and congratulate them openly and wholeheartedly কলকাতাতেই এটা প্রথমে হওয়া উচিত ছিল, বি পি সি সি-র এটা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা যখন হল না, তখন আমরাই প্রথমে করব। তোমরা এর ব্যবস্থা কর।'

চতুর্দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে হাওড়া কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্বে মুক্ত রাজবন্দীদের জন্য হাওড়ায় অভিনন্দন সভা হবে। যদিও শরৎ সভার নামেই ভয় পেতেন কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে তাঁর সমস্ত চেতনা যেন মুখর হয়ে উঠত। হাওড়া টাউন হলে তিনি স্বয়ং রাজবন্দীদের অভিনন্দন জানিয়ে মানপত্রখানি পাঠ করেন। এই সভায় তিলধারণের স্থান ছিল না, মালা-চন্দন দিয়ে রাজবন্দীদের বিপুল অভ্যর্থনা অভিনন্দন জানানো হয়। যাঁরা এতদিন পর্যন্ত উপেক্ষিত ছিলেন, যাঁদের দেখলে অকারণে লোকেরা ভয় পেত তাঁরা এবার সবার প্রিয় ও পূজ্য হয়ে উঠলেন।

নিতান্তই একটি সাধারণ সভা হলেও তার প্রভাব হল অসাধারণ। যারা সরকারকে ভয় করত, তাদের কাছে এটা যেন একটা দারুণ চ্যালেঞ্জ। নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী হওয়ার দরুন যাঁরা হিংসার নিন্দে করতে পেলে সুযোগ ছাড়তেন না, সেই স্বরাজ দলের কাছেও ব্যাপারটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। এদের মধ্যে ছিল অধিকাংশই আত্মকেন্দ্রিক ধনী–সম্প্রদায়ের লোক। গদগদ স্বরে সেদিন শরৎচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেনঃ 'দেশের জন্যে এরা জীবন উৎসর্গ করেছে, যৌবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গভর্নমেন্ট এদের ভয় করে। কারণ জানে এদের তপস্যার মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। গভর্নমেন্ট সহস্র চেষ্টা করেও পারলে না ধ্বংস করতে, এদের মনের অপরাজেয় বল আর অন্তরের অনির্বাণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। চিরচঞ্চল চিরজীবী চিরতরুণ এরা। দেশের তরুণদের আমি বলি— তোমাদের এত বড় আপনজন, এত বড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই।'

বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়ার চক্র সেদিন থেকে আবার ঘুরতে আরম্ভ করল। ভাগীরথীর বন্ধ উৎস আবার যেন খুলে গেল। বাংলার তরুণ হৃদয় সোনার কাঠির জাদুস্পর্শে জেগে উঠল। তাদের মন থেকে চরকাও তকলির ভক্ত নেতাদের প্রতিচ্ছবি মিলিয়ে গেল। নানান জায়গায় রাজবন্দীদের জন্য সংবর্ধনা হ'ল। জেলা সম্মেলন, যুবক সম্মেলন, সবার ভেতরে যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল যে, তারা সভাপতি কোনো–না–কোনো রাজবন্দীকেই

১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮

করবে। এই সভা ও সম্মেলনগুলিতে রাজবন্দীরা স্বাধীনতার অগ্নিময়ী বাণী, দেশের মুক্তির জন্য জীবন বিসর্জন এবং সর্বস্ব-অর্পণ-করার আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন। বিপ্লবী বাংলা আর-একবার চিরন্তন প্রাণশক্তিতে জেগে উঠল। তরুণ বয়সের ছেলেরা জীবন বিপন্ন করে গুলি বর্ষণ ক'রে চট্টগ্রামে ইংরেজ-অধিকৃত অস্ত্রাগার নিজেদের কব্জার মধ্যে নিয়ে আসে। স্বাধীনতার এই নান্দীপাঠে মেয়েরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন! বীণা দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্বয়ং লাট-সাহেবকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। চারিদিকে যেন তান্ডব লীলা শুরু হয়ে যায়। ভয়ে ইংরেজদেরও প্রাণ কেঁপে ওঠে। শরৎচন্দ্র হিংসার পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু তিনি মনে করতেন, যে, দেশের মুক্তি সংগ্রাম হিংসা-অহিংসার প্রশ্নের মীমাংসা দিয়ে করা যায় না।

কংগ্রেসের অবস্থা সে সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। ১৯২৮ সালে শেষভাগে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কলকাতায় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেস সর্বদল সমিতি নেহরু-কমিটির রিপোর্টে শাসন-বিধানের যে নিয়মাবলী পেশ করে তা মেনে নিয়ে বলে, 'যদি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই বিধানটির কোনো পরিবর্তন না করে, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ বা তার আগে স্বীকার করে নেয়, তাহলে কংগ্রেসও এই বিধান মেনে চলবে; যদি না এর মধ্যে রাজনৈতিক বিশেষ পরিবর্তন ইত্যাদি হয়। কিন্তু যদি তা না হয় এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বিধান না-মঞ্জুর করেন, তাহলে কংগ্রেস দেশের লোকেদের পরামর্শ দেবে যাতে তারা কোনোরকম কর ইত্যাদি সরকারকে না দেয়। এছাড়া অহিংসাত্মক অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। কংগ্রেসের নামে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচারে এই প্রস্তাবটি কোনোরকম বাধার সৃষ্টি করবে না—যদি না এ ধরনের কাজ প্রস্তাবের বিপক্ষে যায়।'

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। তাঁরা এই প্রস্তাবে কিছু সংশোধন করার দাবি করেন, কিন্তু তাঁদের দাবি স্বীকৃত হয়নি। বিরোধী পক্ষের লোকেরা তখন 'স্বাধীনতা সংঘ' নামে একটি নতুন সংস্থা গঠন করেন। এই সংঘে বাংলা যোগ দেয়নি। তারা সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি আলাদা সংঘ তৈরি করে। সে সময়ে বাংলা কংগ্রেসে দুটি দল ছিল। একটি দলের নেতা ছিলেন যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, যিনি কলকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁর সমর্থনকারীদের মধ্যে অনুশীলন সমিতি, গৌরাঙ্গ প্রেস এবং স্যোশালিস্ট দলের লোকেরা ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে পাঁচজন বড় নেতার আর একটি দল ছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী এবং শরৎচন্দ্র বসু। সুভাষ চন্দ্র বসু কলকাতা অধিবেশনে জি. ও. সি. ছিলেন, পরে এঁদের দলেই যোগ দেন এবং তিনিই দলটির নেতা হন। সরস্বতী প্রেস ও চট্টগ্রাম দলের নেতারাও এঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এছাড়া কম্যুনিস্ট দলের পেজেন্টস্ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স্ পার্টি খুব সজাগ ছিল। তারা সবাই পরস্পরের উগ্রবিরোধী ছিলেন। এ সময়ের পরিস্থিতির অত্যন্ত বাস্তবিক বিশ্লেষণ করেছিলেন উত্তর কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, 'আজ সারা বাংলায় কারও পৈতৃক প্রাণটা তার নিজস্ব থাকবার জো নেই। সবাই বেরিয়েছে সবাইকে ক্যাপচার করতে। দাদারা (বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মীরা) বেরিয়েছেন ছেলেদের (বয়োকনিষ্ঠ কর্মীগণ) ক্যাপচার করতে, ছেলেরা বেরিয়েছে দাদাদের ক্যাপচার করতে, লীডাররা বেরিয়েছেন চেলাদের ক্যাপচার করতে, চেলারা বেরিয়েছে লীডারদের ক্যাপচার করতে। চারিদিকে রব-"ক্যাপচার কর, ক্যাপচার কর"।'

এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় শরৎচন্দ্রের মানসিকতা বড়ই বিচিত্র ছিল। প্রকাশ্যরূপে তিনি কোনো নেতা ছিলেন না কিন্তু কোনো-না-কোনো দল বিশেষের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল। দু দলেই ছিল তাঁর প্রিয়জনেরা। তাঁর কাছে যখন যে আসত সবাইকেই তিনি স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে রাখতেন। তিনি দেশবন্ধুর জন্যই কংগ্রেসে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধুর

বড়ই প্রিয় শিষ্য ছিলেন। শরৎ সুভাষকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, বলতেন, 'সবাইকে ছাড়তে পারি, সুভাষকে পারিনে।'

শচীনন্দন লিখেছেন, 'শিবপুরে হাওড়া জেলা কর্মী সম্মেলন হল। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য ও সহকর্মীরা—প্রবোধ বসু, বিজয় ভট্টাচার্য, ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী, অগম দত্ত, গুরুদাস দত্ত, জীবন মাইতি, গুরুপদ মুখোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী, ডাঃ ভূপেন দত্ত, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ এঁরা সবাই ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। দলাদলির ফলে সুভাষচন্দ্র ঐ সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হননি। শরৎচন্দ্রকে যখন সম্মেলনে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে কর্মীরা গেলেন, তখন তিনি বললেন, "আমি যাব না।"

'"কেন যাবেন না? হাওড়া জেলা কর্মী সম্মেলন, আপনি যাবেন না কি রকম?"

'"ওখানে সুভাষের নিমন্ত্রণ হয়নি। শিবহীন যজ্ঞে আমি যেতে পারিনে।"

'একজন খুব রেগে বলে উঠল,"আপনার সুভাষ শিব নয়, ভূত।"

'"ভূত নয় রে, ভূত নয়, ভূতনাথ।"তিনি বললেন।

'কয়েকজন বললেন,"আমরা আপনার কেউ নই?" তিনি সজল চোখে বললেন,"তোমরা আমার অনেকখানি। কতখানি যে তা মাপাও যায় না—কিন্তু তবু আমি যাব না"।'

কর্মীরা বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় নিলেন, তিনি ততোধিক ব্যথিত হৃদয়ে তাদের বিদায় দিলেন। যাঁরা তাঁকে আহ্বান করতে গিয়েছিলেন, তাঁরাও তাঁর প্রিয়তম আর যিনি আহূত হননি, তিনিও প্রিয়তম। দুই সন্তানের বিবাদে জননীর মন যেমন ব্যথিত হয়, শরৎচন্দ্র সেদিন মনে তেমনি ব্যথা পেয়েছিলেন।

সুভাষ তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি আর কিছুদিন কলকাতায় থেকে কংগ্রেসের মধ্যে যে দলাদলি আরম্ভ হয়েছে তা মিটিয়ে ফেলুন।'

কিন্তু এ কাজ শরতের সাধ্যের বাইরে ছিল। সাহিত্যিক রাজনীতির চোট সইতে পারেন না। এর কয়েক বছর পর[১] যখন শরৎচন্দ্র 'আগামী কাল' নামক সমাপ্ত উপন্যাসে এককড়ির পরিচয় দিচ্ছেন, তখন যেন তিনি এই দলাদলির কথাই বিশদভাবে বলতে চেয়েছেন, 'বন্দেমাতরমের বিরাট কঠিন ধ্বনি কোটর থেকে টেনে তাকে বার করলে। তারপর জেলে গেল, দলাদলির আবর্তে পড়ে নাকে-মুখে পাঁক ঢুকলো; দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রদত্ত নানা বিচিত্র বিশেষণের মালা শিরোপা পেলে, শেষে একদিন যাদের সংসার চালিয়ে দিল তারাই চোর বলে যখন কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলে, তখন সে আর সইলো না, পলিটিক্সে জলাঞ্জলি দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে আবার তার লাইব্রেরী-ঘরে এসে আশ্রয় নিলে।'

শুধু সাহিত্যের খাতিরেই যে শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় হয়েছিলেন তা নয়। রাজনৈতিক ব্যাপারেও তাঁর খ্যাতি কিছু কম ছিল না। একটি মামলায় প্রশ্ন ওঠে যে 'বিপ্লব' শব্দের আসল অর্থ কি? সঙ্গে সঙ্গে একজন পরামর্শ দেয় যে, এর অর্থ জানার জন্য শরৎচন্দ্রকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা যাক। কিন্তু সরকারী উকিল তারকনাথ সাধু নিষেধ করলেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, শরৎকে আদালতে ডেকে জেরা করলে তাঁর মনে দুঃখ হত; যদিও শরৎচন্দ্র কাউকে ভয় পেতেন না। সেদিন তাঁর পরিচিত একজন ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি নিয়ে একজন এস. ডি. ও. তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দফাদার নিবারণ ঘোষাল নামে এক ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের সুহৃদ এবং তাঁরই প্রতিবেশী ছিলেন। এস. ডি. ও. মহাশয় তাঁকে দেখা মাত্র অহঙ্কারের সঙ্গে বললেন, 'ওরে ও নিবারণ, পা ধোওয়ার জল নিয়ে আয় তো।'

একথা শোনা মাত্র শরৎচন্দ্র হঠাৎ ভীষণ রেগে গেলেন। এস ডি. ও-কে বললেন, 'এ ভাবে কথা বলার আপনার কি অধিকার আছে? এটা আমার বাড়ি, আপনার অফিস ঘর নয়। এখানে নিবারণ ঘোষাল আমার প্রতিবেশী, সুহৃদ, বন্ধুস্থানীয়, আপনার দফাদার এখানে সে নয়।

১ 'বিচিত্রা', চৈত্র, ১৩৪২ (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৩৫)

এভাবে তাকে ডাকা মানে তার অপমান করা। আর তাকে অপমান করে আমার বাড়িতে কেউ বসতে পারবে না। আপনি এখুনি এখান থেকে চলে যান, যান মশাই! আর আমার বিরুদ্ধে যা করতে পারেন করুনগে।'

একথা বলে শরৎচন্দ্র মুখ ফিরিয়ে উপরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। এস ডি ও ভদ্রলোক একেবারে অবাক। স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, তাঁর সঙ্গে কেউ এরকম ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু সেদিন শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফিরে যেতেই হয়।

দলাদলি ও তর্ক-বিতর্কে কংগ্রেস যখন ব্যতিব্যস্ত, তখন যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ হিংসার পথ বেছে নিয়ে জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করছিল। যুবকদের ওই প্রাণশক্তি শরৎচন্দ্রকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করত। শরৎকে ঘিরে তাদের একটা দল গড়ে ওঠে। সেবার দিনাজপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক যুব-সম্মেলনের অধিবেশনে শরৎচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি মহাত্মা গান্ধীর খিলাফৎ আন্দোলন ও স্বরাজ আন্দোলনকে একসঙ্গে যোগ করার কর্মপদ্ধতির সমালোচনা এবং চরকা-খদ্দর দ্বারা স্বরাজ লাভের আশাকে বিদ্রূপ করলেন।

সাম্যবাদ ওই সময় থেকেই ধীরে ধীরে মাথা তুলছিল। একদিন শিক্ষিত বাঙালী তরুণেরা শরৎচন্দ্রের কাছে এসে ভিড় করে জমিদারি ও পুঁজিবাদের ব্যাপারে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য আসে। তাঁর একান্ত বিশ্বাস ছিল জমিদারি একদিন-না-একদিন শেষ হবেই। তাঁর এই বিশ্বাস তরুণদের মনে শক্তি জোগাত, আর তিনি আরামকেদারায় শুয়ে নতুন বাংলাকে প্রবুদ্ধ করে তুলতেন। এইভাবে যে স্যোশালিস্ট পার্টি সংগঠনের ভিত তৈরি হয়, তা কংগ্রেসের ভেতরেও ছড়িয়ে পড়ে।

এই সময়[১] হাওড়া পৌরসভার মেথরেরা ধর্মঘট করে। শরৎচন্দ্র কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল পার্টিতে কংগ্রেসের মেজরিটি ছিল না। তারা শরৎচন্দ্রকে বলে, 'যে ব্যক্তি ধর্মঘট পরিচালনা করছেন তিনি আপনার শিষ্য। আপনি তাঁকে ধর্মঘট বন্ধ করতে বলুন।' শরৎচন্দ্র বললেন, 'না। আমি তাঁদের কিছুই বলব না। দোষ তাঁদের নয়। তোমরা এখুনি বোঝাপড়া করে নাও, তা না হলে আমি আমার বক্তব্য মিউনিসিপ্যাল পার্টির বিরুদ্ধে পেশ করব।'

কয়েকদিন ধর্মঘট চলে। শেষে দুই দলই দীনবন্ধু সি এফ্ অ্যান্ড্রুজকে মধ্যস্থ হিসেবে মেনেই নেয়। মেথরদের প্রায় সব শর্ত মেনে নেওয়া হয়। শরৎচন্দ্র শ্রমিক সংগঠনের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু একথাও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তাদের নিজেদের ভার নিজেদেরই বহন করা উচিত। তারা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে, সেটুকু সাহায্য ও উপকার যদি আমরা করতে পারি তাহলে তা সর্বোত্তম কাজ হবে।

তরুণ ছাত্রদের উপর শরতের এমনই টান ছিল যে, সাহিত্য বিষয়ে ভাবনা প্রায় তিনি ছেড়েই দিয়েছিলেন। তিন বছর আগে[২] শিলচরে সুরমা উপত্যকা ছাত্র সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার সময় তিনি বলেন,—যত কঠিন কর্তব্যই হোক-না-কেন, ছাত্ররা তা পালন করার যোগ্য। তারপর শরৎচন্দ্রকে রংপুরে[৩] বঙ্গীয় যুব-সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সে সময়েই মাজুতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছিল। সেখানেও তাঁকেই সভাপতি করা হয়। শরৎচন্দ্র ভেবেছিলেন, প্রথমে যুব-সম্মেলনে যোগ দিয়ে তারপর সাহিত্য সম্মেলনে পৌঁছবেন, কিন্তু তাঁকে শেষ পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয় নি। এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর নীতির তিনি বড় কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। 'বেণু'[৪] পত্রিকায় কিশোরদের সম্বোধন করে লেখেন, 'তোমরা জান বোধ হয়, বাংলা দেশে যুব-সমিতি নাম দিয়ে একটি সংঘের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির বার্ষিক সম্মিলনী কাল শেষ

১ ১৯২৮
২ জুন, ১৯২৬
৩ মার্চ, ১৯২৯ সালে শেষের দিকে।
৪ সম্পাদক : ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।

হয়ে গেছে। আমি বুড়োমানুষ, তবুও ছেলেমেয়েরা আমাকেই এই সম্মিলনীর নেতৃত্ব করবার জন্য আমন্ত্রণ করে এনেছে। .... আমি তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আনন্দের সঙ্গে ছুটে এসেছিলাম শুধু এই কথাটাই জানাতে যে, তাদের হাতেই দেশের সমস্ত ভালো–মন্দ নির্ভর করে, এই সত্যটা যেন তারা সকল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে। অথচ, এই পরম সত্যটাকে বোঝাবার পথে তাদের কতই না বাধা। কত আবরণই না তৈরি হয়েছে তাদের দৃষ্টি থেকে একে ঢেকে রাখবার জন্যে। আর তোমরা, যাদের বয়স আরও কম তাদের বাধার তো আর অন্ত নেই। বাধা যারা দেয়, তারা বলে সকল সত্য সকলের জানবার অধিকার নেই।.... তোমরাও এমনি তোমাদের জন্মভূমি সম্বন্ধে অনেক তথ্য অনেক জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়ে আছ। পাছে তোমাদের ইস্কুল–কলেজের পড়ায়, পাছে তোমাদের একজামিনে পাসের পরম বস্তুতে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় মিথ্যে দিয়েও তোমাদের দৃষ্টি রোধ করা হয়। যুব–সমিতির সম্মেলনে এই কথাটাই আমি সকলের চেয়ে বেশি করে বলতে চেয়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম তোমাদের পরাধীন দেশটিকে বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়েই তোমাদের সংঘ গঠন। ইস্কুল–কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যব্যবস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেবার, দেশের স্বাধীনতা–পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে। এবং এই অধিকারের কথাটাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করার অধিকার আছে। .. একজামিনে পাস করা দরকার, এ তার চেয়েও বড় দরকার। ছেলেবেলায় এই সত্য চিন্তা থেকে আপনাকে পৃথক করে রাখলে যে ভাঙন সৃষ্টি হয়, একদিন বয়স বাড়লেও আর তা জোড়া লাগতে চায় না। এই বয়সের শেখাটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।'

সভাপতির ভাষণে[১] তিনি আরও বলেন, 'কংগ্রেস অনেক দিনের—আমারই মতো সে বৃদ্ধ; কিন্তু যুব-সংঘ সেদিনের—তার শিরার রক্ত এখনও উষ্ণ, এখনও নির্মল। কংগ্রেস দেশের মাথাওয়ালা আইনজ্ঞ রাজনীতি–বিশারদগণের আশ্রয় কেন্দ্র কিন্তু যুব-সংঘ কেবলমাত্র প্রাণের ঐকান্তিক আবেগ ও আগ্রহ দিয়ে তৈরি। একটাকে চালনা করে কূটবিষয়বুদ্ধি, কিন্তু অন্যটাকে নিয়োজিত করে জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম; তাই নানা প্ররোচনা ও উত্তেজনার পর মাদ্রাজ–কংগ্রেস যখন পাস করেছিল দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা, তখন সে বস্তু টিঁকলো না—একটা বৎসর গত না হতেই কলিকাতার কংগ্রেসে সে মত নাকচ হয়ে গেল। স্বাধীনতার পরিবর্তে তাঁরা ফিরে চাইলেন dominion status কিন্তু দেশের তরুণ দল সে নির্ধারণে কান দিল না। উভয় প্রতিষ্ঠানের এইখানেই পার্থক্য। পুরাতনের বিধি–নিষেধের বেড়াজালে প্রাণ তার হাঁফিয়ে উঠে, যুব–সমিতির জন্ম–ইতিহাসের এই হেতু। শুধুই কি কেবল ভারতবর্ষে? পৃথিবীর যে–কোনো দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই যেন এর নব অভ্যুদয়ের রক্তরাগ–রেখা চোখে পড়ে।

'দেখা যায়, কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সর্বপ্রকার নীতির সম্পর্কেই তরুণশক্তি যেন নব চেতনা লাভ করেছে। তাঁরা ছাড়া জগতের বর্তমান দুর্ভেদ্য সমস্যা যে কোনো মতেই মীমাংসিত হবে না, এ সত্য তারা নিঃসংশয়ে অনুভব করেছে। এটা মস্ত বড় আশার কথা। পুরাতনপন্থীরা তাদের মাঝে মাঝে তিরস্কার করে বলেন, তোমরা সে দিনের—তোমাদের কতটুকু অভিজ্ঞতা? যুব–সমিতি এ অভিযোগের উত্তর দিতে ছাড়ে না। কিন্তু আমি ভাবি, নানা বাগ্‌বিতণ্ডার মাঝে একথা কেন তারা স্পষ্ট করে জানায় না যে পুরাতনের অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধেই তাদের সবচেয়ে বড় লড়াই? তাদের এই বহু যত্ন–অর্জিত ঘনবিন্যস্ত অভিজ্ঞতার জ্ঞানটাকেই নিঃশেষে দগ্ধ করে দিয়ে তারা জনতাকে মুক্তি দিতে চায়। কিন্তু একটা বিষয়ে তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান; বস্তুত এই–ই দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান— যা বিদেশীর রাজশাসনের অবিচার ও অনাচার মুখ বুজে মেনে নেয় নি। তার দীর্ঘকাল ব্যাপী বাদ–প্রতিবাদ অনুযোগ–অভিযোগের সম্মিলিত কোলাহল বধির রাজকর্ণে প্রবেশ করে নি সত্য, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল কি? এমনি ভাবে দিন চলে যাচ্ছিল, সহসা

১ এই ভাষণটি 'তরুণের বিদ্রোহ' নামে ১৮ এপ্রিল, ১৯২৯ সালে সরস্বতী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়।

একদিন এলো মহাত্মার অদ্রোহ শান্তিপূর্ণ অসহযোগ এবং তার টিকি বাঁধা রইলো খাদি-চরকার দড়িতে। স্বরাজের তারিখ ধার্য্য হল ৩১শে ডিসেম্বর। এলো জেলে যাবার দিন, এলো আত্মত্যাগের বন্যা। মন্ত্র এলো বাংলার বাইরে থেকে, অথচ যত চরকা ও যত খাদি সেদিন বাংলায় তৈরি হল, যত লোক গেল বাংলার কারাগারে, যত ছেলে দিলে জীবনের সর্বস্ব বলিদান, সমগ্র ভারতবর্ষে তার জোড়া রইল না; কেন জান? কারণ এই বাংলার ছেলে যতখানি তার দেশকে ভালোবাসে, হয়তো পাঞ্জাব ছাড়া তার একাংশও ভারতের কোথাও খুঁজে মিলবে না। তাই "বন্দেমাতরম" মন্ত্র সৃষ্টি এই বাংলায়। এই বাংলাতে জন্ম নিয়েছিলেন পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় দেশবন্ধু। এদিকে ৩১শে ডিসেম্বর পার হয়ে গেল—স্বরাজ এল না। কোথায় কোন এক অজানা পল্লী চৌরীচৌরায় হলো রক্তপাত, মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ করে। দেশের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুমের মতো এক মুহূর্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সেদিন একজন জীবিত ছিলেন, ভয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না—তিনি দেশবন্ধু। তিনি তখন জেলের মধ্যে; বাংলার বাহির-ভিতরের সকলে মিলে তাঁর সমস্ত চেষ্টা -আয়োজন দিলে নিষ্ফল ক'রে। কে জানে, ভারতের ভাগ্য হয়তো এতদিনে আর-এক পথে প্রবাহিত হতে পারতো, কিন্তু যাক সে কথা। আবার কিছুদিন নিঃশব্দে থাকার পরে সাড়া পড়ে গেছে। সেবার ছিল জালিয়ান - ওয়ালাবাগ, এবার হয়েছে "সাইমন কমিশন"। আবার সেই চরকা, সেই খাদি; সেই বয়কটের অহেতুক গর্জন, সেই তাড়ির দোকানে ধর্না দেওয়ার প্রস্তাব, সেই ৩১শে ডিসেম্বর, এবং সর্বোপরি বাংলার বাইরের নেতার দল আবারও বাংলার ঘাড়ে চেপে বসেছে। আমি জানি এবারও সেই ৩১শে ডিসেম্বর ঠিক তেমনি করে পার হয়ে যাবে। কেবল একটুখানি ক্ষীণ আশার আলো বাংলার এই যৌবনশক্তির জাগরণ। বঙ্গভঙ্গ সেট্‌ল্‌ড ফ্যাক্ট (settled fact) একদিন অ্যান্‌সেট্‌লড্ (unsettled) হয়েছিল—সে এই বাংলাদেশে। সেদিন বাইরে থেকে কেউ ভার বইতে আসে নি, আন্দোলন পরিচালনার পরামর্শ দিতে বাইরে থেকে কর্তা আমদানি করতে হয় নি; বাংলার সমস্ত দায়িত্ব সেদিন বাংলার নেতাদের হাতে ন্যস্ত ছিল।'

বক্তব্য নিঃসন্দেহে তিক্ত। তাঁর মতো শিল্পীর মুখের ভাষা এ নয়। এ যেন কোনো প্রাদেশিক নেতার অসংযত ভাবুক আক্রোশ ফেটে পড়ছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, ইনিই সেই শরৎচন্দ্র যিনি ঠিক সাত বছর আগে 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

এটি তাঁর স্থায়ী মনোভাব ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনি ভালোবাসতেন। তা না হলে 'শেষপ্রশ্নের' রাজেন্দ্রের মৃত্যুর খবর পেয়ে আশুবাবুর কণ্ঠে তিনিই তো বলেছেন, 'তার মানে দেশ ছাড়া আর কোনো মানুষকেই সে আত্মীয় বলে স্বীকার করে নি। শুধুই দেশ,—এই ভারতবর্ষটা। তবু বলি— ভগবান! তোমার পায়েই তাকে স্থান দিয়ো। তুমি আর যাই করো, এই রাজেনের জাতটাকে তোমার সংসারে যেন বিলুপ্ত কোরো না।'

বিপ্লবের সমর্থন তিনি কখনো করেন নি। তিনি বলেছেন, 'ভারতের আকাশে আজকাল একটাই বাক্য ভেসে বেড়ায়—সেটা হল বিপ্লব। বৈদেশিক রাজশক্তি তাই তোমাদের ভয় করতে শুরু করেছে। কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, কখনও কোনো দেশে শুধু শুধু বিপ্লবের জন্য বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন, অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোনো ফললাভ হয় না। বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়, তাই ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিন্তাহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে। নইলে অসহিষ্ণু অভিলাষ ও কল্পনার আতিশয্যে তোমাদের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দেবে না। তাই স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা নয়। যারা মনে করে জগতে আর সব কিছুরই আয়োজনের প্রয়োজন, শুধু বিপ্লবেরই আয়োজন কিছু চাই না-ওটা শুরু করে দিলেই চলে যায়, তারা আর যত-কিছুই জানুক, বিপ্লব-তত্ত্বের কোনো সংবাদই জানে না। মনে মনে যারা বিপ্লবপন্থী, আমার কথায় হয়তো তাঁরা খুশি হবেন না।…'

একদিন বরিশাল যাবার পথে স্টিমারে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, এই রেভোলিউশনারীদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?'

'সম্মুখের আকাশ ফর্সা হইয়া আসিতেছিল, তিনি রেলিং ধরিয়া কিছুক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাক্টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্তত পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তা ছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিস যাবে না, তখন আরও স্পর্ধিত হয়ে উঠবে, সামান্য মতভেদে একেবারে "সিভিল ওয়ার" বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, শরৎবাবু"।'

শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'আমি নিশ্চয় জানি, রাত্রিশেষের আলো-অন্ধকার আকাশের নীচে, নদী-বক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সত্য ছাড়া আর কোনো বাক্যই বাহির হয় নাই।'

দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্র দুজনেই রাজনৈতিক হত্যা এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিপক্ষে ছিলেন। তবুও যারা হিংসার পথে দেশের মুক্তি চায় তাদের ঘৃণা করার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। নিজের এই ভাষণে যুব-সম্প্রদায় যাতে দলবদ্ধ হওয়ার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, সে-চেষ্টাই তিনি করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'পৃথিবীর সমস্ত শক্তিমান জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আত্মকলহ তাদের মধ্যে থাকে না যে তা নয়, কিন্তু বহিঃশত্রুর সম্মুখে সে কলহ তারা স্থগিত রাখতে জানে। শত্রুকে সম্পূর্ণ পরাভূত না করা পর্যন্ত তারা কিছুতেই ঘরোয়া বিবাদে লিপ্ত হয় না। এই তাদের সবচেয়ে বড় জোর। কিন্তু আমাদের? জয়চাঁদ, পৃথ্বীরাজ থেকে শুরু করে সিরাজদ্দৌলা ও মীরজাফরের ও এই মজ্জাগত অভিশাপ আর ঘুচলো না। বাংলাদেশ মুসলমানেরা জয় করতে এলো। এদেশে ব্রাত্য-বৌদ্ধেরা খুশি হয়ে তাদের ধর্ম দেবতার যশোগান করে "ধর্মমঙ্গলে" লিখলেন—

"ধর্ম্ম হইলা যবন রূপী
মাথায় দিলা কালো টুপী
ধর্ম্মের শত্রু করিতে বিনাশ।"

অর্থাৎ বিদেশী মুসলমানরা যে হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রতিবেশী বাঙালি ভায়াদের দুঃখ দিতে লাগল, এতেই তাঁরা পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন। এইতো সেদিনের কথা-নিজেদের মধ্যে লড়াই করতেই অত বড় বিরাট পুরুষ চিত্তরঞ্জনের সমস্ত আয়ু নিঃশেষ হয়ে গেল। আজও কি তার বিরাম আছে? এই যে যুব-সংঘ; খোঁজ করলেই দেখা যাবে, এর মধ্যেও তেরোটা দল। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই - এর কত রকমের মতভেদ, কত রকমের মান-অভিমানের বিরোধ- পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো অস্থির, কখন গড়িয়ে আলাদা হয়ে গেল বলে। বাইরে থেকে জড়ো করে ভিড় করার নাম কি organisation? Organic দেহবস্তুর মতো এর পায়ের নখে ঘা দিলে কি মাথার চুল শিউরে ওঠে? কিন্তু যেদিন উঠবে, সেদিন উপায়হীনতার নালিশও অন্তত বাংলাদেশে উঠবে না।'

তিনি বিদেশী বস্তুর বহিস্কারের সমর্থক ছিলেন কিন্তু খদ্দরের প্রতি অরুচি কোনোদিন লুকোতে পারেন নি। বলেছিলেন, 'ভারতের বিশ লাখ টাকার খাদি দিয়ে আশি কোটি টাকার অভাব পূর্ণ করা যায় না। কাঠের চরকা দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় না এবং গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না। ....

'বাংলার পল্লীতে আমার গৃহ; বাংলাকে আমি চিনি নে এ অপবাদ বোধ করি আমার অতি বড় শত্রুও আমাকে দেবে না। ঘরে ঘরে গিয়ে দেখেছি, এ জিনিস চলে না। স্বদেশবৎসল দু-চারজন পুরুষের যদি-বা চলে, মেয়েদের চলে না। অন্যান্য প্রদেশের কথা জানি নে, কিন্তু এদেশের তাদের দিনান্তে অনেকগুলি বস্ত্রের প্রয়োজন। এই এদেশের সামাজিক রীতি এবং এই এ দেশের মজ্জাগত সংস্কার। সভায় দাঁড়িয়ে খদ্দরের মহিমায় গলা ফাটালেও সে চিৎকার গিয়ে

কোনো মতেই পল্লীর নিভৃত অন্তঃপুরে পৌঁছবে না। সচ্ছল গৃহস্থের কথাই শুধু বলি নে, গরীব চাষাভূষোর ঘরের কথাও আমি বলছি—এই সত্য, এবং একে স্বীকার করাই ভালো। বাংলার কোনো একটা বিশেষ সাবডিভিশনে মণ–দুই চরকায়–কাটা সুতো তৈরি হওয়ার নজীর দাখিল করে এর জবাব দেওয়া যাবে না। এই তো গেল খদ্দরের বিবরণ; চরকারও ঐ অবস্থা। আমাদের ওদিকে চাষাভূষো দরিদ্র ঘরে মেয়েদের উদয়াস্ত খাটুনি। তারই ফাঁকে এক-আধ ঘণ্টা যদি সময় পায়, মহাত্মার আদেশ জানিয়ে চরকার হাতল হাতে তার গুঁজে দিলেও ঘুমিয়ে পড়ে। দোষ দিতে পারি নে। বোধ হয় সত্যিকার প্রয়োজন নেই বলেই এমন ঘটে।'

এই সময়ে তিনি 'পরশুরাম' ছদ্মনামে 'বেণু' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতেও তিনি চরকার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিছু দিন আগে এ কথা নিয়েই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন, কিন্তু এবার নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য রবীন্দ্রনাথকেই উদ্ধৃত করলেন। চরকার অর্থনীতিতে তিনি এতটুকুও বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই লোকেদের ধারণা হয়েছিল যে, তিনি গান্ধীজীর প্রতিপক্ষ। অবশ্যই তিনি গান্ধীজীর বিপক্ষে ছিলেন এবং বড় উগ্র ধরনেরই ছিলেন। তবুও সে উগ্রতা ও বিরোধের ক্ষেত্র বড় সীমিত ছিল। চিন্তাধারার মিল না হলেও গান্ধীজীকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন,এবং ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর যে স্নেহসম্পর্ক ছিল তাতেও কোনো চিড় ধরে নি। কয়েকমাস আগে মালিকান্দার অভয় আশ্রমে[১] তিনি বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে ছাত্রদের ও যুবকদের অন্যান্য প্রোগ্রামের জন্য চিন্তা না করেই সত্য ও নিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করতে বলেছিলেন এবং এও বলেছিলেন যে, নির্ভয়তার সাধনা করো— 'সাহস বাড়ানো এবং নির্ভীকতা অর্জন কোনোমতেই এক বস্তু নয়। একটি দৈহিক, অন্যটা মানসিক। দেহের শক্তি ও কৌশল বৃদ্ধিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অকৌশলীকে পরাভূত করা যায়, কিন্তু নির্ভয়ের সাধনায় শক্তিমানকে পরাস্ত করা যায়—সংসারে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, সে হয় অপরাজেয়।'

মনে হয় তাঁর চিন্তাধারা প্রায়ই তৎকালিক পরিস্থিতির তৎকালিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। যেমন, বারদৌলির প্রশংসা শুনতে শুনতে তাঁর মনে চরম অভিমান জেগে উঠেছিল এবং সেই আবেগ ও উত্তেজনাবশত তিনি এমন কতকগুলি কথা বলেছিলেন, যা বলা হয়তো তাঁর মতো শিল্পীর উচিত ছিল না। রাজনীতি কাজলের ঘর, তাতে ঢুকলে পরে সবার গায়েই কাজলের কালিমা লাগে। তাছাড়া বাংলার অবস্থাও সে সময় বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না, চারিদিকে শুধু দল আর দল। যে কোন কারণেই হোক যখন কোনো মানুষ কোনো একটি দলবিশেষের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সে সেই দলের পক্ষই সমর্থন করে থাকে। তিনি হুগলী জেলার অধিবাসী ছিলেন, তবুও সেখানকার কংগ্রেসকর্মীরা তাঁকে কখনোও নিমন্ত্রণ করে নি। আসলে সে সময় হুগলী জেলা খদ্দরবাদী দলের হাতে ছিল। একবার এক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনার নিজের জেলার লোকেরা আপনাকে ডাকে না, এটা কি অপমানজনক নয়?'

শরৎচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, 'ভালোই হয়েছে যে, ওরা আমায় ডাকে না। আমার শরীর প্রায়ই খারাপ থাকে। ডাকলেও হয়তো যেতে পারতাম না। সে ক্ষেত্রে তারা আরো বিরক্ত হতো। মনে করো যে, আমি তাদের ডাকাডাকির ফলে গিয়েছি, ওরা আমায় বক্তৃতা দিতে বলল। কেউ কি বিশ্বাস করে, যে মানুষটা এত গল্পের বই লেখে, সে ভাষণ দিতে পারে না? তাই বলছি আমায় না ডেকে ওরা আমার খুব উপকারই করেছে।'

কংগ্রেস অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি বরাবরই যেতেন। রাভী নদীর তটে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে উল্লেখযোগ্য অধিবেশনটি হয়, এবং যাতে পূর্ণ স্বরাজের দাবি জানানো হয়েছিল, সেই অধিবেশনে শরৎচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। প্রবাসী বাঙালীরা নিজেদের অপরাজেয় কথাশিল্পীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

১ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯
২. আশ্বিন, ১৯৩৬ (সেপ্টেম্বর, ১৯২৯)

অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'গর্ব করবার জিনিস আমাদের একমাত্র আছে —এই ভাষা।' ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়ছিল। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, 'বেশ আছি। দিনরাত একটা ইজিচেয়ারে ঢাকা-বারান্দায় শুয়ে আছি। বাঁ পা-খোঁড়া, ডান-কান বধির, অর্শের অজুহাতে অকেজো রক্তগুলো নিয়মিত বেরিয়ে যাচ্ছে,—তন্দ্রায় আরামে পদে পদে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপন দেখি, জাগি,—চোখ চাইলেই সুমুখে মস্ত নদী, পালের নৌকোগুলোকে গুনি, হঠাৎ কখন চোখ বুজে আসে, যায় সব খেই হারিয়ে,—দক্ষিণের সূর্যদেব ঘুরে এসে কড়া রোদে গা দেয় তাতিয়ে, চোখ মেলে গুড়গুড়ির নলটা টেনে দেখি,—বলি, কে আছিস রে, তামাক দে —হয়তো দিয়েও যায়, কিন্তু টানলে দেখি তেমনিই ধুঁয়া নেই। সকলে বলে, ঘুমুচ্ছিলেন যে। সাজা তামাক পুড়ে গেছে। যাচাই করবার শক্তি নেই, তবু গলা চড়িয়ে ধমকে বলি, "হ্যাঁ—ঘুমুচ্ছিলাম বই কি! ব্যাটা মিথ্যেবাদী। দে বলচি শীগগির সেই দিল্লি থেকে আনা বড় কলকেটায়, যেন এ বেলার মতো না নেভে।" তারা চলে গেলে মনে মনে বলি, বাবা ভগবান, যদি সত্যিই থাকো, করোই না একটা আবদার মঞ্জুর, কেউ তোমাকে নিন্দে করবে না। মাথার দিব্যি রইল, বাবা, কথাটা রাখো।

'একদিন রাখবে তা জানি, কিন্তু হয়তো আমার মতো সময় বইয়ে দিয়ে। তখন খুশি হয়ে আর নিতে পারব না। কিন্তু ডাক এলো। পাথেয় উপস্থিত। ঘুমুতে-ঘুমুতে আর জাগতে জাগতে পড়া শুরু করি। বহুদিনের অভ্যাস, বহু আফিং রক্ত মাংসে জড়ানো। হেরেছি অনেকের কাছে, কিন্তু হার মানিয়েছিলাম আবগারী ব্যাটাদের। তাই ভরসা আছে, ঘুমের মধ্যেও পাথেয়র রস কস বেয়ে ভুঁয়ে গড়িয়ে পড়বে না।'

এই নিদারুণ স্বাস্থ্যভঙ্গের সময় তিনি তাঁর প্রিয় সুভাষকে কিন্তু ছাড়তে পারেন নি। তাই পরের বছর হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন অনেক হৈ- হল্লা, গাল -মন্দ ও লাঠালাঠির মধ্যে দিয়ে হয়। লাঠির ভয়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিজুলী বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেইজন্যই হয়তো শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা হতে পারে নি। নির্বিঘ্নে নির্বাচন শেষ হয়। শরৎবাবুর দল অর্থাৎ সুভাষের দল আবার প্রতিষ্ঠিত হল। গত দশ বছর থেকে তাঁর যে আধিপত্য চলে আসছিল, তা দূর করা বড়ই কঠিন। তাঁদের দলের বক্তব্য হল, 'ভুল, ত্রুটি যতই হোক-না-কেন তোমরা বলবার কে? দেশের স্বাধীনতা যদি হয় তাহলে তা আমাদের দ্বারাই হবে, তোমাদের দ্বারা না। তাই তোমরা আমাদের কোনো কাজে হাত দিয়ো না।'

প্রতিপক্ষ এত সহজে হার মানতে রাজী নয়। এই আক্রোশ ও দলাদলির বিষয়ে শরৎচন্দ্র খুব রঙ্গ করে লিখলেন,[১] 'দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে এক দল শেম্ শেম্ বললে, গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে, প্রীতি জানালে, আবার আর-এক দল বারো-ঘোড়ার গাড়ি চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়,—ও মায়া। যাই হোক, রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি। "দি লিবারেটেড ম্যান হ্যাজ নো পারসোনাল হোপস্" এ সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকি নেই। জয় হোক কয়লার গুঁড়োর! জয় হোক বারো-ঘোড়ার-গাড়ির।'

কুমিল্লায় তিনি ত্রিপুরা জেলার রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন ও জেলার ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সুভাষ বসুও ছিলেন। পথে তাঁরা এত যত্ন ও সম্মান পান যে, মন আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠে। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র ছিলেন উদ্ঘাটন কর্তা। দুজনে একই কথা বলেন, 'দেওয়ার মতো একটি খবরই আমি দিতে পারি, আর তা হল স্বাধীনতার। আমার আন্তরিক কামনা বাংলার নবযুবক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হোক, তারা সেবা ও ব্যথার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষকে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করুক। আমার দুঃখ শুধু

১ ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩০
২ নভেম্বর, ১৯৩১

এই যে, এই আন্দোলনের সফলতা আমি চোখে দেখে যাবার সময় পাব না।'

কিন্তু দেখা যায় রাজনৈতিক পরিবেশ বেশি দিন তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে নি। তিনি আবার সাহিত্যজগতে ফিরে এসে মানুষকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলেন।

তাই যখন তিন বছর পর কংগ্রেসের সদস্য পদ থেকে গান্ধীজী ত্যাগপত্র দেন, তখন শরৎচন্দ্র শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লেখেন, 'চরকায় দেশের অধোগতি প্রতিহত করিতে পারে কিনা, শান্তিপূর্ণ অসহযোগ দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আনিতে পারে কিনা, আইন অমান্য আন্দোলনের শেষ পরিণাম কি, এ সকল প্রশ্ন আজ থাক, কিন্তু মহাত্মার এ দাবি সত্য বলিয়াই স্বীকার করি যে, তাঁহার প্রবর্তিত পথে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

'উত্তর কালে হয়ত তাঁহার মত ও পথ উভয়ই পরিবর্তিত হইবে, তাঁহার প্রবর্তিত আদর্শের হয়তো চিহ্ন থাকিবে না, তথাপি তিনি যাহা দিয়া গেলেন, সমস্ত পরিবর্তনের মাঝেও তাহা অমর হইয়া রহিবে। শৃঙ্খলমুক্ত ভারত তাঁহার ঋণ কোনও দিনও বিস্মৃত হইবে না। আজ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তিনি বাহিরে আসিয়াছেন মাত্র, কিন্তু ইহাকে ত্যাগ করেন নাই, করিবার উপায় নাই। যে শিশুকে তিনি মানুষ করিয়াছেন, সে আজ বড় হইয়াছে। তাই তাহাকে নিজের কঠিন শাসনপাশ হইতে মহাত্মা স্বেচ্ছায় মুক্তি দিলেন। ইহাতে শোক করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই,—এই মুক্তিতে উভয়েরই মঙ্গল হইবে, এই আমার আশা।'

২০

সাধারণত সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন একটা কিছু থাকে যার দরুণ সাধারণ মানুষের থেকে তাঁরা একটু ভিন্ন রকমের হয়ে পড়েন। এটা এক ধরনের পাগলামি। পশুপক্ষীদের প্রতি শরৎবাবুর প্রেমও এক ধরনের পাগলামি। একবার কাশীতে একটি ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার উপন্যাসে বর্ণিত মানবিকতায় আমি অত্যন্ত প্রভাবিত কিন্তু কুকুরের উপর যে আপনি এত খরচ করেন, সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, তবে তুমি বোধহয় জান না যে, মানুষের উপর আমি এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় করেছি।' ভুল তিনি বলেন নি। মানবিক করুণার যে পাঠ তিনি শৈশবে রাজুর পাঠশালায় শিখেছিলেন, সারা জীবন তাকেই তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। রেঙ্গুনে সর্বহারা মানুষেরাই তাঁর সব ছিল। বাংলা দেশে ফিরে এসে তিনি গ্রামের লোকেদের জন্য স্কুল খোলেন, রাস্তা-ঘাট তৈরি করান, তাদের হয়ে মামলা লড়েন। নানা লোকেদের নানান প্রকারে অর্থসাহায্য করেছেন।

পৌষমাসের এক বর্ষণমুখর দিনে ছাতা মাথায় তিনি কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ একটি ভিখারিণীর উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টিতে তার কাপড়-চোপড় ভিজে গিয়েছিল, বেচারী শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল। শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ব্যাগ বার করে তার হাতে উপুড় করে দিলেন টাকা ও খুচরো মিলিয়ে বেশ অনেকগুলি টাকা ছিল। নরেন্দ্র দেব আপত্তি করে বললেন, 'দাদা, একি করছেন?'

শরৎচন্দ্র নরেন্দ্র দেবের কথায় কর্ণপাত না করে ভিখারিণীকে বললেন, 'এই শীতে বাইরে বেরিয়ো না। যতদিন চলে এইটুকু দিয়েই কাজ চালাও, পরে আরো দেব।' এই বলে তাকে নিজের বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়ে এলেন।

আর-একবার কবি নরেন্দ্র দেবের বাড়িতে কথাবার্তায় বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। কবি-দম্পতি পথে এগিয়ে দেবার জন্য অনেকখানি রাস্তা এসেছিলেন। মহানির্বাণ মঠ পর্যন্ত পৌঁছতে-পৌঁছতে হঠাৎ একটি শিশুকণ্ঠের কান্না শোনা গেল। শরৎচন্দ্র চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন, পুঁটলি বাঁধা অবস্থায় একটি নবজাত শিশু। সেখানেই তিনি বসে পড়লেন। পুঁটলি খুলে

১ অক্টোবর, ১৯৩৪

দেখলেন, কাঁচ শরীরে অসংখ্য পিঁপড়ে ধরেছে। অত্যন্ত করুণ স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'বাবা আমার, মরে যাই আমি!' বলতে বলতে পিঁপড়ে পরিষ্কার করতে লাগলেন। তারপর রাধারাণী দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাধু, গরম দুধ আর তুলোর পলতে বানিয়ে নিয়ে এসো তো।'

তখুনি সে সব ব্যবস্থা হলে শিশুটিকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, 'তোমরা বরং থানায় গিয়ে খবর দিয়ে এসো।'

রাধারাণী দেবী বললেন, 'না, না, এসব করবার দরকার নেই। আমি মানুষ করব।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'তা হয় না, এটি একটি পরিত্যক্ত সন্তান। এর পিছনে নিশ্চয় কোনো করুণ ইতিহাস আছে। এসব ঝুঁকি নিলে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে।'

বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। একটি দোকান থেকে হাসপাতালে ফোন করা হল। সেখান থেকে জবাব এল, 'এ ধরনের অবাঞ্ছিত নবজাত শিশু হাসপাতালে নেওয়ার নিয়ম নেই। এরপর পুলিসে ফোন করা হল। পুলিস প্রথমে আসতে রাজী হয়নি। কিন্তু শরৎবাবুর নাম শুনে তৎক্ষণাৎ দুজন সেপাই এসে বাচ্চাটিকে নিয়ে গেল। শরৎবাবু ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই বসে ছিলেন। পরদিন কাঠফাটা রোদে দোকানীকে টেলিফোনের পয়সা দিয়ে এসেছিলেন।

পরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক রকম কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। যেমন, সেদিন যখন নবজাত শিশুটির একটা কোনো ব্যবস্থা করছিলেন, তখন চারিদিকে বেশ ছোটখাটো একটা ভিড় জমে উঠেছিল। সেই ভিড়ের মধ্যেই একজন বলে উঠলেন, 'বেঁচে থাকুন শরৎবাবু! বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়ির সামনে এমনিভাবেই বাচ্চা পড়ে থাকতে দেখা যাবে।'

জানি না এ অপবাদের কতখানি সত্য, তবে তাঁর প্রসিদ্ধির এটা একটা প্রবল প্রমাণ। কিন্তু সেবার কাশীর ছাত্রটির প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'মানুষ ও কুকুরের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত আমি দেখতে পাই না, দুজনেই সমান পশু। তবু দুজনের মধ্যে কুকুরকে আমি বেশি পছন্দ করি। কারণ সে তখনই ঘেউ ঘেউ করে যখন তার রাগ হয়। কিন্তু মানুষ মনে মনে যখন ঘৃণা করে, তখনও বেশ হেসে হেসে কথা বলে।'

ছেলেবেলা থেকেই তিনি কুকুর ভালোবাসতেন। বর্মা থেকে ফিরে এসে ভাগলপুরের এক বন্ধুকে তিনি একটি কুকুর দিয়েছিলেন। যখন শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে যেতেন, কুকুরটি তাঁকে দেখে খুব খুশি হত। শরৎচন্দ্র তাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'কি পপি, কেমন আছিস্? এতক্ষণ কোথায় ছিলি? আয়! আয়! অসুখ করেছে নাকি? আহা, গায়ে কত ধুলো লেগেছে। আরে ওটা কি? চোট লেগেছে? মারপিট করেছিস্ নিশ্চয়ই? না, কিছুই দেখা-শোনা করো না তুমি কুকুরের। কতবড় ঘা হয়েছে, কত কষ্ট হয় ওর। কুকুরের প্রতি একটুও লক্ষ্য রাখ না তুমি।'

তাঁর চোখ দুটি সজল হয়ে উঠত। কুকুরের সেবা যত্ন আরম্ভ করে দিতেন, গরম জল, তেল, সাবান, ওষুধ, ব্যান্ডেজ সব ব্যবস্থাই করতেন। তারপর ওষুধ লাগিয়ে তাঁকে বেঁধে শুইয়ে দিতেন।

ছোট ছেলেদের মিষ্টি খাওয়াবার সময়ও তিনি কিন্তু কুকুরকে ভুলতেন না। বলতেন, 'আরে ভুলেই গিয়েছিলাম। পপিকেও মিষ্টি দাও ভাই।' প্রতিদিন স্নান করিয়ে পপিকে নিজের হাতে ডাল, ভাত খাওয়াতেন। এই পপিকেই একদিন কী কারণে শরৎ মজুমদারের ছেলে রিভলবার দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন। হয়তো পপি তাঁর বাড়ি চলে গিয়ে থাকবে। ফলে শরৎবাবুর বন্ধু অর্থাৎ পপির মালিক ভদ্রলোকের হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নেন এবং খুব মারেন। ঝগড়া এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছল যে, কোর্টের শরণাপন্ন না হলেই নয়। ঠিক সে সময়ে হঠাৎ শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে আসেন। তিনি সব ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনে, রেগে বললেন, 'আমি যদি এখানে থাকতাম তাহলে রিভলবার দিয়ে তাকেও মেরে বসতাম। তুমি ভয় পেয়োনা। যদি সে নালিশ করে, তাহলে পয়সা আমি দেব, সে আমার সন্তানকে মেরেছে।'

শরৎ মজুমদারও শরৎচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। যখনই ভাগলপুরে আসতেন, তাঁর সংগেও দেখা করতেন। কিন্তু এ ঘটনার পর আর যান নি। ডেকে পাঠালেও যান নি, বলেছেন, 'তাকেই বরং আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তাঁর ছেলে পপিকে মেরে ফেলেছে।'

কাশী প্রবাসে থাকতে তিনি শৈলেশ বিশীকে বলেছিলেন, 'কাশীতে এসে ব্রাহ্মণ ভোজন করানো নিয়ম, কিন্তু আমি কি ঠিক করেছি জান? আমি কুকুরদের ভোজ দেব। কাশীর কুকুররা বড় দুঃখী। এখানে ছোঁয়াছুঁয়ির বড় বিচার, কুকুর ছুঁলেও এখানে স্নান করতে হয়। না খেতে পেয়েই বেচারীরা মরে যায়। তাই ওদেরই খাওয়ানো উচিত।'

কী আর করবেন বিশী মহাশয়, একটি মোড়ে গিয়ে কুকুরের খোঁজ করতে লাগলেন, তারপর তাদের এক জায়গায় ডেকে খুব ভূরিভোজন করানো হল। শরৎচন্দ্রের আদেশ ছিল যে, যতক্ষণ না কুকুরদের খাওয়াদাওয়া হয়, ততক্ষণ কোনো মানুষই খেতে পাবে না।

একবার স্বাস্থ্যলাভের আশায় তিনি দেওঘরে গিয়েছিলেন। সেখানেও যখন তিনি বেড়াতে বেরুতেন কোথা থেকে একটা কুকুর রোজ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেত। কিন্তু বাড়ির মালিক ও চাকরের ভয়ে কোনোদিন সে বাড়ির ভেতরে ঢুকত না। বাগানের মালী কুকুরটাকে দেখলেই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিত। একদিন শরৎচন্দ্র হঠাৎ কেমনভাবে কুকুরের চোখে জল দেখে চাকর-বাকরদের তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হল্লা শুনে তাঁর বন্ধু বাড়ির মালিকও সেখানে উপস্থিত হলেন। সব শুনে তিনি বললেন, 'দাদার সব ব্যাপারই অদ্ভুত। মানুষ খেতে পায় না, আর আপনি রাস্তার কুকুর ডেকে খাওয়াচ্ছেন। বেশ, বেশ!'

শরৎচন্দ্র খুব পেট ভরে কুকুরটিকে খাওয়ালেন। কুকুরের ভালোবাসার জোরে আরও দুদিন তিনি দেওঘরে রয়ে গেলেন। তারপর যেদিন তিনি রওনা হলেন, সত্যি সত্যিই কুকুরটি তাঁকে স্টেশন পর্যন্ত ছাড়তে এসেছিল। তার স্মৃতিকে অমর করে তিনি লিখেছেন, 'সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল, তারা বক্‌শিশ পেলে সবাই, পেলে না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে, যাবার আগে তারই মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম, স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে। বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলি মনে হতে লাগল অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ-ঢোকবার যো নেই। হয়তো পথে দাঁড়িয়ে দিন-দুই তার কাটবে, হয়তো নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোনো ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা-তারপর পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।'

শ্রীকান্তও তো হঠাৎ একদিন যখন ছেলেবেলার সেই গ্রামে গিয়ে পৌঁছল, তখন ভাঙা চালের নিচে একটা কঙ্কালসার কুকুর দেখতে পেয়ে সেও ঠিক এইরকমই মনে ব্যথা পেয়েছে, 'সেই কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থামিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম সে-বেচারা এইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত পরিচয়ও এই প্রথম, শেষও এইখানে, তবু আগু বাড়াইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোন্ বন্ধুহীন লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে ফিরিবে তাহার অন্ধকার নিরালা ভাঙগা ঘরে। এ সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়েরই কেহ নাই।

'বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের এই অভাগা সঙ্গীর জন্য বুকের ভেতরটা হঠাৎ হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চোখের জল আর সামলাইতে পারি না এমনি দৃশ্য।'

একবার মহিলারা শরৎ-সাহিত্য পড়ে খুশি হয়ে তাঁকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে। সেখানে গিয়ে দেখেন শ্বেত-পাথরের টেবিলে খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এত অঢেল যে যেন কোনো দৈত্যকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। ভাবতে লাগলেন এখন কী করা যায়! হঠাৎ গলির কুকুরদের উপর তাঁর নজর পড়ে। খিদেয় হাড়-পাঁজর বার করা চেহারা সব, মনে হয় কত দিন না জানি পেট ভরে খেতে পায় নি। তিনি গৃহস্বামীকে বললেন, 'মশাই, একটা বড় গামলা থাকে তো আনিয়ে দিন।'

কথা শুনে গৃহকর্তা অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু অতিথি চাইলে তিনি কি আর করতে পারেন? গামলা আনা হলে শরৎচন্দ্র তাতে ডাল, ভাত, মাংস, তরকারী, মিষ্টি, পায়েস যা কিছু ছিল সব রেখে গলির কুকুরদের সামনে গিয়ে ঢেলে দিলেন। আহা, তারা যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে

পেল। গৃহকর্তা হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'এগুলো তো ছেলেপুলেরাও খেতে পারত।'

শরৎবাবু বললেন, 'তারা তো রোজই খায়, কুকুরদের তো আজই জুটল, বেচারীরা যেন নতুন প্রাণ পেল।'

একবার কোত্থেকে একটা কুকুরী তাঁর বাগানে কয়েকটি বাচ্চা দিয়ে গেল। রোজ ঠিক সময়ে এসে তাদের দুধ খাইয়ে যেত। কিন্তু একদিন নির্দিষ্ট সময়ে সে এল না। শরৎচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বাচ্চাগুলোকে দুধ খাইয়ে তাদের মায়ের খোঁজে বেরুলেন। তিনদিন পর্যন্ত খোঁজা খুঁজি করে হয়রান হয়ে শেষে তিনি ঘোষণা করলেন, 'কুকুরের খোঁজ যে দেবে তাকে দশ টাকা দেওয়া হবে।'

হাঁফাতে হাঁফাতে দুজন লোক এসে জানাল যে, পাওয়া গেছে কিন্তু শুকনো কুয়োর মধ্যে পড়ে রয়েছে, তবে বেঁচে আছে।

শরৎচন্দ্র বললেন, 'এখুনি তাকে নিয়ে এসো। আরও পাঁচ টাকা পাবে।'

একটু পরেই মাদী কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে লোক দুটি এসে হাজির। মাকে দেখে বাচ্চারা খুব খুশি হয়ে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল। শরৎচন্দ্রও আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

সামতাবেড়ে থাকতে তিনি লাল রঙের একটা কুকুর পুষেছিলেন, নাম ছিল বাঘা। ভেলুর স্থান না পেলেও বাঘার আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি ছিল না। একদিন একটা পাগল শেয়াল তাকে কামড়ে দেয়, চিকিৎসা করানো সত্ত্বেও সে বাঁচেনি। ব্যথিত হৃদয়ে শরৎচন্দ্র ডায়ারিতে লিখেছিলেন,

> 'আজ বাঘা মারা গেল।
> মোহিনী ঘোষালের বাড়ির সম্মুখে কি জানি কবে তাকে
> পাগল শিয়ালে কামড়েছিল।'

এসব কথা এক মুখ থেকে অন্য মুখে ঘুরতে ঘুরতে অতিরঞ্জন হওয়া অনিবার্য। গল্পের স্বরূপ পর্যন্ত কোথাও কোথাও বদলে গিয়েছে। কিন্তু তা বলে ঘটনাগুলি মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। শুধু কুকুরই নয়, অন্যান্য পশুও তাঁর খুব প্রিয় ছিল। একবার ভাগলপুরের অ্যাডভোকেট চণ্ডীচরণ ঘোষের সঙ্গে তিনি বিহার শরীফ দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি টমটমে চড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল, কিন্তু ঘোড়া চলতেই চায় না। টমটমওয়ালা তিন-চার বার কষে চাবুক দিয়ে মারল। শরৎচন্দ্র শিউরে উঠে বললেন, 'মেরো না, মেরো না, না যেতে চায় নাই সই। আমরা যাব না।'

টমটমওয়ালা বলল, 'মশাই, এ ভাবেই এরা চলে।' বলে কষে আরও তিন-চারবার চাবুক মারল। শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে টমটম থেকে নেমে পড়ে বললেন, 'আমি যাব না।'

ঘোষবাবু অনেক করে বোঝালেন। একটি শর্তে শরৎ যেতে রাজী হলেন যে, টমটমওয়ালা আর ঘোড়াকে মারবে না। টমটমওয়ালাকে অগত্যা প্রতিজ্ঞা করতেই হল, তখন শরৎচন্দ্র টমটমে চড়ে বললেন,'বেচারী জানোয়ার আমাদের মতো চিৎকার করে অত্যাচার, অনাচারের প্রতিবাদ জানাতে পারে না, তাই এদের প্রতি আমার বড় সহানুভূতি হয়।'

সত্যিই তিনি যে ধরনের সহানুভূতিশীল মনের অধিকারী ছিলেন, তাতে যে কোনো প্রাণীর কষ্ট দেখলে মন ছটফট করা স্বাভাবিক। এক প্রতিবেশীর গোরু প্রসব বেদনায় ছটফট করাতে সে রাতে তিনি ঘুমোতে পর্যন্ত পারেন নি। তাঁর নিজের কিছু করবার ছিল না তাই ভগবানকে ধিক্কার দিতেন—কেন তিনি পৃথিবীতে এত কষ্টের সৃষ্টি করেছেন!

শুধু গোরুই নয়, বিষধর সাপের প্রতিও তাঁর অকুণ্ঠ মমতা ছিল। শীতকালে দুপুরবেলায় সামতাবেড়ে বাড়ির সামনের বাগানে ঘাসের উপর বড় বড় সাপেরা রোদ পোয়াতো। শরৎচন্দ্র

সেখানে বসে পাহারায় মোতায়েন থাকতেন, ছোট ছেলেদের সেখানে যেতে ও হৈ হল্লা করতে বারণ করতেন। বলতেন, 'তোমরা ওদিকে যেয়ো না, ওরা ওখানে রোদ পোয়াচ্ছে, তোমরা গেলে পালিয়ে যাবে।'

পাখিদেরও তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। 'দেওঘরের স্মৃতি' নামক প্রবন্ধে তিনি কুকুরদের সঙ্গে পাখিদেরও মনোরম বর্ণনা করেছেন। 'দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে দোয়েল। অন্ধকার শেষ না হতেই তাদের গান আরম্ভ হয়, তারপরে একটি-দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি-পাশের বাড়ির আমগাছে, এ বাড়ির বকুল-কুঞ্জে, পথের ধারের অশ্বত্থ গাছের মাথায়—সকলকে চোখে দেখতে পেতাম না, কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হতো যেন ওদের প্রত্যেককেই চিনি। হলদে রঙের একজোড়া বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসত। প্রাচীরের ধারে ইউক্যালিপটাস্ গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেঁকে যেত। হঠাৎ কি জানি কেন, দিন-দুই এলো না দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম,-কেউ ধরলে না তো? এদেশে ব্যাধের অভাব নেই,—পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা-কিন্তু তিন দিনের দিন আবার দুটিকে ফিরে আসতে দেখে মনে হলো যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল।'

শরতের পরদুঃখকাতরতা সেদিন চরমে উঠল যেদিন বন্ধুর সঙ্গে তিনি শ্যামবাজার যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কাকাতুয়ার করুণ চিৎকার একটা বড় বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে এসেছিল। শরৎচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লেন। দারোয়ান তাকে কিছুতেই আটকাতে পারল না। শরৎবাবু বাড়ির ভেতর গিয়ে দেখলেন কাকাতুয়ার গলায় দড়ি জট পাকিয়ে গেছে। সে জট ছাড়াতে না পেরে বেচারী চিৎকার করছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গলার ফাঁস খুলে দিলেন। দারোয়ান ভাবল যে, এ নিশ্চয় কোন চোর বদমাশ। কাকাতুয়া চুরি করতে এসেছে। দারোয়ান তাঁকে মারবার জন্য উদ্যত হল। চেঁচামেচি শুনে বাড়ির কর্তা বাইরে বেরিয়ে এলেন। শরৎবাবুকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে? কাকে চাই?'

তার জবাবে শরৎবাবু বললেন, 'এই পাখিটি আপনার? পাখি পোষবার আপনার খুব শখ তাই না?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি কী সব বলছেন?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'জীবজন্তু পুষতে গেলে মনে মমতা থাকা উচিত। কখন থেকে কাকাতুয়া চেঁচাচ্ছে আপনাদের কারুর খেয়াল হয় না?'

ভদ্রলোক ভাবলেন লোকটা নিশ্চয় পাগল। ততক্ষণে শরৎচন্দ্রের বন্ধুও ভেতরে এসে পড়েছিলেন। তিনিই বললেন, 'ইনি হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।' একথা শুনে ভদ্রলোক খুবই দুঃখিত হলেন। ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন। শরৎচন্দ্রও সব রাগ-দুঃখ ভুলে গেলেন।

রেঙ্গুনে তাঁর কাছে একটা নূরী পাখি ছিল। ওই জাতির একটি পাখি আবার তিনি পুষেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন তার বাটুবাবা। সন্তানের চেয়েও তিনি বাটুবাবাকে বেশি ভালোবাসতেন। একদিন শৈলেশ বিশী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি দেখলেন যে পেয়ারা গাছে খুব বড় বড় ভালো পেয়ারা পেকে রয়েছে। লোভ সামলাতে আর পারলেন না, পেয়ারা পেড়ে খেতে লাগলেন। ততক্ষণে শরৎচন্দ্র সেখানে এসে পড়েছিলেন। হঠাৎ কী খেয়াল চাপল তাঁর মাথায়, চাকরকে ডেকে বললেন, 'এখুনি সব পেয়ারা পেড়ে পাড়ার লোকেদের দিয়ে এসো।'

বিশী মহাশয় অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। শরৎচন্দ্র বললেন, 'না জিজ্ঞেস করে তুমি পেয়ারা কেন পেড়েছ? এক কাজ করো, তুমিই না হয় ওগুলো নিয়ে যাও।'

এরপর বিশী মহাশয়কে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ঘরের কুলুঙ্গিতে চার-পাঁচটা ছোট ছোট বাটিতে, কোনোটায় বেদানার দানা, কোনোটায় পেস্তা, বাদাম, কিশমিশ ইত্যাদি ছিল। বললেন, 'এ সবই বাটুবাবার খাবার। ঘণ্টায় ঘণ্টায় একবার করে খায়। তার খাবার আগে বাড়ির কেউ কোন ফল খেতে পারে না, কিন্তু তুমি খেয়েছ।'

একদিন সেই বাটুবাবা হঠাৎ উড়ে গেলো। শরৎচন্দ্র তখন দাবা খেলছিলেন, আনমনা হয়ে

পড়লেন। মাঝে-মাঝে বাইরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে আসছিলেন। কেউ উঠলে পরে বলতেন, 'না, না, চিন্তার কিছু নেই, ঠিক ফিরে আসবে, কতবার এসেছে।'

কিন্তু শান্ত মনে তিনি নিজেই শেষ পর্যন্ত বসে থাকতে পারছিলেন না। বারবার বাইরে গিয়ে দেখে আসছিলেন। সন্ধে হতে বন্ধুরা যে যার বাড়ি ফিরে চললেন। একটু এগিয়েছে কি তাঁরা শরৎবাবুর উল্লসিত কন্ঠস্বর শুনতে পেলেন, 'পাখি এসে গেছে, এই গাছের উপর এতক্ষণ বসে ছিল।'

বাটুবাবার মৃত্যুর কথা তিনি ডায়ারিতে যেভাবে লিখেছিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে কত গভীর ভাবেই না তাকে তিনি ভালোবাসতেন। তিনি লিখেছেন,—

'আজ রাত্রি ১০-৪৫
বাটুর মৃত্যু হল
মঙ্গলবার ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৮
সামতাবেড়, হাওড়া।
'বন্ধন থেকে সে নিজেই শুধু মুক্তি পেলে না
আমাকেও একটা মস্ত মুক্তি দিয়ে গেল।
প্রভাসের পাশেই সমাহিত করলাম।
বাকি রইল কেবল আর একটা।'

বাকি আর একটির বিষয়ে তিনি কিছু লিখে যান নি। হতে পারে তাঁর কাছে আর একটা ওই ধরনের পাখি ছিল, বা এও হতে পারে, এ ইঙ্গিত, তাঁর নিজের প্রতি। তাঁর কাছে এমনিতে অনেক রকমের পাখি ছিল। ময়ূর, ময়না, বড় মিঞা, ও ছোট মিঞা নামে দুটো ছাগল। ছাড়া স্বামীজী নামে আর একটি ছাগলও ছিল। কসাইয়ের ছুরির হাত থেকে তাকে কিনে এনেছিলেন। তার মৃত্যুর কথাও তিনি ডায়ারিতে লেখেন—

'১৩ই মাঘ ১৩৩৯
(বেলা ১১ ৩)
বৃহস্পতিবার স্বামীজীর মৃত্যু
আর একটা ভাবনা ঘুচলো।
সামতাবেড়, হাওড়া।'

অক্ষয়কুমার মিত্রের ডায়ারি থেকেও একটি ঘটনার কথা জানা যায়—

'হাওড়ার পুলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহাকে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া, কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া দেখি যে, একটি মহিষ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অতিরিক্ত ভার বহন করিতে না পারিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার নাক দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে এবং শকটচালক তাহাকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করিতেছে।'

পুজোয় পশুবলি দেওয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বিপক্ষে ছিলেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়াতে হিরণ্ময়ী দেবী কালীমন্দিরে দুটো ছাগল বলি দেওয়ার মানত করেন। শরৎবাবু জানতে পেরে দুটো ছাগলের মূল্য পাঠিয়ে দিলেন। বলি দেওয়া তিনি একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। 'লালু' গল্পে তিনি নিজের এ বেদনাকে ব্যক্ত করেছেন। এ-সব গল্পের যেন শেষ নেই। প্রত্যেক ঘটনা একই কথা বলে,—মজ্জাগত সহজ করুণ কাহিনী, বড় অতলস্পর্শী।

এই অসীম করুণার মধ্যে দিয়ে কথাশিল্পীর যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা কি কুপথগামী কোন মানুষের ছবি? তাঁর হৃদয়ে এই যে অফুরন্ত স্নেহ তা কি শুধু আজীবন ঘোর উপেক্ষা ও অবহেলা পেয়েছিলেন বলেই? কিম্বা অপরের জন্য এত যে স্নেহ সে শুধু নিজের কোনো সন্তান ছিল না বলে?

হয়তো স্বাভাবিক। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁর অন্তরের এই যে করুণাধারা তা তাঁর সহজ মানবিকতার ইঙ্গিত দিত।

এস. পি. সি. এ. পশুদের প্রতি অত্যাচার নিবারণী একটি সংস্থা। শরৎচন্দ্র বহুদিন এই সংস্থাটির সভাপতি ছিলেন। তাঁর কার্যালয়ে এই সংস্থার অধিকারীদের বিরুদ্ধে কলকাতার গাড়িওয়ালারা সত্যাগ্রহ করে। একসময় তা এমন হিংস্র রূপ নেয় যে শেষ পর্যন্ত গুলি চালাতে হয়েছিল। ফলে চারজন লোকও মারা যায়। তবু নিরীহ পশুদের উপর অত্যাচার তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল।

২১

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর বয়সে খুব ধুমধামের সঙেগ তাঁর জন্ম-জয়ন্তী[১] পালন করা হয়। সেদিন কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট—এ যে সভা হয়, তার সভাপতি ছিলেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সভায় চন্দ্রশেখর ভেংকটরমন প্রস্তাব করেন যে, দেশের তরফ থেকে কলকাতায় এই শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের যথোচিত সংবর্ধনা ও আনন্দোৎসব অনুষ্ঠান করা হোক।

প্রস্তাব সমর্থন করে সেদিন শরৎচন্দ্র বলেন, 'আমি জানি, আমাদের দেশের অনেকেই বিশ্বভারতীকে তাঁর একটা খেয়াল বলে মনে করেন। আমি বলি, হলই বা খেয়াল, কিন্তু কার খেয়াল ও কত বড় সে খেয়াল তা আমাদের ভুললে চলবে না। তাই বলি, অনুষ্ঠান করুন, আনন্দোৎসব করুন, কিন্তু আসুন কিছু টাকা তুলে দেশের লোক আমরা তাঁর হাতে দিই। তিনি এই বুড়ো বয়সে বিশ্বভারতীর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এ লজ্জা আমাদের।'

এই সভাতেই জয়ন্তী উৎসব সমিতি গঠন করা হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সভাপতি হন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সহকারী সভাপতি ছিলেন। শরৎচন্দ্রও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সে-সময় উত্তরবঙেগ দারুণ বন্যার প্রকোপ হয়। কবিগুরু শরৎচন্দ্রকে লেখেন, 'শুনেছি তোমরা আমার অর্ঘ্যরূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সংকল্প করেচ। দেশের এমন দারুণ দুর্দিন, এ সময়ে অন্য কোনও ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবী করা বিহিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও, তবে সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখহরণ। আমিও স্বতন্ত্রভাবে সেজন্য চেষ্টা করচি·····।'[২]

বিশ্বভারতীর জন্য শরৎচন্দ্রের অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি। এ নিয়ে তিনি বরাবর দুঃখ করেছেন। উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য চাঁদার ব্যবস্থা হয়েছিল, তা থেকে যা অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল কবিগুরু তা বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে দিয়ে দেন।

এই অভিনন্দন সমারোহটি[৩] আসল জন্মদিন থেকে প্রায় সাতমাস পরে হয়েছিল। এই নিয়ে সমিতিতে যথেষ্ট মতভেদ হয়। কিন্তু অমল হোম, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙেগ পরামর্শ করে চুপচাপ এ কাজের ভার শরৎচন্দ্রের হাতে তুলে দেন। যেমন ভাবেই হোক এ কথা চাপা থাকে নি। মানপত্র কে পড়বেন? এ নিয়েও মতভেদ চলছিল। পড়ার কথা ছিল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর, কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়াতে কামিনী রায় তা পড়েন। শরৎচন্দ্র মাথা নিচু করে সংকুচিত হয়ে বসেছিলেন। মানপত্রের প্রথম লাইনটি ভোলার মত নয়, 'তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।'

প্রায় চার বছর আগে[৪] অমল হোমের বিবাহ বাসরে তাঁকে দেখে শরৎচন্দ্র ঠিক সেই রকমই বিস্মিত হয়েছিলেন। 'অনেক দিন পর সেদিন বিবাহ সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কী আশ্চর্য সুন্দর,—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে, রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়

১. ১৬ মে, ১৯৩১
২. ২৯ অগাস্ট, ১৯৩১
৩ ডিসেম্বর, ১৯৩১
৪ ২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৭

সৌন্দর্য। জগতে এত বড় বিস্ময় আছে জানতাম না।'

এই সভার কিছুদিন পর রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনার জন্য টাউন হলে আর-একটি সম্মেলনে শরৎচন্দ্র সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। সভাপতির ভাষণে তিনি নিজের সাহিত্য জগতে প্রবেশের কথা বলতে গিয়ে কবিগুরুর কাছে ঋণ স্বীকার করেন, ও তাঁর প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জানান। 'কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো। বিধাতার এই আশীর্বাদ শুধু আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য করেছে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল করে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই এবং সেইসঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়টুকু তাদের দিয়ে যাব যে, কবির শুধু কাব্যই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেছি, তাঁর কথা কানে শুনেছি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেছে। .... আমরা সমবেত হয়েছি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে দিতে। তাঁকে সহজ ভাবে বলতে—কবি, তুমি অনেক দিয়েছো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েছি। সুন্দর, সবল সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েছো তুমি, তুমি দিয়েছো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েছো অনুরূপ সাহিত্য, দিয়েছো জগতের কাছে বাংলার ভাষা ও ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েছো যা সকলের বড়—আমাদের মনকে তুমি দিয়েছো বড় করে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্মবিরুদ্ধ। প্রজ্ঞাবান যাঁরা যথাকালে তাঁরা এর আলোচনা করবেন; কিন্তু তোমার কাছে আমি নিজে কি পেয়েছি, সেই কথাটাই ছোট করে জানাবো বলেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।' নিজের ছেলেবেলার কথা বলতে বলতে শরৎচন্দ্র বলেন যে, কিভাবে তাঁর রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং কিভাবে তিনি প্রভাবিত হন। তিনি বলেন, 'তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলব না। কোনো কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে চায়, এর পূর্বে কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে, তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওই তো খান কয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

'এরপরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনও দিন লিখেছি; দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে, কি করে যে নবীন বাংলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো আমিই তার কোনও খবর জানি না। কবির সঙ্গে কোনও দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাই নি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খান-কয়েক বই-কাব্য ও কথা-সাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল—পরম শ্রদ্ধা বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ঐ ক'খানা বই-ই বারবার করে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটেছে কি না—এ-সব কথা কখনো চিন্তাও করি নি— ও-সব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

'একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবি শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম-ভয়ের কথা মনেই হলো না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে আমি পারি নে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওর অন্তরের

সন্ধান আমাকে দিয়েছে। পণ্ডিতের তত্ত্ব বিচারে তাতে ভুল যদি থাকে তো থাক, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হয়ে আছে।....

'মানুষ–রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেছি। কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা প্রবর্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেন নি, তার একটা হেতু দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারগ, তার নিন্দে করতেও তিনি তেমনি অক্ষম। আরও বলেছিলেন যে, তোমরা যদি এ–কাজ কর, কখনো ভুলো না যে, অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্য–বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখতো।'

এটা সেই যুগ যেখানে চারপাশে শুধু রবীন্দ্রনাথই ছেয়েছিলেন। সেই বটবৃক্ষের তলায় শরৎচন্দ্র শুধু নিজের আসনই পাতেন নি বরং দেশ ও প্রান্তের জন–মানুষের দৃষ্টিও সেদিকে আকর্ষিত করেছিলেন। এ প্রেরণাও তিনি কবিগুরুর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এ কথা তিনি কোনোদিন অস্বীকার করেন নি। তাঁর মতো প্রতিভাসম্পন্ন লেখক, যিনি সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র পথ ও ভূমি তৈরি করতে পূর্ণ সক্ষম ছিলেন, তিনি নিজের ক্ষমতা জাহির করে না বেড়িয়ে, নিজের অগ্রজ বা সমসাময়িক সাহিত্যিকের কাছে প্রেরণা গ্রহণ করেন, নিঃসন্দেহে এ তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে সেই অবস্থায়, যখন দৈনন্দিন জীবনে আমরা ও ধরনের অনেক উদাহরণ দেখতে পাই যে, একই যুগের বিভিন্ন প্রতিভাশালী লেখক, কবি ও শিল্পী ঈর্ষা এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে বিরোধ ইত্যাদি করে থাকেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র যখনই সুযোগ পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মহত্ত্বের অক্লান্ত প্রশংসা করেছেন। প্রতিদিন তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব–কটি বই বিশেষভাবে চামড়ার ভালো মলাট লাগিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। মলাটের উপর সোনালী অক্ষরে বই ও লেখকের নাম লেখা ছিল। কবিগুরুর কোনো–না–কোনো বই সর্বদা তাঁর টেবিলে থাকত।

একবার বেথুন কলেজের একজন প্রোফেসর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কথায় কথায় তিনি বলেন, 'আপনি যেমন সুন্দর লেখেন, তেমনই স্পষ্ট। আপনার লেখা আমরা খুব ভালো ভাবে বুঝতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমন অস্পষ্ট ও জট পাকানো শৈলীতে লেখেন যে ভালো ভাবে বোঝা যায় না। তিনি খুব বড় কবি হতে পারেন, কিন্তু রহস্যবাদী কোনো কবির লেখা আমার বোধগম্য হয় না। তাঁর "জীবন দেবতার" রহস্য এখনও অভেদ্য।'

শরৎচন্দ্র তখুনি জবাব দেন, 'প্রোফেসর মশাই, আমি আপনাদের জন্য লিখি, আপনারাই আমার পাঠক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য লেখেন। ওঁর পাঠক হলাম গিয়ে আমরা। আমার তো কোথাও অস্পষ্ট মনে হয় না।'

রবীন্দ্রসাহিত্যের নিন্দে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বিশেষ করে সেই নিন্দে যদি কাব্য ও কলা-অনভিজ্ঞ এবং নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে অপরিচিত নিন্দুকের হয়। শরৎ বারবার স্বীকার করেছেন যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের কাছেও ঋণী। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে রোহিণীকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন, আজ আর তার প্রয়োজন নেই। যুগ পালটে গেছে, মূল্যও বদলে গেছে, এই মোহান্ধতা ভঙ্গ করার জন্য আমরা যার ঋণী, আমিও তাঁর কাছেই ঋণী। তিনি হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের যুগের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, পাপ ও পুণ্যের বাঁধনে বাঁধা পড়ে রয়ে গেলেন। 'চোখের বালি' লেখার মতো সাহস তাঁর ছিল না। তাঁর বিচারবোধ ছিল কিন্তু সংস্কারবোধ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সাহিত্যে সমাজের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি।

কবিগুরুর প্রসঙ্গে একবার শরৎ সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে বড় দুঃখের সঙ্গে, তাঁর অপমান, অবহেলা ও লাঞ্ছনার কথা শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'একদিন কবিগুরু আমায় বলেছিলেন, মার খেলে কি চোট লাগে না? কিন্তু সহ্য করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি?

'দেখতেই পাচ্ছ কি রকমের সংস্কৃতি, কি তাঁর শিক্ষা–দীক্ষা, কি অসাধারণ সহিষ্ণুতা। কোনোদিন মুখ খুলে একটুও প্রতিবাদ করেন নি। ঋষিতুল্য এই মহাপুরুষ,সৌম্য, শান্তমুখ কবি

সব-কিছু নীরবে সহ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর মতো ধৈর্য্য কি আর আমার আছে ? আমি না জানি তোমায় আমার কত কথাই না বলেছি। সমালোচকেরা বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ইবসন্ ও মেটারলিঙ্কের অনুসরণ করে থাকেন। ইবসন্ ও মেটারলিঙ্ক কি "গীতাঞ্জলি", "নৈবেদ্য", ও "বলাকা"র মতো সম্পদ সৃষ্টি করতে পারবেন ? তিনি কি দুঃখে অনুকরণ করতে যাবেন ? একটুখানি ভাব বা বিচারের মিল দেখলেই লোকে অনুকরণ বলে চিৎকার জুড়ে দিলেন। একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, "আমার কবিতার শ'দুই পাঠকও নেই।" আমি বলেছিলাম, আপনি কি বলতে চান ? আজকাল এমন কোনো কবিতা আপনি দেখাতে পারেন, যাতে আপনার প্রভাব নেই ? আমি কিন্তু তাকে অনুকরণ বলব না। কাব্যের যে ধারা আপনি প্রভাবিত করেছেন, সেই ধারাকে অনুসরণ করেই সব কবিতা লেখা হচ্ছে।

'শুধু কবিতাই বা কেন ? উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ভাষায় তিনি প্রাঞ্জলতা এনে দিয়েছেন। আজকাল কি কেউ বঙ্কিমবাবুর ভাষায় লেখেন ? বা ওই ধরনের উপন্যাস লেখেন ? তিনি আমার গুরু, আমার গুরু।'

কবিগুরুর সপ্ততিবর্ষ উদ্‌যাপন অভিনন্দনের পর শরৎ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে অমল হোমকে লেখেন, 'অমল, আমি যে কতখানি খুশি হয়ে এসেছি। সে তোমরা (না তুমি ?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে, আমার গলায় মালা দিলে বলে নয়,—আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে বলেও নয়-যেভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক করে তুললে,—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সম্বন্ধে আমি কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানে নি গুরু বলে,—আমার চাইতে কেউ বেশি মক্‌সো করে নি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমার চাইতে বেশি বার কেউ পড়েনি, তাঁর উপন্যাস,—তাঁর "চোখের বালি", তাঁর "গোরা", তাঁর "গল্পগুচ্ছ"। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা ভালো বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি। আর কেউ বললে কি না-বললে, মানলে কি না-মানলে তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারিনি। মস্তবড় কাজ করেছ তুমি। প্রাণ ভরে তোমাকে আশীর্বাদ করি।

'শুনেছি তুমি এই জয়ন্তী ক'রে কলকাতায় বাড়ি তুলছ, গাড়ি হাঁকাচ্ছ। তোমার আমার বন্ধুরাই এ কথা পরম উৎসাহে প্রচার করছেন। জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন, তাঁর শিখণ্ডী মাত্র তুমি—পেছনে থেকে তিনিই তোমাকে সব করাচ্ছেন। এ যে বাংলা দেশ, অমল। "সোনার বাংলা।" তবু বলতে হবে—"আমি তোমায় ভালোবাসি।"

'মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না—যে যা বলে বলুক। আমি জানি তোমার বাড়ি হয়নি, গাড়িও হয়নি—যে গাড়ি চড়ে বেড়াও সে বুঝি কর্পোরেশনের। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। তা না হোক—তোমার ভালো হবে। দেশের মুখ রেখেছ তুমি। তোমাকে সমস্ত অন্তর থেকে আবার আশীর্বাদ জানাই।'

শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রভক্তি সম্বন্ধে প্রমাণের কোনো অভাব নেই। তাঁর সমকালীন সবাই জানেন যে রবীন্দ্রসাহিত্য তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। একদিন কোনো এক লেখক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি "গোরা" বইখানি পড়েছেন ?'

স্বভাবসুলভ হাসি হেসে শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, '"গোরা" ? চৌষট্টি বার ! হ্যাঁ চৌষট্টি বার পড়েছি।'

ঢাকায় গেলে তিনি বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেই উঠতেন। সেবার সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চারুবাবু ঘরে ঢুকে দেখেন যে জ্বরের ঘোরে শরৎচন্দ্র 'বলাকা'র প্রত্যেকটি কবিতা আবৃত্তি করছেন। প্রত্যেকটি কবিতাই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবিতাগুলি পর্যন্ত তাঁর বিস্ময়জনকভাবে মুখস্থ ছিল। বই না দেখে, সামান্যতম ভুল না করে তিনি কবিতাগুলি পাঠ করতে পারতেন। ইলাচন্দ্র যোশীকে

তিনি বলেছিলেন, 'আমি তিন-চার দিন পরে পরে তাঁর কোনো-না-কোনো কবিতার বই খুলে পড়ি। এতবড় কবি পৃথিবীতে খুঁজলেও আর পাওয়া যাবে না।'

সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে তিনি বড়ই আনন্দ পেতেন। তাঁর নাটকের অভিনয় ইত্যাদি দেখার প্রতিও সমান আগ্রহী ছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকার কর্মীদের নিজের ছবি উপহার দেবার সময় তিনি বলেছিলেন, 'কিন্তু এটা মনে রেখো যে, আমরা সবাই রবীন্দ্রনাথের। গঙ্গার তরঙ্গ হয়। কিন্তু তরঙ্গ দিয়ে কখনও গঙ্গা প্রবাহিত হতে পারে না।'

সেদিন কবিতা পাঠের একটি প্রতিযোগিতাতে কবিগুরুর কবিতা নির্বাচিত হয়, 'এবার ফিরাও মোরে।' কিন্তু কবিতা থেকে সেই অংশটি বাদ দেওয়া হয়, যেখানে দেশের দুর্দশার কাহিনীর বর্ণনা ছিল। যাঁরা কর্তাব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের ধারণা ছিল যে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করলে রাজদ্রোহ করা হয়, তাতে বিপদ হতে পারে।

শরৎচন্দ্র লিখলেন, 'দেশের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নিষ্পাপ ও নির্মল, তাঁর হৃদয় থেকে স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যে কবিতার স্ফুরণ হয়েছে, প্রকাশ্য সভায় তা পড়া রাজদ্রোহ এবং অপরাধ—সভ্য দেশের ছেলেদের আজ এ কথা শেখাতে বাধ্য করা হচ্ছে?'

একদিকে এমন অনন্য ভক্তি, অপরদিকে কবিগুরুর সঙ্গে সংঘাতও কিছু কম হয়নি তাঁর—যদিও সে সংঘাত সিদ্ধান্তের সংঘাত। ভাবুক-হৃদয় শরৎ যখনই কবিগুরুর কোনো কথায় অপ্রসন্ন হতেন, কোনোদিনই তা গোপন করতে পারতেন না, মনের তীব্র প্রতিক্রিয়া ভাষায় ব্যক্ত করে ফেলতেন। 'বিচিত্রা'য় কবিগুরুর 'সাহিত্য-ধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি নিয়ে বাংলা সাহিত্যাকাশে প্রচুর ঝড় বয়। ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সাহিত্য-ধর্মের সীমানা ও চৌহদ্দির নির্দেশ করে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে, কবির উদাহরণগুলিকে, তাঁর রূপক ও যুক্তিগুলিকে, রসপূর্ণ রচনার আখ্যা দেন। প্রবন্ধটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সজনীকান্ত দাসের অনেক আলোচনা হয়। এই নিয়ে তিনি এমন একটি লেখা লিখলেন যাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থেকে গিয়েছিল অর্থাৎ সেগুলি ঠিক শরৎচন্দ্রের মনের কথা ছিল না।

এ নিয়ে লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে বেশ প্রতিবাদ জানায় ও আক্রমণ করে। শরৎচন্দ্র তখন 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'[২] নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটিতে নিজের মতামত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে, কবির ক্ষোভের জবাবে তিনি লেখেন, 'তাঁহার "সাহিত্য-ধর্ম" প্রবন্ধের শেষ দিকটার ভাষাও যেমন তীক্ষ্ণ, শ্লেষও তেমনি নিষ্ঠুর। তিরস্কার করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু সত্যই কি আধুনিক বাংলা-সাহিত্য রাস্তার ধুলা পাঁক করিয়া তুলিয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকেই সাহিত্য-সাধনা জ্ঞান করিতেছে? হয়তো, কখনো কোথাও ভুল হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের প্রতি এতবড় দণ্ডই কি সুবিচার হইয়াছে? কবি বলিয়াছেন, সে-দেশের সাহিত্য অন্তত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অন্তরে-বাহিরে, বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি…।

'এই যদি সত্য হইয়া থাকে তো ভারতের দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা। হয়তো প্রবেশাধিকার পায় নাই, হয়তো এবস্তু সত্যই ভারতে ছিল না, কিন্তু কোনো একটা জিনিস শুধু কেবল ছিল না বলিয়াই কি চিরদিন বর্জিত হইয়া থাকিবে? ইহাই কি তাঁহার আদেশ?

'পরের লাইনে কবি বলিয়াছেন: "সে দেশের (অর্থাৎ বাংলাদেশের) সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতা কার দোহাই দিয়ে চাপা দিবে?"

'দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন নাই, চাপা দেওয়াও অন্যায়, কিন্তু ভক্তের মুখের ধার-করা অভিমতটাকেই অসংশয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাতেই কি ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না?

১. ১৯২৭
২. বঙ্গবাণী, সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

'রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্মে"র জবাব দিয়াছেন নরেশচন্দ্র। হয়তো তাঁহার ধারণা, অনেকের মতে তিনিও একজন কবির লক্ষ্য। এ-ধারণার হেতু কি আছে আমি জানি না। তাঁহার সকল বই আমি পড়ি নাই, মাসিকের পৃষ্ঠায় যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই শুধু দেখিয়াছি। মতের একতা অনেক জায়গায় অনুভব করি নাই। কখনো মনে হইয়াছে, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে তিনি প্রচলিত সুনির্দিষ্ট রাস্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখানেও নিজের মতকেই অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করি নাই। নরেশচন্দ্রের প্রতি অনেকেই প্রসন্ন নহেন জানি। কিন্তু, মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে মাধুর্যহীন রূঢ়তাকেই শক্তির লক্ষণ মনে করিয়া পালোয়ানির মাতামাতি করিতেই তিনি বই লেখেন এমন অপবাদ আমি দিতে পারি না। তাঁহার সহিত পরিচয় আমার নাই, কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না, কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক অল্পই আছেন। বাংলা-সাহিত্যের অবিসংবাদী বিচারক হিসাবে কবির কর্তব্য ইঁহার সমগ্র পুস্তক পাঠ করা, কোথায় বা শ্লীলতার অভাব, কোথায় বা কাব্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণে ইনি নিযুক্ত, স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া। তবে এমনও হইতে পারে, কবির লক্ষ্য নরেশচন্দ্র নহেন, আর কেহ। কিন্তু সেই "আর কেহ"রও সব বই তাঁহার পড়িয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে করি। ····· আমাদের দিন গত হইতে বসিয়াছে। এখন একদল নবীন সাহিত্য-ব্রতী সাহিত্য-সেবার ভার গ্রহণ করিতেছেন। সর্বান্তঃকরণে আমি তাঁহাদের আশীর্বাদ করি।

'কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতেছি, ইঁহাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড অভিযান শুরু হইয়াছে। ক্ষমা নাই, ধৈর্য নাই, বন্ধুভাবে ভ্রম-সংশোধনের বাসনা নাই, আছে শুধু কটূক্তি, আছে শুধু সুতীব্র বাক্যশেলে ইঁহাদের বিদ্ধ করিবার সংকল্প। আছে শুধু দেশের ও দশের কাছে ইহাদের হেয় প্রতিপন্ন করিবার নির্দয় বাসনা। মতের অনৈক্যমাত্রেই বাণীর মন্দিরে সেবকদিগের এই আত্মঘাতী কলহে না আছে গৌরব, না আছে কল্যাণ।

'কবির এই "সাহিত্য-ধর্মে"র শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি বিরূপ, আমার কথা হয়তো তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে, বাংলা-সাহিত্য-সেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে, তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাহারা তাঁহার কানের কাছে "গুরুদেব" বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে, তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।'

এই প্রবন্ধটির আরম্ভ কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কবিগুরু ও ডঃ নরেশচন্দ্রের মতভেদের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধদলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত "শনিবারের চিঠি"তে আমার মতামত এমনি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া হ্যাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছলাইয়া পলাইবার আর পথ রাখেন নাই, একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

'এদিকে বিপদ হইয়াছে, এই যে, কালক্রমে আমারও দুই-চারিজন ভক্ত জুটিয়াছেন। তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম? দাও-না তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।

'আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তারপরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তাছাড়া, ওদিকে নরেশবাবু আছেন যে। তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকিল। তাঁর যে-জেরার পরাক্রমে কবির যুক্তি-তর্ক রস-রচনা হইয়া গেল, সে-জেরার প্যাঁচে পড়িলে আমি তো একদণ্ডও বাঁচিব না। কবি তবুও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির কোঠায় পৌঁছিয়াছেন, আমি হয়তো ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তি কোনোটারই নাগাল পাইব না, ত্রিশঙ্কুর ন্যায় শূন্যে ঝুলিয়া থাকিব। তখন?

'ভক্তরা বলে, আপনি ভীরু।

'আমি বলি, না।

'তাহারা বলে, তবে প্রমাণ করুন।

'আমি বলি, প্রমাণ করা কি সহজ ব্যাপার! "রস-সৃষ্টি", "রসোদ্বোধন" প্রভৃতির রসবস্তুটির মতো ধোঁয়াটে বস্তু সংসারে আর আছে নাকি? এ কেবল রস-রচনার দ্বারাই প্রমাণিত করা যায়;-কিন্তু সে সময় আপাততঃ আমার হাতে নাই।

'এ তো গেল আমার দিকের কথা। ও-দিকের কথাটা ঠিক জানি না, কিন্তু অনুমান করিতে পারি।

'প্রিয়পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই আমরা তো আর পারিয়া উঠি না, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না না, ধনুর্বাণ নয়,—গদা। ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি-আধুনিক সাহিত্যিক-পল্লীর দিকে। লক্ষ্য? কোনো প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে।

'কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হৌক, শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া ও জাগিয়া উঠিয়াছেন, এবং বিনীত ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বারবার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন? হ্যাঁ কি না, বলুন?

'কিন্তু এ-প্রশ্নই অবৈধ। কারণ কবি তো থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি, কে আছে তোমাদের খড়গহস্তা শুচি-ধর্মী অনুরূপা,[১] আর কে আছে তোমাদের বংশী-ধারী অশুচি ধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালি-কলমের দল?[২] কি করিয়া জানিবেন তিনি, কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি-আধুনিক সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকা-গৃহেই সন্তান-বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ-সকল অধ্যয়ন করিবার মতো সময়, ধৈর্য এবং প্রবৃত্তি কোনোটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুক্‌রা-টাক্‌রা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেও তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের আব্রু এবং আভিজাত্য দুই-ই গিয়াছে। শুরু হইয়াছে চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এতবড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।'

শরৎচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি নিয়ে দারুণ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস শরতের উপর তীব্র আক্রমণ করেন। শরৎচন্দ্রকে আক্রমণের সুযোগ পেলে তিনি তা কখনোই হাতছাড়া করতেন না। কিন্তু এবারে তিনি ছাড়াও অনেকে তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হন। তাঁরা অভিযোগ করেন যে, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুচিত কটূক্তি করেছেন। পরে অবশ্য শরৎচন্দ্র নিজেও স্বীকার করেন যে, লেখার ত্রুটির জন্য তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তার অন্য অর্থ হয়ে গিয়েছে। এ দোষ অক্ষমতার দোষ, হৃদয়ের নয়।

নতুন লেখকদের উপর শরৎচন্দ্র শুধু যে সদয় ছিলেন তা নয়, তাদের তিনি আন্তরিকভাবে স্নেহ করতেন। কয়েক বছর আগে[৩], শিবপুর ইনস্টিটিউট-এর সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথ অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন। তখন আধুনিক লেখকদের রক্ষার্থে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'ভালো-মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়তো চিরদিনই থাকিবে। ভালোকে ভালো, মন্দকে মন্দ সে-ও বলে; মন্দের ওকালতি করিতে কোনো সাহিত্যিকই কোনোদিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক-দুর্নীতির মূলে হয়তো এই একটা

---

১. প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখিকা—অনুরূপা দেবী

২. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র আধুনিক উপন্যাস ও কবিতা লেখক। নজরুল ইসলাম ওজস্বী বীররসের কবি। ইনি প্রথম শ্রেণীর কবিদের মধ্যে গণ্য। 'কল্লোল', 'কালি ও কলম' আধুনিক ভাবসম্পন্ন মাসিক পত্রিকা।

৩. ১ জুলাই, ১৯২৩

চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।'

ব্যক্তিগতভাবেও তিনি সবাইকেই ভালো বাসতেন। কবি নজরুল যখন জেলে ছিলেন তখন কোনো কারণে তিনি সেখানে অনশন শুরু করেন। শরৎচন্দ্র জেলে গিয়ে অনশন ভঙ্গ করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, 'হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম উপোস করিয়া মর-মর হইয়াছে। বেলা একটার গাড়িতে যাইতেছি। দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধ যদি আবার মানতে রাজী হয়—না হইলে আর কোনো আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধহয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।'[১]

শরৎচন্দ্র একথা বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিক লেখকেরা কোনো বিষয়ে ভুল করতে পারেন। সেজন্য যখন সমাজে তাঁদের অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করা হয়, তখন তাঁরা মনে বড় ব্যথা পান। নিজে এ ভেবেও কষ্ট পেতেন যে, আধুনিক লেখকেরা দরিদ্র এবং সেই অভাবের জনাই নোংরা কথায় নেমে পড়ে তাদের টাকা উপায় করতে হয়। তাদের লেখা তিনি সংশোধন করে দিতেন। বিশ্বাস অর্জনের সুযোগ দিতেন, তর্ক করতেন, কখনো বা ঝগড়াও করতেন, কিন্তু কখনো এমন ব্যবহার করতেন না যাতে মনে হতে পারে যে, আধুনিক লেখকেরা তুচ্ছ ও অতি সামান্য।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে আধুনিক লেখকদের তিনি পুরোপুরি মেনে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মন কষাকষির পর এক বছর পর্যন্ত তিনি আধুনিক লেখকদের লেখা পড়ে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হন যে, সত্য সত্যই তাদের লেখায় রসের বড় অভাব। যারা অতি-আধুনিক সাহিত্যের নামে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রচার করেন, তাঁরা আর যাই করুন সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। সেদিন কবিগুরু যা বলেছিলেন, তা খুব একটা ভুল বলেন নি। এর তিন বছর পর 'শেষপ্রশ্ন'কে নিয়ে যখন আধুনিক লেখকেরা তাঁকে আক্রমণ করেন তখন পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই একটা সাময়িক ব্যবধান এসে পড়েছিল। যুগসন্ধির মুহূর্তে এরকম হয়েই থাকে। তবে নতুন লেখকদের স্নেহ দিলেও তাঁর নিজের সাহিত্য সম্পর্কে পৃথক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, লেখনীর অসংযমতা সাহিত্যের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বইয়ের খুব প্রশংসা করার পর তিনি লেখেন, 'ভগবান লেখার শক্তি আপনাকে অপর্যাপ্ত দিয়েছেন, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে ঐশ্বর্যবানেরই মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন, কাঙালের সে আবশ্যক হয় না। শুধু লিখে চলাই তো নয়, থামতে পারার কথাটাও মনে থাকা চাই যে।'

আধুনিক লেখকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ অপ্রসন্ন, মাত্র এই কারণে শরৎচন্দ্র তাঁর উপরে রাগ করেছিলেন তা নয় বরং 'পথের দাবী'র জন্য যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল তা তখনও পর্যন্ত তেমন ঠাণ্ডা হয়নি। এছাড়া 'ষোড়শী' নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথ গানও লিখে দেন নি। 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' লেখার সময় এ-সব কথা তাঁর মনে বিঁধেছিল বলেই কোথাও কোথাও অনাবশ্যক ভাবে উষ্ণতা প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে কয়েকখানি পত্র লেখেন। সেই নিয়ে আর-একবার কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে।[২] এই চিঠিগুলি সম্বন্ধে অতুলানন্দ রায় তাঁর মতামত জানতে চান। জবাবে রায়মহাশয়কে শরৎচন্দ্র একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন,' "পরিচয়" পত্রিকায় শ্রীমান দিলীপকুমার রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যের মাত্রা-সম্বন্ধে তুমি আমার অভিমত জানতে চেয়েছো। এচিঠি ব্যক্তিগত হলেও যখন সাধারণে প্রকাশিত হয়েছে, তখন এরূপ অনুরোধ হয়তো করা যায়। ..... কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তোমাদের সন্দেহ তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে কবির

১ ১৭ মে, ১৯২৩

২ শ্রাবণ, ১৩৪০ (জুলাই-অগাস্ট ১৯৩৩)

অভিযোগের বিষয় হল ওরা "মত্ত হস্তী" ওরা "বুলি আওড়ালে" "পালোয়ান করলে" "কসরৎ কেরামৎ দেখালে" "প্রবলেম সল্‌ভ করলে" অতএব ওদের · · ইত্যাদি ইত্যাদি।

'এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিমধুরও নয়। শ্লেষ-বিদ্রূপের আমেজ মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে। অথচ, ক্ষোভ প্রকাশও যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমনি বিফল। তৈরি-করা বুলি পাখির মতো আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি "খেল" দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ-সকল জিজ্ঞাসা অবাস্তব। আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। খেলার মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হল অমুক গু মাড়িয়েছে। আর রক্ষে নেই,—কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেছে, ওটা গু নয়, গোবর—সমস্ত বৃথা।

'বাড়ি এসে মায়েরা না খাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েছে। এও আমার সেই দশা।

'সাহিত্যের মাত্রাই বা কি, আর অন্য কোন প্রবন্ধই বা কি, এ-কথা অস্বীকার করিনে যে কবির এই ধরনের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো-বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা-উদাহরণে আসে কলকব্জা, আসে হাট-বাজার, হাতি-ঘোড়া, জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই পাইনে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধে বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগসই হলেই তো তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।

'একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছুদিন পূর্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্তক-সংঘের মতিবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণীর পোষা বেড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না-তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হলো কি? প্রমাণ করলে কি? বেড়ালের যুক্তিতে এ-কথা তো ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে, যে-হেতু অতি-নিকৃষ্ট-জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে, তুমি আপত্তি কর নি, অতএব অতি-উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসব, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এ-সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয় না। এ-সব উপমা শুনতে ভালো, দেখতেও চকচক করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে, তা অকিঞ্চিৎকর। ···

'আধুনিক কালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু-নিন্দিত-বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখদুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবনযাত্রার প্রণালীও গেছে বদলে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপসোস করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না। তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘন। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে না কটু কথা দিয়ে? কবি বলছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূলনীতি দিয়ে। কিন্তু সেই "মূলনীতি" লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে, আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।

'কবি বলছেন, "উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, "উপন্যাস সাহিত্যের সে দশা নেই, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়ে নি, চিন্তার সূর্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে", তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজির দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।" রচনাটি স্বীকার করে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে-হ্যাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিনকাল বদলেছে এবং বয়সও বেড়েছে; সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর

গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তাহলে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ-আমি মনে করি নে। তারা অনায়াসে বলতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্য লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

'কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ করে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা করে দেখিয়েছেন, "বুলির" খাতিরে ও-দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আলোচনা করব না, কারণ, ও-দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্য গ্রন্থই নয়, ধর্মপুস্তক তো বটেই, হয়তো বা ইতিহাসও বটে। ও-দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানানো চরিত্র নাও হতে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজ-কাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।

'চিঠিটায় ইন্‌টেলেক্ট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রবলেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রবলেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক সাংসারিক,–আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রবলেম, সেটা প্লটের। এর গ্রন্থিই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমারসম্ভবের প্রবলেম, "উত্তরকাণ্ডে" রামচন্দ্রের প্রবলেম, "ডল্‌স্ হাউসের" নোরার প্রবলেম অথবা "যোগাযোগে"র কুমুর প্রবলেম এক জাতীয় নয়। যোগাযোগ বইখানা যখন "বিচিত্রায়" চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙগামা বাধিয়ে ছিল, আমি তো ভেবেই পেতুম না— এ দুর্ধর্ষ প্রবল পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ-অফ-ওয়ারের শেষ হবে কি করে? কিন্তু কে জানত সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডী ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্তে এসে। আমাদের জলধর দাদাও প্রবলেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লোক ভারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অন্য উপায়ে। ফোঁস করে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এটা কি হল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,"কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না?"

'পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইবসনের নাটকগুলি তো একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসেনি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে?" না পড়তে পারে, কিন্তু তবুও এটা একটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে একদিন এমনও হতে পারে ইবসনের পুরোন আদর আবার ফিরে আসবে। বর্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।'

এই চিঠির দরুন শরৎচন্দ্রের কয়েকজন ভক্ত বন্ধু বেশ অপ্রসন্ন হন। কবিও কম ক্রুদ্ধ হন নি। প্রতিবাদ জানিয়ে কবি লিখলেন, ওই প্রবন্ধে শরতের প্রতি কবির কোনোরূপ মন্তব্য ছিল না—'আমি এমন কাজ করি নি, সে কথা বিশ্বাস করে নিয়ো। তুমি আমাকে বারবার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করেছ—আমি কোনোদিন তার প্রতিবাদ করি নি এবং কখনোই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমাকে নিন্দা করে শোধ তুলি নি। এবারেও সেই ফর্দে আর একটি সংখ্যা বাড়ল।'

স্বয়ং শরৎবাবুর মনেও দুঃখের সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাঁর মনে হয় কবির সঙ্গে এবার বোধহয় তাঁর সব সম্পর্কে শেষ হল। 'যা লিখে ফেলেছি সে তো আর ফেরাতে পারব না। এখন কবির সঙ্গে বিচ্ছেদ বোধ করি আমার পরিপূর্ণ হল।.... কিন্তু কি যে হোলো, "পরিচয়ের" ঐ লেখাটা পড়া মাত্রই সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে গেল, তখনি কাগজ কলম নিয়ে চিঠিটা লিখে ফেললাম।'[১]

কিন্তু এরপরেও কবিগুরুর প্রতি তাঁর রাগ যায়নি। দিলীপকুমার রায়কে একটি পত্রে লেখেন,[২] 'উপমা-উদাহরণ কোনটিই যেন রবীন্দ্রনাথের মতো নিরর্থক ও অসম্বন্ধ না হয়। এখানে লজিক যেন কিছুতে বাষ্পাচ্ছন্ন না হয়ে ওঠে। মানুষকে অলংকার দিয়ে সাজানোর রুচি এবং স্যাকরার দোকানে অলংকার দিয়ে শোকেস সাজানোর রুচি এক নয়। এ-কথা সর্বদাই মনে রাখা চাই। অলংকৃত বাক্যের বাহুল্য-ভার যে কত পীড়াদায়ক সেকথা শুধু পাঠকই বোঝে।'

১ জানুয়ারি, ১৯৩৪
২ ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪

কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর বিবাদ কখনও কখনও বড় উগ্ররূপ ধারণ করত। কিন্তু সেই আবেগ, আক্রোশ ও তীব্রতা শেষ হয়ে যেত, অনুতাপের আগুনে তিনি জ্বলে পুড়ে যেতেন। বন্ধুদের চিঠি দিয়ে নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা করতেন। একটি পত্রে তিনি লেখেন,[১] 'এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে আমার চেয়ে কে বড়ো, কে ছোটো এ-নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোনো আক্ষেপ, কোনো উদ্বেগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি বলতেন আমার কোনো বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি, একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হোত না। হয়তো বিশ্বাস করা শক্ত, হয়তো মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করছি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করেছি। এইজন্যই কোনো আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি নে। যৌবনে এক-আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়তো ভুল করে ফেলেছিলাম।'

বারবার তিনি দিলীপকুমারকে বলেছেন, 'বিশ্বাস করো, তিনি সত্যই বিরাট পুরুষ। তাঁর মতো সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, তাই মনে হয় আমাদের জাতির কোনোদিন অকাল-মৃত্যু হবে না। এ-যুগে দুই মহাপ্রাণ পুরুষ দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন—রবীন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু'

কবিগুরু কয়েকবারই মুক্ত কণ্ঠে শরৎচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন তবু শরৎচন্দ্রের মনে চিরদিন এ ক্ষোভ রয়ে গিয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সহজ মনে গ্রহণ করেন নি। নিজের চিঠিতে ছোট ও বড়র কথা তুলেছেন। ঠিক এই ধরনের কথা রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন।[২] এই সব প্রশ্ন নিয়ে মহারথীরা কেন যে এত পরিশ্রান্ত, তার আভাস শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রবোধকুমার সান্যালকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে পাওয়া যায়। —'শরতের মৃত্যুতে একখানি সার্বজনীন চৌপদী পাঠিয়ে দেওয়ার বেশি আর কিছু করতে পারিনি। আমার কাছ থেকে শরতের যে প্রশস্তি পাওনা ছিল, নিতান্ত অবিবেচকেব মতো শরতের মৃত্যুর পূর্বেই তা অকৃপণ লেখনীতেই সেরে রেখেছি। আমার মৃত্যুর পরে শরৎ এই কথাটি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন, বোধ করি এই লুব্ধ আশা মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। আমার ভাগ্যে উলটোটাই ঘটে, তাই আমার জীবিতকালে অকারণে অসহিষ্ণু হয়ে আমার প্রতি শরৎ অবিচারই করেছেন—যদি ঠিক সময়মতো মরতে পারতুম, তাহলে নিঃসন্দেহেই যথোচিত ভাবে সেই গ্লানিটা মার্জনা করে যেতেন।

'আমার আয়ুকালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে পরে পরে তিনটে পর্ব দেখা গিয়েছে। আমি যখন আসরের জাজিমটার একধারে জায়গা করে নিয়েছিলাম তখন কবির উচ্চ আসনে ছিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সিংহাসনে, মধুসূদন বিদায় নিয়ে গেছেন। এঁরা চলে যাবার কিছু পূর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয়েছিল। প্রথম পর্বে আমি ছিলুম সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো, দ্বিতীয় পর্বে সকলের চেয়ে বয়সে বড়ো। তার ফল হয়েছিল সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার বয়স্যতার সম্বন্ধ ঘটতে পারেনি। একলা পড়ে গিয়েছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার গুণে বয়সের বাধা পেরিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ আমার কাছে আসতে পেরেছিলেন। তাই কাব্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় মিলতে পেরেছিল। এই জয়ের মিলনে আমি যে রস পেয়েছিলাম সেটাকে আমি মস্ত লাভ বলে মনে করি। আমার বিশ্বাস মানুষ রূপে তিনি আমার কাছে আসাতে কবিরূপে তিনিও আমাকে বেশি সত্য করে পেয়েছিলেন।

'তৃতীয় পর্বের আরম্ভ হয়েছে শরৎকে নিয়ে। আধুনিকদের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে তার পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটে নি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়। এটা শুনতে স্ববিরোধী, কিন্তু দেখা যায়, কৃত্রিমতা সহজ, স্বাভাবিক হওয়াই সহজ নয়। তেমনি নিজের দেশকালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলে যাওয়া সকলের ভাগ্যে

১ জানুয়ারি, ১৯৩৬

২ অধ্যায় ১৮ দ্রষ্টব্য।

ঘটে না। সকলেই যে নিজের দেশে কালে জন্মগ্রহণ করে তা নয়। জন্মবিধাতা জাতককে স্থান নির্ণয় করে দেবার উপলক্ষে সব সময়ে বর্তমানের সময় নির্ণয় করে চলেন না, সাহিত্যে তার ফলাফল হয় বিচিত্র। যথোচিত দেশকাল থেকে চিরনির্বাসনে যারা জন্মেছে এমন লোকের অভাব নেই। সৃষ্টি বৈচিত্র্যের জন্যে তারও প্রয়োজন আছে। বলা-কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলা সাহিত্য-মণ্ডলীতে। অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হোতে দেবি হোলো না। চেনাশোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়ে এসেছেন। দ্বারী তাঁকে আটক করেনি। সাহিত্যে সেখানে পাঠকদের চিত্ত– পরিচয় এবং লেখকের আত্ম-পরিচয় অব্যবধানে এক সঙ্গে ঘটে, সেখানে এই রকমই হয়-পূর্বরাগ আর অনুরাগের মাঝখানে সময় নষ্ট হয় না।

'সেই সময়টাতে কর্মের টানে এবং বয়সের ভেদে আমি দূরে পড়ে গেছি। ছেড়েই দিয়েছি কলকাতায় বাস। আমার সম্বন্ধে দেশে নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা চলছিল, অধিকাংশ সময়ে তা সত্যও নয়, প্রিয়ও নয়। আমার মন তাই দূরে চলে এসেছিল। এই সময়েই শরতের অভ্যুদয়। শান্তির জন্য যে নিভৃত কোণ আশ্রয় করে আপন কর্মের বেষ্টনে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম, সেখান থেকে শরতের সঙ্গে কাছাকাছি মেলবার কোনো সুযোগ হোলো না।

'কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি খুশি। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা, কথাবার্তা হয় নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনাশোনা হত, তবে ভালো হত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হত। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর "বিন্দুর ছেলে", "বিরাজ বৌ", "রামের সুমতি", "বড়দিদি"। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালোবাসার পক্ষে তাই যথেষ্ট।'

কিন্তু আসলে এ যথেষ্ট ছিল না। মানুষ শরৎচন্দ্র ও মানুষ রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের কাছে কোনোদিন আসতে পারেননি। হয়তো তাই দুজনের মধ্যে বহুবার সংঘাত দেখা দিত। যারা এ দুটি প্রতিভার দ্বন্দ্ব দেখতে ভালোবাসত, তারা আরো বেশি করে তার যোগান দিত। শরতের দৃষ্টি বর্তমান সময়ের প্রতি সজাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শাশ্বত মানবের বিরাট চিত্রকর। শরৎ কেবলমাত্র অন্যায়ের বিরোধিতা করতেন তা নয়, কোনো মানুষকেই তিনি ছোট বা হেয় জ্ঞান করতেন না। পতিতার হৃদয়ে নিহিত নারীত্বকে তিনি আলোকদান করেছেন। তাঁর জীবন-দর্শনই হল তাই। তাঁর নর-নারী, পাত্র-পাত্রীরা অধিকাংশই এ দেশের, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিরকালের সত্যকে আদর্শরূপে বারবার দেশ ও সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিম দেবের উপাসক ছিলেন, আর তিনি ছিলেন বিশ্বমানবের। তাঁর অনুভূতিও ছিল অতীন্দ্রিয়। শরৎচন্দ্র মাটির ধূলিকে মহিমান্বিত করেছেন, করেছিলেন বাংলা ঘরোয়া ভাষার প্রয়োগ। বাংলার সাধারণ মানুষের প্রেমের কথাই বলেছেন। তাঁর বাস্তববাদে, যদি তা বাস্তববাদই হয়, সংবেদনশীলতা ও করুণায় পূর্ণ চিত্তের স্পর্শ রয়েছে। দুজনের মধ্যে মৌলিক তফাত শুধু এইটুকুই।

এছাড়া আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল; কবিগুরু অভিজাত সম্প্রদায়ের, কিন্তু শরৎ চিরব্রাত্য। এই যে পার্থক্য, উত্তেজনার মুহূর্তে অজ্ঞাতেই তা আরো কটুভাবে অভিব্যক্ত হত। অন্যথায় কবিগুরু যখনই সুযোগ পেয়েছেন শরৎবাবুর প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। শরৎচন্দ্রও কবিকে গুরুস্থানীয় এবং বেদব্যাসের পর সর্বোত্তম কবি হিসাবে মনের সবটুকু শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে এসেছেন। একথাও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কবিগুরুর মতো তিনি কোনোদিনই লিখতে পারবেন না।

মৃত্যুর চার বছর আগে বাষট্টিতম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বেতারকেন্দ্র দ্বারা আয়োজিত 'শরৎ-শর্বরী'তে অভিনন্দনের উত্তরে তিনি সর্বপ্রথম কবিগুরুকেই প্রণাম জানিয়ে তাঁর কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।

কবিগুরুর আশীর্বাদ তাঁর কাছে যথার্থ সত্য ছিল, বাকি যা-কিছু তা শুধুই ক্ষণিক উত্তেজনার

তরঙ্গমাত্র। যে মহৎ সে চিরদিনই মহৎ। তাঁর রুষ্টতা ভাদ্রের মেঘের মতো, বর্ষণের একটু পরেই অন্তর্ধান করে। রবীন্দ্রজয়ন্তী সমারোহে শরৎচন্দ্রের দেওয়া ভাষণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক পরম সম্পদ।

এও সত্য যে, বিশ্বসাহিত্যে মহান শিল্পী ও স্রষ্টাদের মধ্যে এ ধরনের সংঘাতের উদাহরণ কিছু কম পাওয়া যায় না। টলস্টয়ের প্রতিভা সর্বপ্রথম তুর্গেনেভ স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু কোন কারণবশত সে প্রশংসা অপ্রিয় সংঘর্ষে পরিণত হয়। দুজনেই পরস্পরের প্রতি তীব্র আক্রমণ করেন, আবার বারবার একে অপরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে দুঃখিত হয়ে তুর্গেনেভ লিখেছিলেন, 'আমি বড়ই আনন্দিত যে, আমি তোমার সমকালীন। আমার বন্ধু! তুমি আমার শেষ প্রার্থনা স্বীকার করো। নিজের সৃজনাত্মক কাজে আবার মন দাও। বন্ধু আমার, আমার দেশ রাশিয়ার মহান্ লেখক, আমার অনুরোধ নিশ্চয় মনে রেখো, তোমায় স্নেহপূর্ণ আলিঙ্গন করতে আমায় একবার আজ্ঞা দাও …আর আমি লিখতে পারছি না, বড় ক্লান্তি বোধ করছি।'

এর ছ-মাস পরে তুর্গেনেভের মৃত্যু হয়। আর টলস্টয় তুর্গেনেভের রচনাগুলি আবার পড়তে শুরু করেন।

২২

ষাট বছর বয়সেই শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভেঙে পড়ে। প্রায় প্রতি চিঠিতেই তিনি নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে আক্ষেপ করেছেন- মাথায় সর্বদা যন্ত্রণা হয়। রক্তের চাপ ঠিক নেই। খুব কষ্ট করে লেখাপড়ার কাজ করতে হয়।…. বছর দু-আড়াই আগে যখন তাঁর ভগ্নীপতির মৃত্যু হয়, তিনি তাঁর ডায়ারিতে লিখেছিলেন, 'মুখুজ্জে মশাই মারা গেলেন। ১০ই অঘ্রান, ১৩৪০, রবিবার–রাত্রি ৬।।। একটা বছর তিনি একান্ত মনে মৃত্যুকে ডাকছিলেন। আজ তাঁর মঞ্জুর হোলো। কি জানি আমার আবেদন কবে গ্রাহ্য হবে।'

বহুদিন থেকেই তিনি অর্শে ভুগছিলেন। শরীর দুর্বল হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। একদিন জ্যৈষ্ঠের ভরা দুপুরে কোথা থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর 'লু' লেগে যায়। মাথার ব্যথা আরো বেড়ে যায়। একটি চিঠিতে লিখেছেন,[২] 'লেখা কিম্বা পড়া সমস্তই বন্ধ। খবরের কাগজ পর্যন্ত না। এ জীবনের মতো লেখাপড়া যদি শেষ হয়েই থাকে তো অভিযোগ করব না। যেটুকু সাধ্য ও শক্তি ছিল করেছি, তার বেশি যদি না-ই পারি ক্ষোভ করতে যাব কেন? মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরাগী এখনও তা-ই যেন থাকতে পারি।'

মনে হয় আগত মৃত্যুর ইঙ্গিত তিনি অনুভব করেছিলেন। কলকাতা থেকে এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন,[৩] 'ইতিমধ্যে আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ি আর রূপনারায়ণ নদ—এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশি দিন কোথাও থাকতে পারিনে। তবে এও সত্যি, এদের মায়া কাটিয়ে যাবারও বেশি দিন বাকি নেই। পুরনো বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন। তাঁদের আমি নিত্যই স্মরণ করি। এইমাত্র এল অধ্যাপক পরলোকগত বিপিন গুপ্তর শ্রাদ্ধ-সভায় যাবার আমন্ত্রণ পত্র। শিবপুরে কত বিকাল বেলাই না একসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছি। তুমি আছ একটি সাবেক কালের বন্ধু, আশা করি অন্তত তোমার আগে যেন যেতে পারি। এ সংসারে আর একটা দিনও মন বসছে না। কেবলই পিছনের কথা ভাবি, সম্মুখের দিকে একবারও চোখ যায় না। কিন্তু যাক্, এসব কথা বলে তোমার মন খারাপ করে দিয়ে লাভ নেই।' তাঁর চিঠিগুলিতে বেশির ভাগই হতাশা দেখতে পাওয়া যায়।

১. নভেম্বর, ১৯৩৩ (১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০)
২. ১৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬
৩. ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬

ভারতবর্ষের সম্পাদক জলধর সেনও কতবার এসে হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন। এই ভাবেই 'বিপ্রদাস' কোনোরকমে তিনি শেষ করতে পেরেছিলেন।[১] 'শেষের পরিচয়'-এর মাত্র পনেরোটি পরিচ্ছেদই লিখতে পেরেছিলেন।[২]

এই উপন্যাসটি লেখার সময় হরিদাসবাবুকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, নিয়মিত ভাবে তিনি লেখা দেবেন। কিন্তু কথা দিয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারেন নি। লেখার মন আগেকার মতো আর ফিরে পান নি। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি কয়েকবার বলেছিলেন, 'শেষের পরিচয়' শেষ করবার জন্য আমায় সময় দাও। আমি ছাড়া আর কেউ তা সম্পূর্ণ করে উঠতে পারবে না।

কিন্তু তাঁর এ অনুরোধ রাখা হয় নি। উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করার ভার রাধারাণী দেবীর উপর দেওয়া হয়। সুরেন্দ্র মামা ও রাধারাণী দেবীর সঙ্গে কয়েকবার এ বিষয়ে আলোচনাও হয়েছিল। উপন্যাসটির আধার ভাগলপুরের একটি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের নায়িকা সবিতা মনে প্রাণে স্বামী-অনুরক্তা। তবু একদিন ক্ষণিকের মোহে স্বামী ও কন্যার মর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সঙ্গে ঘোর কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়ে অনায়াসে তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। যার সঙ্গে সে চলে গেল তাকে কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভালোবাসত না। কখনও বাসেনি, তবু এ পদস্খলন কেন হল? 'শেষের পরিচয়ে'র সমস্যা তাই। শরৎচন্দ্র সমস্যা তুলে ধরতে ভালোবাসতেন কিন্তু তার কোনো সমাধান করতে চাইতেন না। এই উপন্যাসটিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু কিছুই পরিষ্কার বোধগম্য হয় না। এক জায়গায় সবিতা বলছে,'ও ঘটে আচম্‌কা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়।' এই উক্তিতে সত্য কিছু থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু উপন্যাস শেষ হয়নি তাই এই সমাধানকে শরৎচন্দ্রের শেষ নির্ণয় বলে মনে করা যেতে পারে না।

'আগামী কাল'-এর মাত্র চারটি পরিচ্ছেদই তিনি লেখা শেষ করেছিলেন। রাজনীতিতে যে গতি ব্যাহত হয়েছিল শরৎচন্দ্র তাতে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। সেই বিরক্তিরই আভাস এই উপন্যাসটিতে দেখা যায়। সমাজ কল্যাণের প্রতি তাঁর ঝোঁক বেড়ে গিয়েছিল।

এই সময় দুটি এমন উপন্যাস প্রকাশিত হয়, যা একাধিক লেখক দ্বারা লিখিত। এভাবে একটি বারোয়ারী উপন্যাস 'রসচক্রের' প্রায় দশ পাতা তিনি লিখেছিলেন। 'বাড়ির কর্তা' নামে একখানি উপন্যাস লেখার তাঁর ভারি শখ ছিল, কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য কোনো কাজে হাত দেওয়ায় মতো শরীরের অবস্থা তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তা বারোয়ারী উপন্যাসরূপে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটি ষোলো বছর আগে কাশীতে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রবাস-জ্যোতি' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সেখানকারই 'উত্তরা' পত্রিকায় বারোয়ারী উপন্যাস রূপে প্রকাশিত হয়।[৩] এছাড়া 'ভাল-মন্দ' নামে আর একখানি উপন্যাস ছিল। এইটির প্রথম ন-পাতা শরৎচন্দ্র লেখেন। এটি শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ লেখা।[৪] অবিনাশ ঘোষাল-সম্পাদিত 'বাতায়ন' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। এই রকমই আর-একখানি উপন্যাস 'ভারতী'তে ষোলো বছর আগে প্রকাশিত হয়। তার শেষ অংশটুকু শরৎবাবু লেখেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্ব প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে ঠেকেছিল। তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন, আমার সাহিত্যিক জীবনের চারটি পর্ব। প্রথম পর্বে আমি 'বড়দিদি' ও 'দেবদাস' লিখি। সে যুগ ছিল যৌবনের উচ্ছ্বাস ও ভীষণ ভাবুকতার যুগ।

দ্বিতীয় পর্বে অসংযত ভীষণ ভাবুকতা সংযত সংবেদনশীলতায় পরিণত হয়। 'পরিণীতা', 'রামের সুমতি', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' ইত্যাদি অনেকগুলি রচনা জীবনের অনুভূতিতে পরিব্যাপ্ত।

১ ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫

২ শেষ কিস্তি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৩ বৈশাখ, ১৩৪৩ (এপ্রিল, ১৯৩৬)

৪ ১ অক্টোবর, ১৯৩৭ (১৫ আশ্বিন, ১৩৪৪)

তৃতীয় পর্বে শিল্প-প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছেছিল। 'দত্তা' ও 'গৃহদাহ' এ সময়ের দান। চতুর্থ পর্বে অর্থাৎ শেষ পর্বে তিনি যেন নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ স্বীকার করেছেন। তাঁর শক্তি ছিল, বিচার ক্ষমতা সবই ছিল, তবুও এ সময়ের লেখার মধ্যে সহজ অনুভূতির স্পর্শ নেই। যা আছে তা হল বিচার ও বিবেচনার সাহসী সংকল্প, যা শিল্পকে ছাপিয়ে নিজেকে বড় করে তুলে ধরে। 'পথের দাবী' ও 'শেষ প্রশ্ন' এই পর্বেই লেখা।

শরৎচন্দ্র ছোটদের খুবই ভালোবাসতেন কিন্তু আশ্চর্য লাগে যে এতদিন পর্যন্ত ছোটদের জন্য তিনি কিছুই লেখেন নি। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে এই শেষ পর্বে এসে তিনি ছোটদের জন্য কয়েকটি গল্প লেখেন। উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল, 'লালু'-১, 'লালু'-২, 'কলকাতার নতুনদা', 'বছর পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী', 'ছেলেধরা' ও 'লালু'-৩। 'কলকাতার নতুনদা' 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃত। এই গল্পগুলিকে নিয়ে যে গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'এর আগে তোমাদের জন্য কখনও লিখি নি। যাঁরা তোমাদের প্রিয় লেখক, তাঁদের কাছে শুনি তোমাদের খুশি করা বড় শক্ত। অথচ সম্পাদকরা অনুরোধ করেছেন কয়টি গল্প লিখে দিতে। এ যেন কুমোরের কাছে কুড়ুল গড়বার ফরমাস। এই বিপদে হঠাৎ মনে পড়ল এক বাল্য-বন্ধুর কথা। ভাবলাম, আজ তারই দু-একটা গল্প বলি। শুনে খুশি হও ভালই।'[১]

ভূমিকাটিতে শরৎচন্দ্র নিজের যে বাল্য-বন্ধুর কথা উল্লেখ করেছেন, গল্পে তার নাম দেন লালু। তিনি লিখেছেন, 'হিন্দীতে "লাল" শব্দটার অর্থ হচ্ছে প্রিয়। ও-নাম কে তারে দিয়েছিল জানিনে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নামের এমন সঙ্গতি কদাচিৎ মেলে। সে ছিল সকলের প্রিয়।'

এই লালুই হল শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ, আর শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার প্রিয় বন্ধু রাজেন্দ্রনাথ। 'লালু' নামের তিনটি গল্পই রাজেন্দ্রনাথের গল্প। এই গল্পগুলি লিখে যেন তিনি নিজের ছোটবেলার প্রিয় বন্ধু ও গুরুর ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করেছেন।

সে সময় আর্থিক অভাবের দরুন ও চিকিৎসার প্রয়োজনে মাত্র এক হাজার টাকার বিনিময়ে প্রকাশনের স্বত্বাধিকার সুধীরচন্দ্র সরকারকে দিয়ে দেন।

জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলার কথা মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেবেলার একটি লেখা তিনি জীবিতাবস্থায় কোনোদিন প্রকাশিত হতে দেননি। উপন্যাসটির নাম 'শুভদা'। মাত্র বাইশ বছর বয়সে বইটি লেখেন।[২] 'বাল্যস্মৃতি' প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলার নাম আমার মনে নাই। শুধু · ·দুখানা বইয়ের নষ্ট হওয়ার বিবরণ জানি। একখানা "অভিমান", মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা,—অনেক বন্ধুবান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেকদিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না। দ্বিতীয় বই "শুভদা"। প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ "বড়দিদি", "চন্দ্রনাথ", "দেবদাস" প্রভৃতির পরে।'

শরৎচন্দ্র 'অভিমান' বইখানি হারিয়ে যাবার বিবরণ দিয়েছেন কিন্তু 'শুভদা' কেমন করে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল সে কথা বলেন নি। অনেকেই তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু আসলে তা সত্য নয়। 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপিখানি বরাবর তাঁর নিজের কাছেই ছিল। একবার তিনি রামকৃষ্ণকে[৩] 'শুভদা' বইখানি পুড়িয়ে দেবার জন্য আদেশ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিথ্যে কথা বলে, অর্থাৎ পুড়িয়ে দিয়েছি বলে বইটি লুকিয়ে রেখে দেয়। তার কারণও ছিল। একদিন শরৎচন্দ্রকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এটি আপনি কেন পুড়িয়ে নষ্ট করতে চান?'

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'এটা যে পোড়াতেই হবে। আমার এ বই ছাপা হলে একজন যে বড় ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়াবে।'

---

১ এই গল্পগুলি বেশির ভাগ ১৯৩৭-এ লেখা হয়। কিন্তু সংগ্রহটি তাঁর মৃত্যুর পর এপ্রিল ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হয়।

২ ২০ জুন থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮

৩ অনিলা দেবীর দেওরের ছেলে, সে তাঁর কাছে থাকত।

এ রহস্য রামকৃষ্ণের বোঝার কথা নয়। কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে বইখানি পোড়াবার নয়। একদিন কী একটা জিনিস খুঁজতে খুঁজতে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি হঠাৎ সেই পাণ্ডুলিপির ওপর পড়ে কিন্তু কি জানি কি ভেবে সেটি আবার নষ্ট করে ফেলার কথা ভাবেন নি।

তাঁর কয়েকজন বন্ধু এই বইখানির বিষয়ে জানতেন এবং সে বিষয়ে তাঁকে বিরক্ত করতেন। বিশেষ করে অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল বইটি পড়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাতেন। শেষে শরৎচন্দ্র অবিনাশ ঘোষালকে পাণ্ডুলিপিখানি পড়তে দেবেন বলে কথা দেন। কিন্তু অবিনাশ যেদিন বইটি নেবার জন্য এলেন, শরৎচন্দ্র বিষণ্ণ হয়ে বললেন, 'অবিনাশ, সব শেষ হয়ে গেল।'

সে সময় তাঁর ভাবাকৃতি দেখলে মনে হত যেন তিনি কাউকে নিজের পুত্রশোকের কথা শোনাতে বসেছেন। ভেতরে গিয়ে একবাক্স ছাই ও কাগজের টুকরো নিয়ে এসে বললেন, 'তুমি অবিশ্বাস করবে তাই এগুলি রেখে দিয়েছি।'

কিন্তু, এ কী ধরনের রহস্য? রামকৃষ্ণকে যা বলেছিলেন, অর্থাৎ বইটি প্রকাশিত হলে একজন মানুষ ঘৃণাস্পদ হয়ে যাবে—সে সম্ভাবনা কি সত্যই ছিল? কিম্বা অন্য কোনো কারণে তিনি বই প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। বইটিতে দারিদ্র্যের মর্মস্পর্শী চিত্রণ পাওয়া যায়, যে চিত্রণ শুধু কল্পনার সাহায্যে সৃষ্ট হতে পারে না। যদিও বইটিতে প্রৌঢ় শিল্পীর নিপুণ পরিপক্ব দৃষ্টির পরিচয় নেই, কিন্তু তার প্রারম্ভিক জীবনের সহজ অনুভূতি নিশ্চয় আছে। সে অনুভূতি...ধার হল সংসারের দৈনন্দিন কষ্টভোগ। শরৎ সাহিত্যের সকল বৈশিষ্ট্যের বীজ তাতে নিহিত। মূক নারীর কণ্ঠে স্বর দেওয়া, পতিতার (কাত্যায়নীর) অন্তরে লুকানো মনুষ্যত্ব খুঁজে পাওয়া—সবই তাতে আছে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পিতার অকর্মণ্যতা ও মায়ের বেদনার কথা লিখতেও তিনি ভোলেন নি। কিন্তু শ্রীকান্ত যেমন শরৎ নয় সেই রকমই 'শুভদা'র হারানবাবুও মতিলাল নন। আবার শুভদাও কখনও ভুবনমোহিনী হতে পারেন না। বইখানি অপ্রকাশিত রাখার উদ্দেশ্য হিসেবে এই কারণটিই একমাত্র প্রবল কারণ হতে পারে না।

কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে সে কোন্ জন যে ঘৃণাস্পদ হয়ে উঠতে পারে? সেইজনের নাম আজ আর লুকানো থাকে নি, তিনি হলেন নিরুপমা দেবী। এই নামটির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অনেক অপবাদ জড়ানো। তবে এ সত্যি যে শরতের প্রারম্ভিক জীবনের সব-কটি লেখাই নিরুপমা দেবী পড়েছিলেন। তাঁর মধ্যে 'শুভদা' বইখানি অন্যতম। নিরুপমা দেবীর প্রথম দিকের এই 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে' 'শুভদা'র ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। একথা নিরুপমা দেবী অবশ্য নিজেও স্বীকার করেছেন[১]—"দিদি", "অন্নপূর্ণার মন্দির" প্রভৃতি প্রকাশের পর··· এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রের উদয়ের পর অনেকবারই অনেকগুলি যুবক আমার কাছে (নানা স্থানে) জানিতে আসিয়াছে, শ্রীশরৎচন্দ্রের কিরণের কতখানি আমি ধার লইয়াছি, কোন্ কোন্ বই আমার তাঁহার সাহায্যে লেখা, তাঁহার সহিত আমাদের কোন্ সূত্রে কতখানি ঘনিষ্ঠতা। এ সম্বন্ধে তাহাদের মুখে গল্পও শোনা গিয়াছিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য নয়! ···· শরৎচন্দ্র যে আমাদের প্রথম জীবনের সাহিত্য সাধনার উৎসাহদাতা গুরু তাহাতে তো সন্দেহই নাই।···· সাহিত্যসম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র এবং আমাদের কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহাদের রচনাপাঠ আমাদের আবাল্য, অস্থিমজ্জায় গ্রথিত হইলেও আমাদের শরৎদার লেখার প্রেরণা যে আমাদের উপর বিশেষভাবেই কাজ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। "অন্নপূর্ণার মন্দিরে"র কথাটি মাত্র উল্লেখ করিতে চাই। এই গল্পটি "দিদি"র লেখার বৎসরখানেক পরে লিখিত হয়।···

'তবে একটি কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে গল্পটি ["অন্নপূর্ণার মন্দির"] লিখিতে গিয়া অলক্ষ্যে শরৎদাদার, "শুভদা"র আভাসও সে গল্পের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে, ইহা খুবই সত্য। যেমন কবিতা লিখিতে গেলেই অসাধারণ প্রতিভাশালী ভিন্ন সাধারণ লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না, তেমনি এই গল্পটিতে শরৎদাদার লেখার

১ নিরুপমা দেবী, "পুরাতন কথার আলোচনা", জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

প্রভাবও হয়তো আমার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া কার্য করাইয়াছিল। যাঁহারা সেদিনের অর্ধলিখিত শুভদা পড়িয়াছিলেন তাঁহারা জানেন যে, শরৎদাদার "ললনা-ছলনা"র সঙ্গে, সতী-সাবিত্রীর কতখানিই প্রভেদ। শরৎদাদার আমরা শিষ্যাস্থানীয়া হইলেও তাঁহার প্রতিভার অনুকরণ বা অনুসরণ কিছুই করিবার ক্ষমতা যে আমাদের নাই ইহা প্রত্যেকের লেখা হইতেই প্রমাণিত হয়।'

শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'কে কতটা ঋণী লোকেরা এ প্রশ্ন আমাকেও যে না করিয়াছে তাহা নয়। কিন্তু যে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছে তাহাকেই অকপটে এই সত্য কথাটাই চিরদিন বলিয়াছি যে···· আমার কাছে লেশমাত্র কেহ ঋণী নয়। এক স্থানে এক সময়ে ছেলে-বয়সে সাহিত্যচর্চা করিতে থাকিলে লোক পরস্পরকে উৎসাহ দিয়াই থাকে, ভালো লাগিলে ভালো বলিয়া বন্ধুজনেরা অভিনন্দিত করিয়াই থাকে, তাহাকে ঋণ বলিয়া অভিহিত করিতে গেলে মানুষের ঋণের কোথাও আর সীমা থাকে না।···· লেখা পড়িয়া ভালো লাগিলে ভালো বলিয়াছি—কোথাও তেমন ভালো না লাগিলে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিতে অনুরোধ করিয়াছি।· · কোনোদিন সংশোধন করি নাই।····· এতকাল পরে এই সকল কথা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য আমার শুধু এই যে, এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যেন লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে।'

শরৎচন্দ্র যাই বলুন-না-কেন, নিরুপমা দেবীর বক্তব্যের আধারে কল্পনা করা অসংগত হবে না যে, 'শুভদা' বইখানি যে কারণে শরৎচন্দ্র প্রকাশিত করতে চাইতেন না, অনেকগুলি কারণের মধ্যে নিরুপমা দেবীও একজন ছিলেন। কিম্বা হয়তো একথা ভেবেছিলেন যে কোনো সময় যথেষ্ট রূপ বদল করে ছাপালে হয়তো ঠিক হবে। তাই বোধ হয় দ্বিতীয়বার পাণ্ডুলিপিখানি খুঁজে পেয়েও নষ্ট করার কথা আর ভাবেন নি।

শরৎচন্দ্রের জীবনে নিরুপমা দেবীর স্থান কতখানি ছিল, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বিবরণ না পাওয়া সত্ত্বেও একথা সত্য যে শরৎচন্দ্র কখনও তাঁকে ভোলেন নি। বর্মা যাবার পর শরতের জীবন অন্ধকারময় মনে হলেও, সে অন্ধকার 'বড়দিদি' প্রকাশনের সময়ই কেটে যায়। তারপর থেকে ছেঁড়া মন নিয়েও ছেলেবেলার বন্ধু--বান্ধবের সঙ্গে তিনি আবার যোগাযোগ করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। 'বড়দিদি' প্রকাশিত হওয়ার এক বছর পর পুরোনো দিনের কথা মনে করে বিভূতিভূষণকে তিনি লিখেছিলেন, 'বুড়ির সম্বাদও পাই; মনে মনে কত যে আশীর্বাদ করি, কত গৌরব অনুভব করি, তাহা আমিই জানি। সে যাহা লেখে, একটুখানি অংশ আমি মনে মনে আদায় করিয়া নদীর ধারে জেটির উপর বসিয়া পরিপাক করি এবং কামনা করি যেন বাঁচিয়া থাকিয়া বিশেষ একটু ভালো জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি।

'না জানি বুড়ির খাতাখানি আজকাল কত মোটা হইয়াছে। একবার পড়িতে এমনি ইচ্ছা করে। আচ্ছা, কাটাকুটি করা "রাফ্ কপি" একটা কিছু নাই কি? চুপিচুপি চুরি করিয়া একটি বার যদি পাঠাইতে পার, আমি তিন-চার দিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করিয়া ফিরাইয়া দিব। যদি নিতান্তই খোঁজ খবর করে, বলিয়ো—একজন পড়িতে লইয়াছে। সে বেচারা ভালোমানুষ, অত পীড়াপীড়ি বোধহয় করিবে না।'

এই চিঠিটিতে তিনি নিজের প্রণয় কাহিনীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। তবে সেই কাহিনীর কোনো মূলগত আধার ছিল না। এ ধরনের গল্প-কথা প্রচার করা যেন তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়েছিল। এমনও হতে পারে যে নিরুপমা দেবীকে শোনাবার জন্যই এ মিথ্যে গল্পের অবতারণা করেছিলেন। হয়তো বলতে চেয়েছিলেন, তোমার জন্যই আমার এ দুর্দশা হয়েছে।

হয়তো এ নাও হতে পারে। তবে নিজের চিঠিপত্রে বহুবার তিনি তাঁর স্নেহপূর্ণ দাবির কথা উল্লেখ করেছেন। লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার সত্যকার শিষ্যা এবং সহোদরার অধিক একজন আছে, তাহার নাম নিরুপমা। আজ সাহিত্যের সংসারে সে তোমার বোধ করি অপরিচিত নয়, "দিদি", "অন্নপূর্ণার মন্দির", "বিধিলিপি" ইত্যাদি তাহারই লেখা।

১. ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮

অথচ, এই মেয়েটিই একদিন যখন তাহার ষোল বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে বার বার করিয়া এই কথাটাই বুঝাইয়াছিলাম, "বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা ইহার কোনোটাই সত্য নয়।" তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি[১] এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই—তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়ে-মানুষ হইয়াই নাই। এইটি আমার বড় গর্বের জিনিস।[২]

'তোমার চিঠির এবং লেখার ধরন ও ভঙ্গী দেখিয়া আমার কেবল বুড়িকে মনে পড়ে। তোমাদের হাতের লেখাটা পর্যন্ত যেন এক।···· তোমার খাতাখানা বেশ মন দিয়া পড়িবার অবকাশ পাইয়াছি। পড়িতে পড়িতে কি মনে হইয়াছে জানো? একটা দামী জিনিসের দোকান অগোছালো এলোমেলো হইয়া পড়িয়া থাকিলে যে জিনিসের দাম জানে তার যেমন কষ্ট বোধ হয়—ঠিক তেমনি। ঠিক এই অবস্থায় একদিন বুড়ির লেখাগুলো পাইয়াছিলাম।

'তোমার অনেক দামের মাল মসলা মজুত আছে, কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল। আমার ব্যবসাও এই বলিয়া খালি মনে হয়, তার মতো তোমাকেও যদি হাতে ধরিয়া বছরখানেকও শিখাইতে পারিতাম তো ইতিপূর্বে আমি যে আশীর্বাদ তোমাকে করিয়াছিলাম তা শাখায় শাখায় ফুলে-ফলে ফুটিয়া উঠিতে বেশি দেরি হইত না। "দিদি"র মতো আর-একখানা বই লোকের চোখের উপর পড়িতে অতি অল্প সময়ই লাগিত।[৩]

'বুড়ির উপর আমার ভারি আশা ছিল, কিন্তু সে ওই একটা "দিদি" ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারলে না। কেন জানো? বার ব্রত জপ-তপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে ভিতরে তার যা-কিছু মধু ছিল সব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। অবশ্য আতিশয্যের জন্যেই, না হলে আমাদের ঘরের কোন্ মেয়ে আর এ-সব ব্যাপার কিছু কিছু না করে?'[৪]

সেদিন বিভূতিভূষণ দেখা করতে এলেন। ভাগলপুরের গল্পের আর যেন শেষ ছিল না। হঠাৎ শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা পুঁটু, বুড়ি কি এখনও পুজো-পাঠ নিয়েই ব্যস্ত থাকে?'

বিভূতিভূষণ বললেন, 'ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা মেয়ে আর কি করবে শরৎদা? ছেলে-পুলে নেই। আমার ছেলে-মেয়ে ও ঠাকুর-দেবতা নিয়েই তার দিন কাটে। ভুলে থাকার জন্য একটা কিছু তো চাই।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'না, না। আমি সে কথা বলতে চাইছি না। আমি নাস্তিক নই, কিন্তু সাহিত্যে তার দেবার ক্ষমতা অনেকখানি ছিল। এখন মনে হয় ঠাকুর-দেবতার ভয়ে সত্যি কথা বলার সাহস হারাতে বসেছে। ওর মধ্যে একটা এমন অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে যার ফলে মানুষের আসল চেহারাটা ও দেখতে পায়। কিন্তু সাহসেরও তো দরকার।'

ফণীন্দ্রনাথকেও অনেকবার লিখেছিলেন, 'নিরুপমাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই লেখেন ভালো। এবং বাজারেও নাম আছে। অনেক সময়ে এবং বেশির ভাগ সময়েই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভালো বলেই আমার মনে হয়।'[৫]

'বুড়িকে একরকম পরওয়ানা জারি করে দিয়েছি যে, যমুনাকে বিশেষ সাহায্য করতেই হবে। সে আমার হুকুম কোনো কারণেই অমান্য করতে পারে না, সেই ভরসা।'[৬]

নিরুপমা দেবীকে লেখা তাঁর একটি পত্র পাওয়া যায় তা থেকেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন, 'ধম্মকম্মর চাপে সাহিত্যচর্চার টিকিটুকুও তোমাতে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমি মনে করছি, এখন থেকে তোমাকে এমনি কোরে বাধ্য করে প্রতিমাসেই কিছু না

১. সংশোধন করার কথা শরৎচন্দ্র পরে অস্বীকার করেন। পূর্বের উক্তি দ্রষ্টব্য।
২. ২৯ জুলাই, ১৯১৯
৩. ৫ অগাস্ট, ১৯১১
৪. ৭ ভাদ্র, ১৩২৬ (২২ অগাস্ট, ১৯১৯)
৫. চৈত্র, ১৩১৯ (মার্চ-এপ্রিল ১৯১৩)
৬. ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩

কিছু লিখিয়ে নেব।"[1]

রাধারানী দেবীকে লেখা চিঠিতে তিনি নিজের এক গার্জেন ও তাঁর মনে গোপন ব্যথার কথা লিখেছিলেন, 'আমার মতো কুঁড়ে মানুষ সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। একান্ত বাধ্য না হলে কখনো কোনো কাজই আমি করতে পারি নে। তবুও এতগুলো বই লিখেছিলাম কি করে? সেই ইতিহাসটাই বলি।

'আমার একজন গারজেন ছিলেন। এঁর পরিচয় জানতে চেয়ো না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, তাঁর মতো কড়া তাগিদদার জগতে বিরল। এবং তিনিই ছিলেন আমার লেখার সবচেয়ে কঠোর সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোঁজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলোমেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াতো না। কিন্তু, এখন তিনি সব ছেড়ে ধর্মকর্ম নিয়েই ব্যস্ত। গীতা–উপনিষদ ছাড়া কিছুই আর তাঁর চোখে পড়ে না। কখনো খোঁজও করেন না এবং আমিও বকুনি ও তাড়া খাওয়া থেকে এ জন্মের মতো নিস্তার পেয়ে বেঁচে গেছি। মাঝে–মাঝে বাইরের ধাক্কায় প্রকৃতিগত জড়তা যদি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনি আবার মনে হয়—ঢের তো লিখেচি–আর কেন? .... অথচ লেখবার কত বড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করেন তো তখন আর একজনকে দেখিয়ে দিতে পারব এই আমার সান্ত্বনা।'

মনের এই গোপন বেদনার কথা তিনি লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কেও লিখেছিলেন, 'আমার মানসিক পরিবর্তনের সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তুমি বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছ, এবং বহুদিন হইতেই আমি নীরবে আছি। কিন্তু আমার মতো যখন তোমার বয়স হইবে, তখন হয়তো ইহা বুঝিতেও পারিবে যে জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ, এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।

'ভীষ্ম যে একদিন স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন সে কথাটা চিরদিনের জন্য মহাভারতে লেখা হইয়া গেল, কিন্তু কত অলিখিত মহাভারতে যে এমন কত শরশয্যা নিত্যকাল ধরিয়া নিঃশব্দে রচিত হইয়া আসিতেছে তাহার একটা ছত্রও কোথাও বিদ্যমান নাই। এমনি করিয়াই সংসার চলিতেছে। তোমার এই দাদাটির অনেক বয়স হইয়াছে। তাহার এই উপদেশটা কখনো বিস্মৃত হইয়ো না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান–বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া যত বড়ই হোক, তাহাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।

'যে বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে তো, থাক্–না!'

শরৎচন্দ্রের নারী–চরিত্রগুলির মধ্যে যখনই ছেলেবেলার সঙ্গীর কথা ও বিবরণ পাওয়া গেছে—বিশেষত বিধবাদের চরিত্রে—নিরুপমা দেবীর চরিত্রই কি ফুটে ওঠে নি? শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী কি নিরুপমা দেবীর মতোই জপ–তপ, বার–ব্রত ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকত না? হিন্দুধর্মের কু–সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়ামির দরুনই বিধবা রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বরণ করতে পারে নি। রমেশও তো সেই একই কারণে রমাকে জীবনে পায় নি। এ–সবের পেছনে কি শরৎচন্দ্রের নিজস্ব কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না? বিধবা হওয়ার জন্যই নিরুপমা দেবীকে তিনি জীবনে পান নি। খুঁজলে হয়তো আরো অনেক কারণ দেখানো যায়, যেমন–দুটি পরিবারের আর্থিক বৈষম্য, শ্রেণীগত পার্থক্য এবং শরৎচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা ইত্যাদি। কিন্তু বিধবা-বিবাহই মুখ্য কারণ ছিল। বাদ–বাকি ছিল সবই গৌণ। লীলারানীকে লিখেছিলেন– 'আমার সকল বই তুমি পড়েছো কি না জানি না। পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই অন্ততঃ এই ব্যাপারটা চোখে পড়িয়াছে যে অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা-বিবাহ সমাজে না

১. ২৭ এপ্রিল, ১৯১৭

থাকার জন্যই চিরদিনের জন্যই ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।'

এ কথাগুলি কি তাঁর নিজের জীবনের বিফলতার প্রতি ইঙ্গিত নয়? বার-বার নিজের চিঠি পত্রে, গল্প-উপন্যাসে এই অসফলতার কথাই কি তিনি পুনরাবৃত্তি করেন নি? স্পষ্টভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে নিজের বেদনার কথা বলেছেন। বন্ধু হরিদাস শাস্ত্রীকে সম্ভবত কিশোর বয়সের এই ভালোবাসার কথা তিনি কখনও বলেছিলেন,-'নারীজাতির প্রতি আমি কোনোদিনই উচ্ছৃঙ্খল ছিলাম না, আজও নই।

'আমি অনেক নেশা করেছি। মন্দ জায়গাতেও গিয়েছি, কিন্তু যদি তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ তা হলে দেখবে যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় দাদাঠাকুর আবার কেউ কেউ বাবাঠাকুর বলে ডাকে। কারণ অত্যন্ত বেহুঁশ অবস্থাতেও আমি তাদের শরীরের প্রতি কোনো লোভ করি নি। তার মানে এ নয় যে আমি কোনো সংযমী, সাধু ও নীতিজ্ঞ ব্যক্তি। সে-সব আমার রুচির বিরুদ্ধে বলে কিছুই করতে পারতাম না। যাকে আমি ভালোবাসতে পারব না, তাকে ভোগ করার লালসা আমার দেহে কোনোদিন জাগে নি। এ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই।'

শাস্ত্রীজী জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'বিশ্বকবির ওই গানটা তোমার মনে আছে?-

"কখনো কুপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি।
অমনি ও মুখ স্মরি শরমেতে হই সারা"।'

হরিদাস শাস্ত্রী বললেন, 'এর মানে?'

'এর মানেও তুমি জানতে চাও? বেশ শোনো। প্রথম যৌবনে আমি একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম। সে ভালোবাসা আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। তবু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও সর্বদা সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যার কোনো স্বরূপই নেই, সে সম্বন্ধে তোমায় কিছুই বোঝাতে পারব না।'

শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, 'না বোঝাতে পারলে তাই সই, কিন্তু তারপর?'

শরৎ বললেন, 'তারপর সেই মেয়েটির পরিচয় জানতে চাও তাই না? সে আমি দিতে পারব না। আর-একটা কথা তোমায় বলতে চাই, এ-সব নিয়ে তুমি যেন কারুর সঙ্গে আলোচনা কোরো না। এ আমার আদেশ মনে কোরো।'

কিন্তু যে ভাবেই হোক শরৎচন্দ্রের এই মনোব্যথার কথা গোপন থাকে নি। তাঁর বর্মার বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর বইয়ে এবং সৌরীন্দ্রমোহনও তাঁর বইয়ে শরৎচন্দ্রের কিশোর বয়সের এই নিষ্ফল প্রেমের কথা লিখেছেন।

শোনা যায় নিরুপমা দেবীকে এ সম্বন্ধে তিনি একটি চিঠিও নাকি লিখেছিলেন। সে চিঠির কথা অনেকেই জানেন। অন্ধকারময় জীবনের গলি পথ থেকে বাইরে এসে একবার তিনি বহরমপুরে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে এসেছিলেন। সে সময় কি দুজনের ভেতর এ সম্বন্ধে কোনো কথা হয় নি? নিরুপমা দেবী কি কোনোদিন নিজের মনের ব্যথা প্রকাশ করেছিলেন? শরৎচন্দ্রের বিষয়ে কয়েকবার তাঁকে লিখতে হয়েছে, কয়েকটি কথার স্পষ্টীকরণও তাঁকে করতে হয়েছে, নিজের বইএ 'শুভদা'র প্রভাব অকপটে স্বীকার করেছেন। বড় স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি শরৎচন্দ্রের সম্মানে কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর একটি গানের কথা বড়ই অর্থব্যঞ্জক—

'তুমি যে মধুকর কমল বনে;
আহরি আন মধু আপন মনে।'

নিরুপমা দেবী নিজেও একবার একথা স্পষ্ট স্বীকার করে গেছেন। প্রায়ই তিনি তীর্থ করতে যেতেন। প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামীর সঙ্গে তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করেন[১]। মৃত্যুর কিছুদিন

---

১ ১৯৩৯

আগে তিনি বৃন্দাবনে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। সে সময় কবি নরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারানী দেবী বৃন্দাবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। নিরুপমা দেবী ভাববিহ্বল হয়ে রাধারানীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'তুমি আমার শরৎদার রাধু! তুমি আমার শরৎদার রাধু।' তারপর কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,–'শরৎদার যে বাউন্ডুলে দশা হয়েছিল, সে শুধু আমারই জন্য।'[১]

তাদের দুজনের সম্পর্কটি তলিয়ে বিচার করে দেখলে এ কথা অসত্য বলে ভাবতে ভালো লাগে না। সুবিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবী শরৎচন্দ্রের উপর বিরক্ত ছিলেন এই কারণে যে তিনি কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবাকে নিয়ে মহত্ব দেখাবার জন্য যা খুশি লিখে বেড়াচ্ছেন। অনুরূপা দেবী আবার নিরুপমা দেবীর বন্ধুও ছিলেন। আজকের সম্মানিত কিন্তু একদার আশ্রয়হীন বখাটে উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের চর্চা তাঁর মতো ধর্মপ্রাণ মহিলার চোখে খুব খারাপ লাগে। 'তিনি তাঁর বন্ধুর ছোট বোনকে "বুড়ি" বলে উল্লেখ করতে পারেন, সেটা কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু তাই থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, অর্ধশতাব্দী পূর্বে নিতান্ত রক্ষণশীল ঘরের বাল-বিধবা শরৎচন্দ্রের মতো চরিত্রের একজন অনাত্মীয় তরুণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করত।'

অন্তরঙ্গ ভাবে না হোক কিন্তু দেখাশোনা তো হতই। নিরুপমা দেবী নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে বিধবা হয়ে যখন সে বাপের বাড়ি ফিরে আসে, শরৎচন্দ্র তখন সে বাড়ির সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রথম শ্রাদ্ধের সময় যখন কিশোরী নিরুপমা পাশের নদীতীরে পিন্ডদান করতে গিয়েছিলেন, তখন বিধবা বৌদি ছাড়া ছোটভাই বিভূতি ও শরৎ এরা তিনজন নিরুপমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। শরৎ যে শুধু সঙ্গেই গিয়েছিলেন তাই নয়, শ্রাদ্ধের ক্রিয়া-কর্মে সক্রিয় সাহায্যও করেছিলেন। হঠাৎ কোত্থেকে একটা ভীমরুল এসে নিরুপমাকে কামড়ে দেয়। হয়তো মধুর লোভে এসে থাকবে, শরৎ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে কামড়ের জায়গায় কখনও দই লাগাতে বা কখনো মধু লাগাতে বলেছিলেন।

শুধু তাই নয়, শ্রাদ্ধ-শেষে নিরুপমা যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, শরৎচন্দ্র নরুনপাড় ধুতি ও সোনার বালা তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শ্রাদ্ধের সময় এ-সব পরা বারণ ছিল। সে যে কী করুণ দৃশ্য, সবাই কেঁদেছিলেন। শরতের চোখের জলও সেদিন কোনো বাধা মানে নি।

এ ঘটনার বর্ণনা নিরুপমা দেবী নিজেও করেছেন। লিখেছেন–'শরৎদার বন্ধু-বান্ধবেরা বলেন যে, তার মন অত্যন্ত কোমল ও পরদুঃখকাতর। সেদিন এ-কথার প্রমাণ পেয়েছিলাম।'

এরপরও কি অনুরূপা দেবীর কথায় বিশ্বাস করতে হবে যে তখন শরৎ যা-তা চরিত্রের একটি তরুণমাত্র? আসলে অনুরূপা দেবী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা। মনের ব্যাপার বোঝার দৃষ্টি ধর্ম কোনোদিন কাউকে দেয় না। এছাড়া একবার শরৎচন্দ্র অনুরূপা দেবীর একটি উপন্যাসের তীব্র আলোচনা করেছিলেন। হতে পারে সে কারণেই তিনি শরৎচন্দ্রের উপর অপ্রসন্ন ছিলেন। তাই তাঁকে দোষ দেওয়া অনর্থক। এ-কথা অসংকোচে বিশ্বাস করে নেওয়া যেতে পারে যে শরৎচন্দ্র শুরু থেকেই নিরুপমা দেবীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই এবং একথাও সম্পূর্ণ আলাদা যে তাঁদের প্রেম পুষ্পিত পল্লবিত হতে পারে নি। এই অপূর্ণতাই তাঁর মনের গোপন ব্যথা ও তাঁর অপূর্ব সৃজনীশক্তির উৎস। প্রেমিকের হৃদয়ে যখন প্রেমিকার বিরহের বজ্রাঘাত হয়, তখন হয় প্রেমিক পাগল হয়ে ওঠে, নইলে বিরাট শিল্পী। তৃপ্তি মানুষের গতি রোধ করে, অতৃপ্তির পথ ধরেই প্রগতির পথ প্রশস্ত হয়।

রাধারাণী দেবীকে লেখা আর-একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে নিরুপমা দেবীর মনোবেদনা, শরৎচন্দ্রের অজানিত ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, 'তোমরা–এই মেয়েরা–তোমাদের আজও ঠিক চিনে উঠতে পারলুম না। নিজের জীবনের অতি কঠিন ও গভীর বেদনায় এই অভিজ্ঞতা মাত্র সঞ্চয়

১. এ কথা লেখক স্বয়ং রাধারানী দেবীর কাছে শুনেছেন।

করতে পেরেচি। · · আমার সাহিত্যেও হয়তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারেও।· ··আমার কি মনে হয় জানো? আমরাই যে শুধু তোমাদের চিনে উঠতে পারলাম না তা নয়, তোমরা নিজেরাও বোধহয় নিজেদের ঠিক চিনে উঠতে পারো না, অথবা নিজেকে চিনতে ভয় পাও। হয়তো এমন হতে পারে, চিনেও সহজে তাকে স্বীকার করে নিতে চাও না? এও কিন্তু আমার কাল্পনিক ধারণা নয়, সত্যিকারের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ধারণা, সুতরাং এর মূল্য উড়িয়ে দেবার নয়।'

এছাড়াও আর-একটি চিঠিতে তিনি রাধারানী দেবীকে লিখেছিলেন, 'সত্যিকারের ভালোবাসার পরখ হোলো ত্যাগের প্রবৃত্তিতে। যে ভালোবাসায় যত বেশি কল্যাণ বুদ্ধি, যত আত্ম-উৎসর্গের প্রবৃত্তি, ত্যাগের প্রবৃত্তি আপনা হতেই গভীরতর আর দৃঢ়তর হতে থাকে, সেই ভালোবাসাই জেনো খাঁটি জাতের।

'ভালোবাসা যখন হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখন সে চায় আধার বা আশ্রয়। এই আধার সর্বক্ষেত্রেই যে উপযুক্ত অথবা সুন্দর হয়, তা নয়। ভালোবাসা আপনিই আপন হৃদয়রসে রচনা করে নেয় তার পাত্রকে।

'বড়ো ভালোবাসা স্বভাবতই নিঃস্বার্থ। এ কেবল উপলব্ধির সামগ্রী, রাধু। হৃদয়ের মহৎ বৃত্তিগুলির সাহায্যে, উপলব্ধির দ্বারাই স্পর্শ করা যায় একে। বুদ্ধি বিচার জ্ঞান তর্ক যুক্তি দিয়ে নয়, এই আমার নিজস্ব ধারণা।

'সংসারে এমন ভালোবাসাও আছে, যে সমস্ত জীবন যাকে ভালোবেসেছে তার কাছ থেকে বহু যোজন দূরে বহু তফাতেই থাকতে চেয়েছে। তার ভালোবাসাই তাকে এই দূরে সরে থাকার প্রবৃত্তি দিয়েছে। কাছাকাছি থাকা, চোখে দেখার আকাঙ্ক্ষা-ভালোবাসার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেই ব্যাকুল ও তীব্র প্রবৃত্তিকেও সংবরণ করার শক্তি জোগায়-খাঁটি ভালোবাসাই। সত্যকার ভালোবাসা, তার পাত্র বা পাত্রীকে সুস্থ এবং সুখী দেখতে চায়, তাকে সার্থক এবং গ্লানিহীন দেখতে চায়। আত্মপরিতৃপ্তি তার ঐখানেই।

'কোনো মিলন যদি ভালোবাসার পাত্রকে অগৌরবের মধ্যে নতশির করে আনে, তার জীবনের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করে আনে, লজ্জা দুঃখ বা অনুতাপ অনুশোচনার সামান্যতমও কারণ সৃষ্টি করে তার জীবনে,—সে মিলন কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না, সুতরাং বাঞ্ছনীয়ও নয়।

'গভীর ভালোবাসায় সকলের চেয়ে প্রয়োজন মনের বলিষ্ঠতার। মিলনে এবং বিচ্ছেদে উভয়েরই কঠিন সংযম এবং দৃঢ় বলিষ্ঠতার প্রয়োজন। আত্মদানেই শুধু প্রেমের সার্থকতা নয়, আত্মসংবরণেও।

'আমার সাহিত্যে তোমরা যা পেয়েছ, তা যদি আমি নিজের জীবনে না পেতুম, এ সাহিত্য সম্ভব হোতো কি? তোমার বুড়ো বড়দার জীবনটা একেবারেই ফাঁকিতে গড়া নয় রে ভাই। কখনও যদি সম্ভব হয়, তোমাকে বলব একটা কাহিনী। শুনতে গল্প-উপন্যাসেরই মতোই অবাস্তব লাগবে, কিন্তু তার চেয়ে বাস্তব সত্যি আমার জীবনে আর কিছুই ঘটে নি।'

কিন্তু নিজেকে চিরদিন আড়ালে রাখার প্রবৃত্তির দরুন এ গল্প শোনাবার সুযোগ আর তাঁর হয় নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না।

২৩

এ সময়ই তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে দুটি নাটক প্রকাশিত হয়; 'বিরাজ বৌ'-এর নাট্যরূপান্তর ওই নামেই,[১] কিন্তু দত্তার নাট্যরূপান্তর হয় 'বিজয়া'[২] নামে।

'বিরাজ বৌ'-এর নাট্য রূপান্তর শিশির কুমার ভাদুড়ী করেন এবং নিজের নিপুণ অভিনয়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকের যে-রূপান্তরটি বাজারে পাওয়া যায় সেটা লিখেছিলেন

১ ১৮ অগাস্ট, ১৯৩৪
২ ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৪

কানাইলাল বসু। 'বিজয়া'র নাট্যরূপান্তর স্টার রঙ্গমঞ্চের নবনাট্য মন্দিরে অভিনীত হয়।[১] শিশির ভাদুড়ী নরেন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় দারুণ হৈ-চৈ আলোচনা ইত্যাদি হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি রাসবিহারীর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

শিশিরবাবু 'নববিধান' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাস দুটিরও নাট্যরূপান্তর করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই সময় শরৎচন্দ্রের ইউরোপ যাবার কথা ওঠে তাই এ প্রশ্ন চাপা পড়ে যায়। 'গৃহদাহ'র দুটি অঙ্ক তিনি নিজে লিখেছিলেন, শেষ অংশটুকুর রূপান্তর বাংলা সাপ্তাহিকের যতীন্দ্রনাথ রায় করেছিলেন। কিন্তু তা খুব একটা ভালো হয় নি, মঞ্চেও 'গৃহদাহ' নাটকটি তেমন সফলতা অর্জন করতে পারে নি।

নিউ থিয়েটার্স শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি রুপালি পর্দায় চিত্রায়িত করতে আগ্রহী হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ নিউ থিয়েটার্সের স্থাপনা হয়। সেই বছরেই প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয়। এ থেকে বীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন ও সেইসঙ্গে একটি রোমাঞ্চকর অনভূতিও তাঁর মনে জাগে। 'দেনা-পাওনা'র জন্য শরৎবাবু মাত্র এক হাজার ও 'দেবদাসে'র জন্য দু-হাজার টাকা পেয়েছিলেন।

বি. এন. সরকারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক ভালোই ছিল। তাঁর সিনেমা হল 'নিউ সিনেমা'র উদ্‌ঘাটন শরৎচন্দ্র স্বয়ং করেছিলেন।

'বিজয়া' বইটির চলচ্চিত্ররূপ শরৎচন্দ্রের খুবই পছন্দ হয়। এর জন্য তিনি ভূরি-ভূরি প্রশংসা করেন।[২] কিন্তু 'দেবদাসে'র চলচ্চিত্রায়নে প্রমথেশ বড়ুয়া যে সম্মান ও যশ পেয়েছিলেন তা আর কেউ পান নি। গৌরীপুরের রাজকুমার প্রমথেশ বড়ুয়া যখন 'দেবদাস' চলচ্চিত্রায়িত করার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে অনুমতি চাইতে গিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র প্রথমে অসম্মত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমার দেবদাস বড় ভাবুক। তাকে চলচ্চিত্রায়িত করা বড় সহজ কাজ নয়। আমি তোমায় কোনো-মতেই অনুমতি দিতে পারি না। আমার লেখা আরো তো অনেক উপন্যাস আছে, তার মধ্যে থেকে যা ইচ্ছে হয় বেছে নাও। "দেবদাস" আমি তোমায় ছুঁতেও দেব না। আমার দেবদাস বড় ইমোশনাল।'

প্রমথেশ বড়ুয়া এতে দুঃখ পেয়েছিলেন কিন্তু হতাশ হন নি। শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে বড়ুয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই হয়। তিনি বড়ুয়াকে বলেছিলেন, 'আমি তোমায় "দেবদাস" ছবি তৈরি করার অনুমতি দিতে পারি তবে, সিনেমায় তাকে বাস্তবিক যথার্থ রূপ তোমায় দিতে হবে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস দেবদাসের নাম-ভূমিকায় তুমি খাঁটি অভিনয় করবে। কিন্তু পারু ও চুনীলালের ভূমিকাও তো কম উল্লেখযোগ্য নয়। সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।'

প্রথম প্রথম শরৎচন্দ্র স্যুটিংয়ের সময় সেটে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে বড়ুয়া মন-প্রাণ ঢেলে বিশ্বস্ততার সঙ্গে চেষ্টা করছে, তখন তিনি যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন যে পরিচালক ও অভিনেতা দুদিক দিয়েই বড়ুয়া ছবির মর্মস্পর্শী ও ভাবুকতাপূর্ণ জায়গাগুলিতে সংযমী ও সতর্ক হয়ে কাজ করছেন।

'দেবদাস'ছবি তৈরি করার কাজ একদিন শেষ হল, অনেক আশা নিয়ে বড়ুয়া শরৎচন্দ্রকে ছবি দেখাতে নিয়ে এলেন। ছবিখানি সম্পূর্ণ দেখার পর শরৎচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বড়ুয়াকে আন্তরিক আশীর্বাদ করেছিলেন। দর্শকরাও 'দেবদাসে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

নিজের অন্যান্য রচনাগুলির চিত্রস্বত্ব শরৎচন্দ্র নিউ থিয়েটার্সকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। পরে নিউ থিয়েটার্সের কাছ থেকে ছায়া-সিনেমার মালিক শচীন্দ্রনাথ বারিক ১৫০০ টাকার বিনিময়ে 'চন্দ্রনাথে'র চিত্রস্বত্ব কিনে নেন।[৩] শরৎচন্দ্রের বহু গল্প ও উপন্যাস অবলম্বনে অনেক

১. ৬ পৌষ, ১৩৪১ (ডিসেম্বর,১৯৩৪)
২. ২০ কার্তিক, ১৩৪৩ (৬ নভেম্বর, ১৯৩৬)
৩. ২২ অগাস্ট, ১৯৩৬

ছবি করা হয়েছে, কিন্তু ভীষণ ভাবুক 'দেবদাস' তাঁকে যে যশ দিয়েছে তা অভূতপূর্ব।

শরৎ-গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ[১] ও সপ্তম খণ্ড[২] এবং তাঁর প্রবন্ধ ইত্যাদির একটি সংকলন এ সময় ছাপা হয়। অথচ তখনও পর্যন্ত তিনি নিজের পুরোনো লেখাগুলির অনেক জায়গায় রদ-বদল বা সংশোধন করতেন। 'চন্দ্রনাথ'-এর চতুর্দশ সংস্করণের ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেছেন,'— "চন্দ্রনাথ"গল্পটি আমার বাল্য-রচনা, তখনকার দিনে গল্পে-উপন্যাসে কথোপকথনের যে-ভাষা ব্যবহার করা হইত, এই বইখানিতে সেই ভাষাই ছিল। বর্তমান সংস্করণে মাত্র ইহাই পরিবর্তিত করিয়া দিলাম।'[৩]

এ সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'নিষ্কৃতি' বইখানির ইংরেজি অনুবাদ। এটি অনুবাদ করেন দিলীপকুমার রায়[৪]। দিলীপকুমার রায় 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' ছাড়া[৫] 'নিষ্কৃতি'কেও শরৎচন্দ্রের তিনটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে গণ্য করতেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর কাছ থেকে তিনি অগাধ স্নেহ ও আন্তরিক আত্মীয়তা পেয়েছিলেন। সেই ভালোবাসার ঋণ পরিশোধের জন্যই মনে হয় তিনি এ কাজে এত উৎসাহ পেয়েছিলেন। তিনি শ্রী অরবিন্দকে বলেন, 'আমি "নিষ্কৃতির" ইংরেজি অনুবাদ করতে চাই, আপনাকে একটু দেখে দিতে হবে।'

শ্রীঅরবিন্দ রাজী হন। দিলীপকুমার রায় যেমন যেমন অনুবাদ করেছিলেন,শ্রী অরবিন্দ তা সংশোধন করেন। অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর শ্রী অরবিন্দ প্রশংসাসূচক কয়েকটি পংক্তি লিখেছিলেন, 'A wonderful style and a great creative artist with a profound emotional power. শ্রীশরৎচন্দ্রের সাহিত্যে তাঁর বিশাল মেধা, বস্তু ও মানবের সূক্ষ্ম ও সঠিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, দুঃখে-যন্ত্রণায় সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয়ের সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। এত সংবেদনশীল মানুষ পৃথিবীতে কেমন করে শান্তিতে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারেন। তাঁর, দৃষ্টিও নিশ্চয় অত্যন্ত ধারালো। বড় নির্মল মন আর উদাত্ত প্রকৃতির প্রাণময় পুরুষ তিনি।'

এই অনুবাদের ভূমিকা লিখে দেবার জন্য দিলীপকুমার রায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে মানসিক সংঘাত চলছিল তাই তিনি মনে করেছিলেন যে কবি হয়তো তাঁর অনুরোধ রাখবেন না। কিন্তু একটি দীর্ঘ পত্রে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত ভাবে শরৎচন্দ্রের মনোব্যথার আলোচনা করে শেষে শরৎ প্রতিভাকে বরণ করে নিয়ে 'নিষ্কৃতি'র ছোট্ট একটু ভূমিকা লিখে পাঠিয়েছিলেন।–'সেই নবীনতম নেতা, যিনি মুক্তিমার্গের দ্বারা বাংলা উপন্যাসকে আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের ভাবনার নিকটে পৌঁছে দেবার মহতী কাজ করেছেন, তিনি হলেন শরৎচন্দ্র। আমাদের ভাষায় তিনি নতুন শক্তি জুগিয়েছেন। নিজের গল্পে বাঙ্গালীর হৃদয়কে নতুন দৃষ্টির প্রকাশে আলোকিত করে সাধারণ মানুষের ভেতর লুকোন ব্যক্তিত্বকে তিনি জীবন্ত করে তার মহত্ত্বকে দেখিয়েছেন। সাহিত্যিকের যা সর্বোত্তম পারিতোষিক তা তিনি পেয়েছেন। বাঙ্গালী পাঠকের মন তিনি সম্পূর্ণ জয় করেছেন। He has achieved the best reward of a novelist: he has completely won the hearts of Bengali readers.' তবু শরতের মনোব্যথা ঘোচে নি। শরৎচন্দ্র যখন জানতে পারলেন যে শ্রী অরবিন্দ অনুবাদের সংশোধন করছেন তখন দিলীপকুমার রায়কে তিনি একটি চিঠি লেখেন।

১ ২৫ ৯ ১৯৩৪
২ ২৭ ৯ ১৯৩৫
৩ ৪ ১০ ১৯৩৭
৪ ২১ ৩ ১৯৩৫
৫ শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর দিলীপকুমার রায় এ দুটির অনুবাদ করেন। 'মাদার্স্ অ্যান্ড সন্স'-এ দুটি নভেলেট সংকলিত হয়।

চিঠিখানি কয়েকটি কারণে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল—

পি ৫৬৬ মনোহর পুকুর,
কলিকাতা
৩রা মাঘ ১৩৪১

পরম কল্যাণীয়,

মন্টু, কাল রাতে দেশের বাড়ি থেকে এ বাড়িতে ফিরে এসেছি। তোমার চিঠিগুলি পেলাম। একটা একটা করে জবাব দিই কাজের ব্যাপারগুলো—

(১) তোমার ও নিশিকান্তর ছবি বেশ উঠেছে। বহুকালের পরে তোমার মুখ আবার দেখতে পেলাম। বড় আনন্দ হলো। একবার সত্যিকার দেখা ভারি দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভেবেছি এ জীবনে আর হলো না।

(২) টাইপরাইটারটা যে ভালো ভাবে পৌঁছেছে এ বড় তৃপ্তি। ভয় ছিল পাছে সেটা বিকলাঙ্গ হয়ে তোমার আশ্রমে গিয়ে হাজির হয়। সেদিন হীরেন এসে বললে মন্টুদার নিজের টাইপরাইটার গেছে পুরনো হয়ে, একটা নতুন কলের তাঁর দরকার। বললুম একটু খেটেখুটে তাঁকে পাঠিয়ে দাও না হীরেন। সে রাজী হলো,—এ-সব সে-ই করেছে—আমি জড়বস্তু, কোন কাজই আমাকে দিয়ে হয় না। আমি শুধু তাদের ঐ কটা টাকার চেক লিখে দিয়েছিলাম। তোমার যে পছন্দ হয়েছে এর চেয়ে আনন্দ আমার নেই। যে-লোক নিজের সমস্ত দিয়েছে তাকে দেওয়া, দেওয়া নয় পাওয়া। আমি অনেক পেলাম। তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

(৩) শ্রীঅরবিন্দের হাতের লেখা চিঠিটুকু সযত্নে রেখে দিলাম, এ একটি রত্ন।

(৪) 'নিষ্কৃতি'কে ভালো অনুবাদ করার জন্যে যে তুমি যথাসাধ্য করবে সে আমি জানতাম। শুধু আমাকে ভালোবাসো বলেই নয়, যারা যথার্থই সাধুর ব্রত গ্রহণ করেন এ তাঁদের স্বভাব। এ না করে তারা থাকতে পারে না। হয় করে না, কিন্তু করলে ফাঁকি দিতে জানে না।

(৫) যে অনুবাদ দেখে দেবার সংকল্প করেছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে, তা ভালো হবেই। কিন্তু বইটার নিজস্ব গুণ এমন কি আছে, মন্টু? কেন যে শ্রীঅরবিন্দের ভালো লাগলো জানিনে। অন্ততঃ, না লাগলে বিস্মিতও হোতাম না, ক্ষুণ্ণও হোতাম না। তুমি শ্রীকান্ত যবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশা করবো হয়তো বাঙালী একজন গল্প-লেখককে পশ্চিমের ওরা একটুও শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। তোমার উদ্যোগ থাকলে এবং শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ থাকলে এ অসম্ভবও হয়ত একদিন সম্ভব হবে। এই ভরসাই করি।

(৬) অনুবাদের ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ আমি স্বীকার করে নিয়েছি। তার কারণ, তুমি ত শুধু অনুবাদক নও, নিজেও বড় লেখক। তোমাকে অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করার লোক বিরল নয়। তা হোক—তাদের সমবেত চেষ্টার চেয়েও অনেক বড় তোমার প্রতিভা এবং একাগ্র সাধনা। তোমার গুরুর শুভাকাঙ্ক্ষা ত সমস্ত কিছুর পিছনে রইলই। জগতে তাদের অপচেষ্টাটাই সফল হবে আর সার্থক হবে না তোমার অন্তরের জাগ্রত শক্তি? এমন হতেই পারে না, মন্টু।

(৭) রবীন্দ্রনাথ আমাকে ইনট্রোডিউস করে দিতে চাইবেন বলে ভরসা করিনে। আমার প্রতি ত তিনি প্রসন্ন নন। তাছাড়া তাঁর এত সময়ই বা কই? সাহিত্য সেবার কাজে তিনি আমার গুরুকল্প, তাঁর ঋণ আমি কোনকালে শোধ করতে পারবো না, মনে মনে তাঁকে এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু ভাগ্য বাধ সাধলো, আমার প্রতি তাঁর বিমুখতার অবধি নেই। সুতরাং এ চেষ্টা করা নিরর্থক।

(৮) হীরেন হয়ত আজকালের মধ্যেই আসবে। তাকে তোমার কাগজ পাঠিয়ে দিতে বলবো।

(৯) শেষকালে রইলো তোমার কথা। তোমার কাছে আমি সত্যিই বড় কৃতজ্ঞ, মন্টু। এর বেশি আর কি বলবো! চিঠি লেখার ব্যাপারটা চিরকালই আমার কাছে জটিল। যেন কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারিনে। তাই যে-সব কথা বলা আমার উচিত ছিল অথচ বলা হল না, সে আমার

অক্ষমতার জন্যে অনিচ্ছার জন্যে কখনো নয়। এ বিশ্বাস করো।
(১০) শ্রী অরবিন্দের নববর্ষের প্রার্থনা সত্যিই বড় চমৎকার লাগলো। সত্যিই খুব বড় কবি তিনি।

শুভার্থী—
শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠিখানি দিলীপকুমার রায় শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং লেখেন, 'মানুষের প্রাণশক্তির লীলাই এ জীবনের গোড়াকে সরস ও বসন্তকে রঙিন করে রাখে।'

এর জবাবে শ্রীঅরবিন্দ যা লিখেছিলেন তা খুবই উল্লেখণীয়—'শরৎচন্দ্রের চিঠির মহিমা তার সজীবতার দরুন নয়, যদিও তা প্রাণশক্তির ভেতর থেকেই উদ্‌ভাসিত হয়েছে, তবুও প্রাণশক্তি তার মূল প্রেরণা নয়। তাঁর চিঠির প্রতিটি পংক্তিতে অন্তরাত্মার প্রকাশ। কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন যে মানুষের ভেতর এ প্রকাশ কেমন করে সক্রিয় হয় তাহলে অকুণ্ঠিত হয়ে বলব যে এই চিঠির মত। এই অন্তরাত্মাই আমাদের আসল সত্তা। মন প্রাণ বস্তুকে এই তো নিজের জীবনী শক্তি দিয়ে ভরিয়ে তোলে ও এরই মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত ও বিকশিত করে, লাবণ্য ও সৌকুমার্যের রসায়নে। মানুষের চেয়ে নিচু স্তরের জীব-জগতেও তা একই কাজ করে থাকে। আসলে তাদের ধীরে ধীরে সে মানবতার দিকে টেনে আনে। মানুষের ভেতরেই এই শক্তি কেবল স্বাধীন ভাবে কাজ করে। যদিও অনেক অজ্ঞানতা, দুর্বলতা, কর্কশতা ও কাঠিন্যের বোঝা তাকে বইতে হয়। যোগের ভূমিকায় এই অন্তঃশক্তি নিজের লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ভেতরে ভেতরে ভগবদ্‌মুখী হয়ে পড়ে, এবং তা পশ্চাৎ ও ঊর্ধ্বপানে চেয়ে থাকে। সেটুকুই যা পার্থক্য।'[১]

শরৎবাবুর চিঠির এই রকম ব্যাখ্যা হয়তো অনেকেই বিস্মিত করতে পারে কিন্তু তা একান্তই যথার্থ। শ্রীঅরবিন্দকে শরৎবাবুও কম ভক্তি করতেন না। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনতত্ত্ব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও তাঁর প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্য তিনি বারংবার স্বীকার করেছেন। এমন-কি মতদ্বৈধতাও খুব সহজ ভাবে প্রকাশ করেছেন,—'শ্রীঅরবিন্দর যা-কিছু ছোট ছোট মেসেজ অথবা তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তুমি আমাকে যত্ন করে পাঠাও তা পড়ি, চিন্তা করি এবং আবার পড়ি। অবশ্য, বুঝতে পারিনে বেশির ভাগ তা স্বীকার করি। মাঝে মাঝে তিনি মন-চৈতন্য বা কনশাসনেস-এর এত বিভিন্ন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায় বা স্তর নির্দেশ করেন যে সে আমার বুদ্ধির অগম্য। তাঁর কবিতার সম্বন্ধেও মতামত আমি সব সময়ে মেনে নিতে পারিনে।'[২]

শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধা করলেও তাঁর শিষ্যদের প্রতি তিনি তেমন শ্রদ্ধাবনত ছিলেন না। দিলীপকুমার রায় সন্ন্যাস বেশ ধারণ করাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। এ কথা কোন দিন লুকোবার চেষ্টা করেন নি। অনেকদিন আগে তাঁকে স্পষ্ট করে লিখেছিলেন,[৩] —'তোমার নামে তো আর ওয়ারেন্ট ছিল না যে সাধু হতে গেলে? ব্যস্‌ আর না। এই পত্র পাওয়া মাত্র চলে আসবে। আবার না হয় দিনকতক পরে যেয়ো, ক্ষতি নেই। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমার বয়সে আমি চার-চার বার সন্ন্যাসী হয়েছি। ও অঞ্চলে বোধ করি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানী ····দের পিঠের চামড়া ছাড়া কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে! এ বাঙালীর পেশা নয় বাপু, কথা শোন, চলে এসো। তুমি এলে এবার একসঙ্গে বর্ষার পরে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ একবার বেড়াতে যাবো। তুমি সঙ্গে না থাকলে খাতির পাওয়া যাবে না, খাওয়া-দাওয়ারও তেমন সুবিধে ঘটবে না। কবে আসচো পত্রপাঠ লিখে পাঠাবে। আমি ইস্টিশানে যাবো।

১ জানুয়ারি, ১৯৩৫
২ ৬ ভাদ্র, ১৩৩৮ (২৩ ৮ ১৯৩১)
৩ ১৩ জুন, ১৯২৯

'আর একটি কথা। বারীন (শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ) শুনেছি যে-কোন গাছের পাতা তোমার নাকের ডগায় রগড়ে দিয়ে যে-কোন ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে। উপেন বাঁড়ুয্যে বলে এটা সে কর্তার কাছ থেকে মেরে নিয়েচে। আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে। হঠাৎ সে মানবে না, কিন্তু ছেড়ো না। দিন কতক তার "আন্দামানের বাঁশি"র খুব তারিফ করতে থাকবে এবং বইখানা সর্বদাই হাতে হাতে নিয়ে বেড়াবে। এবং এ-বই এতদিন যে পড়োনি, এই বলে মাঝে মাঝে তার সুমুখে অনুতাপ প্রকাশ করবে। খুব সম্ভব এই হলেই বিভূতিটা হস্তগত করে নিতে পারবে। উত্তর-ভারত বেড়াবার সময়ে এটা বিশেষ কাজে লাগবে।

'অনিলবরণ শুনেছি নাকি মাটির গুঁড়োকে চিনি করে দিতে পারে। বেশিক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু ৫-৭ ঘণ্টা চিনির মত দেখতে হয়, খেতেও লাগে। এটাও নিশ্চিত শিখে আসবার চেষ্টা কোরো—অনিলবরণ লোকটি সরল এবং ভালো মানুষ, —একান্তই যদি শেখাতে আপত্তি করে তো খুব ভূত পেত্নীর গল্প করবে। হলফ্ করে বলবে যে পেত্নী তুমি চোখে দেখেচো। তারপরে ভাবতে হবে না,—অনায়াসেই কৌশলটা মেরে নিতে পারবে। আর এ দুটো সত্যিই যদি শিখে নিতে পারো ত ওখানে কষ্ট করে থাকবারই বা দরকার কি?

'অনেককাল তোমাকে দেখিনি। ভারি দেখবার ইচ্ছে হয়, গান শোনবার সাধ হয়। কবে আসবে জানিয়ো। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—বিভূতি দুটো আদায় করে আনাই চাই। সময়ে অসময়ে ভারি কাজে লাগে। যাই হোক শীঘ্র চলে এসো। সন্ন্যাসী হওয়া ভারি খারাপ মস্টু, আমার কথা বিশ্বাস কর। আজকালকার দিনে কিছু মজা নেই। কবে আসবে নিশ্চয় লিখো।'

এর দু বছর পর আর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,[১]—'তকুর সঙ্গে শীঘ্রই একদিন দেখা কোরব। বোলব না যে তাঁর সম্বন্ধে তুমি আমাকে কোন-কিছুই লিখেচো, কিন্তু যা-সব তুমি আমাকে জানিয়েছো তাই ভিত্তি করে জেরা করে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা কোরব। দেখি তকু কি বলেন।

'শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কোথাও তো আমি ও-কথা বলিনি। তাঁকে দেশশুদ্ধ সবাই গভীর শ্রদ্ধা করে, শুধু কি করি নে আমিই? তবে আশ্রমবাসীদের উপর আমার মন বেশ সুপ্রসন্ন নয়। হেতু কতকটা তকুর কথায় আর কতকটা অন্যান্য আশ্রমবাসীদের সম্বন্ধে আমার নিজের জানা-শোনায়। তাছাড়া তোমার নিজের চলে যাওয়াটা আমার অত্যন্ত বেজেছিল। যখন আই. সি. এস. কিম্বা আইন পড়লে না তখনও বেজেছিল, কিন্তু যখন গান-বাজনাকেই এবং তার সঙ্গে সাহিত্যকে আশ্রয় করলে তখন সে ক্ষোভ গিয়েছিল। ভেবেছিলাম সবাই চাকরি করবে এবং দেশের লোককে জেলে পাঠাবে হাকিম হয়েই হোক বা ব্যারিস্টার হয়েই হোক,—তাই বা কেন? মন্টুর খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, ও যদি ভারতের কলা-শিল্পকে বিদেশীর চোখে বড় করে তুলতে পারে, বুদ্ধি দিয়ে এর গতানুগতিক পথ থেকে আর এক নতুন পথে টেনে আনতে পারে, সেই কি দেশের কম লাভ, কম গৌরব? তার পরে একদিন শুনলাম তুমি সব ছেড়ে বৈরিগী হয়ে গেছ। হঠাৎ মনে হয়েছিল আমার নিজেরই যেন একটা মস্ত বড় লোকসান হয়ে গেছে। এ জীবনে তোমাকে হয়ত আর দেখতেই পাবো না, এ কি মনে কর আমাদের সোজা দুঃখ? আর কেউ না বিশ্বাস করুক কিন্তু তুমি তো জানো। এই ব্যাপারটা যে আমাকে চিরদিনই গভীর দুঃখ দেবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তোমাদের অনিলবরণ শুনেছি ধুলোকে চিনি করতে পারে। আশ্রমের সমস্ত চিনি নাকি সেই সাপ্লাই করে,—এ কি সত্যি? আমি অবশ্য বিশ্বাস করিনে, কারণ, তাহলে সে আশ্রমে থাকতে যাবে কিসের জন্যে? কলকাতায় বসে অনায়াসে তো একটা চিনির দোকান খুলতে পারতো।

১. কার্তিক, ১৩৩৮ (২১ অক্টোবর, ১৯৩১)

'বারীনের সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়। সে বলে সে কখনো আর ও-মুখো হবে না। অত ভীষণ কড়াক্কড়ির মধ্যে ওর আত্মা পুরুষ যে আজও খাঁচা ছাড়া হয় নি সে ওর বহুভাগ্য। কিন্তু তোমাদের মাদারের সম্বন্ধে ওর একটা গভীর ভক্তি আছে। বলে, ও-রকম আশ্চর্য মানুষ দেখা যায় না। বলে, তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যেমন খাটবার শক্তি, যেমন ডিসিপ্লিন বোধ তেমনি প্রখর বুদ্ধি। প্রত্যেক লোকের ব্যাপার তাঁর চোখের সুমুখে থাকে। তাঁর আদেশ ও উপদেশ ছাড়া এখানে কিছুই হতে পারে না। এইজন্যেই বাইরে থেকে যারা হঠাৎ যায় তারা তাঁর সম্বন্ধে নানাবিধ উল্টোপাল্টা ধারণা নিয়ে ফিরে আসে।

'"নিষ্কৃতি"র অনুবাদ সম্বন্ধে তাঁর মনে বড় আশা ছিল, "নিষ্কৃতি"র ফরাসী অনুবাদের কল্পনাও তোমার আছে দেখতে পেলাম। আমার নিজের বিশ্বাস নেই, শুধু ভাবি শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদে অঘটনও ঘটতে পারে।'

দিলীপকুমার রায় অনুবাদ করছেন, এবং শ্রীঅরবিন্দ তা দেখছেন একথা জানার পর অনেকেই বই প্রকাশনে আগ্রহ দেখায়।

একজন আমেরিকান মহিলা (পূর্বে তিনি 'এশিয়া' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন, এবং এক বাঙালী ভদ্রলোককে বিবাহ করেছিলেন) 'নিষ্কৃতি'র অনুবাদখানি আমেরিকায় প্রকাশিত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েন। কিন্তু তখন শরৎচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল যে 'নিষ্কৃতি'র বদলে 'শ্রীকান্ত'র অনুবাদ হওয়া উচিত। সে দেশে 'নিষ্কৃতি' কোন্ গুণের জোরে সমাদর পাবে? বারবার তিনি দিলীপকুমারকে লেখেন,—'তুমি "শ্রীকান্ত" তর্জমা করতে সঙ্কোচ বোধ করচো কেন? যদি হয় ত তোমাকে দিয়েই হবে।'[১]

'এবার "শ্রীকান্ত" ধরো। বেঁচে থাকতে এর অনুবাদটা চোখে দেখে যাই।'[২]

কিন্তু শরৎচন্দ্রের এ ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। দিলীপকুমার রায় 'শ্রীকান্তে'র অনুবাদ করে উঠতে পারেন নি। অন্য কয়েকজন সে চেষ্টা করেছিলেন, তবে তাঁরাও শেষ পর্যন্ত সফলকাম হতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্রের জীবনে মিথ্যে অপবাদের ভূমিকা তখনো বোধহয় শেষ হয় নি, তাই সে সময় একটা হল্লা ওঠে যে শরৎচন্দ্র নাকি 'নোবেল পুরস্কার' পাবেন। দিলীপকুমার রায় ও অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন যাতে তিনি শরৎচন্দ্রের জন্য প্রস্তাব করেন, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে কবি সে প্রস্তাব করেন নি।

আসলে ডঃ কানাই গাঙ্গুলী ও দিলীপকুমার রায়ের বিশেষ আগ্রহে শরৎচন্দ্র ইউরোপে যেতে রাজী হয়েছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেই ব্যাপারটাকেই এমনভাবে প্রচার করে যার দরুন মনে হয় যে শরৎচন্দ্র নোবেল প্রাইজের জন্য চেষ্টা করতে ইউরোপ যাচ্ছেন।

এ-সবই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষের পরিণাম। এমন কি কখনো কখনো তা হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করত। কোনো-এক অভিনেতার নামও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিল। কিছুদিন 'শনিবারের চিঠি'তে নটরাজের বেশে তার একটা ছবি ছাপা হয়েছিল, এবং তার নীচে কেবল এটুকুই লেখা ছিল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু কোনো অপবাদেই শরৎচন্দ্র মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন নি। আক্রমণ যত তীব্র হত তিনি সেই পরিমাণে নির্ভীক হয়ে উঠতেন। এবার তিনি 'অনাগত' নামে আর-একখানি নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের লেখা একটি উপন্যাসেরও নাম ছিল 'অনাগত'। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগে যে শরৎবাবু যদি ওই নামে বই লেখেন তাহলে তাঁর বইয়ের দিকে লোকে ফিরেও তাকাবে না। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে শ্রী অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের মাধ্যমে তিনি শরৎবাবুকে নিজের উপন্যাসের নাম বদলাবার জন্য অনুরোধ জানান। আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁকে অপদস্থ করেছিল, কিন্তু

১ ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ (২১ মে, ১৯৩৫)

২ ৭ চৈত্র, ১৩৪১ (২১ মার্চ, ১৯৩৫)

শরৎচন্দ্র তখুনি রাজী হন এবং উপন্যাসটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'আগামীকাল' নামে প্রকাশিত হয়। যদিও সেই উপন্যাসখানিও তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাসের তালিকায় আর একটি সংযোজন হয়েছিল।

ইউরোপ যাওয়ার কথা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। লন্ডনে একটি অভ্যর্থনা সমিতি সংগঠন করার পরিকল্পনা করা হয় এবং এ চেষ্টা করা হয় যাতে সে সভায় বার্নার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েল্‌স এবং অলডাস হাক্সলে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু সে-সময় শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য এমন ভেঙে পড়ে যে শেষ পর্যন্ত যাওয়া স্থগিত রাখতে হয়।

২৪

বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি গ্রামেই বাস করেছিলেন, গ্রামের একটা নিজস্ব আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও, অসুবিধেও কিছু কম ছিল না। বারবার ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলায় জড়িয়ে পড়তেন। গ্রামের লোকেদের সমস্যার সমাধান করতে করতে তিনি উত্ত্যক্ত হয়ে পড়তেন। তখন মনে হত সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন।

কলকাতায় তাঁকে প্রায়ই যেতে হত কারণ তাঁর বইগুলি সেখান থেকেই প্রকাশিত হত। সভা-সমিতি থেকে প্রচুর নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণও আসত কিন্তু গ্রামের বাড়ি থেকে কলকাতা যাওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার ছিল, স্টেশন ছিল দু-মাইল দূরে, কাঁচা সড়ক, বর্ষাকালে কাদায় সে পথ ঘাট ডুবে একাকার হয়ে যেত। সে বিষয়ে একবার খুব সহজ ভাবে লিখেছিলেন, 'বৃষ্টি-বাদলে রেল-স্টেশনের একটিমাত্র পথের যা অবস্থা তাতে যাওয়ার কল্পনা করতেও ভয় হয়। পাল্‌কি নিয়ে চলতে বেহারা আশংকা করে, হয়তো পা পিছলে বাঁধ থেকে একেবারে খালে ফেলে দেবে। আচ্ছা জায়গাতেই এসে পড়েছি! এখানকার লোকের একটা সুবিধে আছে। তাদের এই বর্ষাকালে পায়ে খুর গজায়,—তাতেই দিব্যি খট্‌খট্ করে হেঁটে চলে,—পিছলকে ভয় করে না। আমার এখনো ওটা গজায় নি—তবে এরা ভরসা দিয়েছে আরো দু-এক বছর একাদিক্রমে বাস করলেই গজাবে। অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলছি খুরে আমার কাজ নেই, আমি বরঞ্চ যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাব।'

গ্রামে তাঁর শরীর স্বাস্থ্যও ভালো যাচ্ছিল না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানান বিকার বেড়ে গিয়েছিল। অনেক কারণে শহরে আর-একখানি বাড়ি তৈরি করার মনস্থ করেন। হিরণ্ময়ী দেবীও বহুবার তাঁকে শহরে বাড়ি তৈরি করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বাড়ি তৈরি করার জন্য তো টাকার দরকার। তাই আবার তিনি লেখায় মনোনিবেশ করেন। প্রকাশকের কাছে টাকা চেয়ে লেখেন,— 'আমার কলকাতার বাড়িটা শেষ হয়ে এলো। এ সময়ে আপনি আমাকে হাজার পাঁচেক টাকা দিলে আমার দুর্ভাবনা ঘোচে। যে তিনখানা নতুন বই আমার প্রায় শেষ হয়ে এল—আশা হয় এর থেকে ওটা এক বছরেই শোধ হতে পারবে। বাড়িটার এস্টিমেট ছিল চোদ্দ হাজার টাকা, যাঁরা তৈরি করলেন তাঁদের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল অর্ধেক টাকা এ বছরে দেবো, বাকি অর্ধেক পরের বছরে দেবো, কিন্তু পাকেচক্রে খরচ বেড়ে গেল আরও হাজার তিনেক বেশি। নইলে টাকার আবশ্যক হতো না, ধার না করেও নিজেই দিতে পারতাম।

'এ বাড়িতে আজ পর্যন্ত বোধ করি হাজার ষোলো-সতেরো নষ্ট করলুম, কলকাতার বাড়িতেও বোধ করি হাজার তিরিশ নষ্ট হবে।'[১]

তাঁর আয় খুব ভালোই ছিল, তবু এত ধারের উপর ধার কেন? তাঁর একটা বদ্ অভ্যেস ছিল—দরকার থাক্ বা না থাক্ দরকারি বা অদরকারি জিনিসপত্র সবই বাজার থেকে কিনে আনা। এক টাকার দরকারি জিনিস কেনার পর অন্তত পঁচিশ টাকার অদরকারি জিনিস কিনবেনই। কেউ যদি বলত, 'দাদা, এর তো কোনো দরকার ছিল না। কেন অনর্থক কিনতে

১. ২৮ মার্চ, ১৯৩৪

গেলেন?' শরৎচন্দ্র জবাব দিতেন, 'আরে তুমি তো বোঝ না, কখনোও দরকার হতে পারে।'

সেদিন দোকানে একটি সিগারেট কেস দেখলেন। সত্যিই ভারি সুন্দর ডিজাইন, ব্যস—সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেললেন। সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, বললেন, 'দাদা, আপনি তো পাইপ বা হুঁকো খান। খামোকা এই সিগারেট কেসটা কেন কিনলেন?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'সে তুমি বুঝবে না ভায়া! কী সুন্দর দেখেছ, জিনিসটা থাকল। হয়তো কোনোদিন সিগারেট খাওয়া ধরব।'

এই রকম ভাবে সুন্দর সুন্দর নোটবুক, দামী বিলিতি মনিব্যাগ, সুন্দর কাঁচের দোয়াত এমনি কত কী জিনিস কিনতেন। সঞ্চয়ের প্রতি যেন একটা তীব্র ঘৃণা ছিল, গম্ভীর হয়ে বলতেন, 'থাক্, সারা জীবনটাই তো টাকার অভাবে কষ্টে কাটল, মরার সময় ভগবান আমায় ভরে দিয়েছেন— কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজনটাই বা কি?'

শরৎচন্দ্র একদিকে যেমন 'মরিস' মোটর গাড়ি কিনেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বন্ধুদের সাহায্যের জন্যও সর্বদা তৎপর থাকতেন। দোকান থেকে সাত টাকার জিনিস কিনলে দোকানীকে দশ টাকার নোট দিতেন। ফিরতি পয়সার হিসেব নিতেন না। কেউ বললে বলতেন, 'ভুলে গেছি, পরে দিয়ে দেবে' বলে এড়িয়ে যেতেন।

ওষুধপত্র পর্যন্ত তিনি পাইকারি হিসেবে কিনতেন। মাথা ব্যথার ওষুধের একটা শিশি শোবার ঘরের তেপায়ার উপর, অন্যটা বারান্দায়, বাথরুমের কুলুঙ্গিতে তৃতীয় শিশি, আর চতুর্থটা থাকত বাইরের বৈঠকখানায়।

কলকাতার বাড়ি তৈরি হবার পর গৃহপ্রবেশের দিন[১] অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির ভেতর রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। তিনি গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে স্বরচিত দুটি কবিতা পাঠ করেন। মনোমুগ্ধকর স্তব্ধতায় পরিবেশটি মনোরম হয়ে উঠেছিল। কবিগুরু আবৃত্তি করেছিলেন—

'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে
দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।'

কলকাতায় বাড়ি তৈরি হওয়ায় শরৎচন্দ্র অনেকগুলি অসুবিধের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। প্রথমত এখানে চিকিৎসার সুবিধে ছিল, তাছাড়া যাঁরা অতদূর গ্রামে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন তাঁদের পক্ষেও সুবিধে হল। নতুন লেখকেরা মনে অজস্র ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর কাছে আসত ও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করত। শরৎচন্দ্র বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন। দুদিকে ছোট ছোট টেবিল রাখা থাকত, দুটি টেবিলই একই ধরনের জিনিস সাজানো থাকত—ব্লটিং পেপার, সুন্দর লেখার প্যাড, বহুমূল্য ফাউনটেন পেন, পেন্সিল ইত্যাদি। যেদিকে তাঁর ইচ্ছে হত সেদিকে মুখ ফিরিয়ে লিখতেন। টাকার বাক্সের মতো একটা বাক্সে আফিং রাখা থাকত, ছিলিম নিভে গেলে চাকরকে হাঁক দিতেন, 'বৃন্দাবন।'

পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের আসার কোনো বিরাম ছিল না। খাওয়া-দাওয়া, গল্প, আড্ডায় কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত বোঝা যেত না। একদিন এরকম করে সকাল থেকে রাত হয়ে

১ জুলাই, ১৯৩৪

এল। তখন হরিদাসবাবু, দিলীপকুমার রায় ও আরো অনেকে ছিলেন। হঠাৎ হরিদাস বললেন, 'অনেক রাত হল, এবার ওঠা যাক নইলে শরৎদা এখুনি চাকরকে দলিল আনতে হুকুম করবেন।'

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, 'দলিল কেন?'

হরিদাস বললেন, 'তবে শুনুন, আপনার মতোই এক ভদ্র ব্রাহ্মণ ছিল, সরস্বতী পুজোর দিন সে অনেক লোকজন নেমন্তন্ন করে। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হবার পরও কারুর যাবার নামটি নেই। তখন তিনি চাকরকে ডেকে বললেন, 'এই চাবিটা দিয়ে লোহার সিন্দুক থেকে বাবার দলিলটা নিয়ে এসো তো!'

'অতিথিরা অবাক, চাকরও ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, "দলিল?"

'কর্তা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ দলিল, দেখতে চাই বাবা এই বাড়িখানা আমায় দিয়েছেন না এদের সবাইকে।" এ কথা শোনার পর প্রাণখোলা যা একখানা অট্টহাসি হল তা আর বলার নয়।'

সুবিখ্যাত ভাষাবিদ্ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ছিল। তাঁদের দেখাশোনা সভা-সমিতিতেই হত। কলকাতায় তাঁর বাড়ির কাছেই সুনীতিকুমারের বাড়ি ছিল। সুনীতিবাবু প্রায়ই শরৎচন্দ্রের বাড়ি যেতেন। একবার শরৎচন্দ্র এমন একটা মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যার কথা তোলেন যে তার সমাধান সহজ ছিল না। শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করেন, 'বলো তো সুনীতি, তোমার কী ধারণা? কোন্‌টা প্রবল—পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া সামাজিক পরিবেশজনিত সংস্কার, না মানুষের মূল প্রকৃতি?'

সুনীতিবাবু তখুনি কোনো জবাব দিতে পারলেন না, বললেন—'আপনার মনে হঠাৎ এ প্রশ্ন হল কেন?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'কি জানি কেন তোমায় দেখে বর্মার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তোমায় ঘটনাটি শোনাচ্ছি, শোনার পর হয়তো আমার প্রশ্ন তুমি বুঝতে পারবে।—রেঙ্গুনে তখন বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। একদিন আমার এক পরিচিত বাঙালী ভদ্রলোক এসে বললেন, "শরৎবাবু, আমার পরিচিত একটি ব্রাহ্মণের ছেলে চট্টগ্রাম থেকে চাকরির খোঁজে এখানে এসেছে, আপনি যদি ওর কোন ব্যবস্থা করে দেন তাহলে ভাল হয়।" আমার এক বন্ধুর সেগুন কাঠের ব্যবসা ছিল, সেখানেই তাকে কেরাণীর চাকরিতে লাগিয়ে দিলাম। কয়েকমাস পর তার সঙ্গে দেখা হতে অবাক হলাম। পরণের ধুতিখানার অর্ধেক গায়ে চাদরের মতো জড়ানো, পায়ে চটি নেই, গায়ে কামিজ পর্যন্ত নেই। কাঁধে একটা নামাবলী, মাথায় বিরাট এক টিকি, কপালে চন্দন, একেবারে পণ্ডিতের চেহারা। আমায় দেখে নমস্কার করল, বললাম, "এ-সব কি ভাই, পুরুত গিরি করছ নাকি?" খুব নম্র হয়ে বলল, "কী করব বলুন, সেখানে যা পেতাম তাতে কুলোত না। ভাবলাম এখানে তো অনেক বাঙালী হিন্দু আছেন, পুজোআর্চার জন্য তাদের ব্রাহ্মণের দরকার হতে পারে, আর আমি বামুনের ছেলে, পণ্ডিতের কাজ কেনই বা পারব না বলুন। আপনার আশীর্বাদে চাকরির থেকে বেশি উপার্জন করি।"

'বেশ কয়েকবছর কেটে গেল, আমি তাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কী একটা দরকারি কাজে আমায় একবার উত্তর-বর্মার মেমিয়ো শহরে যেতে হয়। এই পার্বত্য প্রদেশটি ভারি সুন্দর। একদিন একটা সার্বজনিক উদ্যানে একা-একা বেড়াচ্ছি। হঠাৎ মনে হল আমায় কেউ ডাকছে "শরৎবাবু! ও শরৎবাবু!" আমি পেছন ফিরে দেখলাম। এখানে তো আমার পরিচিত কেউ নেই। দেখি যে একজন মুসলমান আমার দিকে এগিয়ে আসছে, কাছে এসে বলল, "আপনি কি আমায় চিনতে পারছেন না?" আমি বললাম, "হ্যাঁ ভাই, তোমায় কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

'লোকটি হেসে বলল, "আমি সেই চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। যাকে আপনি কাঠের গুদামে চাকরি করে দিয়েছিলেন।" আমি তাকে লক্ষ্য করে দেখে বললাম, "হঠাৎ এ বেশ কেন?"

'বলল, "আমি মুসলমান ধর্ম নিয়েছি। এছাড়া আর কীই বা করতে পারতাম, শরৎবাবু? পুরোহিতের কাজ আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু সে চলল না। ইংরেজী না জানার দরুন ভালো চাকরিও জুটল না। মেমিয়োতে আসার পর কয়েকজন বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে আলাপ হল,

তাদের মধ্যে একজন নিজের বাড়িতে আমায় আশ্রয় দিল। তার মাংসের কারবার ছিল, আমি তার জোগানদার হলাম। তারপর একদিন ধর্ম পরিবর্তন করে ফেললাম। লোকটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়াতে আমি তার বিধবা বউকে বিয়ে করি। যাবতীয় সব আমারই হল, এখন আমি বেশ ধনী লোক।"

'আমি খুব অবাক হয়েই তার গল্প শুনছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কোন্ কোন্ পশুর মাংস বিক্রি কর?" অত্যন্ত সহজভাবে বলল, "এই ভেড়া, ছাগল, গোরুর মাংস। সব জাতের লোকেরা আসে, সে খেয়ালও আমায় রাখতে হয়।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আর-মাংস কাটে কে?" সে বলল, "আগে টাকা দিয়ে লোক রাখা হয়েছিল। এখন আমি নিজেই এ কাজ রপ্ত করেছি। শুধু গোরু কাটবার সময় অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।"

'শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ব্রাহ্মণের ছেলে, রক্তে ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি, তবু এ-সব কেমন করে সম্ভব? শিক্ষা, সামাজিক পরিবেশ, পূর্বপুরুষদের যে সংস্কার আমরা আজন্ম গ্রহণ করে আসছি তা কি কেবল আমাদের আসল প্রকৃতির উপর একটা পাতলা চাদরের আস্তরণ মাত্র? যখন ইচ্ছে সে আস্তরণ সরিয়ে ফেলতে পারি?'

গল্প শেষ করে শরৎচন্দ্র বললেন, 'এবার মনে হয় তুমি আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছ। তোমার কী মনে হয়?'

সুনীতিবাবু বললেন, 'এর অন্যদিকও থাকতে পারে। এমনও লোক আছে যে প্রাণ গেলেও জীবহত্যা করতে পারবে না। যত প্রতিকূল পরিস্থিতিই হোক না কেন নিজের সংস্কৃতি বিসর্জন দিতে পারবে না। সব-কিছুই নির্ভর করে কোন্ লোক কিভাবে সংস্কার-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে তার উপর। কিন্তু আপনি এ ঘটনা থেকে কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন?'

'আমি কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারি নিঃ অনেক কিছুই মানুষের প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। তবে একথা আমার মনে হয় যে, সংস্কার বাইরের জিনিস, বিপদের সম্মুখীন হলে মানুষের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে।'

এরকম মাঝে-মধ্যে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নানান সমস্যার প্রশ্ন তুলে তার সমাধানের পথ খুঁজতেন। এ ধরনের সমস্যার ছাপ তাঁর গল্প-উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'বিলাসী' গল্পে লিখেছেন— 'ভাল কায়স্থ সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোন কালে সে কসাই ভিন্ন আর-কিছু ছিল।'

তাঁর একটি সমস্যার কথা মহাত্মা গান্ধীর কানে ওঠে। একটি চিঠিতে[১] প্রবর্তক সংঘের মতিবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচার্যগণ বলেন, কলা-সাধনার মূল সূত্র হলো সত্য, শিব এবং সুন্দর। অর্থাৎ, সাধনা হয় যেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ফল যেন হয় কল্যাণময়। যাঁরা বিজ্ঞানের সাধক (তত্ত্বজ্ঞান বলচিনে,-বলচি সাধারণ সাংসারিক অর্থে) অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক যাঁরা তাঁদের একমাত্র মন্ত্র হলো সত্য। সাধনার ফল সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণকর-কোনটাতেই তাঁদের গরজ নেই। হয় ভালোই, না হলেও অপরাধ নেই। সাহিত্য-সেবায় বহুদিন ব্রতী থেকে নিরন্তর অনুভব করি এখানে সত্য এবং সুন্দরে বাধে পদে-পদে বিরোধ। জগতে যা ঘটনায় সত্য, সাহিত্যে হয়ত সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর সে হয়ত সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য বলে জানি তাকে মূর্তি দিতে গিয়ে দেখি সে হয়ে ওঠে বীভৎস কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জন করেও পাইনে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও। জিজ্ঞাসা করি সত্য যদি হয় সুন্দরের পরিপন্থী, কল্যাণ অকল্যাণ হয় গৌণ, সাহিত্য সাধনায় এ সমস্যার মীমাংসা কোন্ পথে?'

গান্ধীজীর সঙ্গে মতিবাবুর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। শরৎবাবুর প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে তিনি তাঁর চিঠিখানি গান্ধীজীকে পাঠিয়ে দেন। গান্ধীজী শরৎচন্দ্রের চিঠির জবাবে

১ ১৭ আশ্বিন, ১৩৪১(অক্টোবর, ১৯৩৪)

লেখেন,–[১] 'শরৎবাবুর চিঠি সম্বন্ধে এটুকু বলা যেতে পারে যে বাস্তবিক সত্য ও সৌন্দর্যের মধ্যে কোনো তফাত নেই, তাই সত্য সদাই সুন্দর। আমার মতে সত্যই সম্পূর্ণ শিল্প। সত্যবিহীন শিল্প যথার্থ শিল্প নয় আবার সত্যবিহীন সৌন্দর্য একেবারেই কুরূপ। এ কথা সত্যি যে পৃথিবীতে অনেক কুরূপ জিনিসকেও সুন্দর মেনে নেওয়া হয়, তার কারণ সত্যকে আমরা সব সময় গুরুত্ব দিই না।'

ইদানীং লেখা ছেড়ে দিলেও ভাবনা–চিন্তার হাত থেকে তাঁর রেহাই ছিল না। নানা প্রশ্নে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। সে সময় একটা প্রশ্নের ঝড় ওঠে, গল্প উপন্যাস কেন এত বেশি লেখা হয়? বিজ্ঞান–বিষয়ক সাহিত্য কেন প্রকাশিত হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন্নগর পাঠচক্রের অধ্যক্ষের ভাষণে শরৎচন্দ্র এ প্রশ্ন সমাধানের কিঞ্চিৎ চেষ্টা করেছিলেন,[২] – 'গল্প লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কি হবে? টাকার অভাবে কত ভালো ভালো কল্পনা–কত বড় বড় প্রতিভা যে নষ্ট হয়ে যায়, তার খবর কে রাখে? যৌবনে আমার একটা কল্পনা ছিল, একটা উচ্চাশা ছিল যে "দ্বাদশ মূল্য" নাম দিয়ে আমি একটা "ভল্যুম" তৈরি করব। যেমন–সত্যের মূল্য, মিথ্যের মূল্য, মৃত্যুর মূল্য, দুঃখের মূল্য, নরের মূল্য, নারীর মূল্য–এই রকম মূল্য–বিচার। তারই ভূমিকা হিসেবে তখনকার কালে "নারীর মূল্য" লিখি। সেটা বহুদিন অপ্রকাশিত পড়ে থাকে। পরে "যমুনা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সেই "দ্বাদশ মূল্য" আর শেষ করতে পারি নি, তার কারণ–অভাব। আমার জমিদারি নেই, টাকা নেই, তখন এমন কি দুবেলা ভাত জোটাবার পয়সা পর্যন্ত ছিল না। প্রকাশকেরা উপদেশ দিলেন, ও–সব চলবে না। তুমি যা তা করে তার চেয়ে দুটো গল্প লিখে দাও;–তবু হাজারখানেক কাটবে। আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য বলুন কিংবা দুর্ভাগ্যই বলুন, বই কিনে আমরা লেখকদের সাহায্য করি না। এমন–কি যাঁদের সংগতি আছে–তাঁরাও করেন না। বরং অভিযোগ করেন, গল্প লিখে হবে কি? অথচ আজ অন্তঃপুরের যেটুকু স্ত্রী–শিক্ষার প্রচার হয়েছে, তা এই গল্পের ভেতর দিয়েই। আমাদের বড়লোকেরা যদি অন্ততঃ সামাজিক কর্তব্য হিসাবেও বই কেনেন, অর্থাৎ যাতে দেশের লেখকদের সাহায্য হয়–এমন চেষ্টা করেন, তাতে সাহিত্যের উন্নতিই হবে। লেখকেরা উৎসাহ পাবেন, পেটে খেতে পাবেন, নিজেরা নানা বই পড়বার অবসর পাবেন। এর ফলে তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে, তবে ত তাঁরা জ্ঞানগর্ভ বই লিখতে পারবেন।'

তখনো পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য হতে পারেন নি, কারণ, যখনই তাঁকে বিশিষ্ট সদস্য করার প্রশ্ন উঠত, পুরাতনপন্থীরা প্রস্তাবটি নাকচ করে দিতেন। তাঁরা তাঁকে দুর্নীতিপরায়ণ লেখক বলে মনে করতেন, ফলে এমন লোককে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য কেমন করে করা যায়? কিন্তু তরুণের দল এ নিয়ে হৈ–চৈ করে তাঁকে বিশিষ্ট সভ্য নির্বাচিত করে তবেই ক্ষান্ত হয়।

কলকাতায় গৃহপ্রবেশের ঠিক দু–মাস পরে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গৌরীনাথ মুখার্জীর বাড়িতে বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয়। একটি উপহার পুস্তিকা তাঁকে প্রদান করা হয় ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রশস্তি পাঠ করেন।

কিন্তু কলকাতার নগর জীবনেও তিনি হাঁফিয়ে উঠতে লাগলেন। যখনই সময় পেতেন গ্রামের বাড়িতে ছুটে যেতেন। গ্রামের বাড়ি যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকত। নির্জনতা প্রিয় একাকী স্বভাব তাঁকে গ্রাম্য পরিবেশে ঠেলে নিয়ে যেত। বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে,– 'দেশের বাড়ি ছেড়ে আমি কোনকালেই যে সহরে উঠে আসবো অর্থাৎ পল্লীবাসীর বদলে নাগরিক, তাহলে মানতেই হবে যে সে কার্য তোমার বিবাহের মতই হবে। (বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তিপ্পান্ন বছর বয়সে কয়েকটি সন্তানের জননী এক বিধবা ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছিলেন,) এতে আমি সহজে রাজী হবো না, তা যত উৎসাহিতই মানুষ করুক। এখানে

১ ১২ নভেম্বর, ১৯৩৪
২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫

রোজ দাড়ি কামাতে হয়, এতবড় যন্ত্রণার ব্যাপার। আমি কল্পনাও করতে পারিনে।.... তোমার সঙ্গে বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, যদি পার একদিন এসো দুপুর বেলায়। লোকজনের ভিড় তখনই একটু কম থাকে। ৪/৫ দিন আরো এখানে আছি, তারপরই পালাবো এবং হয়ত দীর্ঘদিন আর আসবো না।'[১]

জীবনের শেষদিক প্রায় তিন কি সাড়ে তিন বছর কলকাতা ও সামতাবেড় ছুটোছুটি করেই কেটে গেছে। এমনিতে প্রতি বছরই তাঁর জন্মদিন পালন করা হত। কিন্তু এ বছর তাঁর ষাট বছর পূর্ণ হওয়াতে গুরুদেবই এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। শরৎচন্দ্রকে লিখলেন, 'আগামী রবিবার তোমার প্রৌঢ় বয়সের প্রারম্ভকে অভিনন্দিত করব বলে সংকল্প করেছি। উক্ত দিনে আশুতোষ কলেজ হলে ভবানীপুরে একটি নাট্যগীতি অভিনয়ের আয়োজন করা গেছে, সেইখানেই তোমার সম্মাননার অভিপ্রায় আছে। আর কোথাও আর কোন সময়ে সুযোগ করে উঠতে পারলুম না। আমি কাল বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে কলকাতায় পৌঁছব। সেখানে যদি তোমার কাছ থেকে সম্মতি পাই, তাহলে কথাটা পাকা হোতে পারবে।'

শরৎচন্দ্রের সম্মাননায় রবিবাসরের এই বিশেষ উৎসব গৌরীপুর, দমদমের সুশীল মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাড়ি 'অলকাডবনে' সুসম্পন্ন হয়।[২] কবিগুরু সে উৎসবে আসতে পারেন নি। তাই তিনি এই বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেন। জন্মদিনের দু' সপ্তাহ পরে এই সভাটি 'রবিবাসর'-এর তত্ত্বাবধানে 'প্রফুল্ল-কানন' বেলেঘাটায় হয়।[৩] সেদিন সকাল নটা থেকেই লোকেরা সভায় আসতে আরম্ভ করেন। কবিগুরু সকালে সাড়ে দশটায় এলেন। জলধর সেন তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সাহিত্যের সূর্য ও চন্দ্রের মতন একসঙ্গে বসলেন। সেই আনন্দঘন পরিবেশে উল্লাসের সঙ্গে কবি নিজের আশীর্বাণী পাঠ করলেন,–

'কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র,

'তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্য তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ সভা।

'বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি। তোমার সাহিত্য রসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশন পাত্র। তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

'আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। .... যে লেখার প্রাণ আছে প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

'জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে, মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। .... অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

'আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম, যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারই আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারও স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেননি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বতঃউচ্ছ্বসিত।··· তিনি

১. ২৯ আষাঢ়, ১৩৪১ (১৩ ৭ ১৯৩৪)
২ ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬
৩. ১১ অক্টোবর, ১৯৩৬

বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন। সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টি সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে, কবির আসন থেকে আমি বিশেষ ভাবে সেই স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্য দান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন,—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয়, চমৎকারজনক, শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।'

এই লিখিত ভাষণের পর আলোচনা প্রসঙ্গে কবি আরও বলেন, 'আমার বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ে বাংলা সাহিত্যে আমি এক নূতন ভাবের প্লাবন দেখেছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র ভগীরথের মতো যে নূতন সাহিত্য নিয়ে এলেন তা বাংলাদেশের সর্বসাধারণের অন্তর স্পর্শ করল, তারা তাঁকে সাদরে আপনার বলে গ্রহণ করল, কেবল তখনকার তরুণ ও যুবকেরা নয়, অন্তঃপুরে পর্যন্ত সেই বঙ্কিম সাহিত্যের নূতন হাওয়া প্রবেশ করল। বিরোধীরাও নিন্দা ও প্রতিবাদের ত্রুটি করেন নি। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্য সে সকলকে অতিক্রম করে আপনাকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছিল।---- আমার বৃদ্ধ বয়সে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়ে আবার আমি সেইরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য এমন একটা জিনিস নিয়ে এসেছে, যা বাংলাদেশের সর্বসাধারণের অন্তর স্পর্শ করেছে, তার নিগূঢ়তম বেদনার স্তরে আঘাত করেছে— তাই বাংলাদেশের সকলে শরৎচন্দ্রের রচিত সাহিত্যকে আপনার বলে বরণ করে নিয়েছে। শরৎচন্দ্র নিজের প্রতিভাবলেই বাংলাদেশের হৃদয় জয় করেছেন। কারু কাছে তাঁকে সার্টিফিকেট নিতে হয়নি।'

কবির আশীর্বাদে সেদিন শরৎচন্দ্র বড়ই খুশি হয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন কবি আজ অকৃপণ ভাষায় প্রাণ খুলে তাঁর মঙ্গল কামনা করেছেন। আর তাঁর মনে কোন ক্ষোভ নেই, এর বেশি আর কী চাই? কবিও এর চেয়ে সুন্দর পুরস্কার কোথা থেকে দিতেন?

এই উৎসবটির তিনমাস আগে[১] 'রবিবাসরে'র আর-একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি পদে যোগ দেন। সভাটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে তা শরৎচন্দ্রের কলকাতাস্থ বাসভবনে সম্পন্ন হয়। কবি গিরিজাকুমার বসু ও নিজের ভাইঝিকে সঙ্গে করে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আনতে যান। কবির অনুরোধে তাঁর আসার খবর আগে থেকে কাউকে জানানো হয় নি, তাই সভায় তাঁকে দেখে সবাই খুব খুশি হন। পরিচিত তরুণ সাহিত্যিকদের দেখে কবিও আনন্দ পেয়েছিলেন। একটি দীর্ঘ ভাষণে কবি তাঁর সাহিত্য-রচনার কথা বলেন ও 'বলাকা' থেকে 'ছবি' কবিতা আবৃত্তি করেন, 'তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা'।

শরৎচন্দ্র মর্মস্পর্শী ভাষায় কবিগুরুর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। অনেক রাত অবধি উৎসব চললেও কবিগুরু মাঝখানেই বাড়ি চলে যান। এরপর তাঁর বাষট্টিতম জন্মোৎসব বহু জায়গায় খুব ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়, যা এর আগে কখনো হয় নি। তাছাড়া গত কয়েক বছর থেকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে 'শরৎ- শর্বরী' অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়। এ বছরে আয়োজনটি অসামান্য সফলতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।[২] অধিবেশনে বহু গুণগ্রাহী ও প্রিয়জনেরা উপস্থিত ছিলেন—নাটোরের মহারাজা, কাসিমবাজারের মহারাজা, রায়-বাহাদুর জলধর সেন, রায়-বাহাদুর এন. কে. সেন, কালিদাস রায়, গিরিজাকুমার বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, মুকুন্দচন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, ও আরো অনেকে। শরৎচন্দ্রের 'সতী' গল্পের নাট্যরূপান্তর অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে অভিনীত হয়।

১. ১৯ জুলাই, ১৯৩৬

২ ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার সন্ধ্যা। (বেতার জগৎ ১. ১০ ১৯৩৭)' বেতার জগতে'র রিপোর্ট অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় দ্বারা পঠিত।

সভায় উপস্থিত সবাই সেদিন শরৎচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় যেন ভবিষ্যতের কথা জানতে পেরেছিলেন, তাই বলেছিলেন, 'আমি মানুষ শরৎচন্দ্রের সুদীর্ঘজীবন কামনা করি না। আমি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সুদীর্ঘজীবন কামনা করি।'

অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন, 'বাষট্টি বৎসর বয়সে পা দিয়ে আমার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সকলের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেবার পূর্বে আমার গুরুদেব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি আজ রোগশয্যায়, তাঁকে প্রণাম করি। এ জগতে সাহিত্য-সাধনায় তাঁর আশীর্বাদ এটি শুধু আমার নয়, প্রতিটি সাহিত্যিকের পরম সম্পদ। সেই আশীর্বাদ আজকের দিনে চেয়ে নিলাম।

'নিজের সাহিত্য সাধনার ব্যাপার নিজের মুখে কিছু বলা যায় না। শুধু এইটুকু ইঙ্গিতে বলতে পারি যে, অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে এই সাধনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছি। কোনোদিনই মনে করি নি যে, আমি সাহিত্যিক হব বা কোনো বই আমার কোনোদিন প্রকাশিত হবে। এমন-কি, যা লিখেছি তাও সংকোচে দ্বিধায় পরের নামে। তার কোনো মূল্য আছে কি না ভাবতে পারি নি। তারপরে দীর্ঘকাল—বোধহয় ১৫/১৬ বৎসর, সাহিত্য-চর্চার ধার দিয়েও যাই নি। ভুলেও মনে হত না যে, আমি কোনোদিন লিখি। তারপরে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে আবার এই জীবন, এইটিই হয়তো সত্যকার জীবন। অন্তত ভগবান বোধ হয় এই জীবনটা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তাই ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ঘুরে-ফিরে আবার এরই মধ্যে এই একষট্টিটা বৎসর কাটাতে হল।

'আমি আপনাদের মাঝখানে বেশি দিন থাকি বা না থাকি, আমার এ কথাটা হয়তো আপনাদের মাঝে-মাঝে মনে পড়বে যে, তিনি বলে গেছেন যে অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর এই সাহিত্য-সাধনা ধীরে ধীরে বাধা ঠেলে চলেছিল।'

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কথার সমর্থনে বলেন, 'যদি সাহিত্যিকের মতো হয়ে এই বাংলাদেশকে কিছু দিতে পারি, সে শক্তি ভগবান যদি রাখেন এবং তাঁর সঙ্গে যদি দীর্ঘজীবন দেন আপত্তি নেই। কিন্তু সে যদি না থাকে, যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে, পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে সেই জীবন কারুরই কাম্য নয়—বিশেষ করে সাহিত্যিকের তো নয়ই।'

শরৎচন্দ্র হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন ওপারের ডাক এল বলে, তাই স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা সাহিত্য সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন, 'হয়তো আজকের ৩১শে ভাদ্র আর ফিরে আসবে না। সেইজন্য আসতে হল, তোমাদের ডাককে উপেক্ষা করতে পারলাম না। ৬১টা তো চলে গেল—কিছুই করতে পারলাম না। জানি না, ৬২টা কিরকম ভাবে যাবে। যদি আবার ৩১শে ভাদ্র ফিরে আসে তো তোমাদের কাছে নিশ্চয় আসব।'

আবার একটি স্থানে বলেছিলেন, '৩১শে ভাদ্র বছরে বছরে ফিরে আসবে কিন্তু একদিন আমি আর আসব না। সেদিন এ কথা কারো বা ব্যথার সঙ্গে মনে পড়বে, কারো বা নানান কাজের ভিড়ে স্মরণ হবে না। আবার যদি ৩১শে ভাদ্র ফিরে আসে দেখা হবে, নইলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায়।'

কে জানত সেটাই তাঁর শেষ বিদায়! ৩১শে ভাদ্র আবার এসেছিল কিন্তু তখন আর তিনি আমাদের মাঝে নেই।

এর এক বছর আগে [১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দানে সম্মানিত করা হয়। সেই সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও যদুনাথ সরকারও সম্মানিত হন। চিরদিনের মতো এখানেও একদল তাঁকে দারুণ সমর্থন করেন আর অপর দল করেন তীব্র বিরোধিতা। শেষ পর্যন্ত ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারীবৃন্দকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। শরৎচন্দ্র যখন ঢাকায় গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য যেন একটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের দশম বার্ষিক অধিবেশনেও

১ জুলাই, ১৯৩৬

তিনি অধ্যক্ষতা করেন[১]। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র-সমিতি, কামরুন্নিসা গার্লস কলেজ, মিলন পরিষদ, শান্তি সাহিত্য সম্মিলনী, তাঁকে অভিনন্দন জানান। এক-এক করে বন্ধুদের বাড়ি আতিথ্যও গ্রহণ করতে হয়। অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বঙ্কিম সাহিত্য সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তিনি একটি দীর্ঘ আলোচনা করে বঙ্কিম সাহিত্যের সরাসরি বিরোধ করেন। এই বিরোধ ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য দেবানন্দপুরের বালবিধবা নিরুর গল্প শোনান। বত্রিশ বছর বয়সে দুঃখে কাতর নারীর পদস্খলন হলে ধর্ম-প্রাণ সমাজ তাকে তিলে তিলে মরণের পথে ঠেলে দেয়।[২] বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ ব্যথায় অবরুদ্ধ হয়ে ওঠে, খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'মানুষের মধ্যে যে দেবতা থাকেন আমরা তাঁকে এভাবেই অপমান করি। রোহিণীর কলঙ্ক ও তার শাস্তিও ঠিক এ ধরনের। এমন একটি নারী চরিত্রের কি দুর্গতিই না বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষমতা তিনি জানতেন না তা নয়, কিন্তু তাঁর অভিযোগ যে রবীন্দ্রনাথের মতো সংস্কারমুক্ত হয়ে কেন 'চোখের বালি'র মতো উপন্যাস তিনি লিখতে পারেন নি? এখানে শরৎচন্দ্র ভুল করেছিলেন। প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব ধরনের ক্ষমতা থাকে, অক্ষমতা অপরাধ নয়। একথা তিনি নিজেই বার-বার বলেছেন, কিন্তু বঙ্কিমের বেলায় সে কথা মনে রাখতে পারেন নি। নিজের যুগ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রও কিছু কম বিদ্রোহ করেন নি। কোনো একটি সীমানায় এসে যদি তিনি অপারগ হয়ে থাকেন তো, সেই অক্ষমতা কি শরৎচন্দ্রকেও ব্যাহত করে নি? যদি সে যুগের দিকে তাকিয়ে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রগতিশীল লেখক ছিলেন, গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে বুদ্ধিবাদকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে—তিন-চার হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের যে নিয়ম-কানুনগুলি ছিল, আজকের যুগে তা আক্ষরিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়।

সে বছরই[৩] শান্তিপুরে সাহিত্য সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে শরৎচন্দ্র মুখ্য সভাপতি হন। নিজের সম্বন্ধে আলোচনা শুনলে যেমন তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন, প্রশংসা শুনে তেমনই অস্বস্তি বোধ করতেন। সেদিন একটি ছেলে এসে ঘোষণা করে বসল যে, তিনি নাকি সবার চেয়ে ভালো লেখেন। ইজিচেয়ারে বসে তামাক খেতে খেতে তিনি হ্যাঁ, না করে শুনছিলেন। শেষে ছেলেটি বলল, 'অনেকগুলো বিদেশী উপন্যাস পড়েছি, কিন্তু আপনার লেখায় যে বেদনা আছে তা কোথাও নেই। তাদের লেখা পড়ে চোখের পাতা ভেজে না। কিন্তু আপনার লেখা পড়ে কত যে কেঁদেছি।'

শরৎচন্দ্র হঠাৎ বলে উঠলেন, 'না না, এত কাঁদা ঠিক নয়, চোখ খারাপ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে হাসির গল্পও পড়বে।'

সেদিনের মতো ক্ষমা চেয়ে ছেলেটি ফিরে যায়। শরৎচন্দ্র বললেন, 'নিজের প্রশংসা শুনতে শুনতে তামাক পর্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠল।'

একদিন আর-একটি ছেলে এসে বলল, 'আপনার লেখা "সতী" গল্পটি পড়লাম। এমন গল্প আপনিই লিখতে পারেন, বাংলা সাহিত্যে ও ধরনের গল্প দুর্লভ।'

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প পড়েছ?'

'—পড়েছি কিন্তু এত ভালো লাগে নি।'

'ভালো করে পড়ো। দেখবে এমন গল্প বিশ্ব-সাহিত্যেও দুর্লভ।'

শরৎচন্দ্রের মতো ব্যক্তির পক্ষে প্রশংসা ও নিন্দে দুই-ই সুলভ। প্রশংসার চেয়ে নিন্দেই তাঁর জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে এ-সবের আর কোনো মূল্যই থাকে না। মৃত্যু যখন তাঁর দুয়ারে করাঘাত করছে তখন প্রবোধ কুমার সান্যাল তাঁর প্রতি তীব্র কটাক্ষ

১ পূর্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য
২ প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য
৩. ৮ জুন, ১৯৩৬

করেন। মাত্র কয়েক বছর আগে[১] প্রবোধ কুমার সান্যাল শরৎচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর সহজ সরল চরিত্র–চিত্রণ, বিপুল অভিজ্ঞতা, মধুর কোমল ভাষা, শব্দ নির্বাচনের দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন; সেই প্রবোধ কুমার সান্যাল আজ শুধু তাঁর সাহিত্যের কটু আলোচনাই করেন নি, তাঁর ব্যক্তিত্বেও চরম আঘাত হেনেছিলেন। বলেছিলেন, 'তার মুখের সঙ্গে মনের মিল নেই, কথার সঙ্গে কাজের ঐক্য নেই, তাঁর চরিত্রের সঙ্গে আচরণের সামঞ্জস্য নেই।'

প্রবোধ সান্যালের এ–ধরনের দুটি রচনা 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দেখতে দেখতে পক্ষ–বিপক্ষ দলের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। শরৎচন্দ্রের বন্ধুরা বললেন, 'এ প্রচার ঈর্ষাবশত করা হচ্ছে।' প্রবোধবাবুর একজন সমর্থক শরৎচন্দ্রের এক গুণগ্রাহীর নামে একটি রচনা প্রকাশিত করেন। তাঁরা লেখেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র–মাইকেল–রবীন্দ্র-সেবিত বঙ্গভাষার পূত অঙ্গে বর্মা–পালানো ভবঘুরে শরৎচন্দ্রের লেখনীর খোঁচায় যে দুষ্ট ব্রণ জন্মলাভ করিয়াছিল, আজ তাহা ব্যাপকভাবে সারাদেহ গলিত করিতে চলিয়াছে।'

সেই লেখক বন্ধুটি শরৎবাবুর কাছে গিয়ে বলেন, 'আমি এর প্রতিবাদ করতে চাই।' শরৎচন্দ্র বললেন, 'না, কিছুই কোরো না, আমি এ–সব সইতে পারব না। আমায় নিয়ে এখন আর এত বাক্–বিতন্ডা কেন? আমার কথা শোনো, চুপচাপ বসে থাকো।'

প্রবোধ কুমার সান্যাল একথাও লিখেছিলেন যে, 'শরৎচন্দ্র দিলীপ রায়ের বই পড়ে ইউরোপীয় ভাবধারা শেখেন এবং কালিদাস রায়ের কাছে ব্যাকরণ ও কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে রাজনীতি শেখেন।'

এর প্রতিবাদে কালিদাস রায় একটি রচনা লেখেন এবং শরৎবাবুকে সেটি শোনান। শরৎবাবু শুনে লেখার প্রশংসা করে সঙ্গে সঙ্গে সেটি ছিঁড়ে ফেলে দেন। শুধু তাই নয়, ছেঁড়া টুকরোগুলো জ্বলন্ত ছিলিমের উপর ফেলে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, সেদিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, 'যুবক লেখকদের লেখার তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা হলে কিছু ফল হতে পারে। তাদের আঘাত সইবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি আছে, ভুল করলে শোধরাবারও বয়স আছে। আমার মতো মৃত্যুপথযাত্রীকে এ আক্রমণ কেন? আক্রমণ করে দুদিন পরেই তো অনুতাপ করতে হবে। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, যাবার আগে কারো সঙ্গে বিরোধ করতে চাই না। যে যা বলে বলুক, তোমরাও কোনো প্রতিবাদ কোরো না।'[২]

প্রবোধকুমার হঠাৎ কেন এত কটু হয়ে উঠেছিলেন? তার একমাত্র কারণ কি যৌবনের আবেশ ও পীড়িতের মধ্যে সংঘাত নয়? তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি[৩] দেখে মনে হয়, তিনি নিজের 'মহাপ্রস্থানের পথে' বইখানির জন্য শরৎচন্দ্রকে ভূমিকা লেখার জন্য অনুরোধ জানান। যে–কোনো কারণেই হোক শরৎচন্দ্র তা লিখে উঠতে পারেননি। প্রবোধকুমারের অসংযত কটূক্তির কি এও একটা কারণ হতে পারে না?

টলস্টয় সারাজীবন অন্যায় ও নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন কিন্তু শেষে তিনি বলেন, 'আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না, যেমন যেমন মানুষ বুড়ো হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পথে এগুতে থাকে, তার জীবন বদলে যায়। এখন আমার এই ভালো লাগে, জার হোক বা ভিখারী হোক সবার সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করি।'

শরৎচন্দ্রের মনের কথাও তাই ছিল। মৃত্যুর প্রায় ছ'মাস আগে একটি তীব্র আক্রমণের উত্তরে বলেছিলেন,[৪] 'যাবার দিন ঘনিয়ে এল, নালিশ করে অশান্তি বাড়াতে ইচ্ছে হয় না—মনে মনে এই ভেবে রেখেছি। আমি জানি যারা আমায় সত্যি ভালোবাসে তারা দুঃখ পাবে, কিন্তু সহ্য করা ছাড়া প্রতিকারের আর তো কোনো পথ নেই।'

---

১ ১৯৩২

২ এর কয়েক মাস পরে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়। সেদিনের বিরাট শবযাত্রায় প্রবোধবাবু সবার আগে কাঁধ দেবার জন্য গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন,'ভারতবর্ষে' তাঁর স্মৃতি হিসাবে যে দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়, প্রবোধবাবু তার সম্পাদনা করেন। লেখককে তিনি বলেছিলেন, 'শরৎচন্দ্রকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসেন।'

৩ ১৯৩৩, অপ্রকাশিত চিঠি

৪ ৯ জুলাই,১৯৩৭

জীবনের শেষ লগ্নে এসে সৃজন ক্ষমতার উৎস যেন শুকিয়ে গিয়েছিল। জীবনের নৌকো কোনোরকমে দাঁড়বিহীন দড়ির সাহায্যে এগিয়ে চলছিল। সেদিন হেমেন্দ্র হেসে তাঁর কাছে লেখা চাইলে, বড় দুঃখে তিনি বললেন, 'আমি আর লেখা দিতে পারব না। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়, কলম ধরাই কঠিন হয়ে পড়েছে।'

হেমেন্দ্র আবার অনুরোধ জানালে কাতর হয়ে বললেন, 'বিশ্বাস করো, হেমেন্দ্র, আমি আর লিখতে পারি না। তুমি আমার শরীরের অবস্থা জান না, আমার দ্বারা আর লেখা হয়ে উঠবে না।'

২৫

যদিও রাজনীতির ক্ষেত্রে তখন তাঁর তেমন কোনো সক্রিয় যোগাযোগ ছিল না কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নিয়ে কয়েকবার নিজের স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনা করলেও তাঁদের সঙ্গে তিনি কোনোদিন অশিষ্ট ব্যবহার করেন নি। কোনো এক প্রিয়জনকে বলেছিলেন, 'বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাজের সমালোচনা করলে কোনো ক্ষতি নেই, তবে তা এমনভাবে বলা উচিত যাতে তাঁদের প্রতি কোনো অংশে শ্রদ্ধা না কমে।'

যখন[১] সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং অ্যানে কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে একটি পৃথক দল তৈরি করলেন তাঁর মোটেও ভালো লাগেনি। কংগ্রেসেরই কোনো পার্টির পক্ষপাতী হতে পারেন কিন্তু কংগ্রেস যাতে দুর্বল হয়ে পড়ে তা তিনি চাননি। তিনি বলেছিলেন, 'যিনি এই নব-আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছেন, তাঁকে আমি একনিষ্ঠ প্রবীণ কর্মী হিসেবে শ্রদ্ধা করি; দেশের রাজনৈতিক সাধনার ইতিহাসে দান তাঁর কম বলেও মনে করি নে। কিন্তু দেশের প্রতি দুঃখবোধ তাঁর কংগ্রেসের চেয়েও বেশি, এ কথা প্রমাণের জন্য নূতন কোনো দল গঠনের প্রয়োজন বোধ করি ছিল না। কংগ্রেস দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস চিরকাল লড়াই করে এসেছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে। আজ তাকে ছোট প্রমাণ করবার চেষ্টায় ব্যক্তিগত গৌরব কিছুমাত্র বেড়েছে কিনা জানি নে, কিন্তু দেশের গৌরব বুঝি এতটুকুও বাড়েনি।

'দেশসেবা জিনিসটা যতদিন ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায়, ততদিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। এ কথা আমি প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব করি। আবার ধর্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখনও ঘটে বিপদ। মহাত্মা জানেন এবং ওয়ার্কিং কমিটিও জানেন যে, ভুল তাঁরা করেন নি। মালব্যজী এবং অ্যানের বিরুদ্ধাচরণও মহাত্মাকে বিচলিত করেনি। সুতরাং তিনি যদি কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগই করেন, তার সঙ্গে এ গোলযোগের কোনো সম্বন্ধ থাকবে না।···

'একটা কথা জানি, বাংলাদেশের মুসলমানরাও "জয়েন্ট ইলেকটোরেট" চাইতে শুরু করেছেন। তা না হলে গলদ কোথায়, তা তাঁরা ভালো করেই জানেন। এ কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকাংশ ধনী মুসলমানই নায়েব, গোমস্তা, উকিল, ডাক্তার হিসেবে স্বজাতির চেয়ে হিন্দুদের বিশ্বাস করেন বেশি। সঙ্গে সঙ্গে এও আমি বলি যে, প্রত্যেক হিন্দুই মনেপ্রাণে ন্যাশনালিস্ট। ধর্ম-বিশ্বাসেও তারা কারো হতে ছোট নয়। তাদের বেদ, তাদের উপনিষৎ, বহু মানুষের বহু তপস্যার ফল। তপস্যার মানেই হল চিন্তা। বহুজনের বহুতর চিন্তার ফলে যে ধর্ম গড়ে উঠেছে, আইন-সভায় গুটিকতক আসন কম হবার আশঙ্কায়, তাকে সর্বনাশের ভয় দেখাবার প্রয়োজন বোধ করি ছিল না।'[২]

দু-বছর পর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্ন উঠলে তার বিরুদ্ধে তিনি জোর গলায় নিজের মতামত জানাতে দ্বিধা করেন নি। ফলে বাংলার হিন্দুদের যে ক্ষতি হয় তার বিরুদ্ধে টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়।[৩] সভায় শরৎ স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'নূতন শাসনব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ। সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাংলায় হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত

১ জুলাই, ১৯৩৪
২ "বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ" ('নাগরিক', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪১)
৩ ১৫ জুলাই, ১৯৩৬

হলো সব চেয়ে বেশি। আইনের পেরেক ঠুকে তাঁদের ছোট করা হলো চিরদিনের মতো। তথাপি এ কথা সত্য যে, দেশের মুসলমান ভাইয়েরা দশ-পনেরোটা স্থান বেশি পেয়েছেন বলে তাঁদের বলতে চাই,—অন্যায়, অবিচার—একজনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কাহারও মঙ্গল হয় না।'

সেই দিনেই অ্যালবার্ট হলে এই ধরনের আর-একটি সভা হয়। শরৎচন্দ্র সভার অধ্যক্ষতা করে বলেন, 'তারপর এতবড় অবিচার যে আমাদের—হিন্দুদের উপর হলো, এ তাঁরা জেনেও নীরব হয়ে রইলেন—এইটাই সকলের চেয়ে দুঃখের কথা। এটা কি তাঁরা বোঝেন না যে, এই যে ক্ষোভ হিন্দুদের মনের মধ্যে জমা হয়ে রইল-একদিন-না-একদিন তা রূপ পাবেই; তার যে একটি প্রতিক্রিয়া আছে, এও কি তাঁরা ভাবেন না? এরকম করে তো আর একটা দেশ চলতে পারে না, একটি জাতি বাঁচতে পারে না—এটা তো তাঁদেরও জন্মভূমি। দেখুন, কেবল দিলেই হয় না,—গ্রহণ করার শক্তিও একটা শক্তি। আজ যদি তাঁরা মনে করেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঢেলে দিলেন বলেই তাঁদের পাওয়া হলো—একদিন টের পাবেন, এত বড় ভুল আর নেই।

'আমি আমার মুসলমান ভায়েদের বলছি, তোমরা সংস্কৃতির উপর নজর রেখো; সাহিত্যের উপর নজর রেখো, আর ছোট ছেলের মতো ধারালো ছুরি হাতে পেয়েছ বলে সব কেটে ফেলো না।'

দশ বছর আগে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা[1] হলে তিনি 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন, 'ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনোদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে-কোনো ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এত বড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝবার এখনো অনেক বিলম্ব। এবং জগৎসুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোনোদিন চোখ খুলিবে কিনা সন্দেহ। আর, দেশের মুক্তির সংগ্রামে কি দেশসুদ্ধ লোকেই কোমর বাঁধিয়া লাগে? ইহা সম্ভব, না ইহার প্রয়োজন হয়? আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের অর্ধেকের বেশি লোকে তো ইংরাজের পক্ষেই ছিল। আয়ার্লন্ডের মুক্তিযজ্ঞে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গভর্নমেন্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সে তো এখনো শতকে একজনও পৌঁছে নাই। · কেবলমাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই সত্যাসত্য নির্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া। এই একাগ্র তপস্যার ভার রহিয়াছে দেশের ছেলেদের 'পরে। হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ফন্দি উদ্ভাবন করাও তাহার কাজ নহে, এবং যে-সকল প্রধান রাজনীতিবিদের দল এই ফন্দিটাকেই ভারতের একমাত্র ও অদ্বিতীয় বলিয়া চীৎকার করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁহাদের পিছনে জয়ধ্বনি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া বেড়ানোও তাহার কাজ নহে। জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান-মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয়, এ আশা নির্বিশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয়তো একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ, মিলন তখন শুধু কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে।'[2]

ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে বলেছিলেন,[3]- 'ওয়াজেদ আলী সাহেব সবচেয়ে মর্মান্তিক কথা বলেছেন এইখানে,''বস্তুতঃ দুইটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির সংঘর্ষের ফলে এই বিক্ষোভ। এর জন্য আক্ষেপ বৃথা। হিন্দু মুসলিমকে বোঝে না, এজন্যে দুঃখের বিলাপ আজ চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে তার ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি তার মনকে করেছে অপরিসর, দৃষ্টিকে করেছে

১ ১৯২৬
২ 'হিন্দু-সংঘ', ১৯ আশ্বিন, ১৩৩৩
৩ ৩১ জুলাই, ১৯৩৬

আচ্ছন্ন। আপনার পরিধিকে অতিক্রম করে গতি তার নিশ্চল, আপনার আভিজাত্যের গর্বে যে চিরবিলীন, পরাজয়ে প্রাচীন অভিমান যার আজও দুর্জয়, বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র-পরিমিত স্থান দান করতেও যার আপত্তি অন্তহীন, তার বুদ্ধিকে মুক্ত বলা কঠিন। অথচ, মুক্তি যার নেই সে চলে না, চলতে পারে না, সে জড়। এই আত্মকেন্দ্রী পরবিমুখ জড়বুদ্ধির পরিবেশ এ দেশের মুসলিমকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' করে রেখেছে, ভারতের মাটির রসে রসায়িত হয়েও তার মন যেন ভিজছে না।" [১]

'এই যে বলেছেন দুইটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির ফলে এই বিক্ষোভ, এর জন্য আক্ষেপ বৃথা। আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতিবেশী, আমাদের আকাশ বাতাস মাটি জল এক। মাতৃভাষা এক বলেই স্বীকার করি। তবু সংঘর্ষ এত বড় যে, তার জন্যে আক্ষেপ পর্যন্ত করা বৃথা—এই মনোভাবই যদি সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের সত্য হয় তো এই কথাই বলব যে, এর চেয়ে বড় দুর্গতি মানুষের আর ঘটতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিও কি জড়বুদ্ধি? মন তাঁর মুক্ত নয়? এ যদি সত্য তবে ওয়াজেদ আলী সাহেবের এ ভাষা এল কোথা থেকে? সহজ, সুন্দর ও অবলীলায় আপন মনোভাব প্রকাশ করার শক্তি তাকে কে দিলে? এ যুগে এমন লেখক, এমন সাহিত্য-সেবক কে আছে যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী নয়? সাহিত্য ধর্ম-পুস্তকও নয়, নীতিশিক্ষার বইও নয়, অথচ, আপন বিশাল পরিধির মধ্যে আপন মাধুর্যে সে সব-কিছুকেই আপন করে রেখেছে। তাই সাহিত্য কি, রসবস্তু কি, আজও কেউ তার সত্য নির্দেশ পেলে না। কত তর্ক, কত মতভেদ। এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান সম্বন্ধে মিজানুর রহমান সাহেব জ্যৈষ্ঠের "বুলবুল"মাসিকপত্রে তাঁর প্রবন্ধের একস্থানে অকরুণ হয়ে বলেছেন, "শরৎবাবু তাঁর রাশিকৃত উপন্যাসের ভিতর স্থানে স্থানে মুসলমান-সমাজের যে-সব ছবি এঁকেছেন তা মুসলমান-সমাজের খুব উঁচু দরের লোকের নয়।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উঁচু-নীচু স্তরের পাত্র-পাত্রীর উপরেই কি উপন্যাসের উচ্চতা-নীচতা ভালো-মন্দ নির্ভর করে? এ যদি তাঁর অভিমত হয়, তবে আমার সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য হবে না। না হোক, কিন্তু উপসংহারে যে বলেছেন, "হিন্দু-সমাজের বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যে-সকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছাপ্রণোদিত এমনধারা নির্মম কশাঘাতও মুসলিম সমাজ অম্লানবদনে গ্রহণ করবে তা জোর করে বলতে পারি। বাঙলার কথা-সাহিত্য-সম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।"

'সেদিন জগন্নাথ হলে আমার অভিনন্দনের প্রতিভাষণে এ কথার উত্তর দিয়েছি। অন্তরের শুভ-কামনাকে এঁরা কেমন করে গ্রহণ করেন, এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পূর্বে আমি দেখে যাব। সে যাই হোক, মানুষে শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পারে, কিন্তু তার পরিপূর্ণতার ভার থাকে আর একজনের 'পরে, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর। সেদিন খেতে বসে His Excellency আমাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। আমি উত্তর দিয়াছিলাম, আমার সংকল্প কাজে পরিণত করতে—চাই উভয় সমাজের আশীর্বাদ। ঠিক সমাজ নয়,—চাই উভয় সমাজের সাহিত্য-সেবকদের আশীর্বাদ। যে ভাষার যে সাহিত্যের এতকাল সেবা করেছি, তার 'পরে অকারণ অনাচার আমার সয় না। আমার একান্ত মনের বিশ্বাস, আমার মতো সাহিত্যের যথার্থ সাধনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা হিন্দু-মুসলিম যাই হোন, কারোও এ অনাচার সইবে না। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জন্য পরিবর্তন যদি কিছু কিছু প্রয়োজন হয়—এমন তো কতবার হয়েছে—সে কাজ ধীরে ধীরে এঁরাই করবেন। আর কেউ নয়। সে হিন্দুয়ানির কল্যাণেও নয়, মুসলমানির কল্যাণেও নয়-শুধু মাতৃভাষা ও সাহিত্যের কল্যাণে। এই আমার ছোট আবেদন।' [২]

এই ভাষণে লাটসাহেবের সঙ্গে তাঁর যে আলাপ আলোচনা হয়, সে নিয়ে কলকাতায় দুর্নামের আর শেষ রইল না। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সময় এই নির্দোষ ঘটনা বিদ্বেষের রূপ ধারণ

---

১. "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ", 'বিচিত্রা', ভাদ্র ১৩৪৩
২. "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ", 'বিচিত্রা', ভাদ্র ১৩৪৩

করে। খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, ঢাকায় সমাবর্তন উৎসবে শরৎচন্দ্র ঘোষণা করেছেন, এবার তিনি মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সৃষ্টি করবেন। পত্র-পত্রিকায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে লেখা হয়, 'বহু বাঞ্ছিত ডি-লিট যখন নভেল লিখেই পাওয়া গেল এবং যখন রহমান সাহেবের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার) হাত দিয়েই এল তখন এই ব্রাহ্মণ বটু আতিশয্যে বলে ফেললেন, তিনি অতঃপর মুসলমান ভাইদের নিয়েই নভেল চালাবেন। হায় শরৎচন্দ্র, তোমার এই প্রাণের দায়ে কাঙালপনা দেখিয়া সত্যই তোমাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা হয়।'

'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ করে লেখা হল, 'শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বিশেষত্ব হল তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বালিগঞ্জে বাড়ি ফাঁদিয়া বাংলার অজ্ঞাত মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা, বাগবাজারে বসিয়া লন্ডন করেস্‌পন্ডেন্ট হওয়ার চাইতেও কঠিন কাজ। শরৎচন্দ্র পারিবেন না। তাঁহার সে বয়স নাই।'

শুধু তাই নয় তাঁর উপর ভাষা বদলের অভিযোগও করা হয়। কিন্তু যেমন চিরদিন হয়ে এসেছে এবারেও এসব দুর্নামের কোনো প্রভাবই তাঁর উপর পড়ল না। একষট্টি বৎসরে জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় এ ধরনের রটনার বিষয় আলোচনাকালে তিনি বলেন,- 'মুসলমান আমাদের প্রতিবেশী, বাংলাভাষা তাদের মাতৃভাষা। সত্যিই যদি আমরা সহানুভূতি নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলি তাঁরা শুনতে বাধ্য হবেন। তাঁরাও তো মানুষ।'

তিনি মুসলমান-বিদ্বেষী কোনোদিনই ছিলেন না। বরং সাহিত্যে জাতিবাদের নিরন্তর বিরোধ করে গেছেন। বলেছেন, 'আমার "মহেশ" গল্পটিকে মুসলমানেরা কি ভালোই না বাসে। কিন্তু আমি কি তাদের কথা ভেবে গল্প লিখেছিলাম? এখন যদি কোনো উপন্যাস লিখি তা কি তাদের প্রচার করার জন্য লিখব? মানুষকে নিয়েই তো সাহিত্য আর তা যে-কোনো সমাজেরই হতে পারে। সব সমাজের মানুষকে নিয়েই লেখা উচিত। কিন্তু শরীরের অবস্থা এত খারাপ হয়ে পড়েছে, মনে হয় কিছুই করে উঠতে পারব না। হ্যাঁ, আমি কাউকে ভয় পাই না। যদি ভালো থাকি, কথা দিলাম তা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ করব।'

একটি জনসভায় এক মুসলমান ভদ্রলোকের কথায় তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, 'আমি ঠিক করেছি এবার থেকে মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখব।'

কাজী আবদুল ওদুদ-এর মতন কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছিলেন। লেখার আগে মুসলমান সমাজ জীবন সম্বন্ধে ভালো ভাবে পরিচিত হতে চাইছিলেন। এ সম্বন্ধে কাজী সাহেবের আশ্বাসে কিছু কিছু নোট্‌সও তৈরি করে নিয়েছিলেন। ঢাকায় থাকাকালীন আদ্যোপান্ত প্লটের পরিকল্পনাও করে ফেলেছিলেন।

চারু বাবু তখন বলেছিলেন, 'তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারবে না। আমি চাই তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে আমাদের সাহিত্যের এ অভাব দূর করো।'

কিন্তু মৃত্যুর পদধ্বনি কাছে এসে পড়াতে নিজের দেওয়া কথা তিনি রাখতে পারেন নি। বেঁচে থাকলে হয়তো শিল্পের দিক দিয়ে না হলেও 'শেষ প্রশ্নের' মতো আদর্শ ও সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে তিনি একটি সুন্দর রচনা সৃষ্টি করতে পারতেন। এ সংকল্প তাঁর অন্তর্বিশ্বাসের ফল ছিল। অনেকদিন আগে একবার তিনি বিহার শরীফ দেখতে যান। সঙ্গে ছিলেন ভাগলপুরের অ্যাডভোকেট চণ্ডীচরণ ঘোষ। দুজনে মিলে সেখানের বড় মসজিদ দেখতে যান। ভেতরে গিয়ে হঠাৎ আমুদে শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে 'আল্লা', 'আল্লা' করে ডাকতে লাগলেন। চণ্ডীবাবু হেসে বললেন, 'তুমি কি মুসলমান হয়ে গেছ?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'দেখ চণ্ডী! সবাই ভগবানকে ডাকে। আল্লা বলো আর যাই বলো যে নামেই হোক তাকে ডাকা যায়। ভেতরে এসে কিন্তু আমার ভারি ভালো লাগছে।'

সেদিন দুটি মুসলমান লোক তাঁর পানিত্রাসের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ নমাজের সময় হয়ে যাওয়াতে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে তারা শরৎচন্দ্রের কাছে একঘটি জল চায়। শরৎবাবু ভাবলেন, তারা বোধহয় তেষ্টার জল চেয়েছে। তাই জল দিতে দেখলেন, তারা মুখ হাত ধুয়ে একটা গাছের তলায় নমাজ পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। এ দেখে তিনি তাদের ভেতরে ডেকে একটা

গালচে পশ্চিমের বারান্দায় পেতে দিয়ে নমাজ পড়ার জন্য অনুরোধ করেন। নমাজ শেষ হতে তাদের অতিথির মতো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে, সে রাতে সেখানেই থাকার জন্য বলেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীমতী জাহানারা চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠি খুবই উল্লেখযোগ্য[১]। বাংলায় মুসলমান সাহিত্যিক কিছু কম নেই, কিন্তু যে অনুপাতে হিন্দু এ ক্ষেত্রে এসেছে, সে অনুপাতে মুসলমানেরা যোগ দেন নি। এই সমস্যার বিভিন্ন ধারার বিষয় আলোচনা করে তিনি লেখেন, 'কিছুকাল পূর্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত অধ্যাপক, সাম্প্রদায়িক মালিন্য আজও তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টি আবিল করেনি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি, একই দেশে, একই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো বাস করে, একই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এমনি বিচ্ছিন্ন,এমনি পর হয়ে আছে যে ভাবলে বিস্ময় লাগে। সংসার ও জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েছে, এ গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হলে কারও মঙ্গল নেই। বললাম, এ কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কি ঠিক করেছো? তিনি বললেন, উপায় হচ্ছে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান পাঠকেব কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু এক-ই আনন্দ, এক-ই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়। বললাম, এ-কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কাব, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্পসাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়তো এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে সেই তো নিরাপদ।

'তারপরে দুজনেই ক্ষণকাল চুপ করে রইলাম। শেষে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বলবে, আমরা ভীতু, তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও তাও চূড়ান্ত। এ-ও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় ও সংকোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এ-ও বলি এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায় তখন দেখবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ সবচেয়ে বেশি।

'তরুণ বন্ধুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন, এমনি নন্-কো-অপারেশনই কি তবে চিরদিন চলবে?

'বললাম, না, চিরদিন চলবে না, কারণ, সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি করে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘোচাতে হবে।

'বন্ধু বললেন, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করব।

'বললাম, করো। তোমার "চেষ্টার" পরে জগদীশ্বরের আশীর্বাদ প্রতিদিন অনুভব করবে।'

২৬

ইদানীং শরৎ মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে বললেন, এ নিউর‍্যালজিক্যাল যন্ত্রণা। যন্ত্রণা কমাবার জন্য আলট্রাভায়োলেট রশ্মি দেওয়া হয়। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। ভাবলেন, হয়তো চশমার দরুন এই যন্ত্রণা হচ্ছে কিন্তু চশমা বদল

১ ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩৬

করিয়েও কোনো ফল পাওয়া গেল না। মাথা ব্যথার সঙ্গে জ্বরও হতে লাগল, শেষে এমন হল, বিছানা নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই রইল না। কলকাতা থেকে বড় বড় ডাক্তার এসে বললেন,—এ ম্যালেরিয়ার উপদ্রব।

ব্যস, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা শুরু হল। কুইনিন ইনজেকশনের ব্যবস্থা করা হল। নিজের এই অসুখের উল্লেখ তাঁর একটি চিঠিতে পাওয়া যায়, 'কাল বিধান ডাক্তার কুইনিন ইনজেকশন দিয়েছেন। শরীরের যে অংশে ভর দিয়ে মানুষে বেশ সুস্থ হয়ে বসে, ঠিক সেই যায়গায়। উঃ, কী এর ব্যথা! নুনের পুঁটুলি এবং ভাঙা একটা হ্যারিকেন লন্ঠন নিয়ে সকাল থেকে বসে আছি।'[১]

তবু জ্বর এতটুকু কমে নি, বরং দিনের পর দিন অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। ডাক্তারের আর-একটি দল পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, এ 'বিকোলাই' রোগ। বিকোলাইয়ের চিকিৎসায় জ্বর কম হয়,আর স্বাস্থ্যও একটু ভালো হয়। ডাক্তার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনেরা বারবার বললেন যে, জলহাওয়া বদলালে হয়তো শরীর ভালো হতে পারে, কিন্তু কোথাও যাওয়ার আগে আবার তাঁর জ্বর হতে লাগল। সব সময় নিরানব্বুই ডিগ্রি জ্বর থাকত। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে নিজের সেই চিরাচরিত পরিহাসপ্রিয় ভাষায় লিখলেন[২] 'এদিকে আমার জ্বর ত সারিল না। শ্রী বিধানাদি ডাক্তারের দল রোগ নির্ণয়ে অক্ষম।

নানান্ ছাপের জমলো শিশি
নানা মাপের কৌটা হলো জড়ো
ব্যাধির চেয়ে আধি হয়ে বড়
কবলে যখন অস্থি জর জর,
ডাক্তারেরা বললে তখন, হাওয়া বদল করো।

'অতএব, দুই-তিন দিনেই স্থানত্যাগের বাসনা। নিজের নয়, অন্যদের। আমি মনে মনে বলি, হে আমার সন্ধ্যেবেলার নিত্য সহচর ৯৯ 'জ্বর, তুমি আর একটুখানি প্রসন্ন হয়ে তোমার আরব্ধ কাজটুকু চট্‌পট্ সেরে ফেলো, আমি অব্যাহতি পাই।'

শেষ পর্যন্ত দেওঘরে যাওয়া হয়, সেখানে সুরেন্দ্র মামার ছোটভাই সত্যেন্দ্রনাথ সিভিল সার্জেন ছিলেন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নিজের বাড়িটিও থাকার জন্য দিয়েছিলেন। কয়েকমাস সেখানে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরলেন।

দেওঘরের প্রবাসজীবনে তিনি 'দেওঘরের স্মৃতি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটিতে তাঁর কবি-মন যেন মুখর হয়ে উঠেছে। তাঁর সু-বিশাল সাহিত্যে পশু-পক্ষীর প্রতি যে সুতীব্র প্রেমের কম বেশি পরিচয় পাওয়া যায়,'[৩] সে পরিচয় এই প্রবন্ধটিতে গভীর ভালোবাসায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ সেই সময়কার কথা যখন কংগ্রেস ১৯৩৫-এর বিধানের অন্তর্গত পদ স্বীকার করেছে। পদ, প্রতিষ্ঠার যে দাপাদাপি শুরু হয়েছিল তাও এ প্রবন্ধে আলোচনা করে গেছেন, 'অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম, কংগ্রেসের পান্ডা যারা—মন্ত্রী হবার তাদের কি উগ্র বাসনা। অথচ নিস্পৃহতার আবরণে সেটা গোপন করার কত না কৌশল! আইন যারা বানিয়ে দিলে, একটা কথাও শুনলে না, ব্যাখ্যা নিয়ে তাদেরই সঙ্গে কি ঝুটোপটি লড়াই! নিঃসন্দেহে প্রমাণ দিতে চায় ওদের মতলব ভালো নয়। বিড়ম্বনা আর বলে কারে!'

লেখা ছেড়ে দিলে কী হবে, এদিকে প্রকাশকরা তাঁকে ক্রমাগত অনুরোধ করছিলেন নিজের জীবনস্মৃতি লেখবার জন্য। শরৎচন্দ্র বলেন, 'আত্মকথা আমি লিখতে পারব না কারণ আমি সে পরিমাণে সাহসী বা সত্যবাদী নই, আত্মজীবনীকারের যেটুকু থাকা উচিত।'

শোনা যায়, কবিগুরু তাঁকে একদিন বলেছিলেন, 'শরৎ, তুমি আত্মজীবনী লেখো!' শরৎ উত্তর দিয়েছিলেন, 'গুরুদেব! যদি জানতাম আমি এত বড় হব, তাহলে হয়তো অন্যরকম ভাবে

১ ১৮ ৯ ১৯৩৬
২ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ (১১ পৌষ, ১৩৪৩)
৩ অধ্যায় ২০ দ্রষ্টব্য

জীবন কাটাতাম।'

• কত ভালই না হত যদি তিনি টলস্টয়ের মতো নিজের ডায়ারি রাখতেন। রাখলে হয়তো তাঁর সব রচনার চেয়ে তা উৎকৃষ্ট হত, হত মানুষের রহস্যময় প্রাণের গভীরে প্রবেশপথের আলোর দিশারী। জীবন-সায়াহ্নের কোনো একটি ক্ষণে তাঁর মনে কি এ বেদনা হয় নি যে বখাটে উচ্ছৃঙ্খল জীবন তিনি কাটিয়েছেন, নেশা ভাও করেছেন, দিনের পর দিন বেশ্যাদের মাঝে কাটিয়েছেন, এ ছাড়া বাস্তবিক অবাস্তবিক ভালোবাসার আবর্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন? তবে এসব থেকে নির্লিপ্ত থাকার কথাও অবশ্য বলে গেছেন। 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে দেখি, গুরুদেব রাজলক্ষ্মীকে বলছেন, 'যে অপরাধ একজনকে ভূমিসাৎ করে দেয়, সেই অপরাধই আর একজন হয়তো স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে চলে যায়। তাই সমস্ত বিধিনিষেধই সকলকে এক দাঁড়িতে বাঁধতে পারে না।'

একবার শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, তিনি কোনদিন ছোট কাজ করেন নি।

যে ছোট কাজ করে, অর্থাৎ মনকে মলিন করে, সে কি নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে অপরের মনকে এতখানি প্রভাবিত করতে পারে? তাই যদি হয় তাহলে তিনি কেন ভয় পেয়েছিলেন? এর উত্তর যাবার সময় শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে দিয়েছে, 'লোকে তো মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সেই রাজলক্ষ্মীটিকে চিনবে না, তারা চিনবে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ পিয়ারী বাঈজীকে।।তখন সংসারের চোখে যে কত ছোট হয়ে যাব সেকি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?'

'কিন্তু তাকে তো সত্যিকারের ছোট হওয়া বলে না।'

'ভগবানের চক্ষে না হতে পারে, কিন্তু সংসারের চক্ষু তো উপেক্ষা করবার বস্তু নয়, লক্ষ্মী।'

সংসারের এই চোখকে তিনি ভয় পেতেন কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, যে -দৃষ্টি সংসারের দশজনের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত তা ঈশ্বরের দৃষ্টি, তাকে অস্বীকার করা অন্যায়।

টলস্টয় অভিজাত শ্রেণীর ধনী ব্যক্তি ছিলেন। যৌবনে তিনিও শরৎচন্দ্রের মতো উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটিয়েছিলেন। পরিণত বয়সে যৌবনের সেই স্বেচ্ছাচারিতার আলোচনা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না, তাই কেউ জিজ্ঞেস করলে মনে ব্যথা পেতেন। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই কথা। একবার তিনি অবিনাশ ঘোষালকে বলেছিলেন, 'দেখ! লেখকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত ব্যস্ত হওয়ার কি প্রয়োজন? লেখক বলে কি তাঁকে নিজের জীবনের সব কথা সবাইকে বলতে হবে? এর কি মানে? তাঁর লেখার মাধ্যমে তাঁর যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত,সেটাই লেখকের সত্য পরিচয়। তাই আমি বলি লেখকের ব্যক্তিগত জীবন ও তার লেখক জীবন এক নয়। কোনো কারণেই এ দুটিকে মিলিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আমার লেখায় যেটুকু নিজেকে ব্যক্ত করেছি সেটুকুই আমার পরিচয় পাঠকের জন্য তাই যথেষ্ট।'

নিজের সম্বন্ধে বিচিত্র ধরনের রটনা নিয়ে কোনোদিন কোনোরকম মন্তব্য বা প্রতিবাদ করেন নি। একবার নিজেই বলেছিলেন, 'আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন। জানি, এ লইয়া বহুবিধ জল্পনা—কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে। কিন্তু আমার নির্বিকার আলস্যকে তাহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতেও পারে না। শুভার্থীরা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলেন, এই সব মিথ্যের আপনি প্রতিকার করবেন না? আমি বলি মিথ্যেই যদি হয় তো সে প্রচার আমি করিনি, সুতরাং প্রতিকার করার দায় আমার নয়—তাঁদের। তাঁদের করতে বলোগে।'

জনশ্রুতি শোনা যেত, মেয়েদের পিছু তিনি ঘুরে বেড়ান, অমুক নায়িকাকে প্রেমপত্র লিখেছেন। দুর্নাম ও রটনায় ঘেরা তাঁর ব্যক্তিজীবন আরও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে কারণ এ—সব ব্যাপারে তিনি নিজেও সত্যি-মিথ্যে রঙ ফলিয়ে বলতে কুণ্ঠিত হতেন না। নিজেকে লুকোবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না বরং নীরবে রটনা প্রচারে প্রশ্রয় জোগাতেন। তাঁর প্রকৃতিতে এক অদ্ভুত বিরোধাভাস দেখতে পাওয়া যায়—একদিকে উদাসী বৈরাগী মন, অপরদিকে আমুদে স্বভাব; মনে হয়, একের মধ্যে কয়েকটি শরৎ সমাহিত। তাই কখনো তাঁকে কেউ সংস্কারহীন, অভদ্র, অশিষ্ট লোক ভেবেছে, সভ্য সমাজ কোনোদিনই তাঁকে আপন বলে গ্রহণ করেনি। অপরদিকে আবার এমন লোকও ছিল,

যে তাঁর ভেতরের কীর্তিমানের সবটুকু বিশেষত্ব খুঁজে পেয়েছিল। তাঁর প্রভাবহীন ব্যক্তিত্বে একটি রুক্ষতা ছিল কিন্তু সেই রুক্ষতার আড়ালে মানবিক সংবেদনার যে স্রোত বইত, তার জোরে তিনি অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্ত ও পাঠকদের সৃষ্টি করেছিলেন। বিশ্বস্ততা ও গভীর বিচক্ষণতায় তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন। মানুষকে বোঝার তাঁর ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। নিজের যশ, কীর্তি, প্রতিষ্ঠা কোনো-কিছুরই ভ্রূক্ষেপ করতেন না। আমুদে শরতের ব্যক্তিত্ব যতখানি মুখর, উদাসী শরৎ সেই পরিমাণেই জীবন্ত সত্য। তা যদি না হত, তাহলে নিজের দিদির পাশের গাঁয়ে গিয়ে থাকতেন না। সেখানের সমাজে তিনি একঘরে ছিলেন, সমাজের মাথারা এ নিয়ে তাঁকে নিদারুণভাবে বিব্রত করতে দ্বিধা করেন নি। আবার সমাজে তোলার জন্য নানা ধরনের প্রস্তাব নিয়ে আসা সত্ত্বেও তাঁর দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। অকৃতকার্য হয়ে তাঁরা অপমানে–রাগে–প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। সে সময়েই পাশের গাঁয়ে আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মা মারা যাওয়াতে, সমাজের সুযোগসন্ধানীরা আশুতোষবাবুকে বোঝালেন যে, মাতৃশ্রাদ্ধ খুব ধুমধামের সঙ্গে করা উচিত—অর্থাৎ আশ পাশের দু-পাঁচটি গাঁয়ের ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুরুষ সবাইকে নেমন্তন্ন করা দরকার. এতে মায়ের আত্মা শান্তি পাবে।

আশুবাবু অর্থবান লোক ছিলেন। তিনি রাজী হলে, গাঁয়ের মাতব্বররা আবার বললেন, 'শরৎচন্দ্রের বাড়িতে আপনি নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসুন।'

এই নেমন্তন্নের পেছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল। যদি শরৎচন্দ্র নেমন্তন্ন গ্রহণ করে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হন, তাহলে তাঁকে 'একঘরে' ঘোষণা করে পঙক্তি থেকে উঠিয়ে দেওয়া হবে, আর যদি না আসেন, তাহলেও নেমন্তন্ন অস্বীকার করার অপরাধে তাঁকে অপমানিত করা হবে।

শরৎচন্দ্র সেখানে তো নিজেও যান নি, বাড়ির আর কাউকেও যেতে দেন নি। এ নিয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত দারুণ হৈ-চৈ চলল কিন্তু শরৎচন্দ্র বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। এত বড় অবমাননা সমাজের এতবড় বড় মাতব্বররা কেমন করে সইবেন? তাঁরা অন্য উপায় বের করলেন। আদালতে শরতের নামে অভিযোগ করা হল যে, নদীর বাঁধ ভেঙে তিনি লোকেদের খেত খামার নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। সামতা ও গোবিন্দপুর গ্রামগুলি ঠিক রূপনারায়ণের তীরেই। একবার রূপনারায়ণের বাঁধ আপনা থেকেই ভেঙে যায়। অবশ্য সরকারের তরফ থেকে একটা বাঁধ তৈরি হয়, কিন্তু রূপনারায়ণের জলের তোড়ে বাঁধের কয়েকটা জায়গা ভেঙে যায়।

সেই ভাঙা জায়গাগুলো দেখিয়েই সমাজের ধুরন্ধরেরা শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এই মিথ্যে অপবাদে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে সে সময়কার সবচেয়ে বড় উকিলকে নিজের পক্ষে দাঁড় করান। কিন্তু ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখার্জীর মধ্যস্থতায় মীমাংসার ভার গাঁয়ের মোড়লের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। খোঁজখবর নিয়ে দেখা যায় যে, বাঁধটি আপনা হতে ভেঙে গিয়েছিল। এ-ব্যাপারে নির্দোষ শরৎবাবুর কোনো হাত ছিল না।

২৭

লোকচক্ষে হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের স্ত্রী অথবা কেবল মাত্র জীবনসঙ্গিনী ছিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর থাকা সত্ত্বেও তা কেউ স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। তবে এ-ব্যাপারে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না যে, শরৎচন্দ্র তাঁকে আন্তরিক ভাবে ভালোবাসতেন। অল্পশিক্ষিতা, অনভিজ্ঞা, সরলপ্রাণা এই গ্রাম্য মহিলা হিরণ্ময়ী শরৎ-প্রতিভার তুলনায় কিছুই নয়। যখন কেউ তাঁর সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যের অমর নারীচরিত্রের আলোচনা করতেন, তিনি মৃদু হেসে বলতেন, 'আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, ও-সব কিছুই জানি না। তোমাদের দাদু বলতে পারবেন।' একদিন পার্বতী প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'দাদুর কথা বাদ দাও। দেবদাসের কথা মনে এলেই মনে হয় দুটো ছেলে-মেয়ে বেঘোরে পুকুরে ডুবে মরল।'

একদিন তিনি জলধর সেনের একখানি বই পড়ছিলেন। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল

পড়ছিল, হঠাৎ সেখানে শরৎচন্দ্র এসে পড়লেন। তাঁকে দেখে হিরণ্ময়ী দেবী বললেন, 'তুমি কি সব ছাইপাঁশ লেখ। এমনি বই লিখতে পার না?'

কত সরলপ্রাণাই না ছিলেন তিনি! অন্তরের অনাবিল ভালোবাসায় সর্বজন চিত্তজয়ী কথাশিল্পীর চিত্ত তিনি জয় করতে পেরেছিলেন। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা স্নেহপরায়ণা, কোমলহৃদয়া এই মহিলা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কখনও কোনো বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যান নি।

শোনা যায়, শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে বৈধ ভাবে বিবাহ করেও স্ত্রীর মর্যাদা দেন নি। তাই তিনি একদিন সামতাবেড়েতে বৈদিক পদ্ধতিতে বিবাহ করে তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দেন। তবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কখনও তিনি কোথাও যেতেন না। শরৎচন্দ্রের বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয়স্বজন যাঁরাই আসতেন, তাঁদের খুব যত্ন করে খাওয়াতেন, গল্প-সল্প করতেন। বাড়িতে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।

কিন্তু এও ভারি আশ্চর্যের কথা যে, শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবীর একত্রে কোন ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় না। হিরণ্ময়ী দেবীর একারও ফোটো এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। বর্মা থাকতে একবার ফোটো তোলার কথা হয়েছিল কিন্তু সেইদিনই পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হওয়ার দরুন ফোটো তোলানো আর হয়ে ওঠে নি। মনে হয়, তিনি এ সবের বিরোধী ছিলেন, তাই শরৎচন্দ্র আর কখনও তাঁকে ফোটো তোলার কথা বলেন নি। শরৎচন্দ্রের একটি নাটক পঞ্চাশ রজনী অভিনীত হলে গুণগ্রাহীরা আগ্রহ প্রকাশ করে, তিনি যেন হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে ফোটো তোলার একটি অবসর তাদের দেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'নাটক আমার লেখা, হিরণ্ময়ী দেবীর নয়।'

হঠাৎ এই রাগের পেছনে সেই একই কারণ থাকতে পারে -সমাজ হিরণ্ময়ী দেবীকে সে ভাবে গ্রহণ করে নি। তা না করুক, কিন্তু শরৎ তো তাঁকে মনের সবটুকু ভালোবাসা দিয়েই বরণ করেছিলেন। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে কোনোদিনই তাঁর সেরকম আস্থা ছিল না, তবু হিরণ্ময়ী দেবীর সব রকম অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তাঁর জন্যই কাশীর দারুণ গরমে কয়েকদিন সেখানে কাটাতে হয়েছিল, কলকাতাতে প্রতিদিন তাঁকে গঙ্গাস্নান করাতে নিয়ে যেতেন, তাঁর জন্য চিন্তার অবধি ছিল না। একবার হিরণ্ময়ী দেবীর নিউমোনিয়া হওয়াতে মণীন্দ্রনাথ রায় দেখতে এলে-শরৎ কাতর হয়ে বললেন, 'ডবল নিউমোনিয়া হয়েছে! মনে হচ্ছে আর বাঁচাতে পারব না, বুকে পিঠে সর্দি জমে গেছে, জ্বরও খুব বেশি, একেবারে বেঁহুশ অবস্থা।'

বলতে বলতে চোখদুটি জলে ভরে উঠল। কলকাতা ছেড়ে বাইরে গেলে তিনি এ-বিষয়ে আরো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। দেওঘর থেকে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (হোঁদল)-কে যে চিঠিখানি লেখেন, সেটি পড়লে বোঝা যায় হিরণ্ময়ী দেবীর জন্য তিনি কতখানি চিন্তিত থাকতেন।

'হোঁদল,

আজ দশদিনের মধ্যে বাড়ির খবর কেবল একখানা চিঠিতে পেয়েছি। অসুস্থ দেহে সকলের জন্যে বড় চিন্তা হয়। তোমার মামীমা তো চিঠি লিখতে জানেন না, সুতরাং তোমরা অনুগ্রহ করে যদি প্রত্যহ না হোক ২/১ দিন পরে-পরেও এক-আধটা পোস্ট কার্ড দাও তো কতকটা নিশ্চিন্ত হই।'[১]

দেওঘরে যাবার পর তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীকে লেখা তাঁর মাত্র দুটি চিঠি পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি হল,—

'কল্যাণীয়াসু,—

বড় বৌ, কাল বেলা ৩।। টায় এখানে এসে পৌঁছেচি। ইস্টিসানে সত্যমামা ও মৃত্যুঞ্জয় মোটর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পথে কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। হরিদাসের এই মালঞ্চ বাড়িটি চমৎকার। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেকটা জায়গা আছে। পায়খানা নীচে কিন্তু

১ ৯ মার্চ, ১৯৩৭

ভালোই। আজ সকালে চায়ের জন্যে ছাগল দুধ দিয়ে গেছে, তাকে বলে দিয়েছি ক্রমশঃ একসের পর্যন্ত দুধ আমার দরকার হবে। মশা বেশ আছে। কাল রাত্তিরে মশারি খাটাই নি, ভেবেছিলাম মশা নেই। কিন্তু রাত্রি ৩টা–৩।। টার সময় মশায় খেয়ে ফেলবার উপক্রম করলে। কোন গতিকে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলাম। শীত আছে তাই রক্ষা। সকলেই বলচেন ১ মাস-২ মাস থাকতে পারলে শরীর সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে। দেখি, কতদিন থাকতে পারি। ভাবনা আমার তোমার জন্যে, পাছে অসাবধানে অসুখ-বিসুখ করে। কারণ, তোমার অসুখ যেদিন কানে শুনতে পাবো, সেই দিনই দেওঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবো।

'তেল ঘি এখানকার তেমন ভাল নয় বলে সত্যমামা বলেছেন দুটো জিনিস তিনিই আনিয়ে দেবেন। গম কিনে তাঁর বাড়িতে দিয়ে আসতে হবে, জেলখানা থেকে তিনি ভাঙিয়ে দেবেন।

'মনে হচ্ছে কষ্ট বিশেষ কিছু হবে না। বেড়াবার দরকার, মোটর চাই-ই, নইলে পায়ে হেঁটে বেড়াবার শক্তি নেই। হয়ত কালকে গাড়ী নিয়ে এখানে আসতে হবে। ৬/৭ দিন পরে স্থির করে চিঠি লিখবো।

'বুড়ি বাগা' যেন অত্যাচার করে অসুখ-বিসুখ না করে। দিদি বাড়ি চলে যাচ্ছেন, না গেলেও তাঁর নয়, কিন্তু থাকলেও তোমাদের সকলেরই সুবিধা। রাঁধবার বামুন কি পাওয়া গেল? এর জন্যে চিন্তিত হয়ে আছি। যেমন করে হোক এবং যত মাইনেই নিক, শীঘ্র একটা ঠিক করো, নইলে বাড়ির সকলেরই কষ্ট।

'প্রকাশকে এই চিঠি দেখিয়ে বোলো যে, এখন তার উপরেই সমস্ত নির্ভর। কারও অসুখ করলেই সে যেন আমাকে চিঠি লিখে জানায়। আজ কিম্বা কাল আমাদের কুমুদ শংকর ডাক্তারকে চিঠি লিখবো। প্রকাশ যেন তাঁকে আমার দেওঘরে আসার সংবাদটা দেয়।

'ছোট বৌমা, ছেলেরা, হোঁদল, পকাশ ও তুমি আশীর্বাদ জেনো, দিদিকে আমার প্রণাম দিও।

ইতি ১৮ই ফাল্গুন ১৩৪৩
ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'পুঃ। মৃত্যুঞ্জয় এইমাত্র বাজার থেকে ফিরে এসে জানালে তোমাদের টেলিগ্রাম করে আমার পৌঁছন খবর দিয়েছে।'

এই চিঠিখানিতে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে 'কল্যাণীয়াসু' সম্বোধন করেছেন—এ সম্বোধন প্রেমের নয়, তবু চিঠির প্রতিটি শব্দে ভালোবাসার ছাপ রয়েছে। তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে বউ বা বড় বৌ বলে ডাকতেন। হিরণ্ময়ী দেবী সুন্দরী ছিলেন না কিন্তু শরৎচন্দ্রের চোখে প্রেমাঞ্জন পরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই হয়তো শরৎচন্দ্র তাঁর রূপের প্রশংসায় বিগলিত ছিলেন, বলতেন, 'বড়বৌ-এর রং খুব ফরসা না হলেও তাঁর মতো দেহসৌষ্ঠব বাঙালী মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না।'

বন্ধু-বান্ধবদের যে-সব চিঠি পত্র লিখেছিলেন, তাতে বহুবার তিনি নিজের পারিবারিক জীবনের কথা ও বড় বৌ-এর সহযোগিতার ফলেই যে তিনি জীবনে সফলতা অর্জন করেছেন সে কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর চিঠিতে এ কথাও জানা যায়, তাঁর খাওয়া-দাওয়ার উপর হিরণ্ময়ী দেবীর বেশ শাসন ছিল। একসের তামাক সাতদিন পর্যন্ত চলার নির্দেশ তিনি দিয়ে রেখেছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের উচ্ছ্বাস, আন্তরিকতায় পরিণত হয়। এই চিঠি পড়ে বোঝা যায় ভায়ের ছেলে-মেয়েদের জন্যও তিনি কতখানি চিন্তিত থাকতেন। নিজের দিদিকে যথার্থ শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। অজান্তে, পরোক্ষভাবে দিদি তাঁর জীবনকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিলেন, তাই নিজের সাহিত্যে দিদি চরিত্র তিনি অমর করে গেছেন।

১ প্রকাশচন্দ্রের ছেলে-মেয়ে

দেওঘর থেকে ফিরে আসার পর বেশিদিন তিনি সুস্থ থাকতে পারেন নি। চিঠিপত্রে সেকথা বার বার উল্লেখ করেছেন। হরিদাসকে লিখলেন, 'আমি ভাল নেই। এ দেহটা সত্যিই ভাঙলো—একটা না একটা লেগে আছেই। কতদিন যে এইভাবে কাটবে প্রতিদিন তার মনে মনে হিসেব করি। আশা আছে দীর্ঘদিন নয়। বৈরাগীর জীবন যত শীঘ্র যায় ততই মঙ্গল।'[১]

সত্যেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী(মামা)কে লিখলেন, 'জীর্ণ গৃহে কত ভূতেই যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, ইজিচেয়ারে শুয়ে সেই কথাই ভাবি আর বলি দয়াময়, দেরি কতো?'[২]

মৃত্যু তার পরোয়ানা নিয়ে অতি নিকটেই এসে পৌঁচেছে। তবু তার মধ্যে শরীর মন একটু ভালো থাকলে বন্ধু-বান্ধবদের সুখ-দুঃখ মান সম্মান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। দেওঘর থেকে ফিরে তাঁর মনে হয় স্নেহের বন্ধু অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের ঠিক সম্মান হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'রসচক্রে'র তত্ত্বাবধানে তাঁর সম্মানের আয়োজন করলেন। সমস্ত খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে বেলগাছিয়ার দ্বারকা-কাননে বিধিসম্মতভাবে তিনি অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়ে মানপত্র পাঠ করেন। এমন কি এ সভার সমস্ত খরচ শরৎচন্দ্র একা বহন করেছিলেন।

এই যে উৎসাহ উদ্দীপনা, তা কতদিনের? দয়াময় তো বিলম্ব করার 'মুডে' ছিলেন না। পেটের রোগে অবস্থা একেবারে কাহিল; ডাক্তাররা বললেন, 'ডিসপেপসিয়া'।

আরম্ভ হল ডিসপেপসিয়ার চিকিৎসা, চলল ওষুধের পর ওষুধ খাওয়ার পালা। ব্রেকফাস্টের ঘর শূন্যই রইল। আত্মীয় স্বজনরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় শরতের আবাল্য বন্ধু সুরেন্দ্রমামাকে খুব মনে পড়ত। খবর পেয়ে সুরেন্দ্রমামা ছুটে এসে দেখলেন, কর্তার খাওয়া দাওয়ার বড়ই অব্যবস্থা। বড় বৌ কিছু শুনতেই চান না, তাঁর মতে না খাওয়ার ফলে অসুখ করেছে। তাঁর খাওয়ার ব্যাপারে বড় বৌ সবসময়েই ব্যস্ত থাকতেন কিন্তু খেলেই যে শরৎ অসুস্থ হয়ে পড়তেন। ডাক্তারের কথামত পো ছাড়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পুরনো বন্ধুর মায়া কাটানো বড়ই মুশকিল।

সুরেন্দ্রমামা বললেন, 'তোমার তো এখনও অনেক কাজ বাকি?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'রোগযন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া আর কোন কাজ বাকি নেই।'

মামা বললেন, 'তোমার কাছে দেশের অনেক আশা।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরৎচন্দ্র বললেন, 'সত্যি, কত কাজ পড়ে রয়েছে। যদি একটু সময় পেতাম তাহলে অসমাপ্ত বইগুলো শেষ করে যেতে পারতাম।'

মামা আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'সময় পাবে।'

কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সময় আর নেই। বেশিদিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই ক'দিন পর ফিরে গেলেন। ডাক্তারেরা বললেন, রাজগীর গেলে হয়তো উপকার হতে পারে। কিন্তু শরীরের যা অবস্থা তাতে রাজগীর যাওয়া অসম্ভব ছিল। অবস্থা যখন খুব শোচনীয় তখন প্রকাশচন্দ্র সুরেন্দ্রমামাকে জানালেন, 'এখুনি চলে এসো।'

সুরেন্দ্রনাথ কালীপুজোর পর এলেন। শরতের জরাজীর্ণ শরীরের দিকে চেয়ে হতবাক হয়ে গেলেন; বুঝলেন, বাইরে কোথাও সরিয়ে নিয়ে না গেলে বাঁচানো অসম্ভব।

কিন্তু শরৎচন্দ্র জানালেন, 'এ রোগের আর কোন চিকিৎসা নেই। আমায় শান্তিপূর্ণ ভাবে যেতে দাও, এখানে এই রূপনারায়ণের ধারে, প্রভাসের সমাধির কাছে।'

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'কেন এ সব বাজে কথা বলছ?'

কিন্তু বাজে কথা তিনি বলেন নি, কেননা মৃত্যুর ডাক যে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, তবু কখনও মাছ, ফুল, বাগান ইত্যাদি নিয়ে সে কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করতেন। আত্মীয়-স্বজন,

১ ৩১ অগাস্ট, ১৯৩৭
২ ২৭ ভাদ্র, ১৩৪৪ (১১-১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)
৩ ৩ নভেম্বর, ১৯৩৭

বন্ধু-বান্ধব তাঁর অবস্থা দেখতে এসে মনে বড়ই ব্যথা পেতেন।

একদিন হিন্দী সাহিত্যের লেখক অমৃতলাল নাগর তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁর এক বন্ধু শরৎচন্দ্রের এত বড় ভক্ত যে বইয়ের আলমারিতে 'শ্রী গণেশায় নমঃ' এর জায়গায় 'শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নমঃ' লিখে রেখেছেন। শরৎচন্দ্র নিজেও একবার এইরকম এক মহিলা-ভক্তের দেখা পেয়েছিলেন। তিনি বাড়ির মন্দিরের বেদীতে শরৎচন্দ্রের বইগুলি সাজিয়ে নির্বিবাদে নিত্য পুজো পাঠ করতেন। এক দিন একান্তে নিজের জীবনের কথা শরৎচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন। ভদ্র ঘরের শিক্ষিতা মহিলা, সে বাড়ির ভদ্রলোকের রক্ষিতা ছিলেন। সেদিন যে তিনি কী দারুণ তৃপ্তি পেয়েছিলেন তা বলার নয়। তাঁর সাহিত্য সেদিন সত্যি সার্থক হয়ে উঠেছিল। অমৃতলাল নাগর শরৎচন্দ্রের কাছে প্রায়ই যেতেন, কিন্তু এবার এসে শরৎচন্দ্রের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দেখলেন শরৎচন্দ্রের সংগ্রহণী রোগ হয়েছে, অর্থাৎ কিছুই হজম হয় না। যতটুকুই খান বদহজম হয়ে যায়; শুকিয়ে একেবারে কাঁটা হয়ে গেছেন। কোয়েকার ওট্‌স পর্যন্ত হজম হয় না। অমৃতলাল নাগরকে দেখে শরৎচন্দ্র খুব খুশি হলেন, বললেন,'তুমি এসেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি। এ জীবনে আর কোনো ইচ্ছে বাকি নেই, শরীর নির্জীব হয়ে পড়েছে, বড় ক্লান্তি বোধ করি। যমদূত যেদিন ইনভিটেশন কার্ড পাঠাবে আমি সেই মুহূর্তে যেতে রাজী আছি।'

একটু নীরব থেকে—যেন অন্তরের চিরকালের যাযাবরী নেশা আবার জেগে উঠেছিল। বললেন, 'ইচ্ছে হয় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও চলে যাই,কিন্তু কোনো জায়গায় বেশিদিন থাকতেও যে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে ট্রেনে চড়ে ঘুরে বেড়াই, মাঝে মাঝে দু-একদিনের জন্য কোথাও বিশ্রাম নিয়ে আবার ট্রেনে করে বেরিয়ে পড়ি।'

অমৃতলাল নাগর বললেন, 'আপনার পক্ষে তা বোধ হয় ঠিক হবে না, কেননা আপনি অত্যন্তই দুর্বল হয়ে পড়েছেন।'

শরৎচন্দ্র এ কথার কোনো জবাব দিলেন না, চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইলেন। অমৃতলাল নাগর তখন বললেন, 'আপনি আমাদের দেশে চলুন, লক্ষ্ণৌ-এ এই রোগের ভালো ডাক্তার আছেন, কনখলেও এ রোগের বেশ ভালো চিকিৎসা হয়। হরিদ্বার, হৃষিকেশ, কনখল, যেখানে আপনার ইচ্ছে হয় থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আপনি নিশ্চয় সেরে উঠবেন।'

শরৎচন্দ্র খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'সেখানে তো ভয়ানক শীত পড়ে, আমি কেমন করে সইব। আচ্ছা, ভেবে দেখি। পরশু কলকাতা যাচ্ছি, সেখান থেকে তোমায় চিঠি লিখে জানাব।'

সন্ধেবেলা অমৃতলাল নাগর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে পাল্কিতে উঠতে যাবেন, হঠাৎ শরৎচন্দ্র বললেন, 'দাঁড়াও অমৃত। তোমায় আমি রূপনারায়ণের শোভা দেখাতে চাই।'

পাল্কি থেকে নেমে তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রূপনারায়ণের তীরে এসে দাঁড়ালেন। পূর্ণিমার রাত, তারা-ভরা আকাশ। হাত তুলে ইশারা করে শরৎচন্দ্র বললেন, 'যখন বান আসে, জল আমার বাড়ির উঠোনে এসে পড়ে, আমার ভারি ভালো লাগে। ইচ্ছে হয় একটা জাহাজ কিনে তাতে চড়ে ঘুরে বেড়াই, মাটিতে যেন আর কোনোদিন নামতে না হয়।'

এ যেন সেই চিরপরিচিত যাযাবরের কথা। অমৃতলাল নাগর বুঝতে পেরেছিলেন, সেদিন রূপনারায়ণের তীরে শেষবারের মতো এই মহান শিল্পীর সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। রূপনারায়ণের সঙ্গে শরতের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, কত ভালোই-না বাসতেন। কতদিন নীরবে নদীর ধারটিতে বসে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতেন। কেউ এলেই তাঁকে রূপনারায়ণের কথা অবশ্যই শোনাতেন। একবার হিন্দী লেখক বাচস্পতি পাঠক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় তিনি বলেছিলেন, 'যাবার আগে একটা জিনিস দেখে যাও।'

বাচস্পতি পাঠক রূপনারায়ণের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। জল সে সময় ছিল না কিন্তু দিগন্ত-বিস্তৃত বালুরাশির আকর্ষণ তাই কি কিছু কম ? তাঁকে দাঁড় করিয়ে শরৎচন্দ্র পেছন দিকে সরে গেলেন। বাচস্পতি পাঠক তন্ময় হয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।

১ নভেম্বর,১৯৩৭

যথার্থ শিল্পী সৌন্দর্যের উপাসক। শরৎচন্দ্র ছিলেন তাই। সৌন্দর্যই পুরুষ ও প্রকৃতি, তাই যিনি সৌন্দর্যের উপাসক তিনি প্রকৃতিরও পূজারী। মনোরম ও ভয়ংকর এই দুই প্রকৃতির রূপ ও ঈশ্বরকে তিনি ভালোবাসেন, কারণ সর্বোত্তম সৌন্দর্য ঈশ্বরের যথার্থ রূপ।

অমৃতলাল নাগর ফিরে গিয়েছিলেন। মনে মনে ভেবেছিলেন কত স্নেহপরায়ণ হৃদয়, অফুরন্ত ভালোবাসাই না মানুষকে দিতে পারতেন তিনি। যশস্বী লোক অহংকারের গর্বে নিজের চারিত্রিক মাধুর্য নষ্ট করে ফেলে, কিন্তু এমনও লোক একজন আছেন যিনি দুঃখের মধ্যে দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন। না-জানি পথের ধুলোয় জীবনের কান্তি কতই না মলিন হয়েছে, তথাকথিত পাপ হয়তো তিনি করে থাকবেন; তবু বিশ্বস্ততা, সাহস, করুণা ও ভালোবাসা ত্যাগ করতে পারেন নি। এই গুণের দ্বারাই তিনি মহৎ। প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, বড় বড় সুগভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—এও এক বিশেষ প্রকারের ব্যক্তিত্ব যা মানুষকে সহজেই আপন করে নেয়। এই তো সেদিনের কথা, সুস্থ অবস্থায় সাহিত্য সম্বন্ধে কতই না আলোচনা হয়েছে। বিখ্যাত হিন্দী লেখক প্রেমচন্দের গল্প তিনি পড়েছিলেন। অনেক বছর আগে 'সপ্ত-সরোজ' পড়ে হিন্দী পুস্তক এজেন্সি, কলকাতার শ্রী মহাবীর প্রসাদ পোদ্দার[১], যিনি প্রায়ই শরৎবাবুর কাছে যেতেন, তাঁকে লিখিত সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন, 'গল্প সত্যিই খুব উচ্চমানের ও ভাবপ্রধান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর তুলনা হয়তো অন্যায় ও অনুচিত, তবে, বাংলা ভাষার অন্য কোন লেখক এ ধরনের গল্প লিখতে পারে, আমার তো সন্দেহ হয়।'[২]

এও বলেছিলেন, 'তোমরা নিজেদের সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি কোনো সাহিত্যিককে না করে রাজনৈতিক নেতাদের কী হিসেবে সভাপতি নির্বাচিত করো?'

অমৃতলাল নাগর বললেন, 'হিন্দীতে স্বয়ংভূ কর্ণধারের একটি দল আছে যারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী এ সব কাজ করে, নইলে আমাদের হিন্দীতেও প্রেমচন্দ, জয়শংকর প্রসাদ, মৈথিলীশরণ গুপ্ত, নিরালা, পন্ত—এর মত লেখক ও কবি আছেন যাঁদের নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'আমাদের এই বাংলাদেশেও অধিকাংশ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি বড় বড় জমিদারদের করা হয়। আমার একেবারেই তা পছন্দ হয় না। সাহিত্যে যাঁদের বাস্তবিক জ্ঞান নেই, তাঁদের সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি করা নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার।'

এ-ধরনের আলোচনা ছাড়া অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তিনি কয়েকবার বলেছিলেন, 'দেখ অমৃত! তুমি এখনও ছেলেমানুষ, তোমার মাথার উপর পিতার আচ্ছাদনও নেই। এমন লোককেই পৃথিবীর সবাই ঠকাতে চায়, তুমি সংসারী লোক তাই তোমায় এত কথা বললাম। সব সময় খেয়াল রেখো যে, তোমার কাছে যদি চারটে পয়সা থাকে তাহলে খুব বেশি হলেও সেই চারটে পয়সাই খরচ কোরো, কিন্তু কখনও কারুর কাছে পঞ্চম পয়সাটি ধার কোরো না⋯'

অমৃতলাল নাগরকে একবার তিনি বলেছিলেন, 'আমার প্রফেসর আমায় দুটি কথা বলেছিলেন। প্রথমত, কখনও কারুর ব্যক্তিগত আলোচনা কোরো না; দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া বাইরের কোনো কিছু সম্বন্ধে লিখো না। এই দুটি কথাই আমি তোমায় বলতে চাই, ভাই।'

হিরণ্ময়ীও তো দিবাকরের লেখা 'বিষের ছুরি' গল্প পড়ে সেই কথাই বলেছে, 'যা নিজে বোঝ না, তা পরকে বোঝাবার মিথ্যা চেষ্টা কোরো না। যাকে চেন না, তার যা তা পরিচয় পরের কাছে দিও না।'

নিছক কল্পনা গড়তে যদিও পারে, প্রাণ দিতে পারে না, বইতে পারে, পথ দেখাতে পারে না।

সেদিন গ্রামোফোনে সেতার বাদক এনায়েৎ খাঁয়ের রেকর্ড বাজছিল, বাজনা শেষ হতে তিনি নিজের নাম ঘোষণা করলেন। শুনে শরৎচন্দ্র হেসে ছিলিমে একটা জোর টান দিয়ে বললেন,

১ পোদ্দার মহাশয় শরৎচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। আজকাল জসিডিতে প্রাকৃতিক চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা করছেন।

২ 'সপ্ত-সরোজ'। অষ্টম সংখ্যা, মার্গশীর্ষ ১৯৪৭; ১৯৩০ সালের ভূমিকা। প্রথম সংস্করণ ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়।

'ভাই, আমারও খুব ইচ্ছে হয় নিজের রেকর্ড করি আর শেষে ঠিক এই কায়দাতেই বলি, আমার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

মারাঠী সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক মামা বরেরকরের সঙ্গে শরৎচন্দ্রে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। একদিন অন্য এক লেখক মামা বরেরকরকে বলেন, 'মামা, শরৎবাবু পশুদের খুব ভালোবাসেন ·।' মামা বরেরকর মাঝপথে তাঁকে থামিয়ে বললেন, 'সেইজন্যই তো তিনি আমাকেও ভালোবাসেন।' অট্টহাসি হেসে মামা বরেরকর বললেন, 'একদিন আমি শরৎবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,''আপনার কোনো সন্তান নেই?''তিনি জবাব দেন, ''মামা, তুমি জান আমি কে? কী না করেছি আমি? হেন রোগ আছে যা আমার শরীরে নেই? তুমি কী চাও, আমি পৃথিবীকে এরকম কোনো সন্তান দিয়ে যাব''?'

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে মনের সংবেদনশীল দ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। সকালে চা খাবার পর পয়সা-কড়ি নিয়ে বসতেন। ভিখারীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। পূজারী না আসতে পারলে স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের পুজো করতেন।

এরই মাঝে রবিবার দিন কলকাতা যাওয়া স্থির হল। কিন্তু তা নিয়েও ঝামেলা, বড় বৌ পণ্ডিত ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রবিবারে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

পাঁজি পুঁথি দেখে পণ্ডিত মশাই বললেন, 'না, রবিবার দিন যাত্রা নিষেধ।'

শুনে বড় বৌ চিন্তায় পড়লেন। শরৎচন্দ্র এ-সব গোঁড়ামি একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। বড় বৌ বললেন, 'রবিবার দিন কিছুতেই কলকাতা যাওয়া হতে পারে না।'

কিন্তু শরৎচন্দ্রকে এ কথা গিয়ে কে বলবে? শোনামাত্র হয়তো বলে বসবেন, 'রবিবারেই যাওয়া হবে।'

সবাই মিলে একটা উপায় খুঁজে বের করলেন। প্রকাশচন্দ্র, পণ্ডিত মশায় ও সবার শেষে সজল চোখে বড় বৌ তিনজনে মিলে শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেন। শরৎচন্দ্র চোখ বন্ধ করে আরাম কেদারায় শুয়ে ছিলেন। পায়ের আওয়াজ পেয়ে বললেন, 'কি রে খোকা?'

'রবিবারে যাওয়া হতে পারে না।'

'মামা কী বলছেন?'

'সোমবার।'

'আমিও সে কথাই ভাবছিলাম। কাল সব কাজ হয়ে উঠবে না, সোমবারই ভালো।'

শুক্রবার দিন ফিরে আসা হবে, এই শর্তে তিনি কলকাতা যেতে রাজী হলেন। সোমবার সকালে সব কাজ সেরে রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম করে মৃদু মৃদু স্বরে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে চললেন--

'পথের পথিক করেছ আমায়, সেই ভালো ওগো, সেই ভালো।
আলেয়া জ্বালালে প্রান্তরভালে, সেই আলো মোর সেই আলো।'

গ্রাম ছেড়ে যেতে তাঁর মনে বড়ই বাজছিল। অবসন্ন শরীর, মেদহীন পায়ে সুন্দর মোজা, আর পালিশ করা বাদামী জুতো দেখে মনে হচ্ছিল যেন কেউ মহাপ্রয়াণের সাজ সেজেছে।

ফকির কবির বলেছেন– 'করলে শৃঙ্গার চতুর অলবেলী,
সাজন কে ঘর জানা হোগা।।'

সত্যি তাঁর কাছে যাওয়ার প্রস্তুতিই বটে। স্টেশনে পৌঁছে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমার জন্য সেকেন্ড ক্লাস, আর আমার ও গোপালের জন্য থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে আনি।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'তা কি হয়? সবাই ইন্টার ক্লাসেই যাব।'

সেদিন ভাবপ্রবণতাবশত একথা তিনি বলেন নি। সবাইকেই সমান ভাবে ভালো বাসতেন। শুধু গোপাল কেন? উড়িষ্যার সেই ভোলা, যে অনেকদিন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের কাছে কাজ করেছিল, সামতাবেড়েতে বহুদিন ছিল। যেখানেই তিনি যেতেন, চিরঅন্তরঙ্গ সঙ্গীর মতন ভোলা সঙ্গে থাকত। একদিন সে ছুটি নিয়ে চিরদিনের মতো দেশে চলে গেল। এরপর এল ননী। সাপের কামড়ে ননী মারা গেল— তাকে বাঁচাবার কী চেষ্টাই না শরৎচন্দ্র করেছিলেন। নিজের খরচে

চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে সারারাত চিন্তায় ছটফট করেছিলেন। কিন্তু সে বাঁচে নি। মৃত্যুর খবরে মনে বড়ই দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন, 'সারারাত পথের দিকে চেয়ে বসে আছি যে, কেউ ভালো খবর নিয়ে আসবে, তা তো হল না, এ তুমি কী খবর নিয়ে এসেছ?'

যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, ননীর সংসারে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ী দেবী সে খরচ নিয়মিত ভাবে পাঠাতেন। কালী ড্রাইভার তো বলতে গেলে বাড়ির লোকই। একদিন তিনি অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক ইউরোপীয় হোটেলে চা খেতে যান। সেখানে এক কাপ চায়ের দাম আটআনা, বাঙালীর দোকানে সেই চা দু পয়সায় পাওয়া যেত। কালী বলেছিল, 'আমি সেখানে গিয়েই চা খেয়ে আসছি।'

শরৎচন্দ্র তখুনি বললেন, 'আমরা যখন এখানে সবাই চা খাচ্ছি, তখন তুমি সেখানে কি করতে যাবে?'

তাই আজও শরৎচন্দ্র গোপালের সঙ্গে থার্ডক্লাসে বসেই কলকাতা রওয়ানা হলেন। পথে কোনো এক স্টেশনে গাড়ি থামলে এক অপরিচিত ডাক্তার প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কেমন আছেন, দাদা?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'তুমিই বলো না, কেমন দেখাচ্ছে আমায়?'

'আগের চেয়ে তো ভালো মনে হচ্ছে।'

'তুমি হ'লে গিয়ে জাত ডাক্তার। আমার এ বিশ্বাস আজ আরো পাকা হল।'

ডাক্তার বললেন, 'এত বড় সার্টিফিকেট কেন দিচ্ছেন, দাদা?'

একটু চুপ করে থেকে শরৎচন্দ্র বললেন, 'ডাক্তার, তুমি ভালো করে জান যে আমি সুস্থ নই, এও জান যে আমায় সে কথা বলা উচিত নয়। তাই তোমায় এত বড় বলে মনে করি।'

অন্যান্য কথার পর আবার বললেন, 'অনেকদিন থেকেই আমার অবস্থা আমি জানি। গাছপালা নিয়ে ভুলে থাকার চেষ্টা করছিলাম। কোনোদিন যদি সামতায় আস তাহলে দেখবে।'

'দাদা, ভালো হওয়ার সেই একমাত্র পথ, মনকে নিরুদ্বেগ করুন, দেখবেন ভালো হয়ে গেছেন।'

মাথা নেড়ে শরৎচন্দ্র বললেন, 'এখন আর কিছুই হবার নয়।'

২৮

কলকাতা পৌঁছে তাঁর সেই আত্মভোলা ভাব যেন আবার জেগে ওঠে। ছেলেবেলার কত কথাই-না তাঁর মনে পড়ত; সেই বাগানে ঘুরে ঘুরে ফড়িং ধরে বেড়ানো, ফুল,লতাপাতা,বেজি, কোকিল, ভেলু সবার কথাই তাঁর মনে পড়ছিল। ভেলুর প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রমামাকে বললেন, 'সে আমার রক্ত-মাংসের একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার আগে ও পরে অনেকগুলি এসেছে, গেছে, কিন্তু সে যেন এদের মধ্যমণি ছিল। জীবজন্তুর কাছেই মানুষ সবার বড় শিক্ষা পায়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

তারপর বললেন, 'সেদিন তুমি ছাতে কুঞ্জবন লাগাবার কথা বলছিলে, ভেবেছিলাম সব ব্যর্থ-কি হবে? কিন্তু আজ গ্লোব নার্সারি যাব, যদি বেঁচে থাকি নিশ্চয় কুঞ্জবন তৈরি করব।'

সত্যিই তিনি নার্সারি গিয়ে কয়েক রকমের মরশুমি ফুলের বীজ কিনে এনেছিলেন। গোলাপ ফুল সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। যখন দোকানে দাঁড়িয়ে মামার সঙ্গে কথা বলছিলেন, একটি অপরিচিত যুবক এসে প্রণাম করে তাঁকে বলল, 'আপনি কি দয়া করে একটু আমার স্টলে যাবেন? আমি আপনাকে কিছু ফুল দিতে চাই।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'আমায় কেন দিতে চাও?'

'দিয়ে আমার আনন্দ হবে, তাই।'

'কত লোকেই তো আসে, সবাইকে দাও?'

'সবাইকে তো আমি চিনি না।'

'আমায় চেন?'

'বাংলাদেশে আপনাকে চেনে না কে?'

কেনাকাটা করতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। বলতেন, 'ভগবান আমায় বুড়োবয়সে কত দিয়েছেন, কোথায় রাখব?'

গাড়িতে উঠে ফলের অপেক্ষায় বসে ছিলেন, হঠাৎ খাতা হাতে একটি বৃদ্ধ মুসলমান লোক এসে বলল, 'এ আপনাকে কিনতে হবে।'

'কেন?'

'ঘরে খাবার কিছু নেই, খালি হাতে ঘরে ফিরে যেতে পারব না।'

'কত পয়সা দিতে হবে?'

'এক টাকা।'

তার হাতে দুটি টাকা দিয়ে বললেন, 'এক টাকা তোমার, আর এক টাকা খুদার নামে।'

খুশি হয়ে বৃদ্ধটি বলে, 'জিন্দা রহো, বাবুসাব।' শুনে মৃদু হাসলেন। অন্তরের সুপ্ত শরৎ মনে মনে বলে উঠল, 'বেঁচে থাকার কথাই তো এ বলছে। জীবনের শেষ ক্ষণটি পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব।'

এতদিন পর্যন্ত ডাঃ কুমুদশংকর রায় চিকিৎসা করছিলেন। খবর পেয়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এলেন, বললেন, 'তুমি কবে এলে? আর এ- সবই বা কি? আচ্ছা, শুয়ে পড়ো তো দেখি।' শুতে শুতে শরৎচন্দ্র বললেন, 'দেশে গিয়ে খুব মাছ খেয়েছি,তাই পেপসিয়া বেড়ে গেছে।'

ডাঃ বিধান রায় বললেন, 'হজম করতে যখন পার না তখন এত খাও কেন?'

শরৎ বললেন, 'বড় লোভ হয়। এক-এক দিনে পাঁচ-ছটা পর্যন্ত তপসে মাছ খেয়েছি।'

ডাক্তার বললেন, 'ভাল কাজ করনি, আমায় দিয়ে খেলে হজম হত।' পরীক্ষা করার পর কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর যেমন এসেছিলেন চলে গেলেন।

শরৎ মামাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলে গেলেন?'

'কিং কিংস।'

এ শব্দের মানে বোঝাই দায়। নরেন্দ্র দেবও এসে পড়লেন। ডিকশনারি দেখা হল, তাতে বোঝা গেল যে, অন্ত্রে কোনোরকম বাধা পড়েছে। শুধু এক্সরে করালে কিছু হবে না, অপারেশন করতে হবে।

অতএব গ্রামে ফিরে যাবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। একের পর এক ডাক্তারেরা এলেন। পরামর্শ হল। জ্যোতিষীর কথায় নীলার আংটি ধারণ করছিলেন, পরে প্রবালের আংটি ধারণ করবার সময় বললেন, 'মানুষের জীবনে যখন বিপদ ঘনিয়ে আসে তখন সে কু-সংস্কারের দাস হয়ে পড়ে। এই দেখো-না আমার প্রবালের আংটি। কী হবে এ দিয়ে? তবুও...।'

সুরেন্দ্রমামা বললেন, 'অসুখ হলে যেমন ডাক্তার ডাকা কুসংস্কার নয়, তেমনিই গ্রহ অপ্রসন্ন হলে প্রবাল ধারণ করা কোনো খারাপ সংস্কার নয়।'

সেদিন চিরদিনের স্বেচ্ছাচারী শুধু এতটুকুই বলতে পারলেন, 'দুঃখে পড়ে প্রবাল ধারণ করেছি। মন কিন্তু বিদ্রোহ করতে চাইছে।'

মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিল, তাঁর ইচ্ছে হত একটা গাড়ি কিনে ভাগলপুরে বেড়িয়ে আসেন। সেদিন বাজারে একটা ময়ূর দেখে কিনে নিয়ে এলেন। ছাগলের দুধ সহজ ও সুপাচ্য, রুগীর পক্ষে উপকারী। তাই নিজে বাজারে গিয়ে চারসের দুধ দেয়, এমন ছাগল চল্লিশ টাকায় দেখে এলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ছাগলওয়ালাও তাঁকে চিনত। সুরেন্দ্রমামার কানে কানে বলল, 'ইনি গল্প লেখেন, তাই না? আমি এঁর ছবি দেখেছি, আমি কুড়ি টাকায় তাঁকে ছাগলটি দেব।'

কিন্তু ছাগলটি ভারি অদ্ভুত ছিল, নিজের দুধ সে নিজেই খেয়ে ফেলত। বড় বৌ গ্রাম থেকে এসে গিয়েছিলেন। কেউ তাঁকে বলে, 'যে বাড়ির ছাগল নিজের দুধ খায় সে বাড়ির কর্তা বা গিন্নির মধ্যে কেউ একজন মারা যায়।' একথা শোনার পর বড় বৌ এমন চেঁচামেচি আরম্ভ

করলেন যে, ছাগল বিদায় করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। কিন্তু তা বলে শরৎচন্দ্রের কেনাকাটায় বিরাম পড়েনি।

এক্সরেতে জানা যায়, লিভারে ক্যানসার হয়েছে। ক্যানসার বেড়ে গিয়ে পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁচেছে, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের স্পষ্ট ঘোষণা। মৃত্যু তো এমনিতেই ঘনিয়ে এসেছিল। যেদিন কলকাতায় এসেছিলেন, সেদিন খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মুখখানি বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল, তা দেখে সুরেন্দ্রমামা বললেন, 'কী হয়েছে, শরৎ?'

'স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মারা গেছেন। তাঁর হার্ট বড় দুর্বল ছিল, এবার আমার পালা।'

'এ আবার কী ধরনের যুক্তি।'

'যুক্তি নয়,ইনটিউশন থেকে বলছি।'

'তাঁর বয়েস হয়েছিল। সে হিসেবে তুমি ছেলেমানুষ।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'আমার হার্ট ঠিক আছে কিন্তু খারাপ হতে কতক্ষণ?'

বড়দিনের ছুটিতে মাদ্রাজে ডাক্তারদের একটা বড় কনফারেন্স ছিল। শরৎচন্দ্রের বড় ইচ্ছে ছিল যে, সেখানে যাবার আগে ডাক্তাররা যেন তাঁর সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেন। বিধানবাবু, ললিতবাবু ও কুমুদবাবু এই তিনজন ডাক্তার মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে অপারেশন করাই উচিত। শরৎচন্দ্র বিধান রায়কে বললেন, 'অপারেশন যদি করতেই হয়, আপনি করবেন। মরি যদি তো আপনার হাতেই মরব।'

বিধান রায় হেসে বললেন, 'তুমি শোও। কাজ শেষ করে তবে আমি যাব।' তারপর ঘরের কোণে দাঁড় করানো কুড়ুলখানা তুলে নিয়ে এসে বললেন, 'আমি এখুনি তৈরি।'

এ কথায় সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলেন। কথা ছিল ডাঃ ললিতমোহন অপারেশন করবেন, কিন্তু তাঁর ফিস্ ছিল প্রায় হাজার বারোশো টাকা। এত টাকা দেবার ক্ষমতা শরৎচন্দ্রের ছিল না। তাই সেই অবস্থাতেই তাঁকে ফেলে ডাক্তাররা মাদ্রাজ কনফারেন্সে যোগ দিতে চলে গেলেন। যাননি শুধু ডাঃ দাশগুপ্ত। রোগ যাতে আর না বাড়ে সে চেষ্টায় তিনি ব্রতী রইলেন।

একদিন ডাঃ কুমুদশংকরকে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'অপারেশন যদি করতেই হয় তাহলে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার নেই, আমি কালই এর জন্য তৈরি। মামার সঙ্গে তোমার কাছে যাব, অপারেশন তুমিই করে ফেলো। আমি ভালোভাবে জানি যে তোমার মতো অভিজ্ঞ ডাক্তার সারা কলকাতায় নেই। তোমার নিজের প্রতি যে আস্থা তা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। আমি কোনো মেয়েমানুষ নই, টেবিলের উপর মরে যাবার সম্ভাবনাও নেই। আর যদি তা থাকে তাহলে আমি লিখে দেব, কাউকে ডাকার দরকার নেই।'

কুমুদশংকর পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ বসে রইলেন। শরৎচন্দ্র বললেন, 'কিছু বলো, কুমুদ।'

'আমি করতে পারব না।'

'কুমুদ, তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারবে না। নিজের ছেলের অপারেশন তো তুমি নিজেই করেছিলে।'

'আমার ছেলে ও আপনাতে অনেক তফাত। একটা ছেলে গেলে আবার হতে পারে, কিন্তু একটা শরৎচন্দ্র গেলে দ্বিতীয় আর হতে পারে না।'

মরণের শেষ প্রান্তে খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর বেড়ে গিয়েছিল। একদিন ডাঃ দাশগুপ্তের ল্যাবরেটরিতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র বললেন, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে। কিছু খেয়ে আসিনি, তোমার এখানে ভোগ দেওয়া হবে না? দেশবন্ধুর সঙ্গে তোমার বাড়িতে একদিন খেয়েছিলাম। কতদিন আগের কথা সে-সব।'

ডাঃ দাশগুপ্ত বললেন, 'এখুনি ওটমিলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আপনার পক্ষে ভারি

১ ২২ নভেম্বর, ১৯৩৭

উপকারী।' শরৎ মামার দিকে চেয়ে বললেন, 'সুরেন্দ্র, একেই বোধহয় বলে শনির দশা।'

পেটের কোন্ অন্ত্র রস কোন্ অবস্থায় আছে স্টমাক্ পাম্পের সাহায্যে তাও পরীক্ষা করা হয়। তবু খাওয়ার স্পৃহা তাঁর এতটুকু কমে নি। ডাক্তারের নির্দেশ মতো শুধু কম-মিষ্টি-দেওয়া সন্দেশ খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তাঁর ইচ্ছে হত মটরশুঁটির মচমচে কচুরী খেতে। গ্রামে ফিরে যাবার জন্যও তিনি শেষ সময়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু যাওয়া কি সম্ভব ছিল?

খোঁজখবর নিতে বন্ধু বান্ধবররা রোজই কেউ না কেউ আসতেন। একদিন অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় এসে দেখলেন, সেই ঘর, সেই দালান, সামনের বাগানটুকুও সেই একরকম আছে, তবু যেন চারিদিক নিরানন্দময় হয়ে উঠেছে। কিছু দিন আগেও কেমন সব সজীব প্রাণবন্ত ছিল কিন্তু আজ যেন নিষ্প্রাণ, নিষ্করুণ হাওয়ার স্পর্শে সব-কিছু শুকিয়ে উঠেছে। ব্যথিত মন নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। চারিদিকের ভয়ংকর স্তব্ধতা যেন বারবার ফিরে যেতে বলছিল, কিন্তু দেখা না করে তিনি কেমন করে ফিরে যাবেন? কলবেল বাজালেন, সুরেন্দ্রনাথ এসে দরজা খুলে দিলেন। তিনি যে খবর শোনালেন তা বিশেষ ভালো নয়। সুরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ শরৎচন্দ্রকে খবর দেবার জন্য উপরে গেলেন, তারপর ফিরে এসে বললেন, 'এখুনি আসছেন।'

অসমঞ্জবাবু বলে উঠলেন, 'না না, তাঁকে আসতে হবে না। আমিই বরং উপরে যাচ্ছি।' উপরে যাবার জন্য যেমন তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, চিরপরিচিত পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। অত্যন্ত রুগ্ণ নির্জীব অবসন্নের মতো এসে আরামচেয়ারে বসে পড়লেন। অসমঞ্জ বাবু বললেন, 'এ আপনি কি অনর্থ বাধাতে বসেছেন! এভাবে নিচে নেমে আসা মোটেই উচিত হয় নি।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'তোমার ছেলেকে বলেছিলাম তোমাকে পাঠিয়ে দেবার কথা। তুমি এসেছ, সে কথা শুনে আমি কি না এসে পারি। একদিন তো সবাইকেই মরতে হবে, সে নিয়ে দুঃখ করার কি আছে?'

মনে হল এ যেন শরৎচন্দ্র নয়; ইন্দ্রনাথের প্রিয়শিষ্য ও বন্ধু শ্রীকান্ত কথা বলছে।

সেদিন ২৩ ডিসেম্বর। কয়েকজন বন্ধু এলেন দেখা করতে। কুশল প্রশ্নাদির পর সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললেন, 'নিশ্চয় আপনি ভালো হয়ে যাবেন।' রুগ্ণ মলিন মুখখানিতে মৃদু হাসি নিয়ে বললেন, 'আমার একটা কথা মনে রেখো। ২২শে জানুয়ারির দিন আমাকে স্মরণ কোরো। মনে থাকবে তো?'

যেন তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন না। যাবার চিন্তায় তিনি দুঃখিত ছিলেন না, কিন্তু যাঁরা তাঁকে ভালোবাসত সেই প্রিয়জন, আত্মীয় বন্ধু তাঁদের তো দুঃখের সীমা ছিল না। তাঁদের মধ্যে উমাপ্রসাদ মুখার্জী অন্যতম। হঠাৎ সপ্তাহ খানেকের জন্য তাঁকে বাইরে যেতে হয়, যাবার আগে শরৎচন্দ্রের কাছে আজ্ঞা নিতে এসেছিলেন। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'কয়েকদিনের জন্য যেতে পারো। আপাতত অপারেশনের কোনো সম্ভাবনা নেই, কুমুদ ডাক্তারও বাইরে যাচ্ছেন। চিঠিতে তুমি সব খবরাখবর পাবে, প্রয়োজন হলে তোমায় লিখে পাঠাব।'

উমাপ্রসাদবাবু চলে গেলেন। যাবার সময় সুরেন্দ্রমামাকে বলে গেলেন, 'আমায় নিয়মিত চিঠি দিয়ে সব খবরাখবর জানাবেন।'

২৫ ডিসেম্বর সুরেন্দ্রনাথ লিখলেন—

'৫টা সকাল।.....সেদিন কুমুদবাবুর লেবরেটারিতে শরতের পরীক্ষা হয়েছিল এবং সুবোধবাবু অস্ত্র করতে রাজীও আছেন। পরের দিন সকালে সুবোধ বাবুর বাড়ি যাই—সবিশেষ জানার জন্যে কিন্তু তিনি কোনো কথা আমাদের অর্থাৎ যারা ডাক্তার নয় তাদের বলতে চান না।

'দুদিন শরৎ ভূরিভোজন করাতে আরও দুর্বল হয়ে গেছেন। কাল সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ শরীর খুব খারাপ বোধ হয়—কুমুদবাবু নেই—অন্য কোনো ডাক্তার ডাকতে চাই, তা দেবেন না। অতএব ঘন ঘন ক্যালিফস্ আর আফিং দিয়ে টালটা সামলায়।

....কাল একটা নার্সিং হোম ঠিক করেছি। পার্ক স্ট্রীটে সুশীল চাটুয্যের—সুশীল ভাগ্যক্রমে আমাদের ভাগ্নী জামাই-এর ছেলে। বোধহয় শুক্রবারে ৩১শে ওখানে যেতে হবে।

'আজ ৭।। টার সময় সকালে ডাঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে সুবোধ বাবুর কাছে যাব। এখন এই পর্যন্ত–ফিরে এসে যা হয় জানাব। মোট কথা আপনি চলে যাওয়াতে আমাদের ভরসা কমেছে—যদি ২/৪ দিনের মধ্যে ফিরে আসতে পারেন তো বড় ভালো হয়। আশা করি তা করতে পারবেন। ৩০শে ফিরে আসুন।

'১০।। টায়। সুবোধবাবু আজ ৬।। টায় সময় আসবেন। তিনিই আজ থেকে রুগীর চার্জ নেবেন....'

দুদিন পর সুরেন্দ্রনাথ আবার লিখলেন, '২৭।১২।৩৭ বেলা দশটা। কাল আর সময় করে উঠতে পারিনি চিঠি দেওয়ার। আজ সকাল শান্তভাবেই আরম্ভ হচ্ছে-তাই ও বেলার জন্য ভয় হয়। এখন মুড়ির সঙ্গে তামাক খাওয়া চলছে। মুড়ি খাদ্য হিসাবে নয় : ওটা শুধু খাবার ইচ্ছাকে তৃপ্তি দেবে বলেই ডাক্তারেরা মানা করেন না। কাল শুতে আমাদের ১২।। টা হয়েছিল। এখন "ডুশ" দেওয়ার পর্ব হতে হতে বোধ হয় বেলা ১২ টা হবে। তারপর অলিভ অয়েল মাখা-তারপর রেকটাল গ্লুকোজ–তারপর ১০০ সি সি গ্লুকোজ–ইনটার-ভেনাস। এর মধ্যে একটা স্ট্রীকনিন অবসর-মতো দিতে হবে।

'পেটে-মুখ দিয়ে কোন খাবারই সইচে না : এমনকি উইনকার্নিসও নয়। মুখের খাবার কেবল কষ্টই সৃষ্টি করছে। কিন্তু আর্ত্তি মেটাবার জন্যে ওটা। রাতে দেরী হয় কাজ আরম্ভ করতে। অলিভ অয়েল মাখানো, তারপর রেকটাম্ দিয়ে তিন আউন্স দিয়ে দেওয়া। শেষ শুতে শুতে কাল রাতে বললেনঃ "শোনো একটা গানঃ 'আমার শেষ পারানির কড়ি কণ্ঠে নিলেম গান'।"

"আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব তাই তোমায় গান শোনাচ্ছি।" বাকি খবর ভাল। আমার পূর্বের আপিল আপনার ফেরার সম্বন্ধে দ্বিতীয় তাগিদের দ্বারা সজোরে বলতে চাই। '

চিঠি পেয়ে উমাপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ কলকাতায় চলে আসেন।

২৯

এরই মধ্যে একদিন শিল্পী মুকুল দে ডাক্তার ম্যাকে-কে নিয়ে আসেন। পরীক্ষা করে তিনি বলেন, 'বাড়িতে চিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়, অবস্থা ভালো দেখছি না-যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। এখুনি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'নার্সিং হোমে যাওয়ার কথা তো নিশ্চিত কিন্তু ৩১ তারিখের আগে যাওয়া সম্ভব নয়।'

একটু চিন্তা করে ডাঃ ম্যাকে বললেন, 'মিঃ গাঙ্গুলী, আমার অনুরোধ—যে-কোনো উপায়ে আজই এঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে যান।'

'তাহলে আপনি সাহায্য করুন।'

ডাঃ ম্যাকে সাদার্ন হসপিটাল রোডে একটি ইউরোপীয়ান নার্সিং হোম ঠিক করে দেন।

শরৎচন্দ্র যাবার জন্য তৈরি হলেন, সে কী কান্না, কিছুতেই আর থামতে চায় না। সংজ্ঞাহীনের মতো খাটে শুয়ে পড়লেন। সুরেন্দ্রমামা মুকুল দে-কে বললেন, 'ডাঃ ম্যাকে-কে ডেকে পাঠান, সঙ্গে গেলে ভালো হয়।'

ডাঃ ম্যাকে এলেন। শরৎচন্দ্র তৈরি হয়েই বসে ছিলেন, যাবার সময় হিরন্ময়ীদেবী চরণামৃত নিলেন। শরৎচন্দ্র বললেন, 'ব্যস! হয়েছে, হয়েছে!'

শরৎচন্দ্র যখনই বাইরে যেতেন, কয়েকদিন পর্যন্ত সেখানেই থেকে যেতেন। তাই তাঁকে আটকাবার জন্য হিরন্ময়ী দেবী পা ধুয়ে প্রতিদিন জল খাওয়ার নিয়ম করেছিলেন। বলেছিলেন, 'চরণামৃত না নেওয়া পর্যন্ত কিছু মুখে দেব না।'

১ ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৩৭

একবার শরৎচন্দ্র কয়েকদিন পর বাড়ি ফিরে দেখেন, হিরণ্ময়ী ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে বসে আছেন। সেই থেকে বাইরে যাওয়া তিনি একটু কমিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন পা-ধুয়ে জল নেবার সময় তিনি যেন বলতে চেয়েছিলেন, 'ব্যাস! হয়েছে, আর তো ফিরে আসব না!'

ইউরোপীয়ান নার্সিং হোমে তিনি বেশি দিন থাকতে পারেননি। সেখানকার ব্যবস্থা-পত্র সবই ভালো ছিল। সিঁড়িতে কার্পেট বিছানো, চারিদিকে বিলিতি মেম-সায়েবরা ঘুরে বেড়াত। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হাসপাতালের নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করতে এসে অবাক হয়ে গেলেন। মনে হয়েছিল বাংলাদেশ ছেড়ে কি তিনি বিলেত গিয়ে পৌঁচেছেন? রুম নম্বর দেখে ভেতরে ঢুকলেন, সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর, দামী জিনিসপত্র। সামনে একটা সাধারণ খাটের উপর ধবধবে বিছানা পাতা। সেখান থেকে চোখ তুলে রুগীর দিকে চেয়ে তিনি চমকে উঠলেন—ম্লান দৃষ্টি, পাঁশটে মুখের রঙ, তাঁকে দেখে শরৎ বলে উঠলেন 'তুমি এসে গেছ, এবার ঠিক চিকিৎসা হবে।'

উমাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন?' বলতে-না-বলতেই হাতে গ্লুকোজের জল নিয়ে নার্স এসে দাঁড়াল। শরৎচন্দ্র বললেন, 'এখন নয়, একটু পরে দিও।'

নার্স সে কথা না শুনে বলল, 'সময় হয়ে গেছে, নিতেই হবে।'

নার্সের কথাবার্তায় এতটুকুও স্নেহের পরশ ছিল না, যেন একটা মেশিনের তৈরি মানুষ। তার এরকম ব্যবহারে রুগী উত্তেজিত হয়ে ওঠাতে উমাপ্রসাদ নার্সের হাত থেকে গেলাস নিয়ে বললেন, 'আপনি দয়া করে বাইরে যান, আমি খাইয়ে দেব।'

নার্স রেগে বাইরে চলে গেলে উমাবাবু রুগীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। নিজের হাতের মধ্যে তাঁর হাতটি ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। দারুণ ক্রোধে শরৎচন্দ্রের জীর্ণ শরীর থরথর করে কাঁপছিল। খুব ধীরে উমাবাবু বললেন, 'একটু জল খান!' শরৎচন্দ্র তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর শান্তস্বরে বললেন, 'আচ্ছা খাচ্ছি। কিন্তু এখানে থেকে আমায় নিয়ে চলো, নইলে আমি নিজেই চলে যাব।'

উমাপ্রসাদ বাবু বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়, এখানে থাকা হতে পারে না। কালই এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

বন্ধনমুক্ত মানুষ কেমন করে বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন? ইউরোপীয়ান হসপিটালে বড় কড়া নিয়মকানুন; রুগীর যাতে বিশেষ অসুবিধে না হয় সে বিষয়ে লক্ষ রেখে মাত্র কয়েকজনের সেখানে যাওয়ার আদেশ ছিল। উমাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি নিজের কাছে কাকে রাখতে চান? সেই হিসেবে ব্যবস্থা করা হবে।'

শান্তস্বরে শরৎচন্দ্র বললেন, 'কাউকে চাই না। তুমি তো আছই, এখানে তুমিই থাকো।'

উমাপ্রসাদকে যেমন তিনি ভালোবাসতেন, তেমনই তাঁকে বিশ্বাস ও ভরসা করতেন। সেদিন যখন হিরণ্ময়ী দেবী এলেন, উমাপ্রসাদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন উমাপ্রসাদ! এর পর যদি কোনো দরকার পড়ে এঁকে বলো।'

এ যেন একরকম ভাবে উমাপ্রসাদের হাতে হিরণ্ময়ীর ভার দিয়ে গেলেন।

শান্তিনিকেতন থেকে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এলেন দেখা করতে, দেখলেন, চোখ কোটরে বসে গেছে, জীবনের আশা বড়ই ক্ষীণ। শরৎ বললেন, 'এ ভাবে কষ্ট পেতে কে চায়?' নানান কথার পর আবার বললেন, 'তবুও তো জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়নি। একটা বখাটে ছেলে হিসেবে জীবন শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ ········· সে তো তোমরা জানই।'

কেউ দেখা করতে এলে মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠত, যেন মনের পটে আশার ছবি আঁকার চেষ্টা করছেন। ছেলেবেলার গল্প শোনাতেন, ভাগলপুরের গঙ্গার কত কথা, অন্ধকার বর্ষা রাতে কূল-উপচানো নদী সাঁতরে পার হওয়ার কথা। মনে হত অমানিশার ঘোর রাতে সে আর রাজু ছোট ডিঙি করে উত্তাল সমুদ্রে অন্তহীন যাত্রায় বেরিয়েছে। কত বছর কেটে গিয়েছে, সেই-সব দিনগুলি কী ভীষণ কঠোর নির্মম তবু জীবনকে কতই-না প্রলোভনীয় করে রেখেছে ···· ·।

দুর্বল মুহূর্তগুলিকে ওই ছেলেবেলাকার স্মৃতির সাহায্যে যেন শক্তি জোগাচ্ছিলেন। উমাপ্রসাদবাবু বললেন,'আগে ঠিক হোন,এবার থেকে আপনার সঙ্গে আমিও যাব।'

শরৎচন্দ্র হেসে ফেললেন, বললেন, 'তোর আশা তো বড় কম নয়। গঙ্গায় নিশ্চয় যাব, সঙ্গেও থাকবি কিন্তু সে যে আমার শেষ যাত্রা।'

উমাপ্রসাদ বললেন,'চুপ করুন। বেশি কথা বলা বারণ।'

ডাক্তারের অনুমতি পেয়ে সে রাতে উমাপ্রসাদ হসপিটালেই থেকে গেলেন। চেয়ার টেনে তাঁর পাশে বসলেন। সেবা করার ব্যাপার কিছু ছিল না, ঘরের কোণে ক্ষীণ আলোর ব্যবস্থা, উমাবাবুর চোখে ঘুম নেই। একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে ছিলেন—মহামানব আজ রোগশয্যায় শায়িত-মৃত্যু পথযাত্রী। রোগে শরীর পরিশ্রান্ত হলেও পুরোপুরি হুঁশ ছিল। রাতের ডিউটির নার্স উঁচু হিলের জুতো পরে খট্‌খট্ আওয়াজে নিজের চার্জ বুঝে নিচ্ছিল। অস্ফুট স্বরে শরৎচন্দ্র বললেন, 'খোঁড়া নার্স এসে গেছে।'

অবাক হয়ে উমাপ্রসাদবাবু জিজ্ঞেস করলেন,'খোঁড়া আপনি কেমন করে দেখতে পেলেন?' মিষ্টি হেসে শরৎচন্দ্র বললেন, 'দেখব আর কেমন করে বলো? কানে শুনে বুঝলাম, দু পায়ের জুতোর আওয়াজ এরকম হয় না। দেখে নিও ওর একটা পা নিশ্চয় ছোট।'

ঠিক সেই মুহূর্তে নার্স এসে ঘরে ঢুকল। উমাপ্রসাদ ভালোভাবে দেখলেন,সত্যিই তার এক পা সামান্য ছোট, চট করে ধরা যায় না। কিন্তু শেষ সময়েও রুগীর কি তীক্ষ্ণ অনুভূতি?

শেষ সময়ে তাঁর কারুর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হত না। একদিন বললেন, 'সারা জীবন ধরে মানুষকে ভালোবেসেছি, কাছে টেনেছি কিন্তু আর নয়। শেষের কটাদিন চুপচাপ শুয়ে থাকতে চাই।'

কিন্তু কে শুনবে এ-সব কথা? যাঁরা আসবার আসবেনই। একদিন অপরিচিত একজন এসে বেশ অধিকারের সঙ্গে বলল, 'একবার শুধু দেখা করতে চাই।' তাকে অনেক বোঝানো হল, রুগীর অবস্থা সংকটজনক, কিন্তু কোনো কথাই সে শুনতে রাজী নয়। উমাপ্রসাদ শরৎকে গিয়ে বললেন,'সে আসবেই, আপনি চুপচাপ চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকুন। ঘরে আসামাত্র তাকে বিদায় করে দেব।'

তারপর আগন্তুককে গিয়ে বললেন, 'রুগী ঘুমিয়ে পড়েছেন, একটুও শব্দ যেন না হয়, দেখে চলে যাবেন।'

শ্রদ্ধাপ্লুত আগন্তুক ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে কপট নিদ্রায় শায়িত শরৎচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে দু-হাত তুলে মৌন প্রণাম জানিয়ে চলে গেল। যদি সে দেখত যে শরৎচন্দ্র একচোখ বন্ধ করে তাকে দেখার চেষ্টা করছেন, যেমন চুপিচুপি কেউ জানলা খুলে দেখে। সে চলে যাবার পর শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, 'খুব খেল দেখালাম বটে, কিন্তু আর নয়। তুমি আমার কাছে এসে বসো!'

খুব জল তেষ্টা পেত। খাওয়ার জন্য একটু জল চাইলেন, কিন্তু জল গলার নিচে নামতে চাইত না, তাই উমাপ্রসাদ বললেন, 'একটুখানি খান।' অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, 'একটুখানি।' তারপর বললেন, 'দেখছ!"একটুউখানি," "একটুকখানি," "একটুখানি," কথাগুলো কি সুন্দর। বাংলা ভাষায় কত বিচিত্র সম্পদই না আছে!'

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'জীবন নদীর খেয়াপারের যাত্রী। তবুও সাহিত্য পূজারীর বাণীর দেউলে ভক্তি অর্ঘ্য!' সৌন্দর্য-পিয়াসী মনও সম্পূর্ণ সজাগ আছে। প্রতিদিন সাজিভরা ফুল আসে। গোলাপের গুচ্ছ আসে। রোগীর ঘর রূপে আলোকিত। গন্ধে আমোদিত হয়।

জিজ্ঞাসা করেন, 'কে নিয়ে এলো? বড় ভাল লাগে ফুল। সার্থক জন্ম গোলাপের। শেষ সময়েও আনন্দ দিতে এসেছে।'[১]

১ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—'শরৎচন্দ্রের শেষ দিন', 'তরুণের স্বপ্ন', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৩ পৃঃ ৬১

শ্রীকান্তও তো চতুর্থ পর্বে ফুল দেখে কেমন মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল, 'আর সবচেয়ে মানাইয়াছে মাঝখানটায়। নিশান্তের এই ঝাপসা আলোতেও চেনা যায় শাখায়-পাতায় জড়াজড়ি করিয়া গোটা পাঁচ-ছয় স্থলপদ্মের গাছ—ফুলের সংখ্যা নাই—বিকশিত সহস্র আরক্ত আঁখি মেলিয়া বাগানের সকল দিকে তাহারা চাহিয়া আছে।'

কিন্তু শুধু ফুল দেখেই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না; সুরেন্দ্র মামাকে বললেন, 'বিলাসকে আমি দুটো ক্যানারি পাখি আনতে বলেছি, যদি আনতে পারে বড় ভালো হয়।'

পাখি এল। খাঁচায় বসে সুন্দর পাখি দুটি মিষ্টি মধুর গলায় গান গাইত। ডাক্তার দেখে বললেন, 'রাতে এঘরে পাখি রাখলে ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে, ইচ্ছে হলে দিনের বেলায় ভেতরের জানলায় রাখতে পারো।'

শরৎ হেসে বললেন, 'ঘুম যদি আসে তাহলে কেউ রুখতে পারবে না। এদের গান আমায় শুনতে দাও, বড় মধুর শিক্ষা দিচ্ছে।'

তারপর পাখি দুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওরে, এত সুন্দর গাস নি। একদিন আমার মতো তোদেরও মধুর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে।'

গভীর রাত। তিনি চুপচাপ শুয়েছিলেন। চোখে একবিন্দু ঘুম নেই, উমাবাবুর দিকে তাকিয়ে তাঁকে কাছে ডাকলেন। উমাবাবু সেখান থেকেই বললেন,'চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন।' কিন্তু চোখ বন্ধ করেও পিটপিট্ করে তাকাচ্ছিলেন। বললেন, 'আমার কাছে এসো, একটা কথা তোমায় বলি আমার সীমান্তের একান্ত বন্ধু।' উমাপ্রসাদ কাছে গিয়ে দাঁড়াতে শরৎচন্দ্র তাঁর মাথায় হাত রাখলেন। উমাপ্রসাদ বললেন, 'আপনি কি আমায় আশীর্বাদ করছেন?' শরৎচন্দ্র বললেন, 'এ কথা কেন? তোমায় আমি সর্বদাই আশীর্বাদ করে আসছি।'

সেদিনের সেই দীর্ঘ রাত্রি এ ভাবেই কেটে যায়। কিন্তু ভোরের আলোর সঙ্গে মনে কোন নতুন আশার ঝলকানি দেখা গেল না। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, মুখ দিয়ে জল পর্যন্ত খাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। পেটে খাবার না পৌঁছলে মৃত্যু অবধারিত, ইন্‌জেকশানেও কোনো ভালো ফল পাওয়া গেল না। অন্ত্রের সাহায্যে খাবার পেটে পৌঁছনোর পথ বন্ধ, এ অবস্থায় একমাত্র পেট চিরে নলের সাহায্যে খাবার পৌঁছনো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

সেদিন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দেখতে এলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কষ্ট হচ্ছে, দাদা?'

'কষ্ট কিছুই নেই।'

'তাহলে?'

'তেষ্টা। তেষ্টায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মরুভূমির বুক চিরে দেওয়ার মতো তেষ্টা, ডাক্তার।' উপস্থিত সেখানে সবার চোখ সজল হয়ে উঠল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ডাঃ বিধান রায় বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মতে অপারেশন করতেই হবে। তিনি ডাঃ ললিতমোহন ব্যানার্জীকে মাত্র চারশো পঞ্চাশ টাকায় অপারেশন করতে রাজী করালেন।

১২ জানুয়ারি অপারেশনের দিন ঠিক হল। নিয়মানুসারে রুগীর লিখিত আদেশ চাইলেন ডাক্তার। শরৎচন্দ্রের মুখে স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠল, বললেন, 'লিখে দাও, আমি তাতে সাইন করে দেব।'

ডাঃ কুমুদশংকর রায় আদেশপত্র লিখলেন, শরৎচন্দ্র তাতে ইংরেজিতে হস্তাক্ষর করলেন।

তারপর বললেন, 'একটু দাঁড়াও। তলার দিকে আমি নিজেও কিছু লিখতে চাই।' এতে লেখা ছিল—অপারেশনের দরুন যে বিপদ হতে পারে তার সমস্ত উত্তর দায়িত্ব আমার এবং ডাঃ কে. এস. রায়কে অনুরোধ করছি অপারেশন যেন তিনি করেন। তারিখঃ ১২ জানুয়ারি, ১৯৩৮। শরৎচন্দ্র আড়াআড়ি হস্তাক্ষর করে আবার তারিখ লিখলেন। তারপর একটি লাইন নিচে আরও লিখলেন—'আমার সম্পূর্ণ চেতনা ও সাহস অক্ষুণ্ণ অবস্থায়।'

এ কথাটিও ইংরেজিতে লিখেছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় মস্তিষ্ক হয়তো ঠিকমত কাজ করছিল না কারণ তিনি 'সেন্সেস' ও 'ক্যরেজ' এ দুটি বানান ভুল করে ফেলেছিলেন।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট
জেলা-হাওড়া

পরম কল্যাণবরেষু

সেই জন্যেই এসময়ে নরম বুলি কিছু?
কিরূপে দিলে কম বলে ?

আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো —

২১শে আশ্বিন ৩৪, শরৎ

পু: — কেউ কেউ অতিশয় দুঃখিত হয়ে জানিয়েছেন রবিবাবুকে আমার ও রকম কঠিন কথা লেখা উচিত হয়নি। আমার লেখার মধ্যে নাকি শ্লেষ পর্যন্ত আছে। ওঁর অতি-ভক্তদের প্রতি হয়ত আছে, কিন্তু ওঁর বিরুদ্ধে কোথাও অযথা বিদ্রূপ বা আক্রমণ আছে আমি ত আরও একবার পড়েও খুঁজে পেলামনা। তুমি পেয়েচ? মানুষগুলো কি নির্বোধ। তাই ভাবি।

শ—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্রে কঠিন মন্তব্য বা শ্লেষ আছে বা অযথা বিদ্রূপ আছে, সেকথা শরৎচন্দ্র এই চিঠিতে অস্বীকার করেছেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে।

[illegible]

শরৎচন্দ্রের ষোড়শী নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

ভোলানাথ, আমার এই অনুরোধটুকু রেখে দিও ভাই। এই লোকটি আজ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত, — মাড়োয়ারীদের সামান্য -পয়সা-ওয়ালা বামুন-কায়েতের কবলে পড়লে অবশেষে যেমনই যা হয়।

নানা প্রকার জুলজুলের মধ্যে দিয়ে মামলাটা একেবারে শেষ সীমানায় পৌঁছেচে। High Court এ motion ও file করেচে এও আমার জানি, উকিল নাকি rule কোরে দেওয়ায় উকিলটি রুখে পেয়েছে।

এই লোকটিই তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবে, আমি শুধু কাগজপত্র দয়া কোরে যদি আর একটা দিন দেন তো আমি একটুখানি চেষ্টা চরিত্র করে কোরে যদি কিছু লোকটার উপায় করতে পারি।

ইতিপূর্বে কে একজন advocate বীরেন বোস দয়াপরবশ হয়ে এর এই উপকার কোরেছেন, তিনি নাকি বলেছেন যে এ কেস Lower Court যে ফেরত নেওয়া যায়? এ High Court, এখানে ও-সব অনুগ্রহ কর্তাই চলেনা। যা হোক কোনো এর থেকে একে উদ্ধার করো এই অনুরোধ। মেয়েটি ভালো, নইলে নিজেই দেখায়। আমার কাছে কুশলে আছেন। আমার বোধ হয় এই বন্ধু অধিকাংশের উপর এই রকম ব্যাপার নিয়ে অত্যাচার করা। এ আর সাহেবের।

22 শে কার্ত্তিক ৩৭।

২৫৩ 7/11/30

দা?

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোনো একজন গ্রাম্য লোকের উপকার করবার জন্য ভোলানাথকে শরৎচন্দ্রের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি

অবশেষে একদিন এক অপরাহ্ন বেলায়
গহরের বাটীর সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার সাড়া পাইয়া নবীন বাহিরে আসিল

আমার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল।

যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। [illegible]

[illegible]

[illegible]

১৯৩২ সালে লেখা 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের পাণ্ডুলিপি

ছোটো মেয়েদের প্রতি —

এত আজ তোমাদের মধ্যে [illegible] লিখিনি । যাঁরা তোমাদের প্রিয় লেখক [illegible] ।

[illegible]

[illegible]

[illegible] বেলা [illegible] ।

[illegible]

BENGALI VERNACULAR

Paper-Setters— Mr Saratchandra Chatterjee; Prof Dineschandra Sen, Rai Bahadur, B A, D.Litt.

Head Examiner—Mahamahopadhyay Pramathanath Tarkabhushan

Examiners—
- Mr Prabhatkumar Mookerjee, B A.
- Rai Sahib Jagadananda Ray.
- Mr Satischandra Mitra, B A, B T.
- ,, Kalipada Mookerjee
- ,, Golindanath Guha, M A.
- ,, Purnachandra De, B A
- ,, Basantaranjan Ray
- ,, Manmathanath Ghosh
- ,, Gurubandhu Bhattacharyya, B A, B
- ,, Nikhilnath Ray, B L
- Dr Sitanath Pradhan, M Sc, Ph D

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable

The figures in the margin indicate full marks

1 *Either,* What was the state in which Vidyasagar found Bengali Prose? Discuss how Vidyasagar contributed to the development of the Bengali language and literature giving a complete list of his works

Or, Justify on the line of Rabindranath the following remarks on Sakuntala

"Would'st thou the young year's blossoms and the fruits of its decline And all by which the soul is enraptured feasted and fed. Would'st thou the earth and heaven itself in one sole name combine I name thee, O Sakuntala and all at once is said"

2 With regard to Krishna Kanta's Will—

নারীত্বের দিক দিয়া রোহিণীর জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল কোন অপরাধে ও কাহার অপরাধে ?

সাংসারিক দিক দিয়া ভ্রমরের জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল কোন অপরাধে ও কাহার অপরাধে ?

3 Give, in your own words, the *Puranic* story of *Britra* on which Hemchandra's *Britra Samhar* is based

4 Explain, with reference to context any *three* of the following extracts but not more than two from each group —

Group A

(১) মাতৃভাষা বাংলা বলিলাই কি [illegible] এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই [illegible] —

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বি এ পবীক্ষাব যে বাংলা প্রশ্নপত্র বচনায শবৎচন্দ্র অংশগ্রহণ কবেছিলেন তাব প্রথম পৃষ্ঠা

[illegible]
ক্যাস্টেয়ার্স টাউন, দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা

কল্যাণীয়াসু,

বড়বৌ, কাল বেলা ৩॥টায় এখানে এসে পৌঁছেছি। ইষ্টিশানে সত্যমামা ও মৃত্যুঞ্জয় মোটর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পথে কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। হরিদাসের এই [illegible] বাড়ীটি চমৎকার। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অনেকটা জায়গা আছে। পায়খানা নীচে কিন্তু ভালই। আজ সকালে কাঠ-ওয়ালা দুখানা খাট দিয়ে গেছে, তাকে দাম দিয়েছি এটাকা। একসের কাঠ ২ই আমার দরকার হবে। মশা বেশ আছে। কাল রাত্রে মশারি খাটাইনি ভেবেছিলাম মশা নেই কিন্তু রাত্রি ১টা ১॥টার সময় মশায় খেয়ে ফেলবার উপক্রম করলে, কোন রকমে মশারি খুঁটি দিয়ে তবে শুলাম। শীত আছে তাই রক্ষে। সকলেই বলেন ১ মাস ২ মাস থাকতে পারলে শরীর সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে। দেখি কতদিন থাকতে পারি। ভাবনা আমার তোমার জন্যে, পাছে অসাবধানে অসুখ বিসুখ করে। কারণ, তোমার অসুখ করেছে যেদিন কানে শুনতে পাব সেই দিনই দেওঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবো।

শুনে যে এখানকার তেমন ভাল না বলে সত্যমামা পাঠিয়েছেন এ দুটো জিনিস তিনিই আনিয়ে দেবেন। দাম দিলে তাঁর বাড়ীতে দিয়ে আসতে হবে, জেল খানা থেকে তিনি আনিয়ে দেবেন। মাছ ও হাঁস [illegible] কিছু হবেনা। বেড়াবার দরকার, মোটর চাই নইলে পায়ে হেঁটে বেড়াবার শক্তি নেই। হয়ত কালীকে গাড়ী নিয়ে এখানে আসতে হবে। ৬/৭ দিন পরে স্থির করে চিঠি লিখবো।

বুড়ি বাবা যেন এ্যাবার করে অসুখ বিসুখ না করে। দিদি বাড়ী চলে যাচ্ছেন, না গেলেও [illegible], কিন্তু থাকলে তোমাদের সকলেরই সুবিধা। ঠাকুর রাঁধুনি কি পাওয়া গেল? এর জন্যে চিন্তিত

দেওঘরে পৌঁছে হিরণ্ময়ী দেবীকে লেখা ব্যক্তিগত পত্র।

I take on myself all risks of operation and request Dr. K.S. Ray to operate on me.

Park Nursing Home
12. 1. 38.

Saratchandra Chatterji
12/1/38

With all my Senses intact & Courage

লেখার সময় যেন তিনি অপূর্ব আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করলেন। যে ফাউন্টেন পেন দিয়ে এই কথাগুলি লিখেছিলেন, সেটি উমাপ্রসাদকে দিয়ে বললেন, 'এটা নিজের কাছেই রেখো।'

তারপর একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আহা কী আরাম লিখতে খুব ভালো লাগল।'

জীবন-ভর লেখনীর সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক। তাই যেন ঐ লেখনীটি হল বিদায়বেলায় অত্যন্ত প্রিয়জনের শেষ স্পর্শানুভূতি। এর একদিন আগে তিনি নিজের উইল তৈরি করে গিয়েছিলেন। তাঁর যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি নিজের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর নামে করে দিলেন[১]। হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের ভাইপো এর অধিকারী হবে। ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ছিল, তা তিনি ভাইঝির বিয়ের দরুন রাখলেন, এবং তারপরেও যদি কিছু টাকা থাকে তো তাঁর ভায়ের ছেলেমেয়েরাই পাবে। ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র সপরিবারে ২৪, অশ্বিনী দত্ত রোডস্থিত বাড়িতে থাকবার অধিকারী হল।

ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বারোটার সময় অপারেশন করলেন। দেখলেন, লিভার একেবারেই পচে গিয়েছে, বাঁচার কোনো আশাই নেই। ক্ষতস্থান তিনি সেভাবেই বন্ধ করে দিলেন যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ যাত্রায় যেতে পারেন। টিউব দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। অপারেশনের সময় রুগীর রক্তের প্রয়োজন হলে প্রকাশচন্দ্র রক্ত দিলেন কিন্তু তা পরিমাণে

১ এঁর মৃত্যু ২২ বছর পর ১৫ ভাদ্র, ১৩৬৭, ৩১ অগাস্ট, ১৯৬০

যথেষ্ট না হওয়াতে তাঁর প্রতিবেশী নকুলচন্দ্র পতি রক্ত দিলেন। শরৎচন্দ্র নকুলচন্দ্রকে বরাবরই সাহায্য করে এসেছেন। প্রায় পাঁচ বছর আগে তাঁর পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন থেকেই তাঁর সব ভার তিনি বহন করছিলেন। এ ছাড়া যখনই কোনো বিপদ-আপদ হয়েছে, শরৎচন্দ্র চিরদিন তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। পরে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিও পাইয়ে দিয়েছিলেন। তাই সেই ঋণ পরিশোধের জন্যই মনে হয় নকুলচন্দ্রের রক্ত তাঁর কাজে লাগে। রক্ত দেওয়ার পর অবস্থা একটু ভালোর দিকে মনে হল, অনেকের মনে ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিল।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচাবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ক্রমশঃ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন, মৃত্যু তাঁকে নিজের কোলে ধীরে ধীরে টেনে নিচ্ছিল। নিশ্বাস একবার খুব ধীরে একবার খুব জোরে জোরে পড়ছিল। যেন তাঁর জীবনরূপী নাটকের অন্তিম দৃশ্যের যবনিকা বড় ধীরে ধীরে নামছিল। শুক্রবার, ১৪ জানুয়ারি রাতের পর যন্ত্রণায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন।

'যন্ত্রণা ····· ভীষণ যন্ত্রণা·····'

'কী হয়েছে, শরৎ ?'

'আমি মরে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি না ······ ওরা কারা ?'

সারারাত আর্তনাদ করতে লাগলেন। ভোর চারটে নাগাদ জ্ঞান হারালেন। সাতটার সময় অক্সিজেন দেওয়া হল, কিন্তু সব ব্যর্থ। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কয়েকবার চেঁচিয়ে ওঠেন। মুখের শেষ কথা ছিল, 'আমাকে·····আমাকে····· দাও, আমাকে······দাও·····!'

কিন্তু তাঁকে কে কী দিতেন?

কি তিনি পান নি? বাঙালীরা তাদের প্রাণপাত্র উজাড় করে যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা সব-কিছুই তো তাঁকে দিয়েছিল। তবু কেন? কিসের জন্য এই জীবন বৈরাগী উচ্ছৃঙ্খল কথাশিল্পী জীবনে সান্ত্বনা পান নি? পরলোকের জন্য একটু তৃপ্তি চেয়েছিলেন? তাঁর একথা অনেকে অনেক রকম অর্থে নিয়েছেন, কিন্তু সত্যিই কি তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকতে পারে? কয়েকটি শব্দ আরো বলেছিলেন। হতে পারে তাঁর তেষ্টা পেয়েছিল তাই একটু পিপাসার জল চেয়েছিলেন, আবার এও হতে পারে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মৃত্যুকে আহ্বান করেছিলেন? কী না হতে পারে, কিন্তু এ সবই তো আমাদের কল্পনা মাত্র।

সেদিন ১৬ জানুয়ারি রবিবার ১৯৩৮, তদনুসারে ২ মাঘ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ পৌষ-পূর্ণিমার দিন। সকাল দশটায় ভারতবর্ষের অপরাজেয় কথাশিল্পী, জনপ্রিয় সাহিত্যিক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ৬১ বৎসর ৪ মাস হয়েছিল। একদিন নিজেই তিনি বলেছিলেন, 'আমার জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেছি, শুধু ছোট কাজ কখনো করি নি। যখন মরব—ফরসা খাতা রেখে যাব যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গায়ও থাকবে না।'[১]

সেদিন কলকাতা মহানগরী দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। দলে দলে শোকার্ত নারী-পুরুষ রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে স্বর্গত সাহিত্যিকের উদ্দেশে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কয়েকটি সংবাদপত্রের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রেডিওতে ঘোষণা করা হয়। একজন ঔপন্যাসিকের জন্য এতখানি বেদনা প্রকাশ করা সত্যিই বিরল।

মোটরে করে মরদেহ বাড়ি নিয়ে আসা হল। সামনে দালানে পালঙ্কের উপরে ভারতের অমর কথাশিল্পীর নশ্বর দেহ অন্তিম দর্শনের জন্য রাখা হল। অগণিত ভক্ত অনুরাগী জন ছাড়াও অনেক গণ্যমান্য লোক তাঁকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য হাসপাতাল ও বাড়িতে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন,—মেয়র, সনৎকুমার রায়চৌধুরী, মাননীয় সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শরৎচন্দ্র বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, রমাপ্রসাদ মুখার্জী, কিরণশংকর রায়, ডাক্তার প্রভাবতী দাসগুপ্তা, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জে. সি. গুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, তুষারকান্তি ঘোষ, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন এস চ্যাটার্জী, উপেন্দ্রনাথ

১. শ্রীমতী লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত ২৪ অগাস্ট,১৯১৯-এর চিঠি।

গাঙ্গুলী, সুধাশংকর চট্টোপাধ্যায়, মুরলীধর বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, কুমার মণীন্দ্রদেব রায়, জনাব কে আহমদ, শ্রী ও শ্রীমতী মুকুলচন্দ্র দে, সতীশ সিংহ, রায়বাহাদুর জলধর সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ও প্রবোধকুমার সান্যাল।

পি. ই. এন কলকাতা শাখার তরফ থেকে তাঁর শবে মাল্যদান করা হয়। তিনটে বেজে পনেরো মিনিটে শবযাত্রা আরম্ভ হয়, শবযাত্রা পরিচালনার ভার দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় পতাকাসহ দর্শক মৌন বেদনার সঙ্গে বন্দেমাতরম্ ও শরৎচন্দ্রের জয়ধ্বনি করেন। পথে সুভাষচন্দ্র বসু ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে মালা অর্পণ করা ছাড়াও অনেকগুলি বিশিষ্ট সংস্থা ও কলেজের তরফ থেকে মরদেহে মাল্য দান করা হয়। একজন সাহিত্যিকের এই তো শেষ যাত্রা—কিরণশংকর রায় জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন,—

'এই কি বাঙালীর মনুষ্যত্ব, এই কি বাংলার কৃতজ্ঞতা? আজ বাংলার এতবড় সাহিত্যিক, এতবড় দেশভক্ত লোকান্তরিত হলেন, এই কি তাঁর শবযাত্রা? সমস্ত কলকাতা ভেঙে পড়ল না কেওড়াতলা শ্মশানে?'

শেষ পর্যন্ত যেখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও যতীন দাসের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়েছিল, সেই একই স্থানে শ্রীকান্তের স্রষ্টা, চিরব্রাত্য, চিরবেদনাতুর চরিত্রহীন বখাটে শরৎচন্দ্রের রোগক্লিষ্ট শরীর চিতায় রাখা হয়। ছোটভাই প্রকাশচন্দ্র শেষকৃত্য করেন। প্রকাশচন্দ্রের বালক পুত্র মুখাগ্নি করে।

সন্ধে প্রায় পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কেওড়াতলায় এক বিরাট জনসমুদ্রের সামনে তাঁর মরদেহ দাহ করা হয়।

পেছনে পড়ে রইল শুধু তাঁর অফুরন্ত বিচিত্র সব স্মৃতি, আর রইল তাঁর বিপুল সাহিত্য—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সতত সংগ্রামের অমর সাক্ষী। সাক্ষী রইল তাঁর এই দাবি—

'দুর্নীতি প্রচারের জন্য আমি কলম ধরিনি। মানুষের অন্তরে লুকানো মানবিকতা, সেই মহিমা যা সবাই দেখতে পায় না, নানা ভাবে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি।'

সারা বাংলা হাহাকার করে উঠল। তাঁর জীবিতাবস্থায় যাঁরা তাঁর বিপক্ষে ছিলেন, তাঁরা আজ মুক্তকণ্ঠে তাঁর প্রতিভাকে অভিনন্দন জানালেন। আধুনিক যুগের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে যিনি বাঙালী জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, দেশবাসীর সঙ্গে গভীর মর্মবেদনা অনুভব করে শোকসন্তপ্ত কবিগুরু লিখলেন—

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN BENGAL

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'॥

১২মাঘ
১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর দশদিন পরে কবিগুরু লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলি

পরিশিষ্ট ১

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উইলের প্রতিলিপি

This is the last will and testament of me
Sarat Chandra Chattop. of No 24 Aswini Dutt Road
within the municipal limits of Calcutta now lying
at the Park Nursing Home at Victoria Terrace
in the town of Calcutta I revoke all testamentary
dispositions if any heretofore made by me
I give devise and bequeath all my estate and
effects to my wife Smt Hiranmayee D of No 24
Aswini Dutt Road to be held and enjoyed by her
for the term of her natural life subject nevertheless
to the right of my brother to live in the premises
No 24 Aswini Dutt Road with his family as
he is at present doing and after my death
and my wife's death my brother Prakash's son
or sons who shall survive her shall be
the absolute owner
Notwithstanding anything hereinbefore
contained

This is the last will and testament of me, Sarat Chandra Chatterji of No. 24, Aswini Dutt Road, within the municipal limits of Calcutta, now lying at the Park Nursing Home at Victoria Terrace in the town of Calcutta, I revoke all testamentary dispositions if any heretofore made by me.

I give devise and bequeath all my estate and effects to my wife Smt. Hiranmayee Debi of No. 24, Aswini Dutt Road, to be held and enjoyed by her for the term of her natural life subject nevertheless to the right of my brother to live in the premises No. 24, Aswini Dutt Road, with his family as he is at present doing and after my death and my wife's death my brother Prokash's son or sons, who shall survive her, shall be the absolute owner.

Notwithstanding anything hereinbefore contained my moneys in the

contained my moneys in the Imperial Bank
shall be spent only for the purpose of
the marriage of my brother's daughter and
if there shall be any surplus the same
shall be spent for the use & benefit of
my brother's children & of any of them

In witness whereof I have set my hand
to this as my last will & testament
this the 11th day of January 1938

Sarat Chandra Chatterji

Signed by the abovenamed in
our presence who at his
request & in his presence
in the presence of each
other have signed as
attesting witnesses

N C Chunder
Solicitor Calcutta

Uma Prasad Mookerjee
advocate, Calcutta High Court
11 January 1938

Imperial Bank shall be spent only for the purpose of the marriage of brother's daughter and if there shall be any surplus, the same shall be spent for the use and benefit of my brother's children or of any of them

In witness whereof I have set my hand to this as my last will and testament, this the 11th day of January, 1938.

Sd. Sarat Chandra Chatterji

Signed by the abovenamed in our presence who at his request and in his presence and in the presence of each other have signed as attesting witnesses.

Sd. N. C. Chunder
Solicitor, Calcutta
Sd. Umaprosad Mookerjee
Advocate, Calcutta High Court
11, January, 1938

পরিশিষ্ট ২

শরৎপ্রয়াণে

উদয়োন্মুখ সূর্যের পানে ছিনু অপলক চেয়ে
সহসা কে যেন কহে–
শরৎ গিয়াছে স্বর্গে চলিয়া ছাড়ি' নশ্বর দেহে।
মনে হল এ কি সত্য? অথবা সৃষ্ট সত্য কারও?
গেজেটের ছাপা খবর আসিয়া উত্তর দিল তারও।
চক্ষে ঝরিল বারি–
'মানসচক্ষে উঠিল ভাসিয়া চরিত্রগাথা তারই।
পল্লীর পথে দেখিনু কাঁদিছে–বিজয়া, বিলাসী, রমা,
অচলার চোখে দেখিনু রয়েছে বেদনা-অশ্রু জমা।
বামুনের মেয়ে ভুলে গেছে যেন পথ বেছে যেতে আজ,
বেদন জাগালো রাজলক্ষ্মীর অশ্রুসিক্ত সাজ।
শ্রীকান্ত তার কলম ছেড়েছে পঞ্চমাঙ্ক শেষে,
গৃহদাহ স্মৃতি বুকে নিয়ে আজ শতেক মহিম আসে।
দেনাপাওনার হিসাবের শেষে পথে চলে নরনারী,
দেবদাস চলে পার্বতী পাশে জীবনের শেষ স্মরি'।
বড়দিদি ব'লে মরমের ডাকে ডেকে যায় শত ভাই,
কত মেজদিদি, বিন্দুর মত জননীর দেখা পাই।
মামলার ফল পল্লীর বুকে কতই রয়েছে জমা,
বৈকুন্ঠের উইল-রয়েছে মূর্তিমতী সে ক্ষমা।
শত পরিণীতা, অরক্ষণীয়া ভিড় করে চলে পথে,
কত ভারতী সে সব্যসাচীর চলিয়াছে সাথে সাথে।
পথের দাবীর শত সমস্যা পথে পথে আছে জমা,
পল্লীর বুকে সমস্যা রচে শতেক রমেশ, রমা।
কত সাবিত্রী, কিরণময়ী, অভয়ার দেখা পেনু পথে যেতে,
কত উপীনদা, সতীশ দেখনু, দিবাকর দেখি সাথে।
শেষ-প্রশ্নের কমল, তাহার প্রশ্ন অশেষ রহে,
শেষ স্মৃতির বুকে-বিপ্রদাসের চক্ষে অশ্রু বহে।
কত কথা আসে মনে–
খুঁটিনাটি দিয়ে রচা কত গাথা তাঁরই স্মৃতি টেনে আনে,
চাহিনু ধরার পানে।
মানসচক্ষে দেখনু বিশ্ব রত তাঁরই জয়গানে।
দেখিলাম যেন বিশ্বের বুকে বিশ্বের নরনারী
ভক্তি-অশ্রু দিয়ে গাঁথে আজি বিজয়-মাল্য তাঁরই।
নত করি নতশির
ক্ষুদ্রপ্রাণের শ্রদ্ধার সাথে ঢালি দিনু আঁখি নীর।।

–শ্রী শ্রীমৎ অসীমানন্দ সরস্বতী

[স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী কথিত আত্মকথা 'আমার জীবন' চতুর্থ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

পুরুলিয়া জেলার রামচন্দ্রপুরে 'শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম' ও 'নেতাজী আই হসপিট্যালে'র প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর সহিত শরৎচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বামীজী লিখেছেন, 'বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে সময় দেহত্যাগ করেন, সে সময় আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম। হঠাৎ শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ সংবাদ কানে এসে পৌঁছালো। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বর্ষোৎসবে তিনি যখন এসেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। আমার "বিপ্লবের শিখা" বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে তিনি একটা মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর বিয়োগ-বেদনায় রোগশয্যায় শুয়ে যে-কবিতা লিখেছিলাম, শোকসভায় সেটি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

পরিশিষ্ট ৩

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা পুস্তকের তালিকা

১। অপ্রকাশিত ডায়েরির অংশ—অক্ষয় কুমার
২। চলমান জীবন—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
৩। জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
৪। দরদী শরৎচন্দ্র—মণীন্দ্র চক্রবর্তী
৫। দেশবন্ধু ও গান্ধীজী -শংকরপ্রসাদ মিত্র
৬। পঞ্চশস্য—জরাসন্ধ
৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন
৮। বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন—শৈলেশ বিশী
৯। ব্রহ্মদেশে শরৎ -গিরীন্দ্র নাথ সরকার
১০। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র—যোগেন্দ্রনাথ সরকার
১১। যাঁদের দেখেছি—হেমেন্দ্রকুমার রায়
১২। রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ—সন্তোষকুমার দে
১৩। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়
১৪। রামতনু লাহিড়ী—শিবনাথ শাস্ত্রী
১৫। লেখকের মুখোমুখি—অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
১৬। শরৎচন্দ্র—কানাইলাল ঘোষ
১৭। শরৎচন্দ্র (তিন খণ্ড)—গোপালচন্দ্র রায়
১৮। শরৎচন্দ্র—নরেন্দ্র দেব
১৯। শরৎচন্দ্র (নাটক)—নন্দদুলাল চক্রবর্তী
২০। শরৎচন্দ্র—মদনমোহন কুমার
২১। শরৎচন্দ্র—সুবোধ সেনগুপ্ত
২২। শরৎচন্দ্র ও তারপর—কাজী আবদুল ওদুদ
২৩। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪। শরৎচন্দ্র(চিঠিপত্র)—গোপালচন্দ্র রায়
২৫। শরৎচন্দ্রঃ দেশ ও সমাজ—সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৬। শরৎচন্দ্রঃ সাহিত্য ও দর্শন—মনোরঞ্জন জানা
২৭। শরৎচন্দ্রিকা—নন্দদুলাল চক্রবর্তী
২৮। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী—অবিনাশ ঘোষাল
২৯। শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩০। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক (দুই খণ্ড)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৩১। শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা—অবিনাশ ঘোষাল
৩২। শরৎচন্দ্রের প্রণয় কাহিনী—গোপালচন্দ্র রায়
৩৩। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়
৩৪। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে—অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়
৩৫। শরৎ চেতনা—সোমসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৬। শরৎ পত্রাবলী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭। শরৎ পরিচয়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৮। শরৎ পরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৩৯। শরৎ প্রতিভা—সতীশচন্দ্র দাস
৪০। শরৎবন্দনা—শ্রী গুরুদাস লাইব্রেরী
৪১। শরৎবন্দনা—সম্পাদক নরেন্দ্র দেব
৪২। শরৎ স্মরণী—সম্পাদক গোপাল ভৌমিক
৪৩। শরৎস্মৃতি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৪। শেষ বৈঠক—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৪৫। শ্রদ্ধাস্পদেষু—নলিনীকান্ত সরকার
৪৬। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র—মোহিতলাল মজুমদার
৪৭। সম্পূর্ণ শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ—এম্ সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
৪৮। স্মৃতিকথা (চার পর্ব)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৪৯। স্মৃতিচারণ—দিলীপকুমার রায়

হিন্দি পুস্তকের তালিকা

১। অপারেশন—শরৎচন্দ্র
২। অমরনাথ—শরৎচন্দ্র
৩। ইয়ে অওর ওয়ে—জৈনেন্দ্রকুমার
৪। কাংগ্রেস কা ইতিহাস—ডাঃ পট্টাভি সীতারমৈয়া
৫। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত
৬। প্রভুপাদ শ্রী হরিদাস গোস্বামী—প্রকাশক রামনিবাস চণ্ডারিয়া
৭। প্রেমচন্দ্রঃ কলম কা সিপাহী—অমৃত রায়
৮। বন্দী জীবন—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল
৯। বংগলা সাহিত্য কী কথা—ডঃ সুকুমার সেন
১০। বংগলা সাহিত্য দর্শন—মন্মথনাথ গুপ্ত
১১। শরৎ কী সূক্তিয়াঁ—রামপ্রকাশ জৈন
১২। শরৎ কে নারী পাত্র—রামস্বরূপ চতুর্বেদী
১৩। শরৎ কে লতীফে—ডাঃ মহাদেব সাহা
১৪। শরৎচন্দ্র—লাবণ্যপ্রভা রায়
১৫। শরৎচন্দ্রঃ চিন্তন ওঅ কলা—ইন্দ্রনাথ মদান
১৬। শরৎচন্দ্রঃ ব্যক্তি অওর কলাকার—ইলাচন্দ্র যোশী
১৭। শরৎচন্দ্রঃ ব্যক্তি অওর সাহিত্যকার—মন্মথনাথ গুপ্ত
১৮। সঞ্চারিণী—শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদী
১৯। সম্পূর্ণ শরৎ সাহিত্য—হিন্দী গ্রন্থ রত্নাকর, বোম্বাই

ইংরেজি পুস্তকের তালিকা

১। আব্রাহাম লিঙ্কন—লর্ড চার্নউড
২। এরিয়েল—আঁদ্রে মোরা
৩। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার
৪। টলস্টয়—আলেকজান্দ্রা টলস্টয়

৫। নেপোলিয়ন—এমিল লুডবিগ
৬। বসওয়েল্‌স্‌ জনসন সেম্পলর
৭। মাদার্‌স্‌ অ্যান্ড সন্‌স্‌—শরৎচন্দ্র (অনুবাদ—দিলীপ কুমার রায়)
৮। লস্ট ফর লাইফ—ইরউইক স্টোন
৯। শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জী—হুমায়ুন কবীর

সহায়ক পত্রিকার তালিকা

বাংলা ঃ

১। আমরা—নয়াদিল্লি
২। উত্তরা—বারানসী
৩। কল্লোল—কলকাতা
৪। কালিকলম—কলকাতা
৫। গল্পভারতী - কলকাতা
৬। জয়শ্রী—কলকাতা
৭। তরুণের স্বপ্ন—কলকাতা
৮। দীপালী—কলকাতা
৯। দেশ—কলকাতা
১০। প্রবর্তক—কলকাতা
১১। প্রবাসী—কলকাতা
১২। বঙ্গশ্রী—কলকাতা
১৩। বসুমতী—কলকাতা
১৪। বাতায়ন—কলকাতা
১৫। বিশ্বভারতী—শান্তিনিকেতন
১৬। ভারতবর্ষ—কলকাতা
১৭। রবীন্দ্রভারতী - কলকাতা

হিন্দি ঃ

১৮। ধর্মযুগ—বোম্বাই
১৯। নবনীত—বোম্বাই
২০। ভারতী—বোম্বাই
২১। সাপ্তাহিক হিন্দুস্তান—নয়াদিল্লি
২২। হিমপ্রস্থ—সিমলা

ইংরেজি ঃ

২৩। ফ্রেন্ড—কলকাতা
২৪। মডার্ন রিভিউ—কলকাতা

পরিশিষ্ট ৪

সহায়ক ব্যক্তি

(ক) যাঁদের সঙ্গে লেখক সাক্ষাৎ করেছেন ঃ

১। অনিলবরণ রায়—রাজনৈতিক জীবনের এক বন্ধু
২। অবিনাশ ঘোষাল—সুপরিচিত লেখক
৩। অমল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—মামা গিরীন্দ্রনাথের পুত্র
৪। অমল হোম—সুপরিচিত লেখক
৫। ডাঃ অমিয় কুমার সেন—রেঙ্গুনের অফিসের এক সহকর্মীর পুত্র
৬। অমৃতলাল নাগর—সুপরিচিত হিন্দি লেখক
৭। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়—সুপরিচিত সাহিত্যিক
৮। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—সুপরিচিত সাহিত্যিক
৯। ইলাচন্দ্র যোশী—সুপরিচিত সাহিত্যিক
১০। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সম্পর্কে মামা, সুপরিচিত লেখক
১১। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সুপরিচিত সাহিত্যিক
১২। এ. এন্. বিশ্বাস—রেঙ্গুনের এক পরিচিত বন্ধু
১৩। এম্. এম্. দাস—রেঙ্গুনের এক বন্ধু
১৪। এম্. সি দাস— রেঙ্গুনের এক বন্ধু
১৫। এস্. এম্. দোশী—রেঙ্গুনের এক বন্ধু
১৬। এস্. এম্. মজুমদার—ভাগলপুরের ছেলেবেলার পরিচিত এক বন্ধু
১৭। কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী—সুপরিচিত সাহিত্যিক
১৮। গোপাল—শেষ জীবনের ভৃত্য
১৯। চণ্ডীচরণ ঘোষ—ভাগলপুরের বাল্যবন্ধু
২০। চন্দ্রশেখর ঘোষ—ভাগলপুরের বাল্যবন্ধু
২১। জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী)—সুপরিচিত সাহিত্যিক
২২। দিলীপকুমার রায়—অন্তরঙ্গ বন্ধু, সুপরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ ও লেখক
২৩। নকুলচন্দ্র পতি—গ্রামের প্রতিবেশী
২৪। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—সুপরিচিত লেখক
২৫। নরেন্দ্র দেব—অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সুপরিচিত সাহিত্যিক
২৬। নলিনীকান্ত সরকার—সুপরিচিত লেখক
২৭। পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়—মামা সুরেন্দ্রনাথের পুত্র
২৮। প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায়—বারানসীর এক পরিচিত মামা
২৯। প্রবোধ কুমার সান্যাল—সুপরিচিত সাহিত্যিক
৩০। প্রমথনাথ রায়—মজঃফরপুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু
৩১। প্রেমেন্দ্র মিত্র—সুপরিচিত সাহিত্যিক
৩২। ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ভাগলপুরের ছেলেবেলার বন্ধু
৩৩। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)—সুপরিচিত সাহিত্যিক
৩৪। বাচস্পতি পাঠক—সুপরিচিত হিন্দি লেখক
৩৫। বীরেন্দ্রনাথ সরকার—সুপরিচিত চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক
৩৬। ভূপতিভূষণ ঘোষ—ভাগলপুরের ছেলেবেলার পরিচিত এক বন্ধু

৩৭। ভূপেন চৌধুরী—রেঙ্গুনের এক পরিচিত বন্ধু
৩৮। ডাঃ মহাদেব সাহা—সুপরিচিত লেখক
৩৯। মহাবীর প্রসাদ পোদ্দার—সুপরিচিত প্রাকৃতিক চিকিৎসক
৪০। রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—মামা সুরেন্দ্রনাথের পুত্র
৪১। রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—সুপরিচিত বিচারপতি এবং 'বঙ্গবাণী'র পরিচালক
৪২। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—সুপরিচিত ঐতিহাসিক
৪৩। রাজেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ—সুপরিচিত লেখক
৪৪। রাধারাণী দেবী—সুপরিচিতা বাঙালী কবি
৪৫। রূপেন সেন—রেঙ্গুনের এক পরিচিত বন্ধু
৪৬। রেণুকা কর—রেঙ্গুনের এক সহকর্মীর কন্যা
৪৭। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়—সুপরিচিত লেখক
৪৮। শিশির কুমার মিত্র—সুপরিচিত লেখক ও প্রকাশক
৪৯। সজনীকান্ত দাস—সুপরিচিত বাংলা লেখক ও সাংবাদিক
৫০। সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মাসতুত ভাই
৫১। সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—সুপরিচিত লেখক
৫২। সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি—বোনের শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়াদি
৫৩। সুবোধ চট্টোপাধ্যায়—রেঙ্গুনের এক বন্ধু
৫৪। সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ—সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী
৫৫। সুরেশ চক্রবর্তী—সুপরিচিত লেখক
৫৬। সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—মামা মণীন্দ্রনাথের পুত্র
৫৭। সোমেন্দ্রনাথ বসু—সুপরিচিত লেখক
৫৮। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু
৫৯। হুমায়ুন কবীর—সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও রাজনীতিজ্ঞ
৬০। হেমেন রায়—ভাগলপুরের এক পরিচিত বন্ধু

(খ) যাঁদের সঙ্গে লেখকের পত্র-বিনিময় হয়েছে ঃ

১। অজহরুদ্দীন খাঁ—সুপরিচিত সাংবাদিক
২। অন্নদাশঙ্কর রায়—সুপরিচিত সাহিত্যিক
৩। অশোক চট্টোপাধ্যায়—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র এবং সুপরিচিত লেখক
৪। গুরুদয়াল মল্লিক—সুপরিচিত সন্ন্যাসী সাহিত্যিক
৫। ধর্মেন্দ্র গৌড়—সুপরিচিত লেখক
৬। পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়—মজঃফরপুরের এক বন্ধু
৭। পুলিনবিহারী সেন—সুপরিচিত লেখক
৮। বি. সি. মুখার্জী—রেঙ্গুনের এক বন্ধু
৯। বিভূতিভূষণ ভট্ট—অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু ও সুপরিচিত লেখক
১০। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—সুপরিচিত লেখক
১১। রেজিসট্রার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১২। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সম্পর্কে মামা, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন
১৩। সভাপতি, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন
১৪। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—সুপরিচিত ভাষাবিদ ও লেখক
১৫। সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মজঃফরপুরের এক বন্ধু
১৬। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ—অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ
১৭। হিমাংশুভূষণ রায়—ছেলেবেলার এক বন্ধুর পুত্র

(গ) অন্যান্য ব্যক্তিঃ

১। অনু বেন–শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সাধিকা
২। অমর মজুমদার–সুপরিচিত সাংবাদিক
৩। অসিত কুমার হালদার–সুপরিচিত লেখক
৪। ডাঃ ওমপ্রকাশ–রেঙ্গুনের চিকিৎসক
৫। কাশীনাথ রায়–সুপরিচিত লেখক
৬। কুমুদিনীকান্ত কর–রেঙ্গুনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী
৭। কৃষ্ণাচার্য–সুপরিচিত লেখক
৮। গ্রন্থাগারিক, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা
৯। জগদীশ এম্.এ.–সুপরিচিত লেখক
১০। জে. কে. ডাঙ্গে–মরাঠি লেখক
১১। জৈনেন্দ্রকুমার–সুপরিচিত সাহিত্যিক
১২। দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী–দেবানন্দপুরের জনৈক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি
১৩। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়–সুপরিচিত লেখক
১৪। ননীগোপাল দে–রেঙ্গুনের জনৈক বাসিন্দা
১৫। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত–সুপরিচিত লেখক
১৬। নিরুপমা দেবী–কৈশোরের পরিচিতা, সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা
১৭। পৃথ্বীনাথ শাস্ত্রী–সুপরিচিত লেখক
১৮। প্রমথ চৌধুরী–সুপরিচিত লেখক
১৯। বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়- ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী
২০। ডঃ বচনদেব কুমার–সুপরিচিত লেখক
২১। বিমল বসু–সুপরিচিত চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক
২২। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়–সুপরিচিত লেখক
২৩। বিষ্ণুকান্তি শাস্ত্রী–সুপরিচিত লেখক
২৪। ব্রহ্মানন্দ -সুপরিচিত লেখক ও অগ্রজ
২৫। ভগবান চন্দ্র বিনোদ- সুপরিচিত লেখক
২৬। ভীমসেন ত্যাগী–সুপরিচিত লেখক
২৭। মনোজ বসু–সুপরিচিত লেখক
২৮। মামা বরেরকর–সুপ্রসিদ্ধ মরাঠি সাহিত্যিক
২৯। মোহন সিংহ সেঙ্গর–সুপরিচিত লেখক
৩০। যশপাল জৈন–সুপরিচিত লেখক
৩১। রতনলাল যোশী–সুপরিচিত লেখক
৩২। রাধাকৃষ্ণ–সুপরিচিত লেখক
৩৩। রামচন্দ্র ট্যাণ্ডন–সুপরিচিত লেখক
৩৪। ডাঃ রামশরণ আগরওয়াল–বিকানীর
৩৫। ডাঃ শিবনন্দন প্রসাদ–সুপরিচিত লেখক
৩৬। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়–সুপরিচিত লেখক
৩৭। সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা–সুপরিচিত লেখক, ব্রহ্মদেশ
৩৮। সত্যেন্দ্রনারায়ণ–সুপরিচিত লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ
৩৯। সুজাতা সেন–সুপরিচিতা লেখিকা
৪০। সুধীর ঘোষ–সুপরিচিত লেখক

৪১। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র–সুপরিচিত লেখক
৪২। স্বামী সুন্দরানন্দ–সুপরিচিত পর্যটক ও চিত্রকর
৪৩। হরিশঙ্কর শর্মা–সুপরিচিত লেখক
৪৪। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়–সুপরিচিত লেখক

'ধন্য শরৎচন্দ্র। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কোথা থেকে অবতীর্ণ হলে? বাস্তবিক তোমার মত একজন লেখকের বড়ই প্রয়োজন ছিল। সামাজিক ব্যাধি ও দুর্নীতি প্রভৃতি অঙ্কিত করবার জন্য তুমি যে তুলি ধরেছ তাহা অতুলনীয়।

'কখনও তুমি ধার্মিক বিশ্বাসের উপর বাজে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করনি তাই কুসংস্কার, কুপ্রথার বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করতে তুমি কুণ্ঠিত হও নি। তোমার লেখাগুলি মর্মস্পর্শী, অন্তরের গভীরতম স্থানে তোমার চরিত্রগুলির সঙ্গে একাকার হওয়ার অফুরন্ত সুযোগ। তোমার আর একটি বিশেষত্ব হল চরিত্রের সুখ-দুঃখ যেন পাঠকের নিজের সুখ-দুঃখ। সব কিছুই কেমন সহজ চেষ্টাপ্রসূত কল্পনা নয়–প্রতিদিনের জীবন থেকে চরিত্র সৃষ্টি করেছ।'

— আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ডায়ারি থেকে

'শরৎবাবু সাহিত্যিক হিসাবে মহান হইলেও তিনি সম্ভবত মহত্তর ছিলেন দেশপ্রেমিক হিসাবে। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা কংগ্রেস আজ নিঃসন্দেহে দীনতর হইয়া পড়িয়াছে।'

— সুভাষচন্দ্র বসু